আর্য্য-দর্পণ।

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্র)।

৯ম বর্ষ।

(বঙ্গাব্দ ১৩২৩)————(শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪৩০—৪৩১।)

সারস্বত মঠের

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম হইতে শ্রীপ্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Registered No C. 811.

যোরহাট।

দর্পণ-প্রেসে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা বরুবা দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের প্রতিষ্ঠিত
সারস্বতমঠ হইতে প্রকাশিত
সারস্বত গ্রন্থাবলী—

১। ব্রহ্মচর্য্য-সাধন মূল্য ॥৹ আট আনা।
২। যোগি-গুরু (৩য় সংস্করণ) মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা।
৩। জ্ঞানি-গুরু (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ২।৹ সোওয়া দুই টাকা।
৪। তান্ত্রিক-গুরু মূল্য ১৸৹ এক টাকা বার আনা।
৫। প্রেমিক-গুরু মূল্য ১৸৹ এক টাকা বার আনা।
৬। মায়ের কৃপা মূল্য ।৹ আনা।
৭। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা মূল্য ॥৹ আনা।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ধর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে; ধর্ম্মপিপাসু নরনারিগণ অতি সাদরে গ্রহণ করিতেছেন, একথা বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্ম্মের সার সংগ্রহকরতঃ এই কয়খানি অমূল্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই কয়খানি পুস্তক ঘরে থাকিলে আর বিশাল হিন্দুশাস্ত্রগুলি ঘাঁটিয়া মাথা খারাপ করিতে হইবে না। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি, যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই সারতথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকগুলি লণ্ডন ও বৃটিশ মিউজিয়ম সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রশংসাপত্র ও প্রণেতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই পুস্তকগুলি ২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে; ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্, ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ৪৮নং নবাবপুর, ঢাকা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়ের নিকট, চট্টগ্রাম আশুতোষ লাইব্রেরীতে, যোরহাট—মেসার্স মান্না এণ্ড কোং এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যাইবে।

উপদেশ-সংগ্রহ বা মহাজন বাক্য মূল্য ৶৹ আনা।

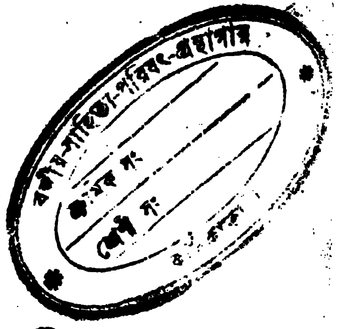
আশ্রমাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেবের হাফ্‌টোন ফটো সুন্দররূপে মুদ্রিত; আকার ১৫″×১২″, মূল্য ।৹ আনা। ছোট ফটো ৴৹ আনা এবং "আর্য্য-দর্পণের" পুরাতন সংখ্যাগুলিও এখানে পাওয়া যায়। ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষের পত্রিকাগুলি অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া হইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন। শ্রীকুমার চিদানন্দ কার্য্যাধ্যক্ষ, "আর্য্য-দর্পণ"। সারস্বতমঠ, পোঃ কোকিলামুখ, (যোরহাট) আসাম।

৯ম বর্ষের সূচীপত্র।

(বর্ণমালানুসারে)

—:0:—

ওঁ তৎসৎ।



আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, } বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

গুর্ব্বষ্টক।*

(১)

লভিয়াছ দেহ খানি সুরূপ সুঠাম,
লভিয়াছ রূপবতী রমণীর প্রেম,
তোমার বিমল যশে ধরা উদ্ভাসিত,
মেরুতুল্য ধনরাজি আছে অগণিত,
কিছু নয়, কিছু নয়, জানিও নিশ্চয়,
শ্রীগুরু-চরণে যদি মতি নাহি হয়।

(২)

কলত্রাদি ধন পুত্র লভিয়াছ ভবে,
হয়েছ বিত্তবশালী অতুল বিভবে,
কাটাও সুখেতে দিন বন্ধুগণসহ,
করেছ নির্ম্মাণ তুমি মনোহর গেহ,
কিছু নয়, কিছু নয়, জানিও নিশ্চয়,
শ্রীগুরু-চরণে যদি মতি নাহি হয়।

(৩)

ষড়ঙ্গাদি বেদ তুমি করেছ পঠন,
অনুক্ষণ শাস্ত্রবিদ্যা কর আলোচন,
অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি করেছ অর্জ্জন,
গদ্য পদ্য অবহেলে করিছ রচন,
কিছু নয়, কিছু নয়, জানিও নিশ্চয়,
শ্রীগুরু-চরণে যদি মতি নাহি হয়।

(৪)

হয়েছ বিদেশে তুমি অতি গণ্য মান্য,
স্বদেশে তোমায় সবে করে ধন্য ধন্য,
করিছ অনুষ্ঠান যত সদাচার,
কর নি জীবনে তুমি কোন অনাচার,
কিছু নয়, কিছু নয়, জানিও নিশ্চয়,
শ্রীগুরু-চরণে যদি মতি নাহি হয়।

---

*শ্রীমদ্ভগবান শঙ্করাচার্য্য কৃত "গুর্ব্বষ্টকের" অনুবাদ।

(৫)

এ মহীমণ্ডলে আছে যত ভূপগণ,
করিছে সকলে তব চরণ সেবন,
তোমার সমান আর কেহ নাই ভবে,
হইয়াছ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় বিভবে,
কিছু নয়, কিছু নয়, জানিও নিশ্চয়,
শ্রীগুরু-চরণে যদি মতি নাহি হয়!

(৬)

তোমার দানের যশে ধরা মুখরিত,
প্রবল প্রতাপে তব ধরা বশীভূত,
জগতের যত কিছু বিষয় বিভব,
যাঁহার প্রসাদে তুমি লভেছ এসব,
কিছু নয়, কিছু নয়, জানিও নিশ্চয়,
সে গুরু-চরণে যদি মতি নাহি হয়।

(৭)

নাহি তব স্পৃহা আর ধনজন-ভোগে,
জন্মেছে বিরাগ তব যত যোগে যাগে,
কাম্যবস্তু উপভোগে না আছে বাসনা,
বিত্ত কিম্বা কান্তাসুখে নাহিক কামনা,
তুচ্ছাতিতুচ্ছ ইহা জানিও নিশ্চয়,
শ্রীগুরু-চরণে যদি মতি নাহি হয়।

(৮)

বিজন কাননবাসে নাহি অভিলাষ,
বিতৃষ্ণা জন্মেছে গৃহে করিবারে বাস,
বিষয় কর্ম্মেতে তব নাহি অনুরাগ,
প্রাণপ্রিয় দেহ প্রতি হয়েছে বিরাগ,
তুচ্ছাতিতুচ্ছ ইহা জানিও নিশ্চয়,
শ্রীগুরু-চরণে যদি মতি নাহি হয়।

(৯)

বহুমূল্য ধনরত্ন বিষয় বিভব,
পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়াছ সব,
ভুজপাশে আলিঙ্গিয়ে রূপসী কামিনী,
কাটায়েছ মনসুখে কত না যামিনী,
তুচ্ছাতিতুচ্ছ ইহা জানিও নিশ্চয়,
শ্রীগুরু-চরণে যদি মতি নাহি হয়।

(১০)

যদি বা পঠয়ে ইহা পুণ্যদেহী যতি,
ব্রহ্মচারী, গৃহাশ্রমী অথবা ভূপতি,
বিফল না হবে তার পাঠ কদাচন,
অভীষ্ট বাসনা তার হইবে পূরণ,
এই গুরুবাক্যে যার নিবেশিত চিত,
ব্রহ্মসংজ্ঞ লাভ তার হইবে নিশ্চিত,

দীন—উমেশচন্দ্র।

—:০:—

প্রার্থনা।*

হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবো মাং প্রসীদতু।

হে আনন্দময় পরমেশ্বর! এই বসন্ত সময়ে জগতে কি মনোহর শোভাই প্রকাশিত করিয়াছ! তরুগণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, পর্ব্বদিবস ভাবিয়া নূতন পল্লবমালারূপ নব পরিচ্ছদ ধারণ-

*এই প্রার্থনাটী স্বর্গীয় কিশোরীলাল রায়ের লিখিত। আঃ দঃ সং—

করতঃ অপূর্ব্ব শোভা প্রদর্শন করিতেছে। লতারূপ দেবকামিনিগণ নবপল্লবপরিচ্ছদ সহকারে কুসুমহার ধারণ করিয়া সৌরভ বিস্তার করায় গুণ গুণ স্বরে ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জন করতঃ মনোহর নিকুঞ্জস্থলকে অধিকতর মনোরম করিয়া তুলিয়াছে, গুঞ্জন-ছলে অলিকুল যেন লতাকামিনীদিগক বন্দনাই করিতেছে।

হে আনন্দময় পরমেশ্বর, তুমি আমাদিগের নয়ন-রঞ্জনার্থ তরুগণকে নবীন পল্লব ও নব কুসুমে সুশোভিত করিয়া আমাদিগের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি এই সময়ে সুনীল বর্ণ গগনতল মেঘবিমুক্ত রাখিয়া কি অনুপম আনন্দই প্রদান করিতেছ। উহাতে রজনীযোগে অসংখ্য হীরকখণ্ডপ্রতিম অসংখ্য তারকামালা সজ্জিত করিয়া তোমার করুণা-প্রকাশক কি চমৎকার ঐশ্বর্য্যই না প্রকাশ করিতেছ। যখন সাধক গম্ভীর নিস্তব্ধ রজনীতে সেই অগণ্য দিব্য হীরকখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ অনুপম শোভা-সন্দর্শন রূপ বিমলানন্দ উপভোগ করেন, তখন তাঁহার হৃদয় তোমার মহিমা ও করুণা আলোচনা করিয়া,—ভক্তি রসাপ্লুত হইয়া আপনা হইতেই কহিতে থাকে, "জগদীশ্বর অপার তোমার করুণা ও অসীম তোমার মহিমা, তোমাকে নমস্কার।" যখন মনে করে, এইকালে বিবিধ বর্ণরঞ্জিত ও মধুর সৌরভভূষিত অগণ্য কুসুমদাম প্রস্ফুটিত হইয়া জগৎকে আনন্দকানন করিয়া তুলিয়াছে, তখন হৃদয় আপনা হইতেই কহিতে থাকে, "অপার তোমার করুণা! অপার তোমার করুণা! জগদীশ্বর, তোমাকে নমস্কার।" সরোবরের বিমল জলে কমল প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে যেন হাস্যপূর্ণ করিয়াই রাখিয়াছে। তাহাতে আবার যখন ধবলবর্ণ হংসগণ কলধ্বনিকরতঃ ইতস্ততঃ ধীরে ধীরে সন্তরণ করিয়া সলিল আন্দোলনকরতঃ পদ্মদলকে ক্ষণে ক্ষণে মনোহরভাবে নাচাইয়া দর্শকগণের অনুপম আনন্দ জন্মাইতেছে, তখন সাধু দর্শকগণ অবশ্যই হৃদয়ের সহিত কহিতেছেন, "অপার তোমার করুণা! জগদীশ্বর, তোমাকে নমস্কার।" এইকালে যখন কোকিল প্রভৃতি সুকণ্ঠগণের সুমধুর কণ্ঠনাদ আমাদিগের শ্রুতিবিবরে শত ধারে সুধাধারা বর্ষণ করিতে থাকে, তখন হৃদয় আপনা হইতেই কহিয়া উঠে, "করুণাময়! অপার তোমার করুণা, তোমাকে নমস্কার।" যখন ময়ূর ময়ূরী অপূর্ব্ব শোভাযুক্ত পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া আনন্দভরে নৃত্য করিতে থাকে, তখন দর্শকের হৃদয়ও ভক্তিরসার্দ্র হইয়া আনন্দে নৃত্য করতঃ বলিতে থাকে, "অপার তোমার করুণা, জগদীশ্বর, অপার তোমার করুণা, তোমাকে নমস্কার।" যখন দেখি, মনোহর খঞ্জন কখন বা স্বচ্ছসলিলাবিশিষ্ট সরোবরের মধ্যে প্রস্ফুটিত কমলোপরি, কখন বা গৃহপ্রাঙ্গনে এবং কখন বা নদীতীর প্রভৃতি স্থানে মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে, তখন আমাদিগের হৃদয়ও তদ্দর্শনে উল্লাসিত হইয়া ভক্তিভাবে কহিতে থাকে, "নাথ! তুমি জগতে এত আনন্দ বর্ষণ করিয়াছ যে, একটী সামান্য বিহঙ্গম পর্য্যন্তও সেই আনন্দ ভরে নৃত্য করিতেছে, "অপার তোমার করুণা! তোমাকে নমস্কার।" যখন দেখি বসন্ত সমীরণ বিবিধ পুষ্পনিঃসৃত সৌরভ মাখিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করতঃ ধরাতল আমোদিত করিতেছে, তখন আমাদিগের হৃদয় না কহিয়াই থাকিতে পারে না যে, "জগদীশ্বর! অপার তোমার করুণা, তোমাকে নমস্কার।"

যখন দেখি এই কালে মলয় সমীরণ সেবন করিয়া জনগণ পূর্ব্বকালীন রুগ্নাবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিতেছে, তখন আমাদিগের হৃদয় কি কহিতে চায় না যে,—হে জগদীশ্বর, তুমি জগতে নানা উপায়েই অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছ। তোমাকে নমস্কার।" এই বসন্তকালে তরুনিচয় নবশোভা ধারণ করিতেছে, ধরাতল হরিদ্বর্ণ নবীন তৃণরাশিতে সুসজ্জিত হইতেছে, কুসুমকানন নানাবিধ পুষ্পরঞ্জিত হইয়া নবীন শোভা ধারণ করিতেছে, বিহঙ্গমগণ তাহাদিগের আপন আপন নানাবর্ণ রঞ্জিত পক্ষপুঞ্জে অভিনব উজ্জ্বলতা লাভ করিয়া নয়নানন্দকর নবীন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে, বিবিধ কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের সুমধুর কণ্ঠনাদ নবীন মাধুর্য্য লাভ করিয়া সঙ্গীত সুধাবর্ষণ করিতেছে, মনুষ্যগণ বসন্ত সমাগমে মনোরম নবীনকান্তি ধারণ করিয়া স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। গগনমণ্ডল শীতকালের কুজ্ঝটিকা মুক্ত হওয়াতে নব-নীলিমাশোভা বিকীর্ণ করিয়া জীবদিগকেই আনন্দিত করিতেছে, নিশাকালে আবার বাসন্তিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নির্ম্মলগগনে মনোরম অসংখ্য নক্ষত্র পরিবেষ্টিত হইয়া নবশোভাবিশিষ্ট নিশানাথ নবকৌমুদীমালা বিকীর্ণ করতঃ ধরাকে ধবলিত করিতেছে, অভিনব স্ফূর্ত্তিলাভ করতঃ মনুজগণ নব অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া বিবিধ সুমধুর বাদ্যযন্ত্র সহকারে নানা প্রকার গীতালাপ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছে। ধবলী, শ্যামলী প্রভৃতি গাভিগণ মাঠে মাঠে নব তৃণরাশি সন্দর্শন করিয়া নবীন স্ফূর্ত্তিলাভ করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, আর রাখালগণ স্থানে স্থানে উপবেশনকরতঃ গান করিয়া পথিকগণকে আনন্দিত করিতেছে। এমন কি সমুদায় জগতেই যেন পুনরায় সৃষ্ট হইয়া অভিনব সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীরণকরতঃ জীবপুঞ্জকে আনন্দিত করিতেছে। করুণাময় পরমেশ্বর! তুমি ধরাতলে, নভোমণ্ডলে, জীব-কলেবরে, কুসুমকাননে, তরুপল্লবে ও সরসীজলে অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিয়াছ, আমাদিগকে অনুপম আনন্দে আনন্দিত করিতেছ,—আমরা করজোড়ে ভক্তিগদগদ চিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য কর, আর আমাদের হৃদয়ে ভক্তি এবং দেহে শক্তি দিয়া আশীর্ব্বাদকর, এই নব বর্ষে আমরা যেন নূতন মনপ্রাণ লইয়া, হে চিরনূতন! তোমার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। পরিশেষে প্রার্থনা এই যে,—তুমি অনাদি পুরাতন হইয়া যেমন নিত্য নূতনরূপে প্রকাশিত হইতেছ, তোমার কৃপায় আমরাও যেন সনাতন ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের সেইরূপ নূতন মূর্ত্তি নব নব প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়া নব বর্ষের প্রবীণ গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দকে নবীনানন্দ প্রদান করিতে পারি। ওঁ শান্তি।

———:০:———

আবাহন।

এস গোরা মাতোয়ারা
ভক্তগণ মনচোরা,
প্রেমানন্দে নেচে গেয়ে এস হে আবার।

এস গৌর গুণমণি,
এস অমিয়ার খনি,
ঢালিতে জগতে (পুনঃ) প্রেমের অমিয়ধার॥

দীনের ঠাকুর এস,
ভক্তগণ হৃদয়েশ,
পাপী তাপী কোলে নিতে এস হে আবার।

বিতরিয়ে প্রেম সুধা
মিটাও জীবের ক্ষুধা
মৃতদেহে পুনঃ প্রাণ হউক সঞ্চার॥

এস এস গৌরহরি,
নিত্যানন্দ শ্রীমুরারি,
সঙ্গে লয়ে আর যত পারিষদগণ।

ধরা বুঝি যায় তল,
পাপে ক্ষিতি টলমল,
এস ত্বরা পাপভার করিতে মোচন॥

এস এস গোরাচাঁদ
পাতিয়ে প্রেমের ফাঁদ
কর পুনঃ প্রেমলীলা অবনী মাঝার॥

এস করুণার সিন্ধু,
এস পতিতের বন্ধু,
নদীয়ার প্রেম-ইন্দু এস হে আবার

সুমধুর নাম গানে,
মাতাও জগত জনে,
প্রেমের প্লাবন পুনঃ বহুক ধরায়॥

ঘরে ঘরে দিয়ে নাম,
পুরাইতে মনস্কাম,
এস পুনঃ সঙ্গে লয়ে নিত্যানন্দ রায়॥

আত্মপর গিয়ে ভুলে,
ভাই ভাই সবে মিলে,
ভেদজ্ঞান তিয়াগিয়ে মাতুক আবার।

গেয়ে হরি গুণ গান
মাতুক সবার প্রাণ
বাজিয়ে উঠুক (পুনঃ) নীরব বীণার তার॥

দীন—হরিদাস।

ধর্ম্ম ও সাধনার প্রয়োজন।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের উচ্চ শ্রেণীর জীব মানুষ হইতে অতি নিম্ন শ্রেণীর জীব কীটপতঙ্গাদি পর্য্যন্ত, সকলেই সুখের জন্য অহোরাত্র লালায়িত,—সুখের জন্য প্রতিক্ষণ ব্যস্ত। তাহাদের স্বভাব, গতি ও ব্যবহার দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সুখের আশা সকলেই করে; কিন্তু সুখী কে? অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, পৃথিবীর একছত্রাধিপতি সম্রাট হইতে কুটিরবাসী ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই আশা—আকাঙ্ক্ষার তীব্র দংশনে

নিয়ত অস্থির। ধন-জন বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বল, ঐশ্বর্য্য বল কিছুতেই মানুষ তৃপ্ত থাকিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। দিল্লীর প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্‌গণ চন্দ্রিকাশালিনী বসন্ত-যামিনীর মধ্যভাগে মৃত্তিকা-শয্যায় শয়ন করিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। এ সংসারে কাহারও আশা পূরে না—সাধ মিটে না। কেহ এক বিষয়ে সুখী হইলেও অন্যান্য পাঁচ বিষয়ে নিরন্তর মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছে। তবে সুখ কোথায়? সুখী কে?

সুখ অর্থে (সু=উত্তম+খ [জ্ঞানের] ইন্দ্রিয়) ইন্দ্রিয় জ্ঞানের স্বভাব নিয়মিত স্ফূর্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য। ইন্দ্রিয় আত্মার শক্তি বিশেষ। তাহা হইলেই বলা যাইতে পারে যে, আত্মশক্তি-জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্যই সুখ। ধর্ম্ম সেই সুখের উপায়, ধর্ম্ম-সাধনার দ্বারাই ইন্দ্রিয় শক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য সাধিত হয়। সুতরাং ধর্ম্ম কি, প্রথমতঃ তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে।

"ধ্রিয়তে ধর্ম্ম ইত্যাহু"—ধারণ করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্ম। পুণ্য কি, পাপ কি, জ্ঞান কি, অজ্ঞান কি, সুন্দর কি, কুৎসিত কি,—এক কথায় ভাল কি, মন্দ কি, যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। লোকত্রয় যাহাতে ধৃত বা নিহিত, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। অথবা লোকসকল যাহাকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম। কেবল লোকসকল বলিয়া নয়,—মহদাদি অণু পর্য্যন্ত, ভুবনত্রয়ে যাহা কিছুর সম্ভাবনা আছে, তৎসমস্তই ধর্ম্মের দ্বারা ধৃত, রক্ষিত ও পরিচালিত। ধর্ম্মই জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রী,—ধর্ম্মই সুখের স্বরূপ। ধর্ম্মের জন্যই জাগতিক পদার্থের আকুল আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ ছুটাছুটী।

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, উদ্ভিদ ও জড়পিণ্ড প্রভৃতি ত্রিলোকস্থ যাবতীয় পদার্থেরই ধর্ম্ম ও সাধনার আবশ্যকতা আছে। তবে মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, ধর্ম্ম আছে, আর পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বা উদ্ভিদাদির ধর্ম্ম আছে, কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান নাই। ধর্ম্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মানুষ জীব-সৃষ্টির চরমোন্নতি—ধর্ম্মসাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র; তাই মানুষ জন্মজন্মান্তরের অনুশীলনবলে ধর্ম্মজ্ঞানে সমুন্নত হয় ও সাধন পথে অগ্রসর হইয়া পড়ে, অন্যান্য জীবে তাহা পারে না। কিন্তু তাহারাও ধর্ম্মদ্বারা চালিত ও রক্ষিত। মানুষ এবিষয়ে অধিকাংশে স্বাধীন, ইতর জীব প্রকৃতির অধীন। হার্বার্ট স্পেন্সার-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, ক্রমবিবর্ত্তনবাদে একবিন্দু বালুকাকণা মহা মহীধরে পরিণত হয়।" কথাটা সত্য—বালুকা-কণার যে ধর্ম্ম আছে, সেই ধর্ম্মই তাহাকে ক্রমে ক্রমে মহীধরে পরিণত করিবে। কিন্তু ঐ বালুকা-কণার ক্রমোন্নতি প্রকৃতির ধর্ম্মে সম্পাদিত হয়, আর মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান থাকায়, সে ইচ্ছা করিলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে।

আবার মানুষ হইলেই যে, তাহার ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকার করিতে পারা যায় না। পাহাড় বা বন-জঙ্গলে ও অনেক অসভ্যদেশে আজিও এমন মানুষ আছে যে, তাহারা ধর্ম্ম কি জানে না বা কোন প্রকারেই ধর্ম্মের সাধন কি অনুশীলন করে না। এমন কি সভ্যসমাজে জন্মিয়াও অনেক মানুষ ধর্ম্মের দিক দিয়া যেসে না; শিথিলচর্ম্ম, পক্ককেশধারী বৃদ্ধ ও আত্মসুখে রত

থাকিয়া জীবনের গণা দিন কয়টা কাটাইয়া দেয়; কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের ধর্ম্ম আছে; তবে ধর্ম্মজ্ঞান নাই। ধর্ম্মজ্ঞান থাক্, আর নাই-থাক্, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তুচ্ছ বালুকাকণা হইতে পশু, পক্ষী, এমন কি দেবতা-দের পর্য্যন্ত ধর্ম্ম আছে এবং সেই ধর্ম্মই সকলকে ধারণ করিয়া আছে ও ক্রমবিবর্ত্তনবাদে উন্নতির পথে টানিয়া লইতেছে। তাহা হইলে এখন দেখিতে হইবে মানুষ, পশ্বাদি ইতর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? পশুর ন্যায় নিত্য আহার, নিদ্রা ও মৈথুন প্রভৃতি আত্মসুখে রত থাকিয়াই কি মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া স্পর্দ্ধা করে? যদি তাহাই হইত, তবে মনুষ্যত্বে ও পশুত্বে প্রভেদ থাকিত না। মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান ও স্বাধীনভাবে তাহার পরিচালনর শক্তি আছে বলিয়াই এবং জগৎপিতা জগদীশ্বর একমাত্র মনুষ্যকে সেই শক্তিশালী করিয়াছেন বলিয়াই, মানুষ জীবসৃষ্টির শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছে। যাহারা ধর্ম্মের অনুশীলন বা সাধনা করে, তাহারাই প্রকৃত মনুষ্য, আর যাহারা আহার, নিদ্রা, মৈথুনে রত থাকিয়া, জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা মনুষ্যদেহধারী পশুমাত্র। অতএব মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া, ধর্ম্মজ্ঞান লাভকরাই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। মানুষ ইচ্ছাকরিলে এই জীবনেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে। ভগবান দয়া করিয়া মনুষ্যকে ঐ শক্তি দান করতঃ তাঁহার সাধের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন। সে শক্তি কি?— ধর্ম্মজ্ঞান।

মনুষ্যকুলে জন্মিয়া যতদিন ধর্ম্মজ্ঞান সমুদ্ভব না হয়, ততদিন মনুষ্য পশু সদৃশ। যদি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরও ধর্ম্মজ্ঞান না জন্মিয়া থাকে, তবে তাহাকেও পশু বলা যাইতে পারে। অতএব মানুষ হইয়া ধর্ম্ম আলোচনায়, পশুত্ববর্জ্জন ও মনুষ্যত্ব-অর্জ্জন করা সকলের কর্ত্তব্য। আবার মনুষ্যত্ব-লাভই চরম সীমা নহে। পশুত্ব পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্ম অনুশীলনে মানুষ হইয়া দেবত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। দেবত্ব লাভ হইলে তখন ব্রহ্ম উপাসনায় ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। মানুষের সে শক্তি আছে।— সে শক্তি আছে বলিয়াই, মানুষ অন্যান্য মনুষ্যেতর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ। যাহার অনুশীলনে মানুষ পশুত্ব পরিহারপূর্ব্বক ক্রমে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিতে পারে, তাহারই নাম ধর্ম্ম ও তাহার অনুশীলনের নাম ধর্ম্ম সাধনা।

এতাবতা স্পষ্টই জানা গেল যে, জীব স্বাধীন, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহাদের স্বাধীনবৃত্তি,— অবিদ্যা বা মায়া তাহাকে মোহগর্ত্তে নিপাতিত করিতেছে। অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে, যাহাতে মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আত্মোন্নতি হয়,—আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, বাসনা কামনার খাদ দূরীভূত হয়, তাহাই করা। আত্মা সুখদুঃখ চাহেন না, আত্মোন্নতিই একমাত্র মনুষ্য জন্মের লক্ষ্য। আবার আত্মোন্নতির মূল কারণ ধর্ম্ম, একথা সকল দেশের জ্ঞানিগণের অনুমোদিত। শুধু আত্মোন্নতি বলি কেন? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির মূলেও ধর্ম্ম নিহিত। ধর্ম্মের স্নেহবাহুর মধ্যে সুরভি সু-বাতা-সের মধ্যে আত্মাকে সুখে রাখিবার উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মসাধনার প্রয়োজন। ধর্ম্ম কি, ইহা বুঝিলে, ধর্ম্মসাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই মনো মধ্যে উদিত হইয়া থাকে। তাই ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণের অনুশাসন বাক্য এই যে,—

"সকলেই সুখের বাঞ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু সুখ ধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়। অতএব সকলেই যত্নের সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে।"

বাস্তবিক জীব মাত্রেই সুখস্পৃহার অধীন। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন মরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিত হয়, সুখের আশায় ও সুখের আভাস পাইলেও জীবসকল তদ্রূপ ধাবিত হইয়া থাকে। একমাত্র সুখই জগতের চেতনাচেতন সমস্তেরই অভিলষিত পদার্থ। তাহারা যে কোন কার্য্য করে, তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র কেবল সুখলাভ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রকৃত সুখ যে কোথায় এবং কিরূপ, ইহা কতিপয় তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কেহই অবগত নহে। সংসার-সুখাসক্ত ক্ষুদ্রচেতাব্যক্তিগণ অজ্ঞানতা-নিবন্ধন ধন এবং পুত্র প্রভৃতি সাংসারিক অনিত্য বস্তুসকলকে প্রকৃত সুখের আকর বিবেচনাকরতঃ শান্তি-শূন্য হৃদয়ে চিরজীবন তাহাদিগেরই সেবা করিয়া থাকে। বৈষয়িক সুখ সহস্র দুঃখের দ্বারা আবৃত। অর্থের উপার্জ্জনে নানা ক্লেশ, পরিরক্ষণে নানা দুঃখ, এতদ্ব্যতীত অর্থ নষ্ট হইলে মহা শোক এবং ব্যয় হইয়া গেলেও দুঃখ হইয়া থাকে; অতএব যাহার আয়, ব্যয়, স্থিতি, তিনটীতেই সুখ অথবা শান্তি নাই, সেই ক্লেশকরী অর্থে কেহই তৃপ্ত হইতে পারে না। পুত্র সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। সংসারে এক বিষয়ে সুখ থাকিলেও মানুষ অন্যান্য পাঁচ বিষয়ে নিরন্তর দুঃখভোগ করিতেছে। আবার সর্ব্ববিধ পার্থিব অভীষ্ট-সিদ্ধির সফলতাতেও, মনুষ্যের প্রকৃত সুখলাভ ঘটে না। কারণ সংসারের সকলই ক্ষণভঙ্গুর;—যে রাজ্যে নিবৃত্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়,—যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে করিয়া জন্ম আগমন করে, যে পরিবর্ত্তনশীল জগতে মরিবার জন্যই জন্ম হইয়া থাকে, সে দেশের সুখও যে দুঃখের আকারে পরিণত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ফল কথা,—সাংসারিক সুখ পরিণাম-দুঃখের প্রসূতি, ইহাতে স্থায়ী সুখ হইতে পারে না। জীব নিরবচ্ছিন্ন সুখ চাহে, দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি করতঃ পূর্ণ সুখের আশা করিয়া থাকে। কিন্তু মানবীয় উপায় দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয় না। একমাত্র ধর্ম্মাচরণে স্থায়ী সুখ লাভ হয়। ধর্ম্মাচরণে ইন্দ্রিয়-শক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য সাধিত করিয়া তখন সর্ব্ববিধ জগতের বাহ্য, অন্তর, বৌদ্ধ ও আধ্যাত্ম্য—যথার্থ তত্ত্ব আত্মায় উপলব্ধি করাইলে সুখ লাভ হয়। সে সুখ স্থায়ী, তাহাতে আনন্দ উচ্ছ্বাসের মৃদু-মধুর লহরী-লীলা আছে, লেলীহান আকাঙ্ক্ষার লক্ লক্ জিহ্বা প্রসার ও অনলময়ী ঝটিকা নাই।

আবার ইহলোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও সেই পরলোকের পথে ধনজন বল, স্ত্রীপুত্র বন্ধু-বান্ধব বল, কেহই সুখের সাথী হইবে না, তখন একমাত্র ধর্ম্মই সঙ্গে যাইবে। অতএব ধর্ম্মের মত বন্ধু আর কে আছে? দেহপাত হইলে সেই পরলোকে—সেই অজানা, অপরিচিত দেশে, সেই পাপ পুণ্য বাসনা-শান্তির দেশে,—সেই নরক স্বর্গের সাধনার দেশে, যে অনুগামী হয়, তাহার মত আদরের,—যত্নের—স্নেহের বন্ধু আর কে আছে? ধর্ম্মের প্রয়োজন এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

আর একটী মহতী কথা, আত্মা পরমাত্মার অংশ; সুতরাং ব্রহ্মানন্দ বা পূর্ণসুখ তিনি

ভোগ করিয়াছেন,—সে আস্বাদ জানেন। জগতের জীব সেই সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। বিষয়ভোগ করিয়াই মনুষ্য সুখের জন্য ধাবিত হয়, পূর্ণানন্দের সংস্কার জাগিয়া পড়ে। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির নামই পূর্ণ সুখ। আর সম্পূর্ণরূপে দুঃখনিবৃত্তি না করিয়া যে সুখ হয়, তাহা পূর্ণসুখ নহে,—সুখের কণা মাত্র। যাহা পূর্ণ নহে, এবং যাহা অচিরে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই প্রার্থিত নহে। কিন্তু প্রার্থিত না হইলেও জীব সেই একটুকুরই কাঙ্গাল। তবে তৃষ্ণা মিটে না, প্রাণভরা পিপাসায় একবিন্দু জলে কি করিতে পারে? জীব কিন্তু ঐটুকুর জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। সাংসারিক সুখে ও সুখের অংশ বা কণা আছে,—সাংসারিক সুখেও একটু সুখভোগ হয়,—নতুবা জীব কিসের জন্য এত লালায়িত? কিন্তু যেই সে সুখটুকু অনুভব হয়, আর সেই মুহূর্ত্তেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া সুখটুকুকে ঢাকিয়া ফেলে। আত্মা, পূর্ণ পদার্থ। আনন্দ যে কি, জীব তাহা জানে,—জীবের পূর্ব্বানুভূতিতে তাহা সংস্কার রূপে বিরাজিত আছে; সেই সুখের আশাতেই প্রধাবিত ও ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। বৈষয়িক আনন্দ পরমানন্দ হইতে বাস্তবিক স্বরূপতঃ বিশেষ বিভিন্ন পদার্থ নহে। পরমানন্দ পূর্ণ—আর বিষয়ানন্দ তাহার অংশ বা কণা। অল্পত্ব, মহত্ব ব্যতীত তাহার আর কোন প্রভেদ নাই। পরমানন্দ যাহা, জীব তাহা জানে,—কাজেই তাহার কণা লইয়া সে মুগ্ধ হইবে কেন? জীব অবিদ্যার বন্ধনে আত্মবিস্মৃত, কিছুই জানে না—কিছুই বোঝে না, তবু সুখের জন্য লালায়িত। ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিতে জীব দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। কিন্তু সংসারে সবাই অতৃপ্ত,—কাহারও সুখের আশা নিবৃত্তি হইতেছে না। অভাব থাকিতে সুখী হওয়া যায় না। অভাবই দুঃখ, এই অভাব ত্রিবিধ—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। কোন অবস্থাতেই মানবের শারীরিক বা মানসিক অভাব বিদূরিত হয় না। মানবীয় চেষ্টাতে কোনরূপে উক্ত দ্বিবিধ অভাবই দূর করা যায় না। তর্কের খাতিরে যদিও তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত আধ্যাত্মিক অভাব দূর হয় না। তাই সর্ব্বযুগে (বিষয়ানন্দে) সুখী হইলেও কাহারও সুখের আশা নিবৃত্তি হইতেছে না। হইবে কেন? সংসারে সকল সুখই অংশ মাত্র, জীব পূর্ণ সুখের কাঙ্গালি। ব্রহ্মানন্দের তুলনায় রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ, তাই রাজরাজেশ্বর মণিময় ময়ূর সিংহাসনে বসিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। কেবল একমাত্র ধর্ম্মাচরণে সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায় বলিয়াই সকলদেশে—সকল সম্প্রদায়ের সকলেই ধর্ম্ম-সাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

সুখলাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতে সাধনার প্রয়োজন। সাধনা দ্বারা যে পর্য্যন্ত না জীবের আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত কষ্টের পরিসীমা থাকে না। সেই অপরিসীম কষ্টের সীমা না থাকিলেও প্রকারগত সীমা আছে, সেই সীমার নাম ত্রিতাপ। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপের নামই ক্লেশ। এরূপ ক্লেশ কেন হয়?—না প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরাধ্যাস জন্য। এক্ষণে দেখিতে হইবে, প্রকৃতি ও পুরুষ এতদুভয়ের যে পরস্প-

অধ্যাস, তাহার উপশম বিলয় বা নিবৃত্তি কিসে হয়, তাহারই অনুসন্ধান আবশ্যক; যেহেতু সে অধ্যাস নিবৃত্তি হইলে আত্মা বা পুরুষ স্বীয়ভাবে অধিষ্ঠিত হইবেন। স্বীয় ভাব কি?—না মুক্তভাব, নিষ্ক্রিয়ভাব, যে ভাবে দ্রষ্টা-দৃশ্য বা ভোক্তা-ভোগ্য ভাব নাই, তাহাই স্বীয়ভাব। তবে কি আত্মা এক্ষণে স্বীয়ভাবে অবস্থিত নহেন?—তিনি অবশ্য এক্ষণে আপনভাবে অবস্থিত আছেন সত্য, কিন্তু সে আপন ভাবের প্রকাশ নাই, তৎ-পরিবর্ত্তে দ্রষ্টা-দৃশ্য বা ভোক্তাভোগ্য ভাবের প্রকাশ হইতেছে। অর্থাৎ—প্রকৃতি এক্ষণে আপনি চিন্ময় পুরুষের ভোগ্য হইয়া, সেই চিন্ময় পুরুষকে আপনার ভোক্তা করিয়া লইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে চিন্ময় পুরুষের ভোগেচ্ছা না থাকিলেও, লৌহ ও চুম্বকের মত অনিচ্ছার ক্রিয়াশক্তির উদ্রেক হইয়াছে; সুতরাং আত্মা এক্ষণে পুরুষরূপে ভোক্তা এবং প্রকৃতি জগৎরূপে তাঁহার ভোগ্য হইয়াছেন। সেই ভোক্তা-ভোগ্য ভাবের অপসারণ বা নিবৃত্তি করিতে হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে সেই নিবৃত্তির উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। সে নিবৃত্তির উপায় ধর্ম্মাচরণ। ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ হইলে বিষয়বাসনা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকে সংযত করতঃ নিঃসঙ্গ হইয়া নির্লিপ্ত-ভাবে সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবে। এইরূপ অভ্যাস নিয়ত করিলে, সে পুরুষের সম্মুখে প্রকৃতি দেবী মায়াজাল বিস্তার করেন না, এবং লজ্জাবনতমুখী হইয়া পলায়ন করেন; অর্থাৎ—সেই পুরুষ প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়েন। প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হইলে, সে পুরুষ আর পুরুষপদ বাচ্য হন না, তখন কেবল আত্মা নামে স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। এই স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার জন্যই ধর্ম্ম ও সাধনার প্রয়োজন।

শিশু সন্তানের পক্ষে তাহার মাতৃস্তন্য যেরূপ, সাধনার দ্বারা যে অমৃত পান করা যায়, আত্মার পক্ষে তাহাও ঠিক সেইপ্রকার। সাধনার দ্বারা আমাদিগের আত্মা ক্রমশঃ অধিকতর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং অসংখ্য প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও উন্নতির পথে যাইতেন সমর্থ হন। উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মার যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, সাধনার দ্বারা অতি সহজে সেই সমস্তই লাভ করা যায়। আত্মরূপ অরণি কাষ্ঠে সর্ব্বদা ধ্যানরূপ মন্থন ক্রিয়া করিলে জ্ঞানরূপ অগ্নি উদিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে। এতদ্ব্যতীত সাধনা দ্বারা মানবের চিত্ত যে প্রকার নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। মনুষ্যের মধ্যে যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে; যিনি অবিকল, সমগ্রাবয়ব-সমৃদ্ধ উপভোগোপকরণ যুক্ত—মনুষ্য-লোকে তিনিই সুখী। কেবল একমাত্র ধর্ম্মসাধনায় এইরূপ অবস্থা লাভ করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়। তাই আজি জগতের সমস্ত সম্প্রদায়,—সমস্ত মনীষী, সমুদায় ধর্ম্মযাজক আপন আপন ধর্ম্ম-কাহিনীর শান্ত, মধুর, প্রোজ্জ্বল ব্যাখ্যা করিয়া মানব হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেছেন। সংসারে মনুষ্যের প্রাণ ও অনন্ত তৃষ্ণাময়ী হৃদয়-বৃত্তি বুঝি ধর্ম্ম-ব্যাখ্যার পরম পবিত্রভাব লইয়াই নিশিদিন ব্যস্ত!

অতএব যদি মরজগতে অমরত্ব লাভ ও মানব জীবনের পূর্ণত্ব সাধন করিয়া যথার্থ সুখী হইতে চাহেন, তবে ধর্ম্ম ও তাহার সাধনা অবশ্য করিতে হইবে; নতুবা সংসারে সুখ অন্বেষণ করা কেবল মরীচিকার জল অন্বেষণ করার ন্যায় বৃথা। যেন সকলের স্মরণ থাকে,—

সুখং বাঞ্ছতি সর্ব্বোহি তচ্চ ধর্ম্ম সমুদ্ভবম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥

কস্যচিৎ-পরিব্রাজকস্য।

——:0:——

যোগানন্দ-লহরী।

বেহাগ (১৬) একতালা।

সকলি তিনি তাঁহারি সকল।
এই বিশ্ব ভরি যেদিকে নেহারি, তাঁহারি মাধুরী হেরি গো কেবল।
সুনীল গগনে উজলে তপন,
চন্দ্রমা বিতরে বিমল কিরণ,
লাবণ্য মাখিয়ে হাসে তারাগণ, কার প্রেমে হ'ল চপলা চঞ্চল?
হেরি কার হাসি উষার কিরণে,
বিহগ আকুল কার গুণ গানে,
শিশির-সিঞ্চিত কুসুমদামে,
কার তরে ঝুরে প্রেম অশ্রুজল;—
শিশুর অধরে কার হাসি খেলে,
ভকত হৃদয়ে কেবা প্রেম ঢালে,
জননী অন্তরে কার স্নেহ গলে, কাহার করুণা ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল?
জলধি উথলে কার প্রেমবলে,
কাহার কৌশলে মেঘ বারি ঢালে,
কাহার মহিমা অনলে, সলিলে,
কার প্রেমে বহে মলয় অনিল;—
শোভে শতদল সরসি মাঝারে,
কলকণ্ঠকুল আনন্দে বিহরে,
অচল দাঁড়ায়ে সদা কারে হেরে, তটিনী কাহার প্রেমেতে বিহ্বল?

যে দিকে তাকাই সেই বিশ্বেশ্বর,
বিশ্বরূপে ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর,
প্রেমের নয়নে হের নিরন্তর,
পূজ প্রেমফুলে দিয়ে অশ্রুজল ;—
কোথা ভেদাভেদ দেখ না চাহিয়ে
তুমি আমি সব তাহাতে ডুবিয়ে
ভাব সেই একে "আমিত্ব" নাশিয়ে, বিশ্বপ্রেমে হোক জীবন সফল ॥

—:0:—

গোষ্ঠ।

(পূর্ব্বাভাস)

ললিত রাগে, কদম তলে
বাজ্ল মোহন বেণু,
গুঞ্জরি ভৃঙ্গ উঠল নেচে
উড়ায়ে ফুলের রেণু।
ছুট্ল ধেনু গোশাল হ'তে
হাম্বা হাম্বা রবে,
শয়ন ছেড়ে, চল্ল ছুটে
ব্রজের বালক সবে,
কোকিল বঁধু পঞ্চমেতে
ডাক্ল তমাল শিরে,
সম্বিত হারা কালিন্দী নীরে
ফির্ল উজান, ধীরে।
বইল হর্ষে মলয় মন্দ
কুসুম-সুবাস লয়ে,
শ্যাম-নিকুঞ্জে চল্ল রাই
উন্মাদিনী হ'য়ে ॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

ভক্ত শঙ্কর।

(শেষাংশ।)

সদা সেব্য কৃষ্ণ সজলে ঘন নীলঃকরতলে,
দধানো দধ্যন্নং তদনু নবনীতং মুরলীকাম।
কদাচিত কান্তানাং কুচকলস পত্রালি রচনা,
সমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈ সহ শিশুবিহারং বিরচরন্।

যিনি প্রথমে করতলে দধি, তৎপর নবনীত এবং তদনন্তর বংশী ধারণ করিয়াছেন, সেই নবঘনশ্যামতনু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেব্য। যিনি কখন কখন বল্লভাগণের (গোপিগণের) কুচকলসোপরি পত্রালি রচনায় সমাসক্ত ছিলেন এবং যিনি বয়স্যগণের সহিত বিহার করিতেন,

সেই কৃষ্ণ সকলের সেব্য।

জ্ঞানি-গুরু শঙ্কর আজ নৃত্যগীত ও স্তুতি করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতি কামনা করিতেছেন, আর দাসত্ব প্রার্থনা করিতেছেন দেখিয়াও কি তাঁহাকে নাস্তিক বা ভক্তি-ধর্ম্মদ্রোহী বলা যায়? তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনাকালে বলিতেছেন, "যিনি কান্তাগণের কুচকলসে পত্রাণি রচনায় নিপুণ।" ইহাতে কি বুঝা যায় না যে, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন এবং ঐ রসের রসিক ছিলেন? তিনি কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা করিয়াই, এই তত্ত্ব তৎকালে সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করেন নাই। তিনি নামস্তোত্র পাঠ করিতেছেন—

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্
গোবর্দ্ধনধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ং।

ইত্যাদি।

ভগবান শঙ্কর-বিরচিত গ্রন্থে এইরূপ শ্লোকের যথেষ্ট সমাবেশ আছে। যিনি এইরূপ সরল ও সহজ ভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহাকে ভক্ত ভিন্ন আর কি আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে? তাঁহার প্রধান অপরাধ এই দেখা যায় যে, তিনি বেদান্তের মুখ্য ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া মনঃকল্পিত গৌণ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ব্যাপার জন্ম (যদি ঐ টীকাদি বাস্তবিকই ধর্ম্মবিপ্লবকারী হয়) তিনি আদৌ দায়ী নহেন। শ্রীভগবানের আদেশক্রমেই তিনি ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব বলিতেছেন,—

তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সপ্তম পরিচ্ছেদ।)

স্থানান্তরে বলিতেছেন:—
"তাঁর দোষ নাহি তেঁহ আজ্ঞাকারী দাস।"

ইহাতে স্পষ্টই শঙ্করের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। ঈশ্বরের নিকট হইতে তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ব্যাখ্যাই প্রচার করিয়াছেন। অতএব তিনি আদেশ পালন ভিন্ন অন্য কিছুই করেন নাই।*

ঐ ব্যাখ্যায় যদি কোন দোষ থাকে বা জীবগণের ধর্ম্মের হানিকর কোন ভাব প্রচারিত হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য স্বয়ং সর্ব্বধর্ম্ম-স্থাপয়িতা শ্রীভগবানই দায়ী; শঙ্কর নহেন। বৈষ্ণবীয় মত অনুসরণ করিলেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। শঙ্কর কর্ত্তৃক যে সময় বেদান্তের ব্যাখ্যায় মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল

---

* লেখকের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই যুক্তিগুলির সহিত আমরা একমত নহি। শ্রীভগবান মায়ামুগ্ধ জীবগণকে করুণা-বাঁশরীর সুরে সদাই নিকটে আহ্বান করিতেছেন;—যে কারণে তিনি ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী সর্ব্বশ্রেণীর জীবের নিকট "দয়াময়" নামে পরিচিত; সে ভগবান জীবগণকে বিপথে পরিচালনের জন্য তাঁহার ভক্তকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এ যুক্তি যত বড় গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের হউক না, আমরা তাহাতে শ্রদ্ধা করিতে পারি না। শঙ্করযুগের ইতিহাস না থাকিলে অন্ততঃ এ যুক্তিকে "নির্লজ্জ গোঁড়ামী" বলিতে সাহস করিতাম না; বরং যাহারা শ্রীভগবানের করুণা এবং তদীয় ভক্তের চরিত্র এরূপে চিত্রিত করে, তাহারা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী। দেহাত্মবাদী নাস্তিকের হাত হইতে দেশরক্ষা করিয়া যিনি পুনঃ হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার সম্বন্ধে এসমস্ত মতপ্রচার অধঃপতিত জাতির কৃতঘ্নতার পরিচয় মাত্র। নতুবা এত সহজে অন্যদেশের লোক আমাদের চিনিতে পারিত না। গোঁড়ামীতে এইরূপেই বিবেককে আচ্ছন্ন করে। সঃ আঃ দঃ।

এবং নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরের ভূমা সত্তা জীব-জগতের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, সে সময় ঐ ব্যাখ্যা মানব-চিত্তের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। কিন্তু যে সময় চৈতন্যদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব প্রচার করিতেছিলেন, তখন পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যখ্যার আর তেমন প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কারণ জীব শঙ্করপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুশাসনবলে ঈশ্বরতত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছিল। অবতারগণ সময়ের অনুরূপ ভাবে বিভাবিত হইয়া জগতে লুপ্ত ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। অজ্ঞ আমরা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পাই না, কিন্তু মীমাংসকের আসন গ্রহণ করিয়া শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বসি। সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব শ্রীভগবান্। তাঁহাকে লাভ করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব যে যেমন করিয়া পারে "ট্রেনে কিম্বা ষ্টিমারে সেথায় আগুয়ান" হউক। আমরাও যেন তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে পারি। আর অবতারতত্ত্বের মূল লক্ষ্য যেন ভুলিয়া না যাই।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।"

যেখানে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি অর্থাৎ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আচরিত হয়, তখনই আমি (ভগবান) মায়াবলে মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

ধর্ম্মের গ্লানি দূর করাই অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ভগবান যুগে যুগে ধরায় অবতীর্ণ হন এবং যখন যেখানে যেরূপ ধর্ম্মের আবশ্যকতা, তাহাই প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা লইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব আমরা হিংসা দ্বেষে জ্বলিয়া মরিব কেন? শ্রীশঙ্কর ও গৌরাঙ্গদেব উভয়েই শ্রীভগবানের বিলাসের জন্য অবতার। শঙ্কর জ্ঞানের অবতার; গৌরাঙ্গ ভক্তির অবতার। উভয়েই ভক্ত, উভয়েই জ্ঞানী। শঙ্কর জ্ঞানমার্গে ভক্তি অবলম্বনে প্রেমের সাগরে ডুবিয়াছিলেন, আবার গৌরাঙ্গও জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে ভক্তিরসে আদ্র হইয়া প্রেমপীযূষ পানে আপনা হারাইয়া ছিলেন। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই মানবের স্বাভাবিক সম্পত্তি। উভয়ই অবশ্য সাধনীয়! একটী বাদ দিয়া অপরটীর সাধনা অসম্ভব।

বর্ত্তমান যুগে যে জ্ঞান ও প্রেমের ঢেউ পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে, ইহার প্রবর্ত্তক ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। ভগবান্ চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর এতদ্দেশে শঙ্কর-বিদ্বেষ সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ করিয়া জ্ঞানি-গুরু শঙ্কর ও ভক্তি-গুরু গৌরাঙ্গের আসন সমসূত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্কর, আবার গৌরাঙ্গও ভগবানের প্রেমবিলাসের নিমিত্ত পূর্ণ অবতার। অতএব উভয়েই জয়যুক্ত হউন।

উপসংহারে ভগবান শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মমতে পার্থক্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ধর্ম্মমতে অনৈক্য বা কোন কার্য্য প্রণালীর বিভিন্নতা সাধারণ মানব জীবনেই সম্ভব। যেহেতু তাহারা মায়ামুগ্ধ ও সদা ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত। কিন্তু যাঁহারা অবতার স্বয়ং

শ্রীভগবানের পাঞ্চভৌতিক দেহে জগৎ-তারণ জন্য পূর্ণ অভিব্যক্তি, সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহাদের মতানৈক্য হওয়া সম্ভব নয়। কারণ একই ভগবান মায়াবশে প্রকাশিত হইয়া আদর্শ মানবরূপে কার্য্য করিতেছেন এবং জীবগণকে অ-মৃতের সংগীত সুধা পান করাইয়া মুক্তি-পথের পথিক করিতেছেন। অতএব শংকর-গৌরাঙ্গ-প্রচারিত ধর্ম্মেও মতদ্বৈধ থাকা সম্ভব নয়। তবে আমরা সাধারণ-ভাবে আলোচনা করিয়া যে পার্থক্য দেখিতে পাই, তাহা পারমার্থিক পার্থক্য নহে; সীমাবদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশিত ভেদ-বুদ্ধিপ্রসূত ভ্রম ধারণা মাত্র। এই ভেদভাব দেশকাল পাত্র ভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জীব জন্মিয়াই প্রথম নিজ সত্তার অনুভব করে এবং তাহার তৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়। তখন জীবজগৎ বা ভগবান-জ্ঞান তাহার থাকে না। অতএব প্রথম প্রকাশিত অহংতত্ত্বের অনুসন্ধানই ধর্ম্মের ভিত্তি এবং ইহার আবিষ্কারই ধর্ম্ম-জীবনে সিদ্ধি। এই সিদ্ধি লাভের একমাত্র পন্থা ভক্তি; ইহা অবিসংবাদিত। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গে ইহাতে কোন মতভেদ নাই। শঙ্কর বলিতেছেন:—

"মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"।

মুক্তি লাভের জন্য যে সকল উপায় বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

এই ভক্তি কি, তাহাও বলিতেছেন:—

স্ব স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধিয়তে।

নিজ স্বরূপের অর্থাৎ "আমি কে" এই তত্ত্বের অনুসন্ধানই ভক্তি নামে অভিহিত হয়।

শ্রীভগবানে ভক্তিই চৈতন্যদেবের মতে এক মাত্র সার বস্তু। তিনি ভারতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম-তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন, প্রতি শ্লোকে জীবনী শক্তি প্রদান করিয়া তিনি অমৃতের প্রস্রবণ উৎসারিত করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ভক্তিতত্ত্বেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতি-পাদন করিয়াছে।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপোত্যাগো যথাভক্তির্মোর্জ্জিতা॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিতে-ছেন, হে উদ্ধব! আমার প্রতি উর্জ্জিতা ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করে, যোগ (অষ্টাঙ্গযোগ,) ধর্ম্ম (গার্হস্থ্যধর্ম্ম,) সাংখ্য, (আত্মানাত্ম-বিবেক,) স্বাধ্যায় (বেদপাঠ,) তপস্যা (বানপ্রস্থধর্ম্ম,) এবং ত্যাগ (সন্ন্যাস) —ইহারা কেহই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না অর্থাৎ ভক্তিতে ভগবান যেরূপ বশীভূত হন, অন্য কিছুতেই সেরূপ নহে।

এই ভক্তি কি, তাহা ভক্তিতত্ত্বের প্রচারক মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিতেছেন:——

"সা ভক্তিপরানুরক্তিরীশ্বরে"

ঈশ্বরে পরা—শ্রেষ্ঠা অনুরক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের জন্য প্রাণের ঐকান্তিকতাই ভক্তি।

আমি কে? এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে হৃদয় মধ্যে "আমির" স্বরূপ প্রেমময় নির্ব্বিশেষ প্রভুর সন্ধানই পাওয়া যায়। আবার ঈশ্বরানুসন্ধান দ্বারাও ঈশ্বরই লাভ হয়। অত-এব "অহং তত্ত্বের" অনুসন্ধান ও ঈশ্বরানুসন্ধান মূলতঃ একই বস্তু। কেবল নামের বিভেদ মাত্র। জীবও কখন শিব নয় এবং শিবও কখন জীব নয় অর্থাৎ জীবত্ব-জ্ঞান থাকিতে

শিবত্ব-জ্ঞান অসম্ভব এবং শিবত্ব-জ্ঞানের উদয়ে জীবত্ব জ্ঞানও অসম্ভব। কিন্তু তবুও জীবে ও শিবে একই তত্ত্বের বিকাশ। এই জ্ঞান যিনি লাভ করেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। কালের ভেরী বাজিতেছে — যে জীব, সে ভেরীনাদ শ্রবণে কাতর, শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত; আর যিনি শিব, তিনি কালের অতীত হইয়া সদা আপন প্রাণেই কালের ভেরী শুনিতেছেন। তেমনি যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া আপনসর্ব্বস্ব হইয়াছেন, তিনি কালের হাতে কলের পুতুলি, জরামরণ-ভয়-ভীত; আর যিনি আপনা ভুলিয়া কৃষ্ণদাস হইয়াছেন, কৃষ্ণ-দাসানুদাস হইয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেমে আপন সত্তার বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তিনিই মাত্র "কালেরে কলা দেখাইয়াছেন," জরামরণ তাঁহার ভীতির বস্তু নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ভিন্ন, সে ভাগ্যবান্ "আন" জানেন না। তাঁহার অহংজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, যতক্ষণ-"আমি, আমার" এই কর্তৃত্ব জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে,--যতক্ষণ "আমার ধন, আমার জন" এই অভিমান থাকে,-যতক্ষণ "আমার দেহ, আমার মান, আমার যশ জ্ঞান থাকে অর্থাৎ এই জড়-দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই জরামরণ-ভয়, ততক্ষণই কেবল কালের ধ্বনিতে হৃদয় ব্যথিত হয়; কিন্তু যখন জীব শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে ভাবিত হয়, তখন সে আর আপনাকে খুঁজিয়া পায় না, হৃদয়ে দেখে মোহন মুরলীধারী কৃষ্ণ, বাহিরে দেখে কৃষ্ণ, লতায় পাতায়' সুনীল অম্বর কাদম্বিনীর কোলে, উচ্চ অভ্রভেদী শৈলশিখরে, সমুদ্রবক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের জগজ্জনমনোমোহনরূপ দেখিয়া দেখিয়া আপনা হারাইয়া, সকল দেহাভিমান ছাড়িয়া অকূলে শ্রীভগবানের অনন্ত সত্তায় ঝাঁপ দেয়। তখন সে আত্মসত্তা ভুলিয়া যায়, জগৎ তাহার নিকট কৃষ্ণময় হয়।

পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞান ও ভক্তিপথের উভয় সাধকই "আমির" অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 'আমি'কে লাভ করিয়া স্থির হইতেছেন।

ভগবান শঙ্কর বলিতেছেন:—"আমি" চিদানন্দ স্বরূপ শিব, আমি মন, বুদ্ধি, অহংকারাদি কিছুই নহি, আমি চিদানন্দ স্বরূপ শিব; যথা:-

"মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদি নাহং
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রং:
নচ ব্যোম ভুমির্ন তেজো ন বায়ু
চিদানন্দ রূপং শিবোহং শিবোহং ॥ ইত্যাদি"

অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহংকার চিত্ত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা বা ব্যোম, ভুমি, তেজ, বায়ু, এ সকল কিছুই আমি নহি, আমি চিৎ ও আনন্দস্বরূপ শিব।

আবার শ্রীচৈতন্যদেবও বলিতেছেন "আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি রাজা নহি, আমি কৃষ্ণ-দাস, আমি কৃষ্ণ-দাসানুদাস; যথা:—

"নাহং বিপ্র নচ নরপতি
নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং ধনী নচ গৃহপতি
নো বনস্থো যতির্বা॥
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ
পূর্ণামৃতাব্ধে।
গোপীভর্ত্তুঃ পদ কমলয়ো
র্দাস দাসানুদাসঃ"॥

আমি বিপ্র নহি, নরপতি নহি; আমি বৈশ্যও নই, শূদ্রও নই। আমি ধনী নই, গৃহপতি নই,

ব্রহ্মচারীও নই ; যতিও নই, কিন্তু আমি পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণ কমলের দাস, আমি তাঁহার দাসানুদাস ।

উপরোক্ত উভয় স্থলেই "আমি কে" এই তত্ত্বেইর মীমাংসা দেখা যাইতেছে । "আমি চিদানন্দময় শিব" বলিয়াও দেহাত্মজ্ঞানময় "আমির" পারে মন চলিয়া যাইতেছে । আবার আমি শ্রীকৃষ্ণের "দাসানুদাস" বলাতেও মন স্থুলদেহে আত্মবুদ্ধি ছাড়িয়া নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকরূপে পরিণত হইতেছে । উভয় ভাবেই দেহাত্মজ্ঞানের নাশ এবং পরমানন্দময় অবস্থালাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হইতেছে । অতএব ধর্ম্ম লাভ করিতে আসিয়া মতদ্বৈধতা সৃষ্টি করিয়া এরূপে হিংসা দ্বেষে চিত্ত পূর্ণ রাখিলে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রভুতা হইয়া চিত্ত কলুষিত হইবে ও মুক্তিপথ রুদ্ধ হইবে ।

বেদান্তোক্ত সোঽহংতত্ত্বও বৈষ্ণবীয় তন্ত্রের সাধনমার্গে বিশেষরূপে অন্তর্নিহিত আছে। ইহাকে অনুগা সাধন বলে । অনুগা সাধন দ্বিবিধ । রাগানুগা ও গোপী-অনুগা * । রাগানুগা,—যেমন শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের ছায়ামূর্ত্তি জলে দর্শন করিয়াই আপনা ভুলিয়া, গৃহ ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য উন্মাদিনী হইলেন, কোনরূপ অপেক্ষা রাখিলেন না । আর গোপী অনুগা—ইহাতে সাধক নিজকে শ্রীরাধা কৃষ্ণের দাসী অর্থাৎ ললিতা, বিশাখাদি কোনও এক সখীরূপে চিন্তা করিয়া সেই সখীর ন্যায় শ্রীরাধা কৃষ্ণের সেবাদি মানসে করিতে থাকেন । এইরূপ সাধন করিতে করিতে ক্রমে সিদ্ধগোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া সাধক নিত্য সেবার অধিকার লাভ করেন ।

হলাদিনীশক্তি রূপিনী শ্রীমতী রাধাও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাস স্থলে যুগলে পূর্ণ, কিন্তু যখন রাধা কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়া হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতরা হন, অতএব তখন তিনি অভাবগ্রস্থা বা অপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হন । আবার শ্রীকৃষ্ণও যখন রাধাসঙ্গ চ্যুত হন, তখন তিনি রাধাসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন অর্থাৎ তখন তিনি অভাবগ্রস্থ বা অপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হন । ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, রাধা ও কৃষ্ণতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিলে ভাবের পূর্ণত্ব সাধিত হইতেছে না । কিন্তু গোপীকা হৃদয়ে এই ভাবাভাবের উদ্বেগ নাই । গোপীকা হৃদয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলতত্ত্ব ধারণ করিয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাঁহার বিরহবেদনা নাই, শোক নাই, তাপ নাই, আত্মসুখের লালসা নাই । তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণময় আপনাহারা । তাহার সুখ দুঃখাদি শ্রীরাধা কৃষ্ণের সুখদুঃখে পর্য্যবসিত । ভাবের অভাব না হওয়ায় গোপীকার ভাবেই পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে । এই গোপীভাবে পূর্ণভাব বা দ্বৈতাদ্বৈতভাবই ব্রহ্মতত্ত্ব । তাই তত্ত্ববাদীর মূল মন্ত্র "সোঽহংব্রহ্ম" । জ্ঞানমার্গের সাধক যেমন "সোঽহংব্রহ্ম" ধ্যান করিতে করিতে নিষ্কল ব্রহ্মের সারূপ্য লাভ করেন, তেমনি গোপী অনুগা ভক্ত-সাধকও "আমি গোপী", "আমি গোপী" ধ্যান করিয়া গোপীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন । ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিয়া জগৎময় অনাদি, অনন্ত পুরুষ প্রকৃতির লীলাবিলাস (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা) দর্শন করিয়া

*মতান্তরে ইহাই রাগমার্গ নামে অভিহিত হয়।

পরম প্রেম লাভ করতঃ ধন্য হন। আর গোপী-অনুগা ভক্ত গোপীদেহ লাভ করিয়া নিত্য-লীলার সহায় হইয়া নিত্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপ মাধুরীতে ডুবিয়া লীলারস আস্বাদন করতঃ ধন্য হন। উভয়েই শেষে একই তত্ত্বে উপস্থিত হইয়া একই রস আস্বাদন করিতে থাকেন। অতএব জ্ঞান, ভক্তি লইয়া বা শঙ্কর-গৌরাঙ্গ লইয়া সাম্প্রদায়িক মত-বাদ বৃথা। উহা একনিষ্ঠার সহায় হইতে পারে, কিন্তু অন্যের প্রতি অবজ্ঞার সৃষ্টি করিলে হেয় ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ব্রজে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ জয় যুক্ত হউন। শ্রীশ্রীশঙ্কর-গৌরাঙ্গ-পদে প্রণত হইয়া আমিও এক্ষণে বিদায় হই।

দীন—সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

———:0:———

আত্মোপদেশ।

(৫)

বুদ্ধির পূর্ণতার লক্ষণ।

মনুষ্যের বুদ্ধি যতদিন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন সে জগতে অনিশ্চিতভাবে, সদাই সন্দেহযুক্ত ও শশঙ্কচিত্তে বাস করে; পরন্তু যখনই তাহার পূর্ণ বুদ্ধি হয়, তখনই অনিশ্চিত ও সন্দিগ্ধভাবে জীবন যাপন তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে; তখন তাহার মনে বিবেক ও বিচার উৎপন্ন হয়। যথা:—

(১) আমার কর্ত্তব্য কি?

(২) আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আমার গুণই বা কি?

(৩) আমি এভাবে কিরূপে উপনীত হইলাম? আমার বীজরূপ, বীজধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম (মুক্ততা, বুদ্ধতা, শুদ্ধতা) কোথায় হারাইল?

বীজ ও বৃক্ষ।

বীজরূপ বিস্মৃত না হইলে, বৃক্ষরূপ ধারণ হয় না। বীজ অবস্থাই আদ্যাবস্থা এবং উহাই অস্তিত্বের, চৈতন্যের এবং আনন্দের পরিসমাপ্তি বা চরম সীমা।

ধর্ম্ম রক্ষার মূল আত্মচৈতন্য বা আত্মজ্ঞান; সর্ব্ব বস্তুর ধর্ম্ম নিজ নিজ চৈতন্যে অঙ্কিত থাকে।

প্রত্যেক বস্তুই "বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত শক্তি; বস্তুর অন্তরে যদি নিজ ধর্ম্মের বা গুণের ধ্যান না থাকে, তাহা হইলে সে আপনার রূপ বজায় রাখিতে পারে না; কারণ ধর্ম্মের বা গুণের প্রকাশ বা বিকাশকেই রূপ বলে।

নির্গুণ বা শান্ত শক্তি বিশিষ্ট পদার্থ লইয়া, যদি কোন মূর্ত্তিবিশেষ গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে চৈতন্য ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়।

মৃত্তিকা স্বয়ং চৈতন্য সাহায্য ব্যতীত বিবিধ আকারের ঘট হইয়া যায় না; ঘটের স্মারক, ঘট মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তবে ঘট নির্ম্মাণে সমর্থ হয়।

তদ্রূপ যে শক্তিটি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া এই জগতে আপনার অস্তিত্ব বিকাশ করিতেছে, এই শক্তিটির একটি চৈতন্যরূপী শিব বা আত্মা আছেন, শক্তির যখনই যেমন যেমন দেহ ধরিতে ইচ্ছা (ক্ষোভ) হয়, তখন সেই শিবই ব্রহ্মা হয়ে তাহার মনের রূপটা স্পষ্ট করে ফুটিয়ে দেন, বিষ্ণু হয়ে ধ্যানটা ধরে রাখেন, আবার রূপ বদলাবার সময় শিব হয়ে দেহটাকে ভেঙ্গে দেন। পরিণাম শক্তিই ক্ষোভ উৎপাদন করে।

ফল কথা যতক্ষণ কোন বিশিষ্ট দেহ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ সেই দেহের ভিতর দেহের ধর্ম্ম বা গুণ থাকে এবং ধর্ম্ম বা গুণ আত্মার কাছে লেখা থাকে।

আত্মার কাছে গেলেই সকলেই আপন আপন গুণ বা ধর্ম্ম টের পাইতে পারে। যখন কেহ নিজ ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, তখন তাহার অধোগতি হয়; এবং ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হয়।

অভ্যাস-শূন্য ধর্ম্মশূন্য বস্তু থাকে না; এবং এক ধর্ম্ম বা অভ্যাস ত্যাগ হইলেই আর এক ধর্ম্ম বা অভ্যাস উপস্থিত হয়।

কর্ম্মক্ষেত্রে ক্রোধের উদ্রেক।

মনুষ্যেরা জ্ঞান ও শক্তির হীনতাবশতঃ অধীর হইয়া পড়ে এবং অপর বস্তুর বা শক্তির ধর্ম্মে জ্ঞান দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না বলিয়া, "সকলই আমার" এই প্রকার যে মিত্রতা ধর্ম্ম, উহা ভুলিয়া গিয়া, বৈরীভাব প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্ব শক্তির ধর্ম্মে জ্ঞান দ্বারা প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে, শক্তিকে আয়ত্ত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায় না।

জ্ঞানার্জ্জন।

কোন বস্তুর সম্বন্ধে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে; তদ্বস্তুর নিত্য ধর্ম্ম ও উপস্থিত ধর্ম্ম অবগত হইতে হয়; কারণ তাহার উপস্থিত ধর্ম্ম, তাহার নিত্য ধর্ম্মেরই বিকৃতি বা ক্ষরিত অবস্থা। নিত্যই মূল কারণ—অনিত্য কার্য্য।

বীজ ধর্ম্ম।

সর্ব্ব বস্তুর বীজ ধর্ম্মই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। অঙ্কুর, পত্র, শাখা, দেহাদি তাহার সঙ্কোচ, বিকাশশীল অনিত্য ধর্ম্ম।

ঈশ্বরই আমাদের বীজরূপ; ঈশ্বরের ধর্ম্মই আমাদের বীজ ধর্ম্ম।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভয়, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণাদি অনিত্য ধর্ম্ম, বা বর্ত্তমান অবস্থার ধর্ম্ম।

বীজ স্মরণে আমাদের নিত্যাভিমুখ বা ঊর্দ্ধগতি হয়, দেহ স্মরণে আমাদের অধোগতি হয়, বা অনিত্য ও পরিবর্ত্তন ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ নব নব বিকার বংশ বৃদ্ধি হয়।

সম্বোধন।

ওহে ভবধামের পথিক! তোমার পথ-ভ্রমণ শেষ হইল কি? তুমি কি গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছ? না এখনও খুঁজিয়া পাও নাই।

ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন কিরূপে হয়।

সর্ব্ব বস্তুর উপস্থিত ধর্ম্ম, অনুরাগ ও বিরাগ শক্তির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়।

অনুরাগ শক্তি বা ভালবাসা, বা পুনঃ

পুনঃ চিন্তা দ্বারা অপর ধর্ম্ম গ্রহণ হয়, এবং বিরাগ ধর্ম্ম দ্বারা উপস্থিত ধর্ম্ম ত্যাগ হয়।

অনুকূল ও প্রতিকূল ধর্ম্ম।

অনুকূল ও প্রতিকূল ধর্ম্মবিহীন কোন সৃষ্ট পদার্থ নাই এবং থাকিতেও পারে না। বস্তু মাত্রের অন্তর্গত অনুকূল ও প্রতিকূল রূপ দুইটি বিপরীত ভাবের ক্রিয়াশক্তি অহরহ ক্রিয়াশীল থাকে। যে বস্তুর মধ্যে এইরূপ শক্তি ক্রিয়া হয় না, তদ্বস্তু অপরিণামী, তাহার উন্নতি বা অবনতি কিছুই হইতে পারে না; উহার পদ নিত্য।

মনুষ্যগণ যখন অনুরাগ শক্তি বর্দ্ধন করিয়া ঈশ্বর বা পরমাত্মার ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, তখন তাহাদের মনুষ্য-ধর্ম্ম সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং মনুষ্য ধর্ম্মহীন, মনুষ্য দেহ মানবীয় কর্ম্মাভাবে শীঘ্রই পতন হইয়া নিজ নিজ কারণ বল হারাইয়া, মূল আদ্যা-শক্তির আকর্ষণে তাহাতেই কালক্রমে প্রবেশ করে। প্রথমে পাঞ্চভৌতিক দেহ স্ব স্ব উপাদান কারণে অর্থাৎ পঞ্চভূতে লয় হয়। সাধক যখন পরমাত্ম-বীজের ধ্যানে প্রবিষ্ট হয়, তখন দেহাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় শক্তি (দেবতারা) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন ; কারণ সর্ব্বশক্তির শোষণ করিয়া তবে পরমাত্মপদ প্রত্যক্ষ হয়।

দেহের গঠন, চালক ও পোষক শক্তি-দিগের গতি ও মূর্ত্তি ফিরাইতে না পারিলে পরমাত্মারূপ বীজপদ উদয় হয় না।

যাহারা চিৎশক্তির ও ক্রিয়াশক্তির তত্ত্ব বা স্বরূপ লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে ধ্যান বা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের শক্তি সঞ্চিত হয়; পরন্তু যাহারা ফলভোগ কামনায় তাহার আরাধনা করেন, তাঁহাদের শক্তি ক্ষয় হয়।

ব্রহ্ম চৈতন্য।

কার্য্য-কারণ রূপ গুণময় অবস্থার অতীত যে নিত্য, স্থির ব্রহ্ম চৈতন্য, সেই সর্ব্বাত্ম ও সর্ব্বশক্তি বলে যাহা স্বতঃ ব্যক্ত হয়, তাহা কখন মিথ্যা হইতে পারে না।

সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বাত্মতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা অপর কোন কারণ বা ইন্দ্রিয়াদি হইতে সেই অভিব্যক্তি উদ্ভূত হয় না। ইহাকেই অতীন্দ্রিয়, আত্মসম্ভূত জ্ঞান বলা যায়। ব্রহ্মচৈতন্য প্রবেশ না করিলে এ অধিকার বা ঐশ্বর্য্য লাভ হয় না। জননি ! তুমি আমায় যাহা শিখাও, আমি তাহাই শিখি। নহিলে আমার শিখিবার অন্য কি উপায় আছে ?

আচরণ।

সংসারে তুমি বলবান (বলপ্রকাশোন্মুখ) ব্যক্তির নিকট প্রণত হইয়া প্রথমেই তাহার বল হরণ করিয়া তাহার সহিত নিষ্কামভাবে আচরণে সঙ্গত হইবে। সকামীরা সকলের নিকট প্রণত হইতে পারে, পরন্তু নিষ্কাম প্রণতিতেই ব্রহ্মবিদ্যা সঞ্চিত হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

:0:

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(২০)

ভূমা কাহাকে বলে ?

সমুদ্রতীরবাসী কখন কূপের প্রশংসা করে না, কণ্টকারী ফুল নন্দনকাননবাসীর নিকট চিত্ত-বিনোদক হয় না, বিলাসিনীর অপাঙ্গভঙ্গী মক্ষিসদৃশ মহামনার মনোহরণী হয় না, (মক্ষি, শাণ্ডিল্যকুলজাত ব্রাহ্মণ, ঋষি বিশেষ) তদ্রূপ বেদবিদ সাধুগণের নিকট শ্রুতি-বিরুদ্ধ বাক্য "মধুমিশ্রিত বিষকণা বোধে" দূরে পরিত্যজ্য ব্যতীত কস্মিনকালেও প্রশংসিত হয় না, রমমাণ থাকিয়া আত্মহারা হওয়া ত দূরের কথা। অতএব নানাবেশধারী ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রচারিত "ভূমা নামক একটী পৃথক স্থানের অস্তিত্ব", "নিষ্কামের পর ভূমা।" —"ভূমা হইতে ব্রহ্মত্ব ইত্যাদি" বাক্য সমর্থনে প্রকৃতির নিতত্ব ও জগৎ-কারণত্ব বজায় রাখিতে হইলে, শ্রুতি-বিরুদ্ধ বাক্যের অপব্যবহার হইলে চলিবে না। শ্রুতি সমন্বয়ের সহিত "ভূমা কাহাকে বলে" নির্ণয় করিতে হইবে।

শ্রুতি * বলেন—যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি,—স ভূমা, যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্তং, নাল্পে সুখমস্তি ; অর্থাৎ যাহাকে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহাই ভূমা। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত স্বরূপ ও সুখ স্বরূপ। তদপেক্ষা যাহা অল্প অর্থাৎ যাহা ভূমার বিপরীত,—(যাহাকে অন্য বস্তু দর্শন করে, শ্রবণ করে, অন্য বিষয় জানিতে পারে) তাহা মরণশীল ও বিনাশী। তাহাতে অমৃতত্ব ও সুখত্ব নাই; তাহা অল্প—অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তু বিশেষ মাত্র। পরিচ্ছিন্ন বস্তু সীমাবদ্ধ, পরিমিত ও অবধিযুক্ত; অনন্ত নহে। যাহা অনন্ত নহে, তাহা সান্ত অর্থাৎ অন্তবান। কাজেই বিনাশী, নশ্বর ও অনিত্য বস্তু বিশেষ। অতএব যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহাই অনিত্য। অল্প বা অনিত্য বস্তুতে সুখত্ব নাই,— অর্থাৎ "নাল্পে সুখমস্তি"।

বেশ, আর বিচার কেন ? উল্লিখিত শ্রুতি বাক্যই ত "ভূমা অর্থে" মনোবাণীর অতীত পূর্ণপরব্রহ্ম প্রতিপাদন করিল;—অর্থাৎ ভূমাবোধক শ্রুতি বাক্যই মনোবাণীর অতীত; বাগিন্দ্রিয় বর্জ্জিত পূর্ণ পরব্রহ্ম অর্থে বিবক্ষিত হইল। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া এই বাক্যের নিষ্প্রয়োজন কল্পনা দূর করিতে হয়। তদ্বারা প্রামাণ্যনিশ্চয়-সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়া কৃতকৃতার্থতা লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়। অতএব বিশেষ যুক্তির সহিত বিচারের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। বিচারই অজ্ঞান-দাবাগ্নির জ্বলন্ত অঙ্গারে তপ্যমান জীবের মহৌষধ স্বরূপ; সংশয় রূপ পরিপন্থী বিনাশের আয়ুধ বিশেষ। বিচার দ্বারা সমস্ত শাস্ত্র-তাৎপর্য্যের সারভাব হৃদয়ঙ্গম হইয়া "শাস্ত্রে" বিশ্বাস,—ভক্তির প্রবৃত্তি প্রবল হয়, শাস্ত্র-বৈফল্য দোষ দূরে পলায়ন করে। পরন্তু অবগত হওয়া যায় যে:——

যাহাকে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানে না, তাহাই "ভূমা"। ভাবকথা;—ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যে দর্শন করে, সে দ্রষ্টা, বা দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তাই দ্রষ্টা; যে শ্রবণ করে, সে শ্রোতা; যে জানে সে জ্ঞাতা। দ্রষ্টা, শ্রোতা ও জ্ঞাতা থাকিলে অবশ্যই তাহারা দর্শন করিত, শ্রবণ করিত ও জানিত। অতএব যাহাকে অন্য কিছু দর্শন করে না,—অর্থাৎ যাঁহার দ্রষ্টা নাই; অন্য কিছু শ্রবণ করে না,—অর্থাৎ যাহার শ্রোতা নাই; অন্য কিছু জানে না,—অর্থাৎ যাহার জ্ঞাতা নাই; তাহাই "ভূমা" তবেই দেখা গেল,—দ্রষ্টা, শ্রোতা ও জ্ঞাতাবিহীন স্থানই "ভূমা" স্বরূপ।

আবার দ্রষ্টা না থাকিলে দৃশ্য থাকে না, শ্রোতা না থাকিলে শ্রোতব্য থাকে না। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয়ই থাকে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় না থাকিলে, বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোষ থাকিতে পারে না। তদভাবে প্রাণময় ও অন্নময় কোষের অবস্থিতি কদাচ সম্ভবপর নহে;—সুতরাং আনন্দময় কোষের ত কথাই নাই। কারণ, মন, অন্তঃকরণ, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই পাঁচটী মনেরই পর্য্যায় শব্দ বা অন্তঃকরণের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ মন "পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়" দশবিধ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ, হৃদয় রূপ পদ্ম তাহার বাসস্থান। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং বাহ্য বস্তু গ্রহণে সমর্থ হয় না;—এইজন্য মনের একটী নাম অন্তঃকরণ। অনুস্মৃতি আছে বলিয়া,—অর্থাৎ অতীত বিষয় স্মরণ করে বলিয়া মনের একটী নাম চিত্ত। দারা, পুত্র, গৃহ, ধনাদিতে মদীয়ত্ব বুদ্ধি, অর্থাৎ "আমার," "আমার" বুদ্ধি ও অহং-জ্ঞান থাকায় মনের একটী নাম অহঙ্কার। ভ্রমশূন্য প্রমাজ্ঞান দ্বারা বস্তুর প্রামাণ্য নিশ্চয়ে সমর্থ হয় বলিয়া (যাহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলে) মনের একটী নাম বুদ্ধি। অতএব জানা গেল যে, মন আর অন্তঃকরণ একই পদার্থ; কেবল "আক্ষরিক" শব্দ—বিভিন্নতা মাত্র। এই মন বা অন্তঃকরণের কয়েকটী বৃত্তি বা ক্রিয়ার তারতম্যতায়,—একই মন,—অন্তঃকরণ, চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি আখ্যায় আখ্যায়িত হয়, বা মনকে চারি প্রকার বলা হয়; যথা মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। মতান্তরে চিত্ত, অহঙ্কার ও বুদ্ধি লইয়া মন বা অন্তঃকরণকে তিন প্রকার বলা হয়। "যত প্রকারই হউক না কেন-" ইহা দ্বারা জানা গেল যে,—চিত্ত, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি ইহারা মনেরই পর্য্যায় শব্দ বা অন্তঃকরণ পদ বাচ্য।

এই মন ও বুদ্ধি অন্তঃকরণ পদ বাচ্য হইলেও, মনের সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যোন্মুখ হয় না। আবার মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ ত্রিগুণময় পদার্থ। ইহাদের মূলীভূত 'সত্ত্ব—রজঃ—তম' গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ সত্ত্ব গুণের আধিক্যে—রজ ও তমো গুণের,—রজগুণের আধিক্যে সত্ত্ব ও তমোগুণের,—তমোগুণের আধিক্যে রজো ও সত্ত্ব গুণের কার্যকরণী শক্তি লোপ পায়। তথাপি বুদ্ধির সহায়তায় উপযুক্ত ভাবে সম্মিলিত হইয়া ইহারা "করণ" রূপে পরিণত হয়। এইজন্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তিন অন্তঃকরণ, যথা মন, চিত্ত, অহঙ্কার (মতান্তরে মন বুদ্ধি, অহঙ্কার) এই তেরটী বস্তু "করণ নামে' অভিহিত। ইহারাই পৃথিব্যাদি স্থূল, সূক্ষ্ম যাব-

তীয় জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া বুদ্ধিতে সমর্পণ করে এবং বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বদাই বুদ্ধির আদেশ পালনে প্রস্তুত হয়। এইজন্য "বুদ্ধি" অন্তঃকরণ বৃত্তির মধ্যে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথম জাত বলিয়া প্রধান ও কর্ত্তৃরূপে পরিগণিত হয়। এবম্বিধ বুদ্ধি যখন বেদার্থ নিশ্চয় করে,—অর্থাৎ বেদার্থ বিষয়ে সংশয়শূন্য হইয়া প্রমায় পরিণত হয়, তখন তাহার নাম "বিজ্ঞান"; আর তন্ময় মনই বিজ্ঞানময় নামে অভিহিত হয়। বিজ্ঞানময় মনের সর্ব্ববিদিত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্ব আছে। এইজন্য শ্রুতিমতে তাহা "জ্যেষ্ঠমুপাসতে"। অর্থাৎ বিজ্ঞান বস্তুটী বুদ্ধিরই পর্য্যায় শব্দ বা নামান্তর মাত্র। আবার বুদ্ধি পদার্থটী মন বা অন্তঃকণের নামান্তর স্বরূপ। এই মন বা অন্তঃকরণ অধ্যবসায় বৃত্তির সহায়তায় বিপর্য্যয়শূন্য হইয়া (অতত্ত্বে তত্ত্ব, অনিত্যে নিত্যত্ব, অশুচিতে শুচিত্ব প্রত্যয়জনিত ভ্রান্তির নাম বিপর্য্যয়,—মতান্তরে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা মরণভয় এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে বিপর্য্যয় বলা হয়) যখন বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য হয়, তখন দেবতাগণ তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ—আদি (প্রথম জাত) ও শ্রেষ্ঠজ্ঞানে "উল্লিখিত বিজ্ঞানময় অবস্থাকে"-বিজ্ঞান বিশেষিত পূর্ণ পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন। অতএব জানা যাইতেছে যে,—মন বা অন্তঃকরণের নামান্তর স্বরূপ যে বুদ্ধি তাহার—কর্ত্তৃরূপে কর্ত্তৃত্ব থাকায় "বুদ্ধিই"—বিজ্ঞানময়,-আর করণরূপে করণত্ব থাকায় "মনই" মনোময় শব্দে অভিহিত হয়।

উপরোক্ত বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোষ পরস্পর অন্তর্বাহ্যভাবে অবস্থিত;—অর্থাৎ "অন্তর্বহিশ্চৈতে পরস্পরম্"। এইজন্য ইহারা অখণ্ডাকার বস্তু;—একটীর অভাবে অন্যটীর বিদ্যমানতা অসম্ভব। আমাদের আলোচ্য জ্ঞাতা ঐ বিজ্ঞানময় কোষ হইতে উৎপন্ন হয়;—"অর্থাৎ বিজ্ঞানময় উৎপন্নো জ্ঞাতা"। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি ত্রয়োদশ করণের "গুণকার্য্য রূপে" রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এবং পাঞ্চভৌতিক পদার্থ সমূহ বা তদ্বিষয়ীভূত স্থূল,—সূক্ষ্মাদি সমস্ত পদার্থই "জ্ঞেয়"। দশম ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ "করণরূপী" মনের সাহায্যেই জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান সুসম্পন্ন হয়। এইজন্য, মনোময় কোষ হইতে ঐ "জ্ঞেয় বিষয়ক" জ্ঞান উৎপন্ন হয়;—অর্থাৎ "জ্ঞানং মনোময়ঃ"। অতঃপর সহজেই বোধগম্য হইবে যে,—জ্ঞাতা বিজ্ঞানময় কোষ হইতে, আর "জ্ঞেয়"—মনোময় কোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। অতএব এবম্ভূত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় না থাকিলে, বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোষের অবস্থিতি কদাচ সম্ভবপর নহে।

আবার যে বস্তুর শক্তি-চমৎকারিত্বে অলক্ষিতভাবে অন্নময় স্থূল দেহের সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়,—অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন ও আঘ্রাণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, বাক্যকথন, গমনাগমন, বস্তুগ্রহণ, মলাপনয়ন ইত্যাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম; অধিকন্তু পাকরসাদি নিঃসারণ, ভুক্তান্ন ও পেয় জলাদির সমতা সাধন, ভুক্ত বস্তুর সারাংশ পোষণ, স্থাবর জঙ্গম চরাচরাদি অনন্ত পদার্থের পোষণ ক্রিয়া সাধন এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ ইত্যাদিতে "ত্রয়োদশ করণ সম্ভূত" সমস্ত কর্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন হয়; যাহার প্রকাশাবস্থায় অন্নময় স্থূল শরীর জীবিত, অপ্রকাশাবস্থায় মৃতবৎ গণ্য হয়; যে বস্তু অগ্নিরূপে পাকক্রিয়া, সূর্য্যরূপে তাপ প্রদান, মেঘরূপে বারিবর্ষণ,

বায়ু রূপে মেঘবাহন, ইন্দ্ররূপে প্রজা পালন, চন্দ্ররূপে পোষণ ইত্যাদিতে সারা জগতের কল্যাণ সাধন করে; শ্রুতি যাহাকে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, আচার্য্য-ব্রাহ্মণ এবং দাতা, দেয় ও গ্রহীতা স্বরূপ বর্ণনা করেন; সেই পরম বস্তুই বোধ সৌকর্য্যার্থে "প্রাণ" নামে অভিহিত হয়।

অন্যথায় সে বস্তুর "অর্থাৎ প্রাণের" কোনরূপ নামের সংজ্ঞা অবশ্যম্ভাবী নহে। মনে করুন,—আমরা যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকি, তখন আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বতঃই প্রবাহিত হয়। দেহে প্রাণও থাকে। মৃত্যু হইয়াছে কেহ বলে না। সেই সুপ্তাবস্থায় যদ্যপি কেহ আমাদের নাম ধরিয়া ডাকে, বা "প্রাণ মশায়"! "জগৎ প্রাণ মশায়"! বলিয়া চীৎকার করে, তাহাতে আমরা জাগরিত হই না, বা তাহার সম্বোধনে কোন উত্তর দেই না। উচ্চ চীৎকার করিলে অবশ্যই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ঘুম ভাঙ্গিলে আমাদের নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া হয়। তবেই দেখা গেল যে, প্রাণের যদ্যপি প্রকৃত নাম বা সংজ্ঞা থাকিত, তাহা হইলে সুপ্তাবস্থায় প্রাণের বিদ্যমানতা স্বত্বেও উত্তর না দেওয়া হইত কেন? অতএব প্রাণ ঘুমাইলে অর্থাৎ অপ্রকাশ হইলে নামের সংজ্ঞা হারায়, আর প্রকাশ হইলে নানাবিধ নাম ও গুণ ক্রিয়ার অধিকারী হয়।

আলোচ্য প্রাণময় কোষ, প্রাণের প্রকাশাবস্থার সংজ্ঞা বিশেষ। এই জন্য "ময়" পদটী বিকারার্থে বিবক্ষিত হয়। অজ্ঞানবশতঃ ভ্রমের নাম বিকার, আর যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তু নির্ণয় করাই ভ্রম। এই-জন্য বিকার ও বিপর্য্যয় (উপরে বলা হইয়াছে) একার্থবোধক শব্দ মধ্যে গণ্য হয়। প্রাণের কোন নাম নাই, তথাপি বোধসৌকর্য্যার্থে তাহা প্রাণ, প্রাণময়, প্রাণময়ী ইত্যাদি নাম এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান পঞ্চবিধ বায়ু দ্বারা,—"একই প্রাণ বস্তুর পর্য্যায় শব্দ বা নামান্তর সংজ্ঞা প্রয়োগে" বিভিন্ন গুণ বর্ণনায় বহুবিধ প্রয়োজন বা ব্যবহারে আনিতে হয়। যে পর্য্যন্ত প্রাণই পূর্ণপরব্রহ্ম স্বরূপ, সারা জগৎ প্রাণ স্বরূপ, প্রাণাতিরিক্ত কোন পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব নাই, এইরূপ জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ না হইবে, কিম্বা প্রাণ ও পূর্ণপরব্রহ্মের একীভাব "অনন্য-প্রয়োজন-বিশিষ্ট, অনুপম ও শাশ্বত"—দৃঢ় ধারণায় না আসিবে,—ততদিন ঐ "ময়" পদটী বোধসৌকর্য্যার্থে প্রয়োজন-সিদ্ধির প্রতিপাদক হইয়া বিকারার্থেই বিবক্ষিত হইবে। ইহাই "প্রাণ বা প্রাণময়ের" চুম্বক আলোচনা।

পক্ষান্তরে—প্রাণের গতি, প্রাণের কার্য্য, শরীর মধ্যে কোথায় কি ভাবে প্রাণের অবস্থান, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীতে প্রাণের গতি ও ক্রিয়া ইত্যাদিতে "প্রাণময় শরীর সাধনের" উপায় বর্ণনা না করিলে প্রাণের ব্যাখ্যা বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এক পক্ষে তাহা যেমন হৃদয়গ্রাহী ও সাধন-ভজনবিহীন অনাত্মজ্ঞানী ধর্ম্মপ্রচারকদের নিদ্রাভঙ্গক, অন্যপক্ষে তদ্রূপ বৃহৎ ব্যাপার ও সময় সাপেক্ষ। পরন্ত বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এক কথায় "সারভাব" জানিতে হইবে যে:—

ভূভাগের উপরিস্থিত জলরাশি ভূগর্ভে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রমুখে আকৃষ্ট হইয়া

পুনরায় যেমন উৎসরূপে ভূভাগের উপরে আনীত হয়; রসাদি পদার্থ সকল বৃক্ষ মূল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষের উন্নতি সাধন করতঃ পুনরায় যেমন পত্র, পুষ্প, ফলাদি রূপে বহির্গত হয়; তদ্রূপ যে বাহ্য প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়-সীমাদেশ বিস্তৃত নাড়ীগুলির দ্বারা শরীরের বাহ্য দেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া প্রাণময় শরীরে আনীত হয়,—এবং প্রাণময় শরীরের উন্নতি সাধন করতঃ ক্রমে কর্ম্মেন্দ্রিয় সীমাদেশ বিস্তৃত নাড়ী গুলির দ্বারা বাহ্য প্রদেশে প্রসারিত হয়,—সেই বাহ্য প্রাণকেই "প্রাণময় কোষ" বলা যায়; কিন্তু মনোময় কোষ দ্বারাই প্রাণময় কোষ পূর্ণতা লাভ করে; যেহেতু মনোময় ও প্রাণময় কোষ অখণ্ডাকার বস্তু,—অর্থাৎ একটীর অভাবে অন্যটী থাকিতে পারে না। অতএব "জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অভাবে" মনোময় কোষ না থাকিলে, প্রাণময় কোষের বিদ্যমানতা কদাচ সম্ভবযোগ্য নহে।

এইরূপ অন্ন, ব্যঞ্জনাদি ভোজ্যও পেয় দ্রব্যের পরিণাম বিশেষে শুক্র-শোণিতোৎপন্ন যে দেহ, যাহা কেবল রক্ত, মাংস, মজ্জা, অস্থি, পূয়, বিষ্ঠা ও মূত্রাদিরই সংহতি বিশেষ পদার্থ; যাহাকে উৎপত্তির পূর্ব্বে ও মরণের পর দেখা যায় না, কোন কোন মতে যাহা পঞ্চীকরণ ও ত্রিবৃৎ করণ হইতে উৎপন্ন হয়;—(পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূত পঞ্চের পরস্পর অংশ সম্মিলনের নাম পঞ্চীকরণ, ইহারই অন্য নাম অপঞ্চীকৃত ভূত পঞ্চের সম্মিলন বিশেষ। আর পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই ভূত ত্রয়ের সংমিশ্রনই ত্রিবৃৎকরণ। এ সম্বন্ধে বহু কথা আছে; বর্ত্তমানে তাহা নিষ্প্রয়োজন। এবম্বিধ স্থূল দেহ বা শরীরই অন্নময় কোষ নামে অভিহিত হয়। এই অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকে :—অর্থাৎ প্রাণ লইয়াই স্থূল দেহের দেহত্ব বা অন্নময় কোষের অস্তিত্ব। অতএব প্রাণময় কোষ না থাকিলে, অন্নময় কোষের বিদ্যমানতা বা স্থূল দেহের অবস্থিতি কস্মিনকালেও সম্ভাব্য নহে।

আবার স্থূল দেহ বা অন্নময় কোষ না থাকিলে, জগতের বিদ্যমানতাও অবশ্যম্ভাবী নহে। যেহেতু দেহ বা শরীর বলিয়া কোন পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব নাই, উহা অন্ন, ব্যঞ্জনাদিরই অবস্থান্তরিত অবস্থামাত্র। অন্ন, ব্যঞ্জনাদি ভুক্ত বস্তুই কৌশলক্রমে রক্ত, মাংসাদি আকারে "দেহ রূপে" পরিণত হয়। অতএব দেহ বলিলে অন্ন, ব্যঞ্জনাদি বস্তুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার অন্ন ব্যঞ্জনাদি বস্তু, পার্থিব পরমাণুপুঞ্জের অবস্থান্তরিত অবস্থা বিশেষ বা নামান্তর মাত্র; সুতরাং দেহ শব্দ পরমাণুর প্রতিপাদক হইল বা দেহ বলিলে পরমাণুরই নামান্তর বুঝাইল। আমরা এই "পরমাণু" লইয়াই পরিতপ্ত; অর্থাৎ পরমাণুগুলি নিমিত্ত কারণের অভাবে মিলিত না হওয়ায় জগতের অনুৎপত্তি;—পরন্তু তাহারা (পরমাণুগুলি) নিজের নিত্যত্ব রক্ষায় অসমর্থ হইয়া জড়াবস্থায় কাটাইতেছে। এই দুইটী কারণে আমরা পরিতপ্ত অর্থাৎ দুঃখিত। এইজন্য যাঁহারা প্রকৃতিকে নিত্য বস্তু ও জগৎ কারণ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়ে প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ-কারণত্ব সমর্থনার্থেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ "ভূমার" আলোচনা। মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, পরমাণু-মিলন কার্য্য সমাধা হইলেই,—জগতের

উৎপত্তিতে "জ্ঞান ও ভক্তির" এক একত্ব বা অভেদত্ব প্রদর্শন নিষ্কণ্টক করা। —অতএব দেহ পরমাণুর নাশান্তর বা অবস্থান্তর হইলে, পরমাণুই "ময়" অর্থাৎ বিকারার্থে স্থূল দেহ বা অন্নময় কোষ, বর্ত্তমানাবস্থায় স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং এবম্বিধ দেহ বা অন্নময় কোষ না থাকিলে পরমাণুকে আর বিকৃত বা অবস্থান্তরিত হইতে হয় না। অভিপ্রায় এই যে, যাহার জন্য পরমাণুর বিকার বা অবস্থান্তর,—সেই জন্য-বস্তু স্থূল দেহ বা অন্নময় কোষ অস্তিত্বশূন্য বস্তু হইলে, পরমাণুকে বিকৃত অর্থাৎ স্পন্দিত বা সংযোগ দ্বারা ক্রিয়ান্বিত হইয়া দ্ব্যনুক, ত্রসরেণু ইত্যাদিতে বিশ্ব বিস্তার করিতে হয় না; সুতরাং জগতের অনুৎপত্তি বা জগতের বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী নহে, অর্থাৎ জগৎ থাকে না। জগতের অভাবে অর্থাৎ জগৎ না থাকিলে আনন্দময় কোষের অবস্থিতিও তথৈবচঃ। এইজন্যই উপরে বলা হইয়াছে যে, "জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়" না থাকিলে বিজ্ঞানময় মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষের অবস্থিতি কদাচ সম্ভব নহে;—সুতরাং তদাভাবে আনন্দময় কোষের ত কথাই নাই।

অতএব পূর্ব্বাপর আলোচনায় দেখা গেল যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় না থাকিলে সারা জগৎ থাকে না। কাজেই দ্রষ্টা—দৃশ্য, শ্রোতা-শ্রোতব্য, ভোক্তা-ভোগ্য, মন্তা-মন্তব্য ইত্যাদিতে স্থাবর, জঙ্গম, চরাচরাদি কিছুই থাকিতে পারে না। সুতরাং—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" শ্রুতি মন্ত্রের বা বেদ বাক্যের (যাহাকে অন্য কিছু দর্শন করে না, যাহাকে অন্য কিছু শ্রবণ করে না, যাহাকে অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহাই ভূমা) সার ভাব দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে,—যাহাতে সারা জগৎ থাকে না, তাহাই "ভূমা;" অর্থাৎ সে স্থানই ভূমা পদ বাচ্য বা "ভূমা-স্বরূপ"।

সেই জগৎশূন্য স্থানই ত অদীর্ঘ, অহ্রস্ব, অরূপ, অনাশ্রয়, অবিনাশী, অক্ষয় ও সনাতন। তাহাই ত অনাবিল, অম্লান ও শাশ্বত। তাহারই ত নামের সংজ্ঞা পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পূর্ণপরব্রহ্ম। বেদ উদ্গাথ-ভক্তিতে (বৈদিক স্তোত্র বিশেষে) তাঁহারই ত যশোগান করিয়া বলেন—"অন্তশ্চরতি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্ব মূর্ত্তিষু।" অতএব যাহা "ভূমা" তাহাই "পূর্ণপরব্রহ্ম" বা পূর্ণপরব্রহ্ম লক্ষণাক্রান্ত বস্তুই ভূমা স্বরূপ প্রতিপন্ন হওয়ায়, উভয়েই অর্থাৎ "ভূমা ও পূর্ণপরব্রহ্ম" শব্দ একার্থ-বোধক, অভেদ ও অখণ্ড।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।
সন্তোষপুর; হুগলী।

—:0:—

উত্তর গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন,—সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর ব্রহ্মকে অবগত হইয়া "আমিই সেই ব্রহ্ম" এইরূপ নির্দ্দেশ করে, তাহার প্রমাণ কি? ১॥

শ্রীভগবান কহিলেন,—জলে জল, ক্ষীরে ক্ষীর, ঘৃতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষত্ব থাকে না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোনরূপ বিভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। ২॥

ব্রহ্মবিৎ সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করতঃ তত্ত্বমসি মহাবাক্য দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তা করিবে, তাহা হইলেই জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর স্বয়ং প্রকটিত হইবেন। ৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—যদি গুরূপদেশে জ্ঞেয় বিষয় তৎক্ষণাৎ অবগত হওয়া যায়, এবং তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তবে আর যোগ ধারণার প্রয়োজন কি? ৪॥

শ্রীভগবান কহিলেন,—যেমন আলোক তিমিরাবৃত স্থানের তিমির বিনাশ করিয়া সেই স্থানের দ্রব্যাদি প্রকাশিত করে, তদ্রূপ জ্ঞানালোকে দেহমল বিদূরিত হইলে, তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি ব্রহ্মসমন্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে বিদ্বান ব্যক্তির কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হইয়া থাকে। ৫॥

যেমন জল জলে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ পবিত্র, নির্ম্মল অম্বরসদৃশ, অদ্বৈতরূপ পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে, তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বাধি উপাধিশূন্য হইয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। ৬॥

পরমাত্মা আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য, অন্তরাত্মাও তদ্রূপ বায়ুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় না; যে যোগীব্যক্তি সমাধি দ্বারা আত্মাকে নিশ্চল ও অন্তর্ম্মুখীন করিয়াছেন, তিনিই আত্মা ও পরমাত্মার একীভাব অবলোকন করিয়াছেন। যেমন সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী আকাশ উপাধি বিনাশে মহাকাশে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির যে রূপেই মৃত্যু হউক না কেন, ব্রহ্মে লয় হয় ৭-৮॥

চৈতন্যরূপী আত্মা শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সেই আত্মাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের অতীত বলিয়া জানিতে হইবে। ৯॥

যে যোগী মুহূর্ত্ত মাত্রও নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া চিত্ত সংযত করেন, তিনি শত জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ১০॥

শরীরের দক্ষিণাংশে পিঙ্গলানাম্নী যে নাড়ী আছে, তাহা অগ্নির ন্যায় জ্যোতিষ্মতি ও পুণ্যকর্ম্মানুসারিনী। ইহাই দেবযান বলিয়া খ্যাত। ইড়া বাম নিশ্বাস চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল। ইহা শরীরের বামভাগে অবস্থিতি করে এবং পিতৃযান বলিয়া খ্যাত। ১১-১২॥

জীবের শরীরের অভ্যন্তরে মুলাধার হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত বীণাদণ্ডের ন্যায় যে একটী দীর্ঘ অস্থি আছে, উহাকেই মেরুদণ্ড বা ব্রহ্মদণ্ড কহে। তাহার মধ্য ভাগে একটি অতি সূক্ষ্ম নাড়ী আছে, তাহাকেই ব্রহ্মনাড়ী কহে। ১৩-১৪॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যভাগে যে সূক্ষ্মরূপিনী সুষুম্না নাড়ী আছে; তাহাতে সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বতোমুখ, ব্রহ্মজ্যোতি অবস্থান করিতেছেন। ঐ নাড়ীর মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, পরমেশ্বর, ভূতলোক, দিক, ক্ষেত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, শিলা, দ্বীপ, নদী, বেদ-চতুষ্টয়, শাস্ত্রাদি, বর্ণ, স্বর, মন্ত্র, পুরাণ, সত্ত্বাদি গুণত্রয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ইত্যাদি বাস করিতেছে। ১৬॥

এই সুষুম্না নাড়ী জীবগণের দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া নানা নাড়ী প্রসব করিয়া থাকে; সুতরাং উর্দ্ধদেশে মূল এবং অধোদেশে শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

জীবের শরীরাভ্যন্তরে দ্বিসপ্ততি সহস্র সংখ্যক নাড়ী আছে। যোগিগণ বায়ুর সহায়তায় ঐ সকল সচ্ছিদ্র নাড়ীর অভ্যন্তরে গমনাগমন করতঃ তাহাদিগের তত্ত্ব অবগত হন। ১৭-১৮॥

যে সকল নাড়ী সুষুম্না হইতে উৎপন্ন হইয়া নবদ্বার নিরোধপূর্ব্বক উর্দ্ধাধোভাবে প্রসৃত রহিয়াছে, যোগীব্যক্তি বায়ুর সহযোগে ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদি নবদ্বার অবগত হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৯॥

নাসার অগ্রভাগে অমরাবতী নামক ইন্দ্রলোক, চক্ষু মধ্যে তেজোবতী নামক বহ্নিলোক, কর্ণের নিকটে সংযমনী নামক যমলোক, এবং তাহার পার্শ্বে নৈর্ঋতলোক, শরীরের পশ্চাদ্ভাগে, পৃষ্ঠদেশে বরুণের পুরী বিভাবরী, কর্ণের পার্শ্বদেশে বায়ুর গন্ধবতীপুরী, কণ্ঠ হইতে বামকর্ণ পর্য্যন্ত পুষ্পবতী নামক কুবেরলোক, বামচক্ষুতে ঈশানের অবস্থিতি স্থান—মনোন্মনীপুরী, এবং মস্তকে দেহ-সংশ্রিত ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মপুরী অবস্থিত আছে। ২০-২৪॥

প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল ভগবান, কি উর্দ্ধ, কি অধঃ, কি মধ্য, কি বাহ্য, কি অন্তর, সর্ব্বত্র থাকিয়া কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। ২৫॥

পদকে বিতল, পদের অধোদেশকে অতল, পাদ-সন্ধিকে নিতল এবং জঙ্ঘাকে সুতল কহে। জানুদেশ মহাতল, উরুদেশ রসাতল, কটিদেশ তলাতল, এই সপ্ত পাতাল জীব শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। ২৬-২৭॥

নাভির নিম্নভাগে যেখানে ফণীন্দ্রগণ, যে স্থানে অনন্ত জীবরূপে কুণ্ডলাকারে আছেন, তাহাই পাতাল বলিয়া জানিবে। ২৮॥

নাভিদেশে ভূর্লোক, কুক্ষদেশে ভুবর্লোক এবং হৃদয়ে সূর্য্যাদিগ্রহ-তারাসমন্বিত স্বর্গলোক অবস্থিত। ২৯॥

যোগীব্যক্তি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, নক্ষত্রাদি ধ্রুবলোক কল্পনা করিবেন। এরূপ করিলে তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ করিবেন। ৩০॥

এই যোগীর হৃদয়ে মহর্লোক, কণ্ঠে জনলোক, ভ্রূমধ্যে তপলোক ও মস্তকে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত থাকে। ৩১॥

ব্রহ্মাণ্ডরূপিনী পৃথিবী জলে, জল বহ্নিতে, এবং বহ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে; আকাশ মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহঙ্কারে, অহঙ্কার চিত্তে, চিত্ত ক্ষেত্রজ্ঞে বিলীন হইয়া থাকে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অবশেষে পরমাত্মায় বিলীন হয়। ৩২-৩৩

তখন "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান করতঃ

যোগী একাগ্রমনে আমাকে ধ্যান করিয়া থাকেন; তখন তিনি শতকোটিকল্প কৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন ।৩৪ ॥

ঘটাকাশ উপাধিবিশিষ্ট ঘট মধ্যস্থ আকাশ, ঘট ভগ্ন হইলে যেমন মহাকাশে লয় পায়, তদ্রূপ অজ্ঞান বিদূরীত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে । ৩৫ ॥

ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় হয়, ইহা যিনি তত্ত্বজ্ঞানে অবগত হইয়াছেন, তিনি নিরবলম্ব জ্ঞানলোক প্রাপ্ত হয়েন । ৩৬ ॥

এইরূপ একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া সহস্র বৎসর যাবৎ তপশ্চরণ করিলেও এইরূপ ধ্যানযোগের একাংশের ফল লাভ করিতে পারে না ।৩৭॥

অগ্নি যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ এই ধ্যানযোগ সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা ও প্রাণহত্যাজনিত পাতক নষ্ট করিয়া থাকে ।৩৮॥

রন্ধন করিবার হাতা যেরূপ রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্য পাক করিয়াও তাহার রসাস্বাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ চারি বেদ ও সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তবে তাহার সমুদয় অধ্যয়ন বৃথা হইয়া থাকে ।৩৯॥

যেমন চন্দনকাষ্ঠ-বহনকারী গর্দ্দভ চন্দনের গুণ অবগত হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াও সার জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, তাহার গর্দ্দভের ন্যায় বহনই সার হইয়া থাকে ।৪০॥

যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, তাবৎকালই শৌচ, জপ, যজ্ঞ, তীর্থভ্রমন প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ।৪১॥

দেহ আপনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও যাহার "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান না হয়, সেই বিপ্র বেদ চতুষ্টয়ে পারদর্শী হইয়াও সুক্ষ্মস্বরূপ ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে । ৪২॥

গরু অনেক বর্ণ হইলেও তাহাদের দুগ্ধ এক বর্ণই হইয়া থাকে । সেইরূপ মনুষ্যগণের আকার ও রং ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, তাহাদের জ্ঞান দুগ্ধের ন্যায় একরূপই হইয়া থাকে । ৪৩।

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশুর আছে, মানবেরও আছে ; তবে মনুষ্যের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা জ্ঞান লাভে সমর্থ । সেই জ্ঞানহীন ব্যক্তি পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে ।৪৪॥

প্রাতঃকালে জীবগণ মলমূত্র ত্যাগ করে; মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে, ভোজনকরতঃ পরিতৃপ্ত হয় । আর রাত্রিকালে বিহারান্তে নিদ্রাভিভূত হয় ; সুতরাং মনুষ্য ও পশুর ভিতর কি প্রভেদ রহিল ?৪৫॥

সহস্র সহস্র নাদবিন্দু এবং কোটি কোটি জীব দগ্ধীভূত হইয়া নিরঞ্জন ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইতেছে ; সুতরাং "আমিই ব্রহ্ম" যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ ।৪৬।৪৭॥

নির্ম্মমতা ও মমতা এই দুইটী জীবের মুক্তি ও বন্ধনের কারণ। মমতার দ্বারা জীব বন্ধন দশাগ্রস্থ হয় এবং নির্ম্মমতার দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ।৪৮॥

মনের উন্মনীভাব অর্থাৎ অহঙ্কারাদি দূর হইলে অদ্বৈত ভাবের উদয় হয়, তখন মন পরম পদে লীন হইয়া থাকে। ৪৯।

ক্ষুধাতুর ব্যক্তি আকাশে মুষ্টিপ্রহার করিলে, বা তুষ কুণ্ডন করিলে, যেমন তাহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, তাহার মুক্তি হয় না। ৫০ ॥

ইতি উত্তর-গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

———:0:———

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীভগবান কহিলেন,—

শাস্ত্রগ্রন্থ অনন্ত এবং জ্ঞানের বিষয় বহু; কিন্তু সময় অল্প ও নানাবিধ বিঘ্ন বর্ত্তমান। এরূপ স্থলে হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করে, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি অনন্ত শাস্ত্রের মধ্যে যাহা সারাংশ তাহাই গ্রহণ করিবে। ১ ॥

যেমন সংসারে স্ত্রীপুত্রাদি যোগাভ্যাসে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদপুরাণ, ভারতাদি শাস্ত্র সকলও ভিন্ন ভিন্ন মতবাদাদি হেতু জ্ঞান লাভের পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া থাকে। ২ ॥

এইটী জ্ঞান, এইটী জ্ঞেয়, এই প্রকারে যে ব্যক্তি সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করে, সে সহস্র বর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়াও শাস্ত্রের পার দর্শন করিতে সক্ষম হয় না। ৩

জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরমাত্মা অক্ষয় ও সৎ, ইহা বিদিত হইয়া অনন্ত শাস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা সত্য তাহারই উপাসনা করিবে। ৪ ॥

পৃথিবীতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ই জিহ্বা ও উপস্থের উপভোগের নিমিত্ত, যিনি এই ইন্দ্রিয়দ্বয়ের ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার আর পৃথিবীতে কি প্রয়োজন আছে? ৫ ॥

আত্মধ্যান-পরায়ণ যোগিগণ হৃদয় মধ্যেই নিখিল তীর্থ ও যাবতীয় দেবতা দর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা পুণ্যসলিলা নদ্যাদিবিশিষ্ট তীর্থস্থান ও পাষাণ নির্ম্মিত বা মৃন্ময় দেবতা দর্শন করিতে নানাস্থানে গমন করেন না। ৬ ॥

দ্বিজাতিদিগের অগ্নিই দেবতা, মুনিগণের হৃদয় স্থিত আত্মাই দেবতা, স্বল্পবুদ্ধি মানবগণের মৃৎপাষাণাদিময় মূর্ত্তিই দেবতা এবং যে সকল ব্যক্তি সমদর্শী, তাঁহাদের সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্মই দেবতা। ৭ ॥

শান্তমূর্ত্তি দেবদেব জনার্দ্দন সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু যেমন অন্ধব্যক্তি সূর্য্য সকলস্থানে সমভাবে উদিত থাকিলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ জ্ঞানচক্ষু-বিহীন ব্যক্তিগণ সেই সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষ পরমব্রহ্মকে দেখিতে পায় না। ৮ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীর মন যে স্থানেই গমন করুক না কেন, তিনি সর্ব্বত্রই সেই পরম ব্রহ্মকে সমভাবে অবস্থিত দেখেন। ৯ ॥

যেমন বিমল আকাশ নেত্রে বিশেষরূপে প্রতিভাত হয় এবং তাহার রূপাদি বিশেষ করিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ যিনি "আমিই সেই অক্ষয় ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই অব্যয় স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরম ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। ১০ ॥

যে ব্যক্তি "আমিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড" এইরূপ জ্ঞান-নেত্রে পরম সুখস্বরূপ পরমাত্মাকে দৃষ্টিগোচর করেন, তখন তিনি আপনাকে আকাশরূপে দর্শন করেন এবং আপনাকে আকাশরূপ চিন্তা করেন। ১১ ॥

পরম ব্রহ্ম, নিষ্কল, সূক্ষ্ম, মোক্ষদ্বার-বিনির্গত, অপবর্গের কারণ এবং পরম বিষ্ণু ॥ ১২ ॥

তিনি সকলের আত্মজ্যোতি স্বরূপ, তিনি সর্ব্বভূতে বাস করিতেছেন। সেই আত্মাই পরমাত্মা এবং যোগিগণের আত্মরূপী ব্রহ্মস্বরূপ। ১৩ ॥

যে মনুষ্য "আমিই ব্রহ্ম এবং অখিলব্রহ্মাণ্ড আমিই" এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই ভোজন, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি সকল কামনা বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ১৪ ॥

যোগিগণ যেখানে নিমেষকাল বা তদর্দ্ধ সময় বাস করেন, সেই সেই স্থানে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য-প্রভৃতি তীর্থসকল বিরাজ করে। ১৫ ॥

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

বার্ষিক-উৎসব—বর্ত্তমান মাসের ২২শে তারিখ শুক্রবার অক্ষয়া তৃতীয়া তিথিতে অত্র সারস্বতমঠান্তর্গত শান্তি-আশ্রমের ৯ম বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে; তদুপলক্ষে ঐ দিন শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের আবাহন ও অর্চ্চনা, ২৩শে তারিখ শাস্ত্রব্যাখ্যা ও আলোচনা এবং ২৪শে তারিখ পঞ্চমী তিথিতে জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে সারস্বতমঠে তদীয় আসনে তাঁহার পূজা, আরাত্রিক, হোম ও বেদপাঠাদি হইবে; সমস্তদিন ব্রহ্মনাম যজ্ঞ এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবা পূজা হইবে। এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাধু-সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ এবং আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছি।

দানপ্রাপ্তি-স্বীকার—আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমে" নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি:—শ্রীযুক্ত হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙ্গা ১৲, শ্রীযুক্ত তারাপদ দত্ত, তেহট্ট, নদীয়া ১৷৵, ও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দত্ত, কাশীপুর, চট্টগ্রাম ।০ আনা।

শ্রীশ্রীযোগমায়া-মাতৃমন্দির।

হিন্দু-সমাজের বিধবা রমণী পবিত্রতার আদর্শ—ত্যাগের জীবন্ত ছবি। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উদাসীনতায় তাহারা উপেক্ষিতা ও অনাদৃতা হইয়া পড়িতেছে। সংসার কিংবা ধর্ম্ম এই উভয়ের একটী বন্ধনে জীবন বাঁধা না থাকিলে জীবনে স্বতঃই যে পদে পদে স্বেচ্ছাচারের আবর্জ্জনা জড়াইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। এদিকে লক্ষপতির বিধবা আত্মীয়াও একটী পয়সার কাঙ্গালিনী। আবার সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালী বিধবার অবস্থাই দিন দিন শোচনীয়া হইয়া উঠিতেছে। এই সকল বিধবা নারিগণের শিক্ষা ও সাহায্যকল্পে শ্রীশ্রী৺-

কাশীধামে একটী আদর্শ আশ্রম স্থাপনার প্রয়োজন সম্বন্ধে একজন সন্ন্যাসিনী-মাতা সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন উত্থাপন করেন। ক্রমশঃ কাশীবাসিনী কয়েকটী শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাতে যোগদান করেন। তাহার ফলে বিগত ৫ই আষাঢ় এই আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

এখানে কতকগুলি বিধবা নারীকে স্থানদান করতঃ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আচার, নিয়ম, পূজা, জপ ও যোগাদি ধর্ম্মাঙ্গ শিক্ষা দেওয়া এবং শাস্ত্রপঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শেলাই-শিল্পাদি জীবিকার্জ্জনের শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে। এতদ্ব্যতীত তাহারা আশ্রমে স্থানপ্রাপ্তা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাগণের সেবা করিবে এবং আর্ত্তগৃহস্থের সেবা ও সাহায্যার্থ প্রস্তুত থাকিবে; পরে এই আশ্রমের শিক্ষাপ্রাপ্তা বিধবারাই সর্ব্বত্র স্ত্রী-শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করিবে।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ বিধবারা এখানে আসিয়া যাহাতে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। ভদ্রলোকের স্ত্রী-কন্যাগণকে এখানে রাখিয়া সুশিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইবে। মাতৃত্বই নারী-জীবনের পূর্ণত্ব। প্রত্যেক নারী যাহাতে মাতৃত্ব লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। যাহাতে মেয়েরা বুঝিতে পারে, বিধবাজীবন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে, পরন্তু উহা বিধাতার করুণায় ধর্ম্মের উদ্বোধন; সুতরাং রাণী, রাজকন্যাও বিধবা হইলে যাহাতে এখানে আসিয়া শান্তি পান, আমরা সেই উদ্দেশ্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। বলা বাহুল্য এই আশ্রমের সহিত পুরুষের কোন সংস্রব থাকিবে না।

সেবাসহায়ে চিত্তশুদ্ধিপ্রয়াসিনী নগণ্যা স্ত্রীলোক আমরা, কেবলমাত্র মাতা যোগমায়া অন্নপূর্ণেশ্বরীর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া বহুব্যয়সাধ্য দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। আশাকরি, দেশের মহানুভব ব্যক্তিগণ আমাদিগকে পরিচালিত করিয়া আরব্ধ সৎকার্য্য সম্পাদনে যত্নবান হউন। কত অর্থ অনর্থে ব্যয় হইতেছে। তাহার সামান্য অর্থ দান করিলে, অনেক বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপারও সংসাধিত হইতে পারে।

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

তাই ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব দেশের ধর্ম্মপ্রাণ, সৎকার্য্যের সহায়ক ও সদনুষ্ঠানের সাহায্যদাতাগণের কৃপার উপর ন্যস্ত করিলাম। বিশেষতঃ বিধবা বা সধবা রাণী ও ভূম্যাধিকারিণীগণ সততই ইহার উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। যিনি যাহা দান করিবেন, যতই অল্প হউক না কেন, সাদরে গৃহীত হইবে। আশ্রমের কর্ম্মকর্ত্রী শ্রীযুক্তা "শান্তি দেবী, ২০০ নং মান-সরোবর ৺কাশীধাম," এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে আশ্রমের নিয়মাদি জানিতে পারিবেন। সাহায্যাদিও তাঁহার নামে পাঠাইবেন। ইতি—

শ্রীশ্রীকাশীধাম।
২০০ নং মান-সরোবর।

বিনীতা
শ্রীমাতৃমন্দিরের সেবিকা-বৃন্দ।

মন্তব্য—আমরা এরূপ একটী আদর্শ মাতৃ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রার্থনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। আশাকরি ইহার উপর সহৃদয় এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাগণের দৃষ্টি পতিত হইবে। সঃ আঃ দঃ।

—:০:—

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, } জ্যৈষ্ঠ। { ২য় সংখ্যা।

তিনটী 'দ'।

তিনটী 'দ' শুনিয়া কাহারও পাঁচটী 'ম' মনে পড়িয়া না যায়; অর্থাৎ পঞ্চ-মকারের কাছাকাছি মনে করিয়া প্রবন্ধটী পড়া কেহ বন্ধ না করেন; সেইজন্য প্রথমেই বলিতেছি 'দ' তিনটী তান্ত্রিক নহে, খাঁটী বৈদিক; বিশেষতঃ "ম"কারের ন্যায় আধ্যাত্মিক, ব্যবহারিক প্রভৃতি অর্থের মারপেঁচ "দ-"কারের নাই,—সাদা অর্থ, সুতরাং শান্তভাবে সকল শ্রেণীর পাঠকই পাঠ করিতে পারেন।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, "ত্রয়ঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্য অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ "দ" ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

অথ হৈনমসুরা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।"

দেবতা, মনুষ্য ও অসুর প্রজাপতির এই তিন পুত্র পিতৃ-সন্নিধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রজাপতি তাঁহাদিগকে "দ" অক্ষর বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবতারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে, তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমরা বুঝিলে? দেবতারা বলিলেন,—আমরা বুঝিয়াছি, আপনি "দাম্যত" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-দমন কর, এই উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিলেন। প্রজাপতি আনন্দিত হইয়া বলি-

লেন, "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ"। ঐরূপ মনুষ্যেরা পিতৃ-সন্নিধানে উপদেশ প্রার্থনা করিলে পর প্রজাপতি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমরা বুঝিয়াছ"? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করিলেন যে বুঝিয়াছি। আপনি "দত্ত" অর্থাৎ দানকর, এই উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ তোমরাও বুঝিয়াছ"। তৎপরে অসুরেরা ঐ প্রকার পিতার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে, তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা উপদেশ প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা বুঝিলে"? তদুত্তরে অসুরেরা বলিলেন যে, বুঝিয়াছি,— আপনি "দয়ধ্বং" অর্থাৎ দয়া কর, এই উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রজাপতি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "হাঁ তোমরাও বুঝিয়াছ"।

প্রজাপতি তিনটী 'দ' দ্বারা ব্রহ্মচারীর,— কেবল ব্রহ্মচারীর বলিব কেন, মানব মাত্রেরই জীবনের মূলমন্ত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন। যাঁহাদের 'দ' অর্থাৎ দম, দান ও দয়া এই তিনটী আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহারা মর্ত্ত্য-ভূমে দেবতাতুল্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই তিন গুণে দেবতা, মানব ও অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে। দেবতারা ভোগী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রজাপতি দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অসুরেরা ক্রোধী বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রজাপতি দয়ালু হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। আর মনুষ্যেরা লোভী বলিয়া তাঁহাদিগকে দান করিবার জন্য প্রজাপতি উপদেশ দিয়াছিলেন। মানবে—দেবতা, অসুর ও মনুষ্যের স্বভাব বর্ত্তমান। ভোগবাসনা অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী মানবের মহা শত্রু। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে,—

> "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
> কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।"
>
> গীতা, ১৬।২১

অর্থাৎ—কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী নরকের দ্বার স্বরূপ; তজ্জন্য এই তিনটী পরিত্যাগ করিবে। আবার এই তিনটী শত্রুর মধ্যে প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান শত্রুই কাম। কামই তাবৎ দুঃখকর কার্য্যের প্রবর্ত্তক। কামের দ্বারাই প্রাণীর বিষম অনর্থপাত হইয়া থাকে। ধুম যেমন অগ্নিকে মলিন করে, ধূলি যেমন দর্পণের স্বচ্ছতার হানি করে, জরায়ু যেমন জীবের স্বরূপ দেখিতে দেয় না, সেইরূপ কাম প্রথমাবস্থায় জ্ঞানের তেজ মলিন করে, দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞানের প্রতিভার হানি করে, তৃতীয় অবস্থায় জ্ঞানকে আদৌ প্রকাশিত হইতেই দেয় না। অতএব কামই জীবের প্রধান শত্রু। কাম, বিবেক শক্তিকে প্রকাশিত হইতে দেয় না। কাম যদিচ অবিচার-সিদ্ধ বহু সুখের হেতু স্বরূপ, তত্রাচ উহা পরিহার্য্য। অবিবেকিগণ বিষয় ভোগকালে কামকে মিত্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু পরিণামে তজ্জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়। কামের এই পরিণাম-বিরস প্রকৃতি জানিয়া জ্ঞানিগণ তাহাকে নিত্য বৈরী মনে করিয়া থাকেন। কাম ইচ্ছা ও তৃষ্ণারূপে জীবগণকে শত্রুর ন্যায় সদাই উত্তেজিত করে। কাষ্ঠ-ঘৃতাদির আহুতি দ্বারা অগ্নি যেমন

উত্তেজিতই হয়, নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ কাম অশেষবিধ ভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না। নিবৃত্তি ব্যতীত কামরূপ বৈরী নিপাতের উপায়ান্তর নাই। কাম মহাশন অর্থাৎ অপরিমিত ভোজী। যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু পাইলেও উহার উদর পূর্ত্তি বা তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্রীহি-যবাদি অন্ন, সুবর্ণাদি ধন, গো-অশ্বাদি পশু, পরমা সুন্দরী স্ত্রী আদি ভোগ্য পদার্থ কামীব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না; তবে অল্পভোগে কিরূপে শান্তি হইবে? এতদ্ বিচার পূর্ব্বক কামনা পরিত্যাগ করিবে।

রূপ রসাদির আশ্রয় স্বরূপ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সংকল্পস্বরূপ মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কাম জ্ঞানকে আবৃত করতঃ দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে। যেমন পর্ব্বত, দুর্গ-আদি রাজাদিগের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদিও কামের প্রশস্ত আশ্রয় স্থান। ইন্দ্রিয়গুলি স্ববশে থাকিলেই কাম স্বতএব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলেই মনবুদ্ধিও ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসে। কেন না বাহেন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারাই মন ও বুদ্ধি মলিন হইয়া অনর্থপাত করে। কামই জ্ঞান (আত্মবোধ) ও বিজ্ঞানের (আত্মানুভবের) পথ বন্ধ করিয়া প্রধানরূপে পাপরাশির সূচনা করিয়া থাকে। অতএব কামকে মহা অনর্থকারী অপরাধীর ন্যায় দণ্ডদান ও বিনাশকরা কর্ত্তব্য। নতুবা ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না। যথা:—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
মনু, ২।৯৪

ঘৃতকাষ্ঠাদি দ্বারা যেমন অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বহু পদার্থ উপভোগ দ্বারাও সেইরূপ কামও বর্দ্ধিত হয়। তজ্জন্য প্রজাপতি ভোগপরায়ণ দেবতাগণকে 'দ' অক্ষর দ্বারা দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীভগবানও অর্জ্জুনকে কাম বিনাশের জন্য ইন্দ্রিয়সংযমের উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা:—

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশনম্॥
গীতা, ৩।৪১

"হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্ব পাপের মূলভূত ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিনাশকারী এই কামকে বিনষ্ট কর।" কামের নিবৃত্তি হইলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সকলেই কাম নিবৃত্তির জন্য যত্নের সহিত দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিবে।

কামের ন্যায় ক্রোধও অনর্থকারী। কাম বাধা পাইয়া ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়। জীব যে বস্তুর কামনা করে, তাহা প্রাপ্তির বিঘ্ন হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ মহা চিত্ত-উত্তেজক রিপু। ক্রোধে কি কি কুফল উৎপন্ন হয়, ক্রোধীব্যক্তি তাহা সর্ব্বদা আলোচনা করিবে। ক্রোধ মনুষ্যের পরম শত্রু। ক্রোধে মানবের মনুষ্যত্ব নাশ করে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, কোন পিশাচ কর্ত্তৃক সে আক্রান্ত হইয়াছে। ক্রোধের উত্তেজনায় সময়ে সময়ে মানবের মৃত্যুপর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ ক্রোধের কুফল ও ক্রোধ দমনের মহত্ব চিন্তা করিতে থাকিলে

কালে সুফল লাভ করা যায়। কাম, লোভ, অহঙ্কার ও পরদোষের আলোচনা যত কমাইতে পারিবে, ক্রোধ ততই কমিয়া যাইবে। ক্ষমা, শান্তি ও দয়ার যত অধিক সাধনা করিবে, ততই ক্রোধের হ্রাস হইবে। ক্রোধের বিপরীত বৃত্তি দয়া; সর্ব্বদা দয়াবৃত্তির অনুশীলন করিলে ক্রোধ বিনষ্ট হয়।

আত্মোন্নতির জন্য কামের ন্যায় ক্রোধও পরিহার্য্য; তজ্জন্য প্রজাপতি ক্রোধী অসুরগণকে 'দ' অক্ষর দ্বারা দয়া করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেব জীবে দয়া করিতে বিশেষরূপে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। মহাত্মা তুলসীদাস নিজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন;—

"দয়া ধরমকা মূল হ্যায়, নরক মূলহি অভিমান।
তুলসি মৎ ছোড়িও দয়া যঁও কণ্ঠাগত প্রাণ॥"

বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সমুদয় শাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিচার করতঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পরপীড়ন পাপ; আর পরের উপকার করাই পুণ্য। যথা:—

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রানি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যঞ্চ পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে॥

অপরের অনিষ্টজনক কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া সাধ্যানুসারে পরের উপকার করাই-ধর্ম্ম। অতএব অর্থের দ্বারা, কিম্বা শরীরের দ্বারা, অথবা বাক্যের দ্বারা—যে কোন প্রকারেই-হউক,—আত্মপর; শত্রুমিত্র অবিচারিত চিত্তে সকলের উপকার করাই ধর্ম্ম। পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি হইলে অর্থব্যতীত অন্যান্যপ্রকারেও অনেক করা যায়। এই পরোপকার প্রবৃত্তি বা দয়ারভাব মানব হৃদয়ে যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ততই ক্রোধের হ্রাস হইবে।

লোভও কামক্রোধ জাতীয়। ভেদজ্ঞান হইতেই সর্ব্বগ্রাসিনী প্রবৃত্তি হয়। সকলই আমার হউক, অপরের কিছুই না থাকুক, এইরূপ প্রকৃতির লোককেই লোভী বলা যায়। লোভই আত্মোন্নতির বিষম অন্তরায় স্বরূপ হইয়া থাকে। লোভপরায়ণ ব্যক্তি যখন পরের দিকে না তাকাইয়া, স্বীয় বিলাস সম্ভোগার্থে ছলে, বলে, কৌশলে গো, অশ্ব, যান, গৃহ, বসন, ভূষণ, দাস, দাসী, ধন, রত্ন, কামিনী ইত্যাদি নানাবিধ বিলাসের উপকরণ আহরণ করেন, তখন তিনি নানা পাপে জড়িত হইয়া পড়েন। তাই উপদেশ দিতেছেন যে,—

"লোভ পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ সংবরণ॥"

অতএব সকলেরই লোভ সংবরণ করা কর্ত্তব্য তজ্জন্য প্রজাপতি লোভী মনুষ্যগণকে 'দ' অক্ষর দ্বারা দান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। দান করিতে অভ্যাস করিলে গ্রহণের বৃত্তি অর্থাৎ লোভ আপনা হইতেই হ্রাস হইবে। তাই শাস্ত্রকারগণও শতমুখে দানের মহিমা ও দাতার গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা:—

"ন দানাদধিকং কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ে।
দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গঃ শ্রীর্দ্দানে নৈব লভ্যতে॥
দানেন শত্রূন্ জয়তি ব্যাধি র্দ্দানেন নশ্যতি।
দানেন লভ্যতে বিদ্যা * * *
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষানাং সাধনং পরম স্মৃতম॥"

পুরাণ বচন।

ত্রিজগতে দানের অধিক আর কিছুই নাই। দানে স্বর্গ ও শ্রীলাভ হয়; দান ধর্ম্মের দ্বারা শত্রুজয় করা যায় এবং ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। দান দ্বারা বিদ্যা লাভ হয়; অধিক কি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ

সাধন একমাত্র দানের দ্বারা হইয়া থাকে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;—

"দাতব্যং প্রত্যহংপাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতন্তু শক্তিতঃ।

প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূত চিত্তে যাচককে দান করিবে। ন্যায়ানুমুদিত উপার্জ্জিত অর্থের কিছু অংশ দান করিতে হইবে। অর্থাৎ যাঁহার যেমন আর্থিক অবস্থা, তিনি তদনুসারে কিঞ্চিৎ দান করিবে। লোকের কষ্ট ও দুর্দ্দশা দেখিয়া যদি তোমার মনে দান ও সাহায্য করিতে প্রবৃত্তি না হয়, তবে তোমার মনুষ্যত্ব কোথায়? জীবের এই মহদ্বৃত্তি বিকাশের জন্যই বুঝি দীনদুঃখীর সৃষ্টি। অতএব রুগ্ন, ভগ্ন, দীন দুঃখীকে অন্ন দান করা কর্ত্তব্য। একমাত্র দানই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং স্বর্গও অপবর্গের নিদান, তাহাতে সন্দেহ নাই। একমাত্র দানই সমুদায় সিদ্ধির কারণ। যত অমঙ্গল আছে, সকলই দানে নষ্ট হয়। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ভগবান বেদব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, "যাচককে আমি (গুরু) বলিয়া মান্য করি, কারণ যাচক কর্ত্তৃক মনোমল পরিমার্জ্জিত হইয়া থাকে। আর যে অর্থে ধর্ম্ম নাই, কীর্ত্তি নাই, যাহা পরিত্যাগ করিয়া ইহ-সংসার হইতে প্রস্থান করিতে হইবেক—দান ব্যতীত সে অর্থের প্রয়োজন কি? প্রাণ হইতে প্রিয়তর অর্থের সদগতি একমাত্র দান দ্বারাই হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দীনদুঃখীকে অর্থদান করে, সে ব্যক্তি আপনারই পারলৌকিক সংস্থান করিয়া রাখে।"

বাস্তবিক দানই পরম ধর্ম্ম। দানের কোন প্রকার ফলকামনা না করিয়া ভগবদাজ্ঞা পালন ও ভগবানের তৃপ্ত্যর্থ যথাসাধ্য দানকরা কর্ত্তব্য। স্বর্গাদি ফলকামনায় অথবা প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় যে দান করা যায়, তাহা রাজসিক। যে দান অনুপযুক্ত দেশে, অপাত্রে এবং সৎকারবর্জ্জিত ও অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, তাহা তামসিক দান; আর প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া দেশ-কাল পাত্রের উত্তমতঃ বিচার পূর্ব্বক, কেবল কর্ত্তব্যানুরোধী যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান। যথাঃ—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশেকালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
গীতা ১৭।২০

অতএব সকলেরই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া যথাসাধ্য দান করা কর্ত্তব্য। স্মৃতি "দানমেকং কলৌ যুগে" বলিয়া যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

দান করিতে প্রবৃত্তি জন্মিলেই লোভ কমিয়া যাইবে। দাতার দান করিবার লোভ ভিন্ন পাইবার লোভ থাকিতে পারে না। আবার সেই শ্রেষ্ঠ দাতা, যিনি দানের ফললাভেরও লোভ করেন না, দান ধর্ম্মের অনুশীলনে কিরূপে অন্তের প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মোন্নতি সাধিত হয়, তাহা বোধহয় বুঝিয়াছেন।

কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটী মানবের মহা শত্রু। কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রভাবে মানবগণ ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মোন্নতি সাধণ করিতে পারে না। ইহারা মানবকে অধস্তন নরকাদিতে নিক্ষেপ করে। এইজন্য সুধিগণ প্রযত্নপূর্ব্বক এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবেন। যিনি কামাদি বিষম রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার নরকে গতি ও অধম যোনি প্রাপ্তি

হয় না। অধিকন্তু তাঁহার অন্তকরণ উপদ্রব-শূন্য ও চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

"এতৈর্বিমুক্ত কৌন্তেয় তমোদ্বারৈ স্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥"
গীতা, ১৬।২২

"হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বার স্বরূপ এই কাম, ক্রোধ ও লোভকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য শ্রেয়ঃ সাধন পূর্ব্বক পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। আবার এই তিনটী পরিত্যাগ করিতে হইলেই দম, দয়া ও দানের সাধনা চাই। আর তিনটীর আদ্যক্ষর, 'দ'—সুতরাং এক্ষণে আমরা বলিতে পারি যে, পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যই তিনটী "দ"-কারের সাধনায় শ্রেয়ঃ লাভ পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিতে পারেন। আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অতএব পঞ্চ-মকারের ন্যায় "দ"-কার সাধনাই পৃথিবীর যাবতীয় মানবের সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম।

ইন্দ্রিয় সংযম কর, লোভ পরিত্যাগ কর, এবং সর্ব্ব জীবে দয়া কর, ইহাই ধর্ম্মের সার কথা। যাঁহারা ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে এই তিনটী কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। এই তিনটীর সাধনাই ধর্ম্মের প্রধান সাধনা ও মূল কথা। ইন্দ্রিয় দমন ও রিপু সংযম করিতে না পারিলে, ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাহার ইন্দ্রিয় দমিত ও চিত্ত শমিত হয় নাই, সে সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ হইলেও ঘোর মূর্খ। মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"কাম ক্রোধ লোভ কি যব লগ মনমে খান্।
তব লগ্ পণ্ডিত মূরখো তুলসী এক সমান॥"

মানবগণের চিত্তক্ষেত্রে যে পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ ও লোভের খনি বিদ্যমান আছে, সেপর্য্যন্ত পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই সমান। কাম, ক্রোধ, লোভ থাকিতে কেহ ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে না। অতএব যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত কাম, ক্রোধ, লোভের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা দম, দয়া ও দানের সাধনা করিবেন। দম, দয়া ও দানই জীবমাত্রেরই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। আর যাঁহাদের এই তিনটী আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক।

অতএব দম, দয়া, দান,— এক কথায় তিনটী "দ"-কারের সাধনাই জগজ্জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। তিনটী (দ) র মর্ম্ম এই যে,—"দাম্যত" অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম কর, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিও না,। "দত্ত" অর্থাৎ লোভপরিত্যাগ কর, সকলই নিজে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিও না, পরকেও দান করিও। "দয়ধ্বং" অর্থাৎ ক্রোধ পরিত্যাগ কর,। হিংসা-বৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিও না; জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। যাঁহারা এই তিনটী আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শন হইয়াছে; তাঁহাদের আর জন্মমরণের অধীন হইতে হইবে না। উপসংহার কালে বৃহস্পতির সহিত আবার বলি, তিন্‌টী (দ) অর্থাৎ দম, দয়া, ও দানই জীবের একমাত্র যুগধর্ম্ম। যথাঃ —

তপোধর্ম্মঃ কৃতেযুগে, জ্ঞানং ত্রেতাযুগে স্মৃতম্।
দ্বাপরে চাধ্বরাঃ প্রোক্তা কলৌ দানং দয়া দম॥

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:0:—

উত্তর গীতা।

(শেষাংশ)

আত্মধ্যান-পরায়ণ মহাত্মাগণ নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধকাল যে ধ্যান করেন, তাহা সহস্র কোটি যজ্ঞফল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ১৬॥

এবম্প্রকার যোগীর নিকট মিত্র-অমিত্র, সুখ-দুঃখ, ইষ্ট-অনিষ্ট, শুভ-অশুভ, মান-অপমান এবং নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই তুল্য বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ১৭॥

শতছিদ্রান্বিত কন্থা দ্বারাও যখন শীত-নিবারণ হইয়া থাকে, তখন কেশবে অচলা ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির আর বিভবের প্রয়োজন কি ? ১৮॥

মোক্ষকামী যোগী কেবলমাত্র দেহ রক্ষার্থই ভিক্ষা করিবে, শীতনিবারণ জন্যই বস্ত্র ধারণ করিবে, এবং কি পাষাণ, কি স্বর্ণ, কি শাক, কি শালি তণ্ডুলের অন্নভোজন, এই সকলে সমজ্ঞান-সম্পন্ন হইবে। ১৯॥

সৃষ্ট পদার্থের বিনাশে যিনি কিছুমাত্র শোক করেন না, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ২০॥

ইতি উত্তর-গীতা সমাপ্ত।

:0:

তুমি ও আমি।

তুমি দৈত্যের মত চলিয়া যাও, আনন্দে করিয়া কেলি ;
তুমি উদাসীর মত চাহিয়া যাও, রসের তরঙ্গ তুলি ;
তুমি ভোগীর মত দেখায়ে যাও, ভোগ্যের মত কায়া ;
তুমি বান্ধবের মত নয়নে লাগ, ধেয়ানে ফুটাও ছায়া ;
তুমি নিমিষের মাঝে সরিয়া যাও, চিরদিন দাও স্মৃতি ;
তুমি আকাঙ্ক্ষা জাগায়ে ঘুরাও মোরে, শ্রবণে শুনাও প্রীতি ;
তুমি হতাশে আশার পরশ দাও, (দাও) দুরাশা বলিয়া গালি ;
তুমি কি জানি কেমন বুঝি না আমি, (তবু) হৃদয়ে আগুন জ্বালি।
আমি তোমারে ছাড়িয়া ইহারে পাইতে রাখিতে না চাই প্রাণ,
আমি তোমারেও চাই, ইহারেও চাই,—দুদিকে সমান টান ;
আমি তোমার ভিতরে ইহারে পাইতে, পাই যে বিষম ভয়,
আমি ইহার ভিতরে তোমারে পাই, এই বড় সাধ হয় ;
আমি চাহিয়া খুজিয়া লুকিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি মোহভ্রান্তি,,
আমি বুঝিয়াছি, তুমি চাহিলে আমারে, পাইব মধুর শান্তি ;
আমি আমার বলিয়া চাহিয়া চাহিয়া ক'রে থাকি যদি ভুল,
আমি চাহিতে তোমার হইব তোমার তুমি থেকো সদা মূল।

শ্রীযোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

:0:

উপাসনা।*

"তস্মিন প্রীতি তৎ প্রিয় কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

এই বাক্যগুলি যিনি প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনিই বুঝিয়াছিলেন প্রকৃত উপাসনা কাহাকে বলে। প্রকৃত উপাসনা বিমলানন্দের উৎস স্বরূপ। এইজন্য যথার্থ উপাসকগণ ঈশ্বরকে "রস স্বরূপ তৃপ্তিহেতু" বলেন। জগতীতলে প্রকৃত উপাসক অপেক্ষা অধিকতর সুখী ব্যক্তি আর কেহই নাই; কেননা যিনি পরিপূর্ণ আনন্দময় পুরুষ, তিনি তাঁহারই সহবাসে কালযাপন এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী প্রতিপালন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন। পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী পালন করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য এবং লঙ্ঘন করিলে অপ্রিয় কার্য্য করা হয়। ঐশ্বরিক নিয়ম পালনে সুখভোগ হইয়া থাকে; এবং প্রধানতঃ সেই নিয়মপালনই আবার তাঁহার প্রিয় কার্য্য এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য আবার তাঁহার উপাসনার এক অঙ্গ। অতএব যিনি যথার্থরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনি যে নিরতিশয় সুখী তাহাতে আর সন্দেহ কি? সংসারের প্রধান প্রধান সুখই মানবীয় প্রীতি-মূলক; অতএব সর্ব্বসুখ-বিধাতা পরমানন্দময় পুরুষে যিনি অকৃত্রিম এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিস্থাপন করিতে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার সুখের ইয়ত্তা কোথায়? স্থূলদর্শী মনুষ্যেরা যে পথকে নিরানন্দময় জ্ঞান করে, তাহাই আনন্দপ্রদ এবং তাহারা যে পথকে উল্লাস পরিপূর্ণ জ্ঞান করে, তাহারই অনুসরণ করিলে অবশেষে দুঃখারণ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যেমন সুনির্ম্মল গগনমণ্ডলের উপরিভাগ দিয়া কখন কখন শিলাবৃষ্টি ও ঝটিকোৎপাদক ঘোর ঘনঘটা ধাবমান হইলেও তদাচ্ছাদিত গগনতলে স্বাভাবিক বিমলতা বিরাজমান থাকে; তদ্রূপ যিনি পরাৎপর

---

* এই প্রবন্ধ বগুড়া—শিববাটীর স্বর্গগত মহাত্মা কিশোরীলাল রায় মহাশয়ের লেখনী প্রসূত।—কিশোরী বাবু তাঁহার স্বাধীন চিন্তাশীলতা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা এবং মহৎচরিত্রের জন্য উত্তর বঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম-সাময়িক এবং তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

কিশোরী বাবু "A free enquiry after truth" (সত্যের স্বাধীন অনুসন্ধান), "An essay on happiness (সুখ-তত্ত্ব) ও "দেবতত্ত্ব" নামক কয়েকখানি জ্ঞানগর্ভ অমূল্য গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন এবং জীবিত কালেই প্রকাশিত করেন। ইহাদের প্রথম দুই খানি ইংরাজীতে এবং তৃতীয় খানি বাঙ্গলায় লিখিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার লিখিত বহুল প্রবন্ধ ও কয়েকখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থ তাঁহার কৃপাপাত্র ধর্ম্মানুরাগী সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ "আর্য্যদর্পণে" প্রকাশ জন্য প্রদান করিয়াছেন। তাহার প্রায় সকল প্রবন্ধই ৩০ বা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। কাজেই চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই নবযুগের প্রারম্ভে ধর্ম্মভাব কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল তাহা এই সকল প্রবন্ধ পাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

কিশোরী বাবু ৫৫ বৎসর বয়সে ১৩০০ সনে মরজগত ত্যাগ করেন। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান, একনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ গৃহী অতি বিরল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

পরমেশ্বরে অকৃত্রিম প্রীতি স্থাপন করিতে অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার অন্তরাকাশ সময়ে সময়ে সাংসারিক দুঃখ বিপদরূপ ঘনঘটার সমাচ্ছাদিত হইলেও তাঁহার অন্তরের গূঢ় প্রদেশে এক অনির্ব্বচনীয় বিমল শান্ত ভাব বিরাজিত থাকে; সেই বিমলতা আর কছুতেই অপনীত হইবার নহে।

ঈশ্বরের নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়। ভৌতিক, মানসিক এবং নৈতিক—এই ত্রিবিধ নিয়মের যিনি যতদূর প্রতিপালন করেন, তিনি ততদূর সুখভাগী হন। এইজন্ত যাহারা ফল, পুষ্প দুর্ব্বাধান, ব্রত-উপবাস ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করিয়াও বিবিধ প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা উপাসনাকে নিষ্ফল দেখিতে পান এবং হয়তঃ যাহারা নাস্তিক, কিন্তু অনেক নিয়ম পালন করে, তাহাদিগকেও তাহাদের অপেক্ষা অধিক সুখী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া থাকেন। এ প্রকার উপাসকদের দৃষ্টি প্রায় ইহকালেই সীমাবদ্ধ থাকে; সুতরাং নিয়মলঙ্ঘন-দূষিত স্তব স্তুতির ইহকালে কোন ফলোদয় না দেখিলে, তাঁহারা প্রায় ফলাশায় নিরাশ হন, পক্ষান্তরে যাঁহারা কেবল প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের স্তবস্তুতিই করেন, কিন্তু অনেক সময় তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করেন না। ঈশ্বরের নিয়মপালন এবং সৎকার্য্য সাধন—উপাসনার প্রধান অঙ্গ, স্তবস্তুতি তাহার আনুষঙ্গিক। অতএব যিনি পাপপথে বিচরণ করিয়া কেবল স্তবস্তুতির দ্বারাই মোক্ষ পথের পথিক হইতে আশা করিয়াছেন, তাঁহার আশা দুরাশা মাত্র এবং তাঁহার ভ্রান্তির আর সীমা নাই।

স্তব স্তুতি উপাসনার পুষ্টিসাধক, কিন্তু সৎ কার্য্য ও নিয়ম পালন উহার প্রধান অঙ্গ।

'না বিরতো দুশ্চরিতো নাশান্ত না সমাহিতঃ।
নাশান্ত মানসোবাপি-প্রজ্ঞানেনৈন মাপ্নুয়াৎ।

যে প্রকার উপাসনাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, এই বাক্যটী তাহা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে। বাস্তবিক সাধন—কার্য্যে; কথাতে নহে। কিন্তু ঈশ্বর আছেন, এই মাত্র বিশ্বাস করিয়া কেবল সৎকার্য্য সাধনে রত হইলেও আবার প্রকৃত উপাসনা হয় না। তাঁহাতে প্রীতি চাই; কিন্তু সেই প্রীতি আবার তাঁহার স্বরূপ আলোচনা ভিন্ন হইতে পারে না। যিনি ঈশ্বরের এই ভাবটী চিন্তা করেন যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইলেও তাঁহার শক্তি কেবল জীবদিগের মঙ্গলবিধানেই সতত নিয়োজিত রহিয়াছে। তখন স্বভাবতই তাঁহার প্রতি প্রীতির উদ্রেক হয়। যখন মনে করা যায়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও কৌশলময়; কিন্তু তাঁহার সকল কৌশলেরই উদ্দেশ্য মঙ্গল, তখন তাঁহাকে সকলেই প্রীতি করে। যখন মনে করা যায়, তিনি অপার করুণাসাগর; কিন্তু তথাপি অপরিণামদর্শী পিতার সন্তানকে অনুচিত স্বেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায়, তিনি সন্তানদিগকে অনুচিত কর্ম্মে প্রশ্রয় দেন না। প্রত্যুত যে স্বেচ্ছাচারে পরিণামে অমঙ্গল হয়, তাহার যথোচিত দণ্ড বিধানই করেন, তখনও তাঁহার প্রতি কেবল প্রীতিই হয়, যেহেতুক তিনি এমন দয়া করেন না, যাহাতে কৃপাপাত্রের পরিণামে অমঙ্গল ঘটে। সুতরাং দুঃখ বিপদে তাঁহার যে নিষ্ঠুরতা আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তাহা বাস্তবিক নিষ্ঠুরতা নহে—উহাও কেবল মঙ্গলগর্ভ। কিন্তু যখন মনে করা যায় যে, তিনি

অহরহ জীবদিগের জন্য সুস্বাদু অন্ন, সুশীতল জল, সুমধুর ফলমূল এবং বিবিধ প্রকার শারীরিক ও মানসিক সুখ বিধান করিতেছেন এবং আশৈশব আমাদিগকে রক্ষনাবেক্ষণ করতঃ অপার স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন, তখন কাহার মনে তৎ প্রতি প্রীতির উদয় না হইয়া থাকিতে পারে? যিনি পিতা মাতা অপেক্ষাও আমাদিগকে সমধিক স্নেহ করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি কাহার প্রীতি না হয়? তিনি আমাদিগের উপর যে প্রকার করুণা বর্ষণ করেন, তাহা মনে করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। তাঁহার স্বরূপ আলোচনা আবার আমাদিগকে নানা প্রকার সান্ত্বনাবিধানও করে। যখন মনে করি, প্রভু সর্ব্বশক্তিমান এবং আমরা সতত তাঁহারই ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছি, তখন মনোমধ্যে কেমন নিরাপদের ভাব সমুদিত হয়। যখন মনে করা যায় যে, তিনি কেবল সর্ব্বশক্তিমান নহেন, সর্ব্বজ্ঞ ও মঙ্গলময়ও, তখন তাঁহার প্রতি আমাদিগের মনে কেমন নির্ভরতার ভাব উদিত হয়। তখন আমাদিগের মনে হয় যে, আমাদিগের কিসে এবং কখন্ কি হইবে, এবং কি হইলেই বা মঙ্গল হইবে, তাহা তিনি সকলই জানেন এবং যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহার বিধান করিতে শক্তিমান বটেন, তখন আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া কে সুস্থচিত্ত না হন? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য; ইহা মনে করিলে আমাদিগকে আর তাঁহার আশ্রয় হইতে বিচ্যুতির ভয় করিতে হয় না। এই প্রকারে তাঁহার স্বরূপ আলোচনা করিলে মনোমন্দিরে নানাবিধ সদ্ভাবের সমাগম হয়। তাঁহার শক্তি মনে করিলে অবস্থাভেদে ভয় ও নির্ভয়ের ভাব, মঙ্গল ভাবযুক্ত জ্ঞান মনে করিলে ভক্তি এবং কারুণ্য মনে করিলে প্রীতি উৎপাদিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর করুণা করিয়া আমাদিগের যে অশেষ প্রকার সুখ বিধান করিতেছেন, তাহা মনে করিয়া আমরা তাঁহাকে প্রীতি করি; কিন্তু কি আশ্চর্য্য তৎ প্রতি প্রেমই আবার অনুপম সুখের আকর। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি করণ সময়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হয়, তাহা যিনি উপভোগ করিয়াছেন, তিনি অতি সুখী ও ভাগ্যবান মনুষ্য সন্দেহ নাই। অতএব ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধন ও তৎ প্রতি প্রীতিকরণ এই উভয়ের সমবায় প্রকৃত উপাসনা এবং প্রকৃত উপাসনাতেই মনুষ্যের সার সুখ অবস্থান করে।

———:0:———

পাগল রাধামাধব।

আমাদের প্রাণের আরাধ্য, প্রেম-পাগল রাধামাধব আর ইহজগতে নাই। এ অত্যাচারের রাজ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি, নিত্য লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। প্রকৃত মহা পুরুষের ন্যায় তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। মৃত্যুর পরও, দেহের কোন বিকার নাই;—শিব চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ দীপ্তিশালী এবং জপনিরত করদ্বয় বক্ষস্থলে ন্যস্ত

ছিল। পাগলের পবিত্র দেহ, সোণামুখীর আনন্দ-আশ্রম হইতে কিছু দূরে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। তাঁহার পূতস্মৃতি অবলম্বন করিয়া আমরা এই গীতিকাটী লিখিয়াছিলাম; "আর্য্যদর্পণের" পাঠকগণের নিকট পাগল মানুষ বা পাগল "রাধামাধব" অপরিচিত নহেন, তজ্জন্য গীতিকাটী তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত উপহার দিলাম। পাগলের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমরা পরে লিখিব। তাঁহার উপদেশামৃত, পূর্ব্ববৎ "আর্য্যদর্পণে" প্রকাশিত হইবে,—কিন্তু হায়! পাগলকে ত আর কেহ দেখিতে পাইবেন না। পাগলের তিরোভাবের দিন—১১ ই পৌষ ১৩২২।

গীতিকা।

[প্রেম-পাগল রাধামাধবের তিরোভাবে]

আর কি মোদের প্রেমের পাগল-
আমাদের মাঝে আসিবে ?
আর কি মোদের প্রেমের পাগল—
ভক্তগণ ল'য়ে হাসিবে ?
আর কি মোদের পাগল মানুষ—
এক্ তারা করে লইয়ে—
নাশি' মনোব্যথা, গৌর-গুণগাথা—
তুষিবে, পুলকে গাহিয়ে ॥
আর কি মোদের প্রেমিক পাগল—
উপদেশ, সুধা সিঞ্চিয়ে—
সংসার সন্তাপে তাপিত পরাণ,
দগ্ধ হিয়া দিবে জুড়ায়ে।
কপটাচারীর মুখস্ খুলিয়া—
আবার পাগল কি দিবে ?
সত্যের কঠোর অপ্রিয় কাহিনী—
স্বার্থ ছাড়ি' কে আর কহিবে ?
তেজস্বী, নির্ভীক, বীর সে সাধক—
পাগলে কি আর হেরিব ?
চিন্তার বিকার বিহীন ললাট—
পাগলে কি আর পাইব ?
পাষণ্ডীর কাছে কালান্তক সম,
অনুরাগী জনে তুষিতে-
আর কি পাগল আসিবে জগতে
মোহ, পাপ, তাপ নাশিতে ॥
স্বলপে সন্তুষ্ট আশুতোষ যেন,—
আর কি হেরিব পাগলে ?
নির্লোভ, নিস্পৃহ, আদর্শ সংযমী,
বাস সদা যার বিরলে ॥
ভাব-কালি হেথা বিক্রয় না হ'ল,
ক্ষোভিত হৃদয় হইয়া—
অবিচার পুরী কামরাজ্য হতে—
(তাই) গেলহে পাগল চলিয়া।
যে দেশে ভক্তের না আছে সম্মান,
প্রেম ত চাহে না যে দেশে ॥
সে দেশে কি আর আসিবে পাগল ?
সে আশা বিলুপ্ত আকাশে ॥
কত দয়া করে পাঠালেন প্রভু
এমন অদ্ভুত পাগলে।
ভাগ্যদোষে লোকে চিনিল না তাকে,
সুধা ছাড়ি নিল গরলে ॥
দ্বারে দ্বারে গিয়া, যাচিয়া যাচিয়া,—
প্রেম দিতে পাগল আসিল।
হেরি পাগলের অকিঞ্চন বেশ,—
সকলে উপেক্ষা করিল ॥
গরীবের কথা বাসি হ'লে পরে,—
লেগে থাকে বড় মধুর।

হেন দিন হবে, পাগলের বাণী,—
দিবে প্রাণে বল প্রচুর ॥
হেন দিন হবে, ভারতবাসীরে—
অনুতাপ অশ্রু ফেলিয়া—
প্রায়শ্চিত্ত এর করিতে হইবে,
(তখন) পাবে না পাগলে খুজিয়া ॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।
সোনামুখী,-"রাধামাধব-
বিরহ" কুটীর।

—:0:—

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।"

(আলোচনা।)

চৈত্র মাস, বেলা অপরাহ্ণে আতপক্লিষ্ট শরীর সান্ধ্য-স্রোত সমুদ্ভূত মৃদুল পবন হিল্লোল সেবনে শীতল করিবার জন্য বহুলোক কাশীর দশাশ্বমেধঘাটে সমবেত হইয়াছেন। তবে সমস্ত লোকই যে সান্ধ্য-সমীরণ সেবনার্থে ঘাটে আসিয়াছেন তাহা নহে; অনেকে অনেক উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছেন। কেহ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া "নাম" কিনিবার জন্য বক্তৃতার উচ্চরোলে অসনি জমকাইয়া লইয়াছেন। কেহ বেদান্তের অদ্বৈতবাদাশ্রয়ে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট, কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিয়া সগুণ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ব্যাকুল। কেহ কেহ বা আপন ভাবে চিন্তায় থাকিয়া, স্তিমিতলোচনে জপ-ধ্যানে নিমগ্ন। কেহ কেহ

"গাঙ্গংবারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতং।
ত্রিপুরারি—শিরচারি পাপহারি পুনাতু মাং ॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি,
দূরপ্রচারি গিরিরাজ গুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সতত শুভকারি বারি ॥" ইত্যাদি

স্বরে পাঠ করিয়া গঙ্গায় পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। আবার একস্থানে কতকগুলি লোক একত্র হইয়া খোল করতাল যোগে,—

শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ন ফান্দে।
হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,
মনোহি শিকলে বান্ধে ॥
তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,
ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
এখন হ'য়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আকুলি,
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে, পাইনু শুনিতে,
কুবজা রেখেছে ধরে ॥ ইত্যাদি-

মাথুরের পালা গাহিতেছিলেন। ফলতঃ ঘাটটী নানা বিষয়ে মুখরিত। স্থানটী দেখিলেই প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে, অতীতের স্মৃতি,—স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠে, হৃদয়ে ভাবের ঢেউ খেলিয়া যায়।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে; তখন চন্দ্র-কিরণোদ্ভাসিত সুরতরঙ্গিনীর বিমল বক্ষে মুক্তা-মালার ন্যায় বীচীবিক্ষিপ্ত তরঙ্গ-লহরী শোভা পাইতেছিল। মুক্ত-বিধৌত কল-

নাদিনী গঙ্গা আনন্দে কল কল তানে নাচিতে নাচিতে যাইতেছিল। এমন সময় বাঁধান চত্বরে সোপানোপরি হেম একাকী বসিয়া, আপন মনে গাহিতেছিল,—

জয় শচীনন্দন, গৌর গুণাকর,
প্রেম পরশ-মণি ভাব-রস সাগর।

কিবা সুন্দর মুরতি মোহন, আঁখি-রঞ্জন কণকবরণ
কিবা মৃণাল নিন্দিত, অজানু লম্বিত,
প্রেম-প্রসারিত কোমল যুগল কর।

কিবা রুচিকর বদন-কমল, প্রেমরসে ঢল ঢল।
চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল,
হরি প্রেমে বিহ্বল অপরূপ মনোহর।
মহাভাবে মণ্ডিত, হরিরসে রঞ্জিত,

আনন্দে পুলকিত অঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গ, সোণার গৌরাঙ্গ
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর।
হরি-গুণ গায়ক, প্রেমরস-নায়ক,
সাধু-হৃদি-রঞ্জক, অলোক-সামান্য,
ভক্তি-সিন্ধু শ্রীচৈতন্য,

আহা ভাই বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে লন কোলে,
নাচেন দু'বাহু তুলে, হরিবোল হরিবোল বলে
অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরন্তর।
কোথা হরি প্রাণধন, ব'লে করে রোদন,
মহাস্বেদ কম্পন, হুঙ্কার, গর্জ্জন,

পুলকে রোমাঞ্চিত শরীর কদম্বিত,
ধুলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর।

হরি লীলারস নিকেতন, ভক্তি রস প্রস্রবণ,
দীনজন বান্ধব, বঙ্গের গৌরব
ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম শশধর॥"

মৃদু মন্দ মলয় মারুতোত্থিত প্রশান্তসলিলা ভাগিরথীর কুল কুল স্বর, হেমের গানের স্বর-লহরীর সহিত মিশিয়া কৌমুদি-স্নাত অনন্ত তারকাখচিত নৈশ গগনে মিলাইয়া গেল। হেমের গান ধরিবার অব্যবহিত পরেই হরিশ, হেমের পশ্চাতে দাড়াইয়া তাঁহার গান শুনিতে-ছিল। "গান" শেষ হইলে হরিশ হেমের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলে, হেম বলিল, কি ভাই হরিশ! এসেছ বস। কিছুকাল উভয়ের মধ্যে নানারূপ কথা বার্ত্তা হইল; পরে হরিশ বলিল ভাই হেম, একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, অনেক দিন হইতেই মনে করিতেছি, তোমাকে বলি, কিন্তু তুমি কি মনে কর, এই ভাবিয়া বলি নাই।

হেম। কি কথা বল না।

হরিশ। তুমি "গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি" পূজা কর কেন? আর সেই মূর্ত্তির নিকট যুক্তকরে "প্রভু দীনের ঠাকুর, পতিতপাবন, এই দীনকে কৃপা করিয়া তোমার শ্রীচরণ পাশে স্থান দানকরতঃ সেবাধিকার প্রদান কর।" ইত্যাদি কতকগুলি বাক্য বলিয়া, স্ত্রীলোকের ন্যায় নয়নাসারে বক্ষস্থল ভাসাইয়া দাও, তাহার কারণ কি ?

হেম। কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি আছে না কি? তোমরা যদি তুচ্ছ চাকুরীর জন্য,—দু' টাকা বেতন বৃদ্ধির লোভে, যার তার পদ লেহন করিতে পার, যার তার খোসামুদি করিতে পার, আর আমি "ভগবানের" নিকট প্রার্থনা করিতে পারি না?

হরিশ। উপমাটা বেশ দিয়েছ; আমি বা তোমাকে জিজ্ঞাসা করলেম্ কি, আর তুমি বা উত্তর দিলে কি; আমি কি তোমাকে ঐরূপ হেঁয়ালী ভাবের প্রশ্ন করিয়াছি?

আমি জিজ্ঞাসা করছি ঐরূপ প্রার্থনার কারণ কি ?

হেম। ঐরূপ প্রার্থনার কারণ ভগবানের কৃপা লাভ করা।

হরিশ। কি কারণে ভগবানের কৃপা লাভ করিতে চাচ্ছ ?

হেম। বা! তুমি ত বেশ প্রশ্ন করেছ, ভগবানের কৃপা লাভ করিতে চাচ্ছ কেন, একথা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছ ? বুঝেছি তোমার কিছু তর্ক করিবার ইচ্ছা। ভাল তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে দিচ্ছি, অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

হরিশ। তোমার প্রশ্ন কি বল।

হেম। তুমি চাকুরী কর কেন ?

হরিশ। চাকুরী করি অভাব দূর করিবার জন্য,—স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের জন্য।

হেম। অভাব কি ?

হরিশ। মনের প্রতিকুল অবস্থাই অভাব বা দুঃখ, আর অনুকুল অবস্থাই সুখ। এই দুঃখ দূর করিয়া সুখ লাভ করার নিমিত্তই চাকুরী করি।

হেম। চাকুরী করিলেই কি তোমার অভাব দূর হইবে,—দুঃখ দূর হইয়া সুখ লাভ হইবে ?

হরিশ। সম্পূর্ণ দুঃখ দূর হইবে না, আংশিক দূর হইবে। দুঃখ একরূপ নয়, ত্রিবিধ;—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক; এই ত্রিবিধ দুঃখ সম্পূর্ণ অপনোদন করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করাই জীবের পরম পুরুষার্থ। সাংখ্য-শাস্ত্রকার এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যান্তিক নিবৃত্তির উপায়কেই পুরুষার্থ বলিয়াছেন। যথা:-——

"ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।"

"আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের, অত্যান্ত নিবৃত্তি করার যে উপায়, তাহাই পুরুষার্থ।"

হেম। বেশ, একথা আমিও স্বীকার করি। ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করাই জীবের উদ্দেশ্য, জীব পূর্ণ সুখ বা পূর্ণ আনন্দের কাঙ্গাল। ভ্রমর যেমন মধুর জন্য পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমন করিয়া থাকে, জীবও সেইরূপ আনন্দের জন্য, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। আনন্দই জীবের স্বরূপ, সেই আনন্দ-স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্ত্তমানে ত্রিবিধ দুঃখের অধীন হইয়া পড়িয়াছে; এক্ষণে সেই স্বরূপাবস্থা লাভ করার নিমিত্তই জীব ব্যাকুল। তুমি সেই স্বরূপাবস্থা লাভ কিরূপ ভাবে নির্দ্দেশ কর ?

হরিশ। যেরূপ পার্থিব বিষয়ে প্রেয় ও শ্রেয় অনুভব করিতে পারিয়া—শ্রেয় লাভার্থে সচেষ্ট হই, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক বিষয়েও যাহা মিথ্যা, যাহা মায়ার বিজৃম্ভন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা সত্য, যাহা নিত্য এবং যাহাতে আত্মার উন্নতি হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

কুহকিনী মায়ার কুহকে পড়িয়া জীব যে "ব্রহ্ম" তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছে। "সোঽহং" আমি সেই "ব্রহ্ম"। যেরূপ রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, সেইরূপ ব্রহ্মেতে

জগৎ ভ্রম হইয়াছে; ইহা মায়ার কার্য্য। বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা, জীবও মিথ্যা, সমস্তই "ব্রহ্ম।" যেরূপ সমুদ্রে বায়ু প্রবাহিত হইলে অসংখ্য বুদ্বুদ্ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মে মায়ার পরিকল্পনায় অসংখ্য জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। বুদ্বুদ্ বিনষ্ট হইলে যেমন জল হইবে, জল ব্যতীত তার নিজের কোন সত্তা নাই, তদ্রূপ জীবের ভিতরে যে মায়ার ক্রীড়া হইতেছে, তাহা বিনষ্ট হইলেই বুদ্বুদের ন্যায় জীব যে ব্রহ্ম ছিল, সেই ব্রহ্মই হইবে। মায়ার কার্য্য মিথ্যা পরিজ্ঞাত হইয়া বীরের মত মায়াকে দূরে সরাইয়া দাও; যে পর্য্যন্ত রজ্জুতে সর্প ভ্রম থাকে, সেই পর্য্যন্ত সর্পভীতি,—রজ্জু জ্ঞান হইলে আর সর্পভীতি থাকে না, তদ্রূপ মায়াকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিলে মায়া আর মোহোৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না; সুতরাং মায়ার ক্রীড়া রুদ্ধ হইলেই আত্ম-স্বরূপ লাভ হইবে; তজ্জন্য সীমাবদ্ধ মৃন্ময়াধারে অরূপের রূপ কল্পনা করিয়া সচন্দন তুলসী দলে জড়ের পূজা করিবার প্রয়োজন দেখি না!

হেম। বাঃ! তুমি ত এক নিশ্বাসে অনেক কথা ব'লে ফেল্‌লে! আচ্ছা ক্রমশঃ তোমার কথাগুলোর উত্তর দিচ্ছি।

তুমি দেখি, সৎ ও চিৎএর, জড় ও চৈতন্যের স্বরূপ বুঝিতেছ না, যাহা জড় তাহাই চৈতন্য, যাহা চৈতন্য তাহাই জড়; চৈতন্যই যে জড়ে পরিণত হইয়াছে, আবার জড়ই যে চৈতন্য হইবে। সবই যে চৈতন্যের বিকাশ, সবই যে চৈতন্যে অবগাহিত; একটী পরমাণুও যে চৈতন্যাতিরিক্ত নয়। ভগবানের বিশ্বরূপ, বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বময় থাকিলেও সীমাবদ্ধ স্থানে সীমাবদ্ধ মূর্ত্তির প্রয়োজন আছে। সমুদ্র সম্মুখে থাকিলেই কি তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হইয়া থাকে? তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে হইলেই ঘটী ভরিয়া জল তুলিয়া পান করিতে হয়, সমুদ্র পান করা যায় না। তদ্রূপ বিশ্বরূপ বিশ্বমূর্ত্তি মানব ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না, তাই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ ও আধার বিশেষে চিন্তা করিয়া থাকে। তুমি মূর্ত্ত, আমি মূর্ত্ত, জগৎ মূর্ত্ত, এ মূর্ত্ত-জ্ঞান থাকিতে অমূর্ত্তের ধারণা করা যায়? আর সে অরূপ। তাঁর রূপ নাই? তাঁর রূপ না থাকিলে, এ বৈচিত্রময় জগতের রূপ কোথা হইতে আসিল? কোথা হইতে ফুলের এত প্রাণমন মুগ্ধকর রূপ আসিল? যাহার রূপে মোহিত হইয়া,—সাধু-অসাধু, বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী, রাজা ভিখারী, প্রভৃতি সকলেই ভালবাসিয়া থাকে, সকলেই প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। ঐ যে নীলাকাশে চাদের রূপ উছলিয়া পড়িতেছে, এ রূপ-মধুরী কোথায় পাইল? কোথা হইতে শিশুর অধরে, রমণীর বদনে এত মাধুরী আসিল, যে রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়া কামিনী কাঞ্চন পরিত্যাগী বিষয়-বিরাগী মুনিরও রূপজমোহ উপস্থিত হয়, তাঁর রূপের ভাতি, উহার মধ্যে না থাকিলে কি এত রূপমুগ্ধা আসক্তি সাধুর হৃদয়ে আসিতে পারে? তাঁর রূপ আছে। ফলতঃ তার রূপের কণা পাইয়াই না প্রকৃতি এই বৈচিত্রময় বিশ্ব, নানা রূপ রসে সাজাইয়া রাখিয়াছে? তাই জনৈক ভক্ত গাহিয়াছেন,—

"এমন অপরূপ রূপ না জানি কে গড়িয়াছে।
মুরতি দেখে অনুমানি হে। ——
মাখি সপ্ত সাগর সুধা বুঝি বা রূপে ঢালিয়াছে।
তোমারই করুণা পেয়ে সুন্দর সাগর খেলে,
দেখাতে রূপের ঐশ্বর্য্য কৃপা করি রেখেছ ঢেলে,

সুন্দর সাগর বেলা, সুন্দর সাগর জল
সুন্দর তরঙ্গ মালা, তোমারই রূপে উছলিছে।
তোমারই রূপ-কণা লয়ে, সুন্দরী প্রকৃতি হাসে
তোমারই রূপ ভাতি পেয়ে, গৌরবে ভাস্কর ভাসে
পেয়েছে তব রূপ আভা, তাই কুসুমের এত শোভা
তোমারই রূপ কণা লয়ে, পাখী পালকে মাখিয়াছে ॥
ভুবন আলো করে, রূপে সুধা মাখা শারদ শশী,
তব রূপ লাবণ্য গায়ে মেখে গগনে উঠে হাসি,
আবার তারি লাবণ্য ল'য়ে সাজি অগণ্য তারকা রাজি
বিচিত্র করিয়ে চিত্র আকাশ পটে শোভিয়াছে ॥
এ বিশ্বে যা হেরি দৃশ্য সবে তোমারি রূপে চলা,
নীলাকাশে নব নীরদে তব লাবণ্য করে খেলা,
দেখি ইন্দ্রধনু মাঝে তোমারি রূপ আভা সাজে,
অনিল ল'য়ে অনল দেখি তোমারি রূপ উথলিছে ॥
ঘন মাঝারে দেখি পুনঃ ঘন চপলা চমকিছে,
হাসিয়ে নব নীরদ যেন তব মাধুরী প্রকাশিছে,
বৃক্ষ পত্র মাঝে হেরি, ঢালা তব রূপ-মাধুরী
শিখি পুচ্ছ মাঝে তোমার রূপ লাবণ্য খেলিতেছে।" ইত্যাদি।

রূপ না থাকিলে, মূর্ত্তি না থাকিলে জগতের রূপ ও মূর্ত্তি থাকিত না, এবং জগৎ-লীলাও হইত না। প্রস্তর বল, মৃত্তিকা বল, দারু বল, সবই ত সেই অবিনাশী সচ্চিদানন্দময় ভগবানের চিৎ এর রূপ? তুমি যাহা জড় ও মৃন্ময় ভাবিতেছ,—ভক্তের নিকট,—সাধকের নিকট, উহাতেই চৈতন্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যখন চৈতন্য ও জড়ের স্বরূপ অবগত হইবে, চিত্ত তখনা, তন্ময় হইবে, তখনে—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে কোন মূর্ত্তি,
যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি।"

সে ভাবে—সে অবস্থায় যাহা যাহা নেত্রে পড়ে পত্র পুষ্প ফলে, ফুলে সবের মধ্যেই যে তাঁর আরাধ্য দেবতা। সবের মধ্যেই সে সেই চিরসুন্দর, তাই এক-দিন বৃন্দাবনে শ্যামবিরহে শ্রীমতী রাধা দিব্যোন্মাদাবস্থায়—মেঘের কোলে—তমাল তরুর হরিদ্বর্ণ বন বল্লরীর নব কিশলয় দলে, ফলতঃ তিনি যেখানে আখি দিতেন, সেখানেই — পীতধটি পরিহিত ত্রিভঙ্গিম ঠামে তাঁর হৃদয়েশ্বর শ্যামসুন্দরকে দেখিতে পাইতেন, বৃক্ষ-পত্রও ত জড়। থাক্ সে তত্ত্ব এখানে বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই, পরে বলিব।

তাঁর ভাবে, তাঁর প্রেমে, তাঁর নাম রসে তন্ময় হইতে পারিলে, ডুবিতে পারিলে—ঐ মৃন্ময়াধারেই তাঁর রূপ ও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়,—

"রূপ প্রেমে যে দিয়াছে ডুব,
সে যে অরূপের রূপ, রূপে হেরে
রূপ দিয়া সে অরূপ ধরে।"

ভগবান যে আমাদের মত হস্তপদাদি-যুক্ত স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট নন, তাহা ত সকলেই জানে। সকলেই জানে যে,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
স পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ
স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা।"

"তাঁহার হাত পা নাই, তবু তিনি গ্রহণ করেন, চলেন, তাঁহার চক্ষু নাই, দেখেন কর্ণ নাই, শ্রবণ করেন। তিনি এ বিশ্বকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানে না।"

ভগবানের রূপ ও মূর্ত্তি আছে, কিন্তু সে মূর্ত্তি জড় প্রতিযোগী চিদ্ঘন। সচ্চিদা-

দানন্দময় ভগবানেরই চিদ্ঘন মূর্ত্তি ও রূপ— যে পর্য্যন্ত জীবের স্থূল এবং প্রাকৃতিক জ্ঞান আছে, সে পর্য্যন্ত ধারণা করিতে সক্ষম হয় না বলিয়াই ত—ভগবান্ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া রূপ ও মূর্ত্তি ধারণকরতঃ অবতাররূপে ধরাতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যথা,—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।
শ্রীমদ্ভাগবত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিকাশার্থ মানুষ দেহ আশ্রয় করিয়া সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,—যাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ—মানবগণ—তাহা করিতে পারেন।

অনুকরণপ্রিয় জীব আদর্শ ব্যতীত এক-পদও অগ্রসর হইতে পারে না, জীব আদর্শ চায়; আদর্শের জন্যই ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। মানুষ এই অবতারের উপাসক। অবতারেরই রূপ মূর্ত্তি আদর্শ করিয়া থাকে। যে সমাজ,—ধর্ম্মে যত উন্নত—তারা তত অবতার-বাদী এবং অবতারের উপাসক। অবতার পথ না দেখাইয়া দিলে, মনুষ পথ দেখিতে পায় না। আমি সেই—সর্ব্বরূপের, সর্ব্বমূর্ত্তির, সর্ব্ব আনন্দের, সর্ব্বরসের, সর্ব্বজ্ঞানের, সর্ব্ব প্রেমের আধার প্রেমঘনরসার্ণব মূর্ত্তি—অবতাররূপে অবতীর্ণ ভগবান্ "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের" উপাসনা করিয়া থাকি।

হরিশ। গৌরাঙ্গদেব ভগবানের অবতার! একথা কোন শাস্ত্রে পাইয়াছ?

হেম। বিস্মিত হইও না, সে প্রমাণ পরে দেখাইব; অগ্রে আমার কএকটী প্রশ্নের উত্তর দাও।

হরিশ। তোমার প্রশ্ন কি?

হেম। তুমি জীবের মুক্তি কিরূপ বুঝিয়াছ?

হরিশ। যে দিন জীব জানিতে পারিবে "সোহং" আমি সেই "ব্রহ্ম", সেই দিন—যেমন বুদ্‌বুদ্ বিনষ্ট হইলে জল হইয়া জলে মিশিবে,—সেইরূপ জীবের জীবত্ব বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মে লীন হইবে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইবে। যেমন,—

"জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশে জলে।"

হেম। আচ্ছা,—"আমি" আখ্যা বলিয়া যে জীব, সে নিত্য না অনিত্য?

হরিশ। বাঃ! তুমি বাতুল হইয়াছ না কি? আমি বল্লেম "সোহং" আমি সেই "ব্রহ্ম" আর তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছ "আমি" আখ্যা জীব নিত্য না অনিত্য; ব্রহ্ম আবার কখনও অনিত্য?

হেম—"আমি" আখ্যা জীব ব্রহ্ম কি অব্রহ্ম সে কথা ত আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, "আমি" আখ্যা জীব নিত্য কি অনিত্য, কথা-টার সোজাভাবে উত্তর দাও না?

হরিশ—"আমি" আখ্যা জীব নিত্য।

হেম—"আমি" জীব তুমি যে ভাবে বুঝাইয়াছ, তাহাতে জীব যে নিত্য, তাহা ত বুঝাযায় না।

হরিশ—কেন, আমি কি জীব অনিত্য বলিয়া বুঝাইয়াছি?

হেম—তোমার মতে জীব অনিত্য বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু সে বিষয় বুঝান সময়

সাপেক্ষ, আজ রাত্র অধিক হইয়াছে, চল এক্ষণে যাওয়া যাক্। কল্য এখানে এস, "জীব-তত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। তবে আমি যে তোমাকে বুঝাইব, একথা বলি না, পবিত্র গঙ্গাতীরে বসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা বড়ই আনন্দদায়ক, বড়ই প্রীতিপ্রদ।

হরিশ—আমারও সেই মত, তবে তুমি আমার মূল প্রশ্নের উত্তর এবং গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কখন বলিবে?

হেম—অগ্রে ধর্ম্ম সমন্ধে আলোচনা না করিয়া গৌরাঙ্গতত্ত্ব ও তোমার মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে না। সুতরাং অগ্রে "জীব-তত্ত্ব"-"শক্তি-তত্ত্ব" ও "ভগবৎ-তত্ত্ব" আলোচন করা যাক্।

হরিশ—বেশ তাই হউক, আমার প্রশ্নের উত্তর পাইলেই হইল। (ক্রমশঃ।)

দীন—প্রেমানন্দ।

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী।

বিভাষ (১৭) ঝাঁপতাল

কে তুমি হে সন্ন্যাসী, কেন বা হ'লে উদাসী,
ভ্রমিতেছ দিবানিশি কাহার সন্ধানে?
ভিক্ষাঝুলি কাঁধে করে, করঙ্গ নিয়েছ করে,
সন্তোষ সদা অন্তরে; করুণা নয়নে;—
শিরে জটাভার রাখি, বিভূতি গায়েতে মাখি,
কার তরে হলে যোগী মগন ধেয়ানে॥
(তব) গৃহচ্ছাদ নীলাকাশ, কভু তরুতলে বাস,
অনিত্যেতে নাহি আশ, তৃণ-শয্যা শয়নে;—
নাহি তব সুখ দুঃখ, নাহি ভয় নাহি শোক,
উছলে প্রেম পুলক, জ্ঞানামৃত পানে॥
তুমি মহা বিরাগী, সত্য প্রেম অনুরাগী,
হয়েছ কি সর্ব্বত্যাগী, বিবেক তাড়নে?
ওহে জীবন্ত বেদান্ত, জিতেন্দ্রিয় প্রশান্ত,
কি পেয়ে হয়েছ শান্ত, শুনিব শ্রবণে॥
মায়া মোহ করি ছিন্ন, করেছ সার ভিক্ষা-অন্ন,
আত্মপর নাহি ভিন্ন প্রেমের কিরণে;—
লয়েছ পবিত্র ব্রত, করুণা কহিব কত,
বিশ্বহিতে সদা রত ভুলিয়ে আপনে॥

বদ্ধ জীবের মুক্তাবস্থা।

ঈশ্বর সগুণ আবার নির্গুণ। সত্ব, রজ ও তম এই তিনটী গুণ। যখন তিনি এই গুণ-ত্রয়ের অভিমানী হইয়া কার্য্য করেন, তখন তাঁহাকে সগুণ বলা যায়। আর যখন তিনি এই ত্রিবিধ গুণের সাম্যাবস্থা ঘটাইয়া আত্মারাম রূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে নির্গুণ বা গুণাতীত অর্থাৎ গুণ-ক্রিয়ার অতীত বলা যায়। তাঁহার এই দুই অবস্থায়ই নিত্য। একের বিকাশে অন্যের তিরোধান হয় না। গুণাতীত বা নির্গুণ অর্থ গুণহীন নহে,—সকল গুণের আধার—সকল গুণের নিয়ামক বা কর্ত্তা অর্থাৎ সত্বরজাদি গুণ-ত্রয়ের কোন ক্রিয়া যাঁহার উপর সম্ভবে না। এই তিন গুণ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়া জগতে বিকাশ হইয়াছে; তিনি ইহাদের অধীশ্বর। তিনি বিষ্ণুরূপে পালনী শক্তি বক্ষে ধারণ করিয়া সত্বগুণের বিকাশ, ব্রহ্মারূপে সৃজনী শক্তি লইয়া রজগুণের এবং শিবরূপে সংহারিণী শক্তির আধার হইয়া তমগুণের বিকাশ করিয়াছেন। এই তিনি গুণ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ এই গুণ-ত্রয়ের অধীনে এই জাগতিক স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়বিধ কার্য্যের নিয়মন হইতেছে। অতএব স্থূল বা সূক্ষ্মে যাহা কিছু বর্ত্তমান, তৎসমস্তই এই গুণত্রয়ের অধীন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতে অণু, পরমাণু পর্য্যন্ত এই গুণবন্ধনে আবদ্ধ। বিষ্ণু সত্ব প্রধান, ব্রহ্মা রজঃ প্রধান ও শিব তমো প্রধান। এই বন্ধনই জগতে মায়া নামে অভিহিত হয়। ইহার পরিচালনকর্ত্রী স্বয়ং মহামায়া। যাঁহার শক্তি প্রভাবে সৃষ্টিপ্রবাহ অপ্রতিহত গতিতে চলিতেছে। এই মহাশক্তি মহামায়াকে প্রীত করিতে পারিলেই ত্রিগুণময়ী মায়ার শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া নিত্য, সত্য, সনাতন সর্ব্ব-গুণাধার শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়—অন্যথায় নহে।

এই ত্রিগুণময়ী মায়ার শক্তি মানব মনের উপর মাত্রই ক্রিয়াশীলা। মনাতীত অবস্থার উপর ইহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। কাজেই মনের লয় হইলে মায়ারও লয় হয় এবং পরম জ্ঞান ও প্রেমময় অবস্থা লাভ হয়। মানব শত আশাপাশ বদ্ধ হইয়া, আশার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছে, "তাহার মুক্তি নাই। সে বদ্ধ,—চির বদ্ধ।" কিন্তু সে যেরূপেই নিজকে দেখুক বা চিন্তা করুক না কেন, তাহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে থাকিয়া থাকিয়া কে যেন অনন্ত সুখের, অনন্ত শান্তির, অনন্ত প্রেমের ও অনন্ত জীবনের গান গাই-তেছে। সে সেই সঙ্গীত সুধাপান করিয়া তাহাতে অভ্যস্ত, চির বদ্ধ অবস্থায়ও সেই অনন্ত, অসীম ভাব বুকে করিয়া ধীরে জগতে অগ্রসর হইতেছে। দৃশ্যতঃ এই বদ্ধাবস্থার ভ্রম-জ্ঞান আশা হইতেই সৃষ্ট হয়। আশা মায়ারই কার্য্য বিশেষ। শত শত বিষয় ভোগবাসনা বুকে ধরিয়া, মানব তাহার তৃপ্তির পথ না পাইয়া মনে করিতে থাকে "আমি বদ্ধ"; কিন্তু ঐ বাসনা যে কেবল তাহার মনে, উহার লোপ হইলে যে তাহার বদ্ধভাব দূর হইবে, একথা সে ভাবিতেই পারে না। তাই "আমি বদ্ধ, আমি পাপী, আমার মুক্তি নাই" ভাবিয়া নিরাশায় দিবানিশি হাহাকার

করিয়া বেড়ায়। জীবের স্বরূপ চিদানন্দ-স্বরূপ, প্রেমময়স্বরূপ, ত্রিগুণের অতীত নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ; জীব কখনও স্বরূপতঃ বদ্ধ নয়। অতএব তাহার মুক্তিরও আবশ্যকতা নাই। সে স্বরূপে মুক্ত বদ্ধের অতীত। এই বদ্ধ ও মুক্ত-ভাব মানবের জাগতিক জ্ঞানের অন্তর্গত। মানব যখন মনে করে "আমি বদ্ধ," তখন তাহার পক্ষে মুক্তি স্বাভাবিক এবং পুনঃ বদ্ধ হওয়াও স্বাভাবিক। কারণ আঁধারের পর আলো, সুখের পর দুঃখ, হর্ষের পর বিষাদ, মিলনের পর বিরহ স্বভাবিক নিয়ম, জাগতিক বিধি। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়াই ইহার মূলে ক্রিয়াশীলা। অতএব যে আজ বদ্ধ, সে হয়তঃ কাল মুক্ত হইবে অর্থাৎ আশাপাশ ছিন্ন করিয়া স্ব স্বরূপে কিছুকাল অবস্থান করিবে: মায়াবারিত অহংজ্ঞান ছাড়িয়া হয়তঃ সাময়িক, নিজ জন্মপ্রাপ্ত স্বরূপ অনুভব করিবে; কিন্তু তাহার বদ্ধত্ব সংস্কার থাকায় মুক্তি পদ লাভ করিয়াও আবার বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, আবার বিষয়জালে চিত্ত জড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যে ভাগ্যবান জন্ম জন্মান্তরীন সাধন সৌভাগ্যবলে পরম করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপায় নিজের চিরমুক্ত স্বভাব জানিয়া তাহাতে আস্থাবান হইয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাহার পক্ষেই বদ্ধাবস্থা অলীক মায়ার বিজৃম্ভন মাত্র—অন্য কিছুই নহে। সেই ভাগ্যবানই প্রেমময়কে হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিয়া পরাশান্তি লাভ করেন।

মানব স্বরূপসিদ্ধ নিত্য চৈতন্য স্বরূপ। অচৈতন্য বা দেহে আত্ম বুদ্ধি তাহার সাময়িক ভ্রম মাত্র। "আমি শান্ত, আমি ক্ষুদ্র, অনন্ত এবং বৃহতের অনুসন্ধান আমার নিকট নিতান্ত বাতুলতা" ইত্যাদি মনোভাব নিতান্ত ভিত্তিহীন এবং অপ্রামাণিক। আকাশ অনন্ত, সদা নির্ম্মল, শান্ত; কিন্তু দৃষ্টির দোষে আমরা ইহাকে আয়তনবিশিষ্ট দেখি এবং মেঘ, ঝড় ইত্যাদি দ্বারা অনেক সময়ে আচ্ছন্ন হয় বলিয়া অশান্ত ও আঁধার দেখি। সাময়িক কোন নৈসর্গিক কারণে যে পরিবর্ত্তন আকাশের ঘটিতেছে, তাহাই কি আমরা তাহার প্রকৃত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? মেঘ ও ঝড়ের অবসানে আকাশের নির্ম্মলত্ব অবশ্যম্ভাবী জানিয়া কি আমরা মনে করিতে পারি, আকাশ নির্ম্মল নয়? মানব চিত্তে এই বিষয় বাসনাই ঐ মেঘাদির ন্যায় সাময়িক আবরণ, ইহার অপগমে স্বরূপ আপনিই যখন ফুটিয়া উঠিবে, তখন মানব যে বদ্ধ ইহা প্রমাণসহ কিরূপে হইবে? আরও দেখুন, মানব শান্ত হইলে অনন্তের ভাব কখনই তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারিত না; অনন্ত আকাশ, অনন্ত ময়দান, অনন্ত সমুদ্রের জলরাশি, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ কখনই ক্ষুদ্র মানবের চিত্তাকর্ষক, মন প্রাণ মুগ্ধকর হইতে পারিত না। স্বরূপানুরূপ মাত্রই মানবকে মুগ্ধ করিতে পারে; অন্য কোন বস্তু নহে। নিজ মনো-ভাবের সহিত যে বস্তুর যত বেশী সাদৃশ্য, তাহা তত প্রীতিপ্রদ, যাহার সহিত মনের যত বেশী ঐক্য, সে তত প্রিয় সুহৃদ। নিজ নিজ অন্তর্নিহিত বৃত্তি অনুসারে, মনের একমুখী ভাব অনুসারে আমরা জগতে ভালবাসার বস্তু প্রস্তুত করিয়া লই। যাহা দেখিলে প্রাণ মাতিয়া উঠে, মন কি জানি, কি এক অজ্ঞাত রাজ্যের সুখ স্মৃতিতে জাগিয়া উঠে, তাহাই নিজ স্বরূপ বা নিজ স্বরূপানুরূপ, এবং তাহাই নিজ

স্বরূপের অনুভূতি। মানব অনন্ত; অনন্ত শক্তিশালী না হইলে সে কথনই অনন্তের ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইত না এবং অনন্তের দৃশ্য তাহার নিকট, তত প্রীতিপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক হইত না। দৃশ্যতঃ অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত পাঞ্চভৌতিক দেহধারী ক্ষুদ্র মানব যে অনন্ত হইতে পারে—ইহাই রহস্য। মানব যে সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাহার নিজ দেহ ও জগত প্রত্যক্ষ করিতেছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি সাধনবলে অপরিসীম মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যন্ত্রাদির সাহায্যেও এই সকল শক্তি এরূপে বর্দ্ধিত হয় যে, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তুও গ্রহণীয় হইয়া থাকে। চক্ষুর যে শক্তি দ্বারা আমরা সচরাচর বস্তু সকল দর্শন করিয়া থাকি, সেই শক্তি পরিবর্দ্ধন জন্য যদি Microscope এ ব্যবহৃত কাঁচ বিশেষের শক্তি ব্যবহার করি বা কোন কারণে microscope এর শক্তির ন্যায় আমাদের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণত প্রাপ্ত হয়, তবে আমরা দেখিতে পাইব "আমাদের দেহ পর্ব্বতপ্রমাণ বৃহৎ, আমরা আহার করি পর্ব্বতপ্রমাণ" ইত্যাদি। এইরূপে দৃষ্ট বস্তু মাত্রই অসম্ভবরূপে বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সেই বস্তুর বৃহত্ত্ব জ্ঞান বর্ত্তমান অবস্থার ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞান অপেক্ষা কোন অংশে ক্ষীণ নহে। অতএব আমরা যে ভাবে আমাদের দেহকে অনুভব করিতেছি, তাহা যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি শক্তি সত্য। সেই পর্য্যন্ত সত্য। এই দৃষ্টি শক্তির পরিবর্ত্তনে দেহের আকারও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপে ক্রমে এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, যাহাতে নিজকে অনাদি, অনন্ত, ভূমা—পুরুষ রূপে দর্শন করিতে পারি। আবার হয়তঃ দৃষ্টিশক্তির কোনরূপ ব্যতিক্রমে বা অন্যরূপ কাঁচের শক্তি প্রয়োগে দেখিতে পারি যে, এই দেহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। ইহাতে এই অনুমানই সিদ্ধ হয় যে, আমাদের এই দেহ আছে কি না তাহার নিশ্চয়তা নাই এবং পরিবর্ত্তনীয় দৃষ্টিশক্তির প্রভাবহেতু দৃশ্যমান দেহ নাই, ইহাই অনুমিত হয়। অতএব সান্ত দেহ বা জগত সত্য নহে, মায়াময়। একমাত্র অনাদি, অনন্ত, প্রেমময় সত্ত্বাই শাশ্বত ও সত্য। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের যে পরিমাণ গ্রহণ করি, তাহারই অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করি, আর যাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তাহা অস্বীকার করি। কিন্তু ইন্দ্রিয় শক্তির এরূপ ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিলে ইহাতে আস্থা স্থাপন করিয়া জগতের বর্ত্তমান জ্ঞানে স্থির থাকিতে পারাযায় না। অতএব দেহের বা দৃশ্য জগতের সীমাবদ্ধত্ব বা আমরা যাহা দেখিতেছি, ঠিক তদ্রূপত্ব যখন দৃষ্টি শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে, তখন যে ইহারা বাস্তবিকই অসীম, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। মনও একটী, ইন্দ্রিয় এবং বাস্তব। ইহাদ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহাও বাস্তব। অবাস্তব বা মনের বাহিরের কোন বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইলে মনাতীত কোন শক্তি দ্বারাই তাহা সাধিত হওয়া সম্ভব। মন যাহা বলিবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ তাহার জানিবার শক্তি সীমাবদ্ধ। অতএব এই যে আশা-বায়ু-বিক্ষুব্ধ মন বিষয়-বাসনা-সাগরে ডুবিয়া তোমাকে বলিতেছে, "তুমি বদ্ধ" ইহাও ঠিক নহে। যখন এই আশা কুহেলির আবরণ টুটিবে, মোহমদিরার নেশা ছুটিবে, তখন আবার মন বলিবে

এতদিন তোমাকে আমি যাহা বলিয়াছি," তুমি তাহা মও জানিয়া রাখ। তুমি যাহা, এক্ষণে তাহারই অনুসন্ধান কর।" কাজেই সদা পরিবর্ত্তনশীল মন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে ইহা দ্বারা সত্য বস্তুর অনুসন্ধান কঠিন এবং সাময়িক উচ্ছ্বাস কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইয়া স্থির ও ধীর ভাবে মন বশীভূত করিয়া আত্মানুসন্ধানই কর্ত্তব্য। ইহাই মূল মন্ত্র, "আমি" নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব, পরম প্রেমস্বরূপ, আমার বন্ধন নাই; আমার ভয় নাই, আমার মুক্তিও নাই। অহর্নিশি এই ধ্যান, এই জ্ঞান করিয়া এই চিন্তায় ডুবিয়া থাকিলে "আত্মস্বরূপ"রূপে যিনি অবস্থিত, সেই নিত্য, সত্যস্বরূপ, পুরাণ পুরুষ আত্মপ্রকাশ করিয়া "আমি, আমির" বন্ধন টুটাইয়া দেন এবং প্রেমের অভিসিঞ্চনে হৃদয় মন প্রাণ সুশীতল করেন। এই প্রেমময় স্বরূপ লাভ কেবল মানব-জীবনেই সম্ভব, তাই মানবজনম দুর্ল্লভ বলিয়া মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"আমি বদ্ধ" এই ভ্রমের আর একটী কারণ নাম ও রূপ। যদিও নাম রূপের প্রকৃতিগত কোন অস্তিত্ব নাই, তথাপি মায়ার আবরণে আবরিত হইয়া ব্যবহারিক জগতে নাম রূপই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। নামের মাধুর্য্যে, রূপের মোহে জীব আপনাহারা হইলেও প্রকৃত জ্ঞান বা প্রেমের উদয়ে যখন নামরূপ বর্ত্তমান থাকে না, তখন পরমার্থতঃ ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে। সদা নাশশীল পাঞ্চভৌতিক দেহ খানি তাহার কোন নাম লইয়াই উৎপন্ন হয় না, ইহাতে নাম মাত্রই আরোপিত হইয়া ব্যবহারিক জগত চলিয়া থাকে। অতএব যাহার ব্যবহারিক সত্তার বাহিরে কোন সত্তা নাই বা ব্যবহারিক জগতের বাহিরে যাহার সত্তার কোন আবশ্যকতা নাই, তাহা মানবের সর্ব্বাভীষ্টদাতা হইতে পারে না। যাহা সকলেরই রূপ, তাহাই প্রকৃত রূপ এবং যাহা সকলেরই নাম, তাহাই প্রকৃত নাম। কাজেই নাম ও রূপের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া মায়ার ক্রোড়ে ক্রীড়াপুত্তলী হওয়া ভ্রমাত্মক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নামের প্রয়োজন নাই, আমাদের নামীরই প্রয়োজন, রূপের প্রয়োজন নাই, আমাদের রূপহীনেরই প্রয়োজন। যাহা বাস্তব, তাহা নাশশীল; যাহার উপরে কোন বস্তুর ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না, তাহাই মাত্র স্থায়ী। নাম ও রূপের মধ্য দিয়া নাম ও রূপহীন বস্তু শুদ্ধ সত্তামাত্র যাহা জগতে প্রকাশিত তাহাই সত্য বস্তু। তাহা অজ, নিত্য, শাশ্বত—তাহাই মানবের স্বরূপ। মানব স্বরূপতঃ নামও নয়, রূপও নয়, এই নাম রূপের ফাঁদে পড়িয়া নিত্য মুক্ত শিব আজ নিত্য বদ্ধ জীব রূপে পরিণত হইয়া "আমার মুক্তি নাই" বলিয়া হাহাকার করিতেছে। তাই সাধনবলে এই মনঃকল্পিত বন্ধন মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মুক্তাবস্থা লাভ হইল। ইহাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা—ইহার জন্য স্বর্গাদি কোন স্থান বিশেষে কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহ আবশ্যক হয় না।

স্বরূপ নাম রূপের অন্তরালে অবস্থিত হইলেও, যতক্ষণ এইনাম ও রূপের অভিমান দূর না হয়, ততক্ষণ ইহার সাধনাই আবশ্যক

নামের সাধনে রূপের ভজনক্রমে নাম ও রূপ দূরে সরিয়া দাঁড়ায় এবং নিত্য শুদ্ধ সত্য। প্রেমময় স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

দীন—সুরেন্দ্রমোহন।

—:0:—

অভিব্যক্তি।

সংখ্যাহীন হাস্যোজ্জ্বল তারকার রাশি,
পূর্ণকল—বিমলেন্দু স্নিগ্ধসুধা হাসি,
নগ্নদেহ প্রকৃতির সুষমার ছবি,
প্রভাতি শিশিরস্নাত শস্পে বালরবি,
মার্ত্তণ্ড ময়ুখ মালা নিদাঘগগনে,
প্রাবৃটে দামিনী খেলা কাদম্বিনী সনে,
অনন্ত নীলিমা গেহে বিহগ কূজন,
বিজন বিপিন মাঝে কুরঙ্গ নর্ত্তন,
বিমল মলয়ানীল স্নিগ্ধ শান্ত মন্দ,
কুসুমিত উপবনে ফুল্ল ফুল্ল গন্ধ,
শীতল পয়োধি বক্ষে বাড়ব-অনল,
মণিশিরা ফণিনীর কণ্ঠে হলাহল।
প্রশান্ত বারিধি বক্ষে উত্তাল তরঙ্গ,
কেতকী কোমল প্রাণে ভীষণ ভুজঙ্গ,
কল্লোলিনী নির্ঝরিনী তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ,
মুঞ্জরিত বনকুঞ্জে মধুমত্ত ভৃঙ্গ,
পশুপক্ষী সরীসৃপ পতঙ্গ কীটাণু।
ক্ষুদ্রতম বালুকণা অণু পরমাণু,
রচেছে মঙ্গলময় যেই মহাশক্তি,
জাগায় হৃদয়ে মোর সৃষ্টি "অভিব্যক্তি"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—:0:—

নব জীবন।

ভেঙ্গে গেছে মোহের নেশা,
কেটে গেছে ঘুমের ঘোর।
এতদিনে বুঝি বা মোর,
দুঃখের নিশি হ'ল ভোর॥
নিরাশার মেঘ কেটে গেছে,
জড় দেহ পেল প্রাণ।
ছিন্ন বীণা নূতন সুরে,
ধরল আজ নূতন তান॥
তরুণ অরুণ উঠ'ল হেসে,
পুব-আকাশ আলো করে।
কুসুম সুবাস লয়ে শিরে
মলয় মারুত বইল ধীরে॥
পিকবধু কুহুস্বরে
গাইছে তুলে মোহন তান।
ফুলে ফুলে গুঞ্জরিয়ে
কচ্ছে অলি মধুপান॥
মরা গাঙ্গে বাণ ডাকিল
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিছে।
শত বর্ষের আঁধার আজি
কার পরশে দূরে গেছে॥

পঙ্গু আজ লঙ্ঘিল গিরি
বোবা আজ গাইছে গান।
বধীর আজ পে'ল শ্রবণ
শীতল হ'ল তপ্ত প্রাণ॥

আধার হৃদি আলো হ'লো
পেয়ে কার রূপের ভাতি।
আজ নীরস প্রাণ সরস হলো
পেয়ে কার প্রেম পীরিতি॥

আজকে দেখি সবই মধুর
সবই আজ নূতন, নূতন।
হেয় প্রাণ ধন্য হ'লো
পেয়ে আজ "নব জীবন"।

ও গো দেব।
শূন্য আসন পূর্ণ কর্‌তে
আসলে যদি দয়া করে।
যেও না আর সরে সরে
হৃদয় কোণে উঁকি মেরে।

তোমার হৃদি তোমার আসন
লওগো তুমি আপন জোরে।
মদনমোহন সাজে এবার
দাড়াও হৃদি আলো করে॥

ঘুচে যাক্ অজ্ঞান আধার
মোহ কালী যাক দূরে।
কাম কামনা পাপ বাসনা
আর জ্বালা যেন দেয় না মোরে।

তোমার নামে তোমার কামে
মজে থাকি দিবানিশি।
তোমার ধ্যানে, তোমার জ্ঞানে
যেন সুখনীরে ভাসি।

পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—
আছে যে সব চরাচরে—
আত্ম জ্ঞানে বুকে করে—
(যেন) ভাসি তোমার প্রেম পাথারে।

দীন—উমেশচন্দ্র।

—:0:—

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম।

যাঁহার অপার করুণাবলে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু সচল হয়, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম" বর্ত্তমানে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর ভারত সম্রাট-দম্পতির দিল্লী দরবারের স্মরণীয় দিনে এই সেবাশ্রম বিভাগ সর্ব্ব প্রথমে স্থাপিত হয়।

সেবাশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী।

জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নারায়ণজ্ঞানে জীব-সেবাই সেবাশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য—ইহাতে আত্মপ্রসাদ ও আত্মোন্নতি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বঘটে একমাত্র সর্ব্ব-ব্যাপী পরমাত্মাই বিরাজিত; সুতরাং এই অনন্ত বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই হেয় নাই। "বিষ্ণোর সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্বমিদং জগৎ" অর্থাৎ এই জগত সেই বিষ্ণুরই বিস্তার মাত্র; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জীবজগত সকলই সেই নারায়ণের বিকাশ!—সেই অদ্বিতীয়, চৈতন্যময়, পুরাণ পুরুষ সর্ব্ব ভূতের অন্তরে

বাহিরে সমভাবে চির বিদ্যমান। তাই মনে হয়, ক্ষুধাতুরকে একমুষ্টি অন্ন প্রদানকরা, তৃষ্ণার্ত্তকে এক বিন্দু জল দেওয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া, দরিদ্রকে সাহায্য করা, অসহায় রোগীকে সেবা করা, নররূপী সেই নারায়ণের সেবাকরা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তবে যাহারা অহংকারে স্ফীতবক্ষ হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কর্ত্তৃত্বাভিমানে আত্মহারা হইয়া ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার সহিত দান করে, অথবা "তথা-কথিত" সেবা দ্বারা আপনাদের নাম জাহির করতঃ দাতা সাজিতে চাহে, তাহাদের সম্বন্ধে পৃথক কথা! তাহারা সেবা-ধর্ম্মের মর্ম্ম আদৌ অবগত নহে। কর্ত্তা আর সেবক কখনও এক হইতে পারে না—কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতঃ সেবক হইতে না পারিলে সেবাধর্ম্মে অধিকার হয় না! মনে মনে ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া শুধু মুখে সেবক সাজিলে কি হইবে? সেবক হওয়া বড়ই কঠিন—নিষ্কামসেবাই প্রকৃত সেবা—আপনাকে পরের জন্য বিলাইয়া দেওয়াই সেবকের প্রকৃত আদর্শ। বর্ত্তমানে আশ্রমে যে সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে উপরোক্ত আদর্শ সেবকের ভাব প্রতিষ্ঠা করতঃ সেবকসম্প্রদায় গঠন করা সেবাশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র; জীব মাত্রেই এখানে আসিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছেন। সে কর্ম্ম আর কিছুই নয়, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করা—পরস্পরের ভাবানুভব চেষ্টায় আপন আপন অভাব পূরণ করা। সামান্য কীট হইতে আমরা উপকার পাই—আবার দীন হইয়াও রাজরাজেশ্বরের উপকার করিতে পারি। জগতের প্রত্যেক পদার্থই পরস্পর এইরূপে সংযুক্ত হইয়া বিরাট বিশ্বসংসারের কর্ম্ম-প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছে। পরের জন্যই জীবন; তাই সদাশয় গৃহস্থ আপনাকে শত বিপদে জড়িত করিয়া—আপনার নরকের পথ পরিষ্কার করিয়াও স্ত্রীপুত্রের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যস্ত! ধন্য তাঁহারা—যাঁহারা পরের সেবায় এরূপে আপনাকে ভুলিয়া যাইতে পারে। তবে কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক, কেহ বা কোন অজ্ঞাত শক্তির অনুশাসনে দৈনন্দিন জীবনের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। সন্ন্যাসীর আদর্শ জগদ্গুরু শিব, আপন ভুলিয়া প্রত্যেক জীবের মঙ্গল বিধা-



[illegible]দা কর্ম্ম-নিরত—আমরা তাহাকেই [illegible]লি, যিনি (যে কোন আশ্রম- [illegible] না কেন) শিবের ন্যায় আমি-[illegible] গণ্ডী বিশ্বময় প্রসারিত পূর্ব্বক সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া জগতের মঙ্গল সার সম্বল করিয়াছেন,—যিনি পরকে অমৃত বিলাইয়া নিজের জন্য কালকুট সঞ্চিত করিতে এবং পরের গলায় মণিহার জড়াইয়া আপন কণ্ঠে ফণীহার দোলাইয়া আনন্দে গালবাদ্য করিয়া নৃত্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। আমাদের সেই স্পর্দ্ধা না থাকিলেও কায়মনোবাক্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এতদুদ্দেশ্যে যৎকিঞ্চিত কার্য্য করিতে পারিলেও সেবাব্রত গ্রহণ করা সার্থক মনে করিব। সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থে বর্ত্তমানে সেবাশ্রমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি খোলা হইয়াছে; যথাঃ- (১) শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথনিকেতন—

—যাহাদের পিতামাতা কিম্বা তত্ত্বাবধায়ক, কি কোন অভিভাবক নাই, কিম্বা যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় নাই, এরূপ

অনাথ বালক ও বালিকাদিগকে এই বিভাগেই স্থান দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের যথাযোগ্য শিক্ষাদির ব্যবস্থাকরা হইয়া থাকে। আমরা কতকগুলি অনাথ বালকবালিকাকে আশ্রমে স্থান দান করতঃ তাহাদের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্মশিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইয়া শাস্ত্র পঠন, পঠন ও ধর্ম্মার্থে সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ছেলেদের স্কুল কলেজে পড়ান হয়, মেয়েদের সেলাই, শিল্পাদি শিক্ষা, রন্ধন, গৃহকার্য্য ও সেবাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর মেয়েদিগকে যথোপযোগী শিক্ষা প্রদানের জন্য ৺কাশীধামে স্থায়ীভাবে একটী মাতৃমন্দির এবং ছেলেদের শিক্ষার জন্য একটী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম খোলা হইয়াছে। আশ্রমের ১ টী ব্রহ্মচারী যুবক এবৎসর ঢাকা কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে।

২। দাতব্য ঔষধালয়,—

এই ঔষধবিভাগে নানাপ্রকার এলোপ্যাথিক ঔষধ রাখা হইয়াছে। একজন সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে ইহার ভার দেওয়া হইয়াছে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এখান হইতে ঔষধ বিতরণ এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কোন রোগী আশ্রমে আসিতে অক্ষম হইয়া জানাইলে, ডাক্তার তাহার বাড়ীতে গিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কোন কোন উৎকট ব্যারামে অবধৌতিক ঔষধও দেওয়া হইয়া থাকে

৩। হাসপাতাল ঃ—অনাথ ও নিরাশ্রয় রোগিগণকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করার জন্য একটী হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত হাসপাতালের অন্তর্গত কুষ্ঠ রোগী রাখার একটী স্থায়ী বিভাগ খোলা হইয়াছে; তাহাতে ২ টী কুষ্ঠরোগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১টী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; অপরটীর মৃত্যু হইয়াছে। সময় সময় কলেরা রোগীও হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হয়।

৪। সেবা-বিভাগ ঃ—দুর্ভিক্ষ, মহামারী কিম্বা কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিগণকে সাহায্য করার জন্য এই সেবা-বিভাগ খোলা হইয়াছে; সেবা কার্য্যের জন্য "যোগমায়া ভাণ্ডার" নামক একটী "ফণ্ড" স্থাপিত হইয়াছে। এই "ফণ্ড" হইতে দরিদ্র ও দুস্থ ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হইয়া থাকে এবং সময় সময় দরিদ্র ছাত্রগণকে শিক্ষার সাহায্যও করা হইয়া থাকে। সেবকগণ বিপন্ন স্থানে গমন করতঃ যথাসাধ্য শারীরিক ও আর্থিক সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এতদর্থে সময় সময় সেবকগণ ভিক্ষা দ্বারাও অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

৫। শিক্ষা বিভাগ ঃ—এই বিভাগে অনাথ বালক ও আশ্রমের ব্রহ্মচারী বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্য, যম, নিয়মাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, এবং প্রাথমিক সংস্কৃত শিক্ষাদি প্রদান করা হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত বালকগণের ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। একটী সংস্কৃত টোল স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে —তাহা হইলে ব্রহ্মচারী বালকগণ যথাযোগ্য শিক্ষা পাইবে এবং আশ্রমের নিকটবর্ত্তী সর্ব্বসাধারণে এই টোলে ছাত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন—তদ্বারা এতদ্দেশের একটী বিশেষ

অভাব মোচন হইবে।

৬। নিগমাগম লাইব্রেরী :—সর্ব্ব-সাধারণের ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য এই লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমানে প্রায় পাঁচশত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি সাময়িক পত্রিকাও রাখা হইয়াছে।

আসামে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কারণ।

আমাদের পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক মহাশয়ের সাধনকালের অধিকাংশ সময় আসামের পার্ব্বতীয় প্রদেশে অতিবাহিত হয়। তিনি সে সময়েই স্বভাবসৌন্দর্য্য-বিভূষিত আসামের নিরাবিল শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন, কিন্তু তিনি তখন কৌপীন করঙ্গধারী সন্ন্যাসী—কাজেই আসামে কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া পূর্ব্ববঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া লন। উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী অল্পদিনেই তাঁহাকে গ্রহণ করিল—শিক্ষিত সমাজ তাঁহার কার্য্যে যোগদান করিলেন। তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি বিপুল কার্য্যানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিলেন। সেই সময়েই আসামেই শাখা আশ্রম স্থাপনের কল্পনা হয়। তখন ঢাকা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী; কাজেই দু, একজন আসামবাসী আমাদের ঢাকাস্থিত আশ্রমে যাতায়াত করিতেন এবং আমাদিগেকে ভালবাসার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা অনেক সময় অনুযোগ করিতেন যে, "আপনারা (অর্থাৎ বাঙ্গালীরা) কাশী, শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, মহীশূর, কনখল, আলমোরা প্রভৃতি ভারতের দূরতর প্রদেশে কত আশ্রম করিতেছেন, কিন্তু আপনাদের প্রতিবাসী আসামে কিছু করিলেন না।" শ্রীগুরুদেব তাঁহাদের কথার সার্থকতা আমাদিগকে বুঝাইতেন। তৎপরে দিন দিন আমাদের সেবাকার্য্য প্রসারিত হইতে লাগিল—ঢাকার ন্যায় সহর অপেক্ষা মফঃস্বলে আমাদের উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধি হইবে ভাবিয়া ঢাকা হইতে সেবাশ্রম পল্লীতে স্থাপনই স্থির হইল। পল্লীতে লোকের অভাব অধিক, পূরণের পন্থা অল্প; তাই সহর ছাড়িবার সংকল্প হইল। গুরুদেব আসাম আশ্রমের প্রস্তাব করিলেন, অনেকের তাহাতে আপত্তি থাকিলেও কেহ প্রতিবাদী হইতে সাহস করিল না। আসামীয়া বাবুদিগকে এ কথা বলা হইল; তাঁহারা আনন্দ-চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। যোরহাটের নিকটে আশ্রম স্থাপন করিতে তাঁহারা পরামর্শ প্রদান করিলেন। চারিগ্রামের শ্রীযুত সরুরাম দাস আশ্রম করার উদ্দেশ্যে ৫৮ বিঘা জমি সরকার পক্ষ হইতে বন্দোবস্ত লইয়া হস্তান্তর পত্র দ্বারা তাহা আশ্রমের নামে লিখিয়া দিয়াছেন; ঐ জমির উপরেই "সারস্বত মঠ" ও বর্ত্তমান সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আশ্রমে বৃহদায়তন কয়েকখানি টিনের ও খেড়ের ঘর এবং ফুল-ফলের বাগান করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটী পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত কার্য্যে সাধারণের এক কপর্দ্দকও ব্যয়িত হয় নাই।

কার্য্যের পরিচয়।

আশ্রমের নিকটবর্ত্তী গ্রাম্য লোকেই

ঔষধ লইয়া থাকে, সময় সময় আশ্রমের ডাক্তার রোগীর বাড়ীতে গিয়াও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

২। আলোচ্য কালের মধ্যে প্রায় দুইশত জন অতিথি আশ্রমে স্থানাহার পাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত স্থানীয় দরিদ্রগণ আশ্রম হইতে ভিক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৩। বিগত চারি বৎসর যাবত রংদই নিবাসী দধিরাম কেওট নামক জনৈক কুষ্ঠ রোগীকে সেবাশ্রমে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং রাজগুরুগ্রাম নিবাসী নন্দীকোচের জীবিকা নির্ব্বাহের খরচ আশ্রম হইতে বহন করা হইতেছে। যোরহাটে রাম কলিতা নামক একটী কুষ্ঠ রোগীকে খরচ দেওয়া হইত; বর্ত্তমানে সে অনন্ত ধামের যাত্রী হইয়াছে। একটী রক্তাক্ত গলিত মরণাপন্ন কুষ্ঠ রোগী বিগত বৎসর সেবাশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিল, কিছুদিন পরে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একটী ক্ষতরোগী ও একটী পতিতা কুগীরমনী রোগাক্রান্ত হইয়া সেবাশ্রমে আশ্রয় লইলে প্রায় এক বৎসরব্যাপী তাহাদিগকে চিকিৎসা করা হয় এবং তাহাদের যাবতীয় খরচ আশ্রম হইতে বহন করা হয়, তৎপর তাহারা রোগমুক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যস্থানে চলিয়া গিয়াছে। রামযশ নাম একটী হিন্দুস্থানী লোক বাত ও অন্যান্য রোগগ্রস্থ হইয়া আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে, কয়েক মাস আশ্রমে চিকিৎসিত হইয়া কিছু বিশেষ হইলে পর পুনরায় কার্য্যস্থানে চলিয়া গিয়াছে। যদুনাথ পোদ্দার নামক একটী ক্ষয়রোগীকে প্রায় ৬মাস আশ্রমস্থ হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করার পর সে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। এবার অন্নকষ্ট কালে চারিগ্রাম নিবাসী কিন্তু কলিতা নামক জনৈক দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি ২টী বালক সহ সেবাশ্রমে স্থান পাইয়াছিল; বর্ত্তমানে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় সে আশ্রম হইতে স্বেচ্ছায় চলিয়া আসিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

৪। দামোদর বন্যা :—বিগত বর্দ্ধমান বিভাগের বন্যা উপলক্ষে আশ্রম হইতে কতক অর্থসহ একজন ডাক্তার ও পাঁচজন সেবক প্রেরণ করা হয়; তাহারা প্রথমতঃ বর্দ্ধমানে গমন করেন, সেখানে গিয়া যখন অবগত হইলেন যে, বর্দ্ধমান অপেক্ষা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, তখন তাহাদের মধ্যে দুইজনকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া অবশিষ্ট চারি জন কাঁথিতে চলিয়া যান; সেখানে যাইয়া "হাইকোর্ট-রিলিফ-পার্টি'র" সহিত একযোগে কার্য্যারম্ভ করেন। কালীনগরে মূল কেন্দ্র ও হাড়িয়া থানাতে শাখা কেন্দ্র স্থাপনা করিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক-সমিতি" নাম প্রদান পূর্ব্বক হাড়িয়া কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। সেই সমস্ত স্থান পরিদর্শন কালে বিপন্ন লোকগণের দুর্দ্দশা দর্শনে আশ্রম হইতে গৃহীত অর্থমধ্যে প্রায় শতাধিক টাকার চাউল ও কাপড় একদিনেই বিতরণ করিয়াছিলেন। তৎপর মোয়াটী প্রমুখ প্রায় ২০খানি গ্রাম পরিদর্শনপূর্ব্বক তাহার নক্সা ও দুস্থলোকের সংখ্যাদির আবশ্যকীয় তালিকা প্রস্তুত করতঃ "হাইকোর্ট রিলিফপার্টির" প্রদত্ত চাউল বিতরণ করেন; পরিশেষে কলিকাতার "সেণ্ট্রেল অরগেনাইজেসন পার্টি'র" (central organization party) ঐ সব স্থানের ভার গ্রহণ করিলে, "হাইকোর্ট রিলিফ-

পার্টি” কাঁথি সহরেই মূলকেন্দ্র এবং কাজলা, বামুনিয়া, সরপাই, চৌমুখ, বেলবুনি প্রভৃতি স্থানে শাখা কেন্দ্র স্থাপনাপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করেন। এই সকল স্থান পরিদর্শন ও দুস্থগণকে চাউল বিতরণাদি কার্য্যে "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক সমিতি” বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; এমন কি মেদিনীপুরের জেলামাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্রাইডলিবার্ট কাঁথি পরিদর্শন কালে স্থানীয় বন্যার্ত্তসেবার কার্য্যপ্রণালীতে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাগণকে সহানুভূতি প্রদর্শনে উৎসাহিত করিয়া সরকারী সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। “শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক সমিতি” কাঁথির মূল কেন্দ্র এবং শাখা কেন্দ্রাদিতে কয়েক মাস কার্য্য করার পর কার্য্যের গুরুত্ব লাঘব হওয়ায় স্বামী স্বরূপানন্দ প্রমুখ কয়েকজন সেবক সেবাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎকালে “হাইকোর্ট রিলিফ পার্টির” ভারপ্রাপ্ত মূল-কর্ম্মকর্ত্তা জানাইছিলেন যে, এই গুরুতর কার্য্যে সফলতা লাভ একমাত্র সন্ন্যাসী সেবকগণের কার্য্যকারিতার ফল। উপরোক্ত সেবকগণ চলিয়া আসিলে, অন্য সেবকগণ শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের বন্যার্ত্ত সেবার রিপোর্ট “বেঙ্গলী”, “অমৃতবাজার”, বঙ্গবাসী”, “নীহার”, “মেদিনীবান্ধব” প্রভৃতি সাময়িক সংবাদ পত্রে যথাযথভাবে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কাঁথি মূল কেন্দ্রে ৬৩ খানা গ্রামে প্রতি সপ্তাহে ৫৫/মণ চাউল বিতরিত হইত; চৌমুখ কেন্দ্রে ৩০খানা গ্রামে ৪০/মণ চাউল, কাজলা কেন্দ্রে ১৬খানা গ্রামে ১৮/মণ চাউল, সরপাই কেন্দ্রে ২৪/মণ, বরহাট কেন্দ্রে ৩৪/মণ চাউল, বামুনীয়া কেন্দ্রে ২৭খানা গ্রামে ২২/মণ চাউল ও বেলবুনি কেন্দ্রে ২৯ খানা গ্রামে ১৬/মণ চাউল প্রতি সপ্তাহে বিতরণ করা হইত। এইরূপে স্থানীয় তদন্ত কল্পতঃ চাউলের পরিমাণ কখনও বৃদ্ধি করিয়া, কখনও বা অবস্থানুযায়ী হ্রাস করিয়া প্রায় পাঁচ মাস ঐ সকল কেন্দ্রে কার্য্যকরা হইয়াছিল। চাউল ব্যতীত কখন কখন নূতন ও পুরাতন বস্ত্রাদিও বিতরিত হইত। ওদিগে বর্দ্ধমান কেন্দ্রে “শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক সমিতির” সেবকগণ সাহায্য সামগ্রির ব্যয়ে শতাধিক নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গৃহশূন্য নিরন্ন ব্যক্তিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

বিপন্ন পরিবার :—কাঁথির নিকটবর্ত্তী জমুনসান গ্রাম নিবাসী কার্ত্তিক সাউতের বিধবা পত্নী দুটী বালক ও দুটী শিশু বালিকা সহ বন্যায় ভাসিয়াছিল, তাহারা সেই অবস্থায় স্থানীয় লোকের সাহায্যে কাঁথির হরিসভা-সংলগ্ন ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইতে সক্ষম হয়; কিন্তু এত বিপন্নলোকের মধ্যে কে কাহাকে সাহায্য করিবে ? সুতরাং নিদারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, অন্ন ভাবে শরীর জীর্ণ শীর্ণ ও রোগগ্রস্থ হইতে লাগিল; ঠিক সেই সময়ে “হাইকোর্ট সহায্যসমিতি” আসিয়া কার্য্যারম্ভ করেন; কিন্তু অখাদ্য ভোজনে এবং অনশনে অনেকেরই উদরাময় রোগ দেখা দিয়াছিল, এইরূপে উক্ত বিধবাও জ্বর ও উদরাময়ে শয্যাগত কাতর হইল, ছয়মাসের শিশু বালিকাটী মাতৃস্তন্যাভাবে ১৪শ দিবসে তাহার কোলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, অপর লোকে ঐ মৃতদেহ দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ঐ বিধবা অজ্ঞানাবস্থায়

থাকায় কিছুই জানিতে পারে নাই, তাহার চৈতন্য হইলে, সে ঐ বালিকাকে খুজিয়াছিল্। বালকবালিকাগুলির কষ্টের সীমা রহিল না। কেননা কে তাহাদিগকে দেখিবে এবং আহার্য্য প্রদান করিবে? তখন তৃতীয় সন্তানটীর বয়স ২ বৎসর হইবে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইয়াছিল এবং শরীরের হাড়গুলি অবশিষ্ট ছিল। সংবাদ পাইয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকসমিতির" সেবকগণ তাহাদিগকে দেখিতে যান এবং তদবস্থায় দেখিয়া স্বয়ং তাহাদিগের ভার গ্রহণ করেন; কেননা সাহায্য সমিতির নিয়মানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাউল দুস্থগণকে দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদিগকে সেরূপ সাহায্য করিলে চলিবে না, তাই আমাদের সেবকগণ নিজ হইতে তাহাদের উপযুক্ত আহার্য্য এবং বস্ত্রাদি প্রদান করেন এবং যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেই হইতে উক্ত পরিবারের যাবতীয় ব্যয়ভার সেবকগণ নিজ হইতে প্রদান করেন! আমাদের সেবাশ্রমে "অনাথ-নিকেতনে" আশ্রয় গ্রহণ করাব জন্য উক্ত বিধবা বালকবালিকা সহ শরণাপন্ন হইলে অনুসন্ধানে জানা গেল, তাহাদের বাড়ীঘর সমস্তই বন্যায় নষ্ট হইয়াছে; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের অনুমত্যানুসারে তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করতঃ সেবাশ্রমের "অনাথ-বিভাগে" স্থান দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীহট্ট অন্নকষ্ট ঃ—বিগত পূর্ব্ববৎসর শ্রীহট্টে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে, অত্র সেবাশ্রম হইতে একদল সেবক পাঠানের ব্যবস্থা হয়। তত্রাকার ডিপুটী কমিশনার মিঃ কছ্‌গ্রেভকে এবিষয়ে জানাইলে তিনি আমাদিগকে উত্তর দেন যে, সেস্থানের অন্নকষ্ট অনেকটা উপশম হইয়াছে এবং সরকারী কৃষি-ঋণ প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং এতদুর হইতে যাওয়া বর্ত্তমানে আবশ্যক নাই। তাঁহার উত্তর পাইয়া আমাদের পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাক্ত হইল।

স্থানীয় সংক্রামক ব্যাধি ঃ—বিগত বৎসর অত্র সেবাশ্রম এবং যোরহাটের নিকটবর্ত্তী বহুস্থানে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে, আশ্রমসেবক ডাক্তার বহু রোগীর বাড়ীতে গিয়া ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, তবে কোন কোন গ্রামের লোক কুসংস্কারবশতঃ ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল; তাহাদের বিশ্বাস যে, চিকিৎসা করিলে "মা" আরও কুপিতা হইবেন! এইসব কারণে কোন স্থানে অযাচিতভাবে সাহায্য করিতে যাইয়াও বিমুখ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। আশ্রম সেবকগণ রাত্রি ৮ টার সময় বাবুর আলির পার্শ্বে অনাবৃত স্থানে একটী মৃতবৎ কলেরা রোগীকে পাইয়া তাহাকে হাসপাতালে আনয়ন করেন এবং অগ্নিসেক ও যথাযোগ্য ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অবস্থা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল;—পরদিন প্রাতে সে অনন্ত ধামের যাত্রী হইলে, তাহার যথাযোগ্য সংকারের ববস্থা হইয়াছিল।

সমগ্র দেশব্যাপী বন্যা ঃ—এবার পূর্ব্ববঙ্গ আসাম, বিহার, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি অঞ্চলে ভীষণ বন্যা হইয়া বহুস্থান বিধ্বস্ত, ও অসংখ্য নরনারী বিপন্ন হইয়াছে; আবার অনাবৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গে হাহাকার পড়িয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর করাল ছায়া সমগ্রদেশের উপর পতিত হইয়াছে! তদুপরি মহামারীর করাল নৃত্য! কে কাহাকে রক্ষা করিবে? সমগ্রদেশে সহানুভূতি ও সমপ্রাণতার ভাব দৃষ্ট হইলেও এবং বহু সাহায্যসমিতি আর্ত্ত-সেবায় নিযুক্ত হইলেও তাহা যেন সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মত প্রতিভাত হইয়াছিল। প্রথমে ডিব্রুগড় অঞ্চলে বন্যার সংবাদ পাওয়া-গেল, সেখানে সেবক পাঠাইতে প্রস্তুত হইয়া ডিব্রুগড়ের শ্রীযুক্ত রায় পরশুরাম খাউন্দ বাহাদুরকে লিখিলে তিনি জানাইলেন যে, "জল কমিয়া গিয়াছে, সেবক প্রেরণের প্রয়োজন নাই;" তৎপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া চাঁদপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ভীষণ বন্যার সংবাদ পাইয়া সেই সব স্থানে কয়েকজন সেবক পাঠান হয়; সেবকগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কার্য্যারম্ভ করেন; তৎপর শ্রীহট্টে সেবকের অভাব শুনিয়া তাহারা আসিয়া শ্রীহট্টের নিকট-বর্ত্তী স্থানে কার্য্য করিতে থাকেন; আর কেহ বা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে সাহায্যের জন্য ভিক্ষায় বহির্গত হন। এদিকে যোরহাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল, সুতরাং আমরা এইদিকের কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইলাম। যোরহাটে সাহায্যসমিতি গঠিত হইল এবং তাহাদের সহিত পরামর্শ করতঃ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রমুখ সেবকগণ "খাটোয়াল" গ্রামে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া স্থানীয় তদন্ত ও চাউল বিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন; প্রায় দুইমাস কাল ঐ কেন্দ্রে কার্য্য করার পর অবস্থা কিছু বিশেষ হওয়ায় বর্ত্তমানে কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় সকল স্থানের সেবকগণই দুর্ভিক্ষের কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন। "খাটোয়াল" কেন্দ্রে বার খানা গ্রামে প্রায়১০০/মণ চাউল বিতরিত হইয়াছে। স্থানীয় সাহায্য সমিতির কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সদাশয় সরকার বাহাদুর নিরন্ন কৃষকগণকে বিতরণের জন্য যোরহাট সর্ব্ব-জনিক সভার ও সাহায্যসমিতির সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত কুলধর চলিহা মহাশয়ের মারফত ২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন—ঐ টাকার অধিকাংশ দ্বারা চাউল খরিদ করতঃ আশ্রম-সেবকগণ আর্ত্তসেবায় বিতরণ করিয়াছেন।

নিবেদন।

শিক্ষাবিভ্রাটের জন্যই আজ হিন্দুসমাজ উদ্ভ্রান্ত, নরনারিগণ স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া বিপথগামী। গৃহে গৃহে রোগ, শোক দারিদ্র্য ও অশান্তি বিরাজ করিতেছে। তাই ভগবানের অপার করুণার উপর নির্ভর করিয়া অনাথ সেবার কার্য্যে ব্রতী হওয়া গিয়াছে। একদিকে অনাথ ও অনাথাগণ আশ্রয় ও আহার পাইবে—রোগিগণ ঔষধ পথ্য পাইবে। বালক বালিকাগণকে যথারীতি শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। ইহারা শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া পরের গলগ্রহ না হইয়া নিজেই উদর পোষণ করিতে ও অন্যকে সাহায্য করিতে পারিবে। সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় থাকিয়া ইহ-পরকালে শান্তির অধিকারী হইবে। আত্মবৎ জগৎসেবার, কিম্বা শিবভাবে জীব-সেবার মহিমা জগতে বিঘোষিত হইবে। ইহাই আমাদে উদ্দেশ্য ও আশা। ভগবান্ আমাদের সহায় হইয়া বাহুতে শক্তি—হৃদয়ে ভক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিশুদ্ধ করুন। সেবা-সহায়ে চিত্তশুদ্ধি-প্রয়াসী সর্ব্বভূতে শিব দর্শনা-

ভিখারী, কৌপীন মাত্রেক সম্বল, আশ্রমের নগণ্য সেবক আমরা; তাই ইহার উন্নতি ও স্থিতি দেশের ধর্ম্মপ্রাণ, সংকার্য্যের সহায় ও সদনুষ্ঠানের সহায়দাতাগণের কৃপার উপর ন্যস্ত করিলাম। আমরা দেশ-জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অন্ধ, আতুর, বিপন্নগণের সেবা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। আশা করি, দেশের মহাসুভবগণ আমাদিগকে পরিচালিত করিয়া আরব্ধ সংকার্য্য সম্পাদনে যত্নবান্ হউন। কত অর্থ অনর্থ ব্যয় হইতেছে, তাহার সামান্য অংশ দান করিলে অনেক বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারও সংসাধিত হইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে—

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

বার্ষিক উৎসব—গত ২২শে বৈশাখ অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে ভগবান শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের আসাম প্রদেশীয় সারস্বত-মঠান্তর্গত অত্র শান্তি-আশ্রমের ৯ম বার্ষিক মহোৎসব যথারিতী সম্পন্ন হইয়াছে; তদুপলক্ষে ২২শে হইতে ২৪শে বৈশাখ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরু ব্রহ্মের বিশেষ পূজা, হোম গীতা, চণ্ডী, স্তোত্রাদি পাঠ এবং নাম যজ্ঞাদি বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় যোরহাটের প্রবাসী বাঙ্গালী ও স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পূজা, হোম ও যজ্ঞান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ নির্ম্মাল্য ও যজ্ঞীয় ফোটা ধারণ করেন; পরে ফল, মূল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন ও মিঠাই আদি প্রসাদ বিতরিত হয়, শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের আশ্রিত অনাথ নারায়ণগণেরও নব বস্ত্রাদি দানে সেবা পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে যোরহাট রেলওয়ের সহৃদয় ট্রাফিক্ ম্যানেজার বাহাদুর সকল গাড়ীগুলিই শান্তি-আশ্রম ষ্টেশনে দাঁড়াইবার অনুমতি দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীশঙ্করোৎসব—গত ২৪শে বৈশাখ ভগবান শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে আসাম প্রদেশের অত্র সারস্বত-মঠে ঐ দিবস যথারিতী জন্মোৎসব হইয়াছে। ভগবান শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পূজা, হোম, আরত্রিক হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্র ও উপদেশ মঠের সন্ন্যাসিগণের দ্বারা আলোচিত হইয়াছিল।

শ্রীবুদ্ধোৎসব—গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার বৈশাখী পূর্ণিমাতে ভগবান শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি ও মহানির্ব্বাণের দিনে তাঁহার পূজা, আরতি ও উপদেশাবলী আলোচনা করা হইয়াছিল।

—:0:—

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, } আষাঢ়। { ৩য় সংখ্যা

দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ।

নিতান্ত উন্মাদ ভিন্ন কার্য্যতঃ কেহই অদ্বৈত-বাদী হইতে পারে না। কোন মূঢ় ভোজন, শয়ন, উপবেশন বা ধ্যান করিয়া মনে করিবে যে, এখন জগতের সকলেই ভোজন, শয়ন, উপবেশন বা ধ্যান করিতেছে! যদি কোন ব্যক্তি পিতার পীঠে বসিয়া ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেইস্থানে তখন তাহার পিতা ভোজনার্থ আসেন, তখন কি সে বলিবে "পিতঃ! আপনি ত আহার করিতেছেনই, আপনার আর আহারার্থে এই পীঠে বসিতে হইবে না; যেহেতু আপনি ও আমি উভয়েই এক।" এ কথা কি সে বলিবে? আর বলিলেই তাহার পিতা তাহা শুনিবেন, না উন্মাদ ভাবিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বতন্ত্র পীঠে আপনিও ভোজন করিতে বসিবেন! যদি কোনস্থানে এ প্রকার ঘটনা দেখা যায় যে, পুত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিতেছে, সেই সময়ে তাহার পিতাও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন, "আমাকেই অন্ন দেও।" তাহার কথা মতে তাঁহাকে অন্ন দেওয়া হইল, তিনি ভোজনান্তর পুত্রকে বলিলেন, "তোমার ত ক্ষুধা নিবারিত হইয়াছে, যেহেতু তুমি ও আমি এক; এখন চল স্থানান্তরে যাই।" তাহা হইলে লোকে কি উক্ত পিতাকে উন্মাদ বলিবে না? যদি কেহ বলে যে, আমি ও পরমেশ্বর এক; কিন্তু অন্য গ্রামে এখন কি হইতেছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না বা একটা জীব সৃষ্টি করিতে বলিলে তাহা পারে না; তখন কি সে বাতুল বলিয়া স্থির হয় না? সে বলিল যে, আমি ও পরমেশ্বর এক; কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বত্যাগী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান এবং আনন্দময়; আর সে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, অন্য গ্রামে কি হইতেছে তাহাই বলিতে পারে না,—আনন্দময় হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ে সামান্য কারণে শোকে বা বেদনাদিতে কাতর

হইয়া মুহুর্ম্মুহু অশ্রুপাতকরতঃ রোদন করিতে থাকে। অতএব সে আর ঈশ্বর যে এক, ইহা অপেক্ষা অধিক অসঙ্গত কথা আর কি হইতে পারে? সে বলে যে "আমি ও ঈশ্বর এক," কিন্তু চন্দ্রলোকে কি আছে, তাহা বলিতে পারে না; সে বলে "আমি ও ঈশ্বর এক," কিন্তু একটী ক্ষুদ্র জীবও সৃষ্টি করিতে পারে না।

সে বলে যে "সে ও ঈশ্বর এক" কিন্তু কল্য কি খাইবে, তাহার চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়; সে বলে যে "সে ও ঈশ্বর এক" কিন্তু পুত্রশোকে অধীর হইয়া দীন হীন ব্যক্তির মত বিলাপ করিতে থাকে; সে বলে যে, "সে ও ঈশ্বর এক"; কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য দ্বারা যে আক্রান্ত হয়,—রোগে কাতর হয়,—শোকে অধীর হয়,—চিন্তায় চিন্তিত হয়,—ভয়ে ভীত হয়,—ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়; সংক্ষেপতঃ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপ-ত্রয়ে তাপিত হয়, এ কেমন কথা! যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, তাহার এত প্রকার দুর্দ্দশা ঘটে কেন? যদি কোন চোর বলে যে, "আমি অমুকের বাড়ী চুরি করি নাই, যেহেতু আমি ও যাহার বাটীতে চুরী হওয়ার কথা হইতেছে সে, এই উভয়ে এক; অতএব আমি আর আমার বাটীতে কি প্রকারে চুরি করিতে পারি? তাহা হইলে কি সে রাজদ্বারে নিষ্কৃতি পাইবে? যদি কোন নরঘাতক বলে যে, "আমি কাহাকেও হত্যা করি নাই," তাহা হইলে রাজা কি তাহাকে নির্দ্দোষ বলিবেন? যদি কোন প্রবঞ্চক অন্যের স্বত্বাপহারক, প্রহারক, মিথ্যাবাদী, অলীক নিন্দাপ্রচারক, বিশ্বাসঘাতক, পরদারগামী, পরদ্রব্য লুণ্ঠনকারী অদ্বৈতবাদের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলে, তাহা হইলে তাহারা কি রাজদ্বারে বা সমাজে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইবে? অদ্বৈতবাদের দোহাই দিয়া তাহারা কি ধর্ম্মযাজকের নিকট পারলৌকিক নিষ্কৃতির কথা শুনিবে? যদি কোন ছাত্র বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পাঠ বলিতে না পারে, আর শিক্ষক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া বলে যে, আমি ও আপনি এক; সুতরাং আপনার পাঠ জানা থাকিলে, আমারও জানা থাকে; অতএব আমি তিরস্কৃত হইতে পারি না। এইপ্রকারে যদি ভৃত্য প্রভুকে অমান্য করিয়া,—অমাত্য রাজার আদেশ না শুনিয়া,—প্রজা রাজাকে না মানিয়া,—পুত্র পিতার অবাধ্য হইয়া,—স্ত্রী স্বামীর অপ্রিয়কারিণী হইয়া বলে যে, আমরা কোন দোষ করি নাই, তাহা হইলে তাহারা কি বাতুল বলিয়া পরিচিত হইবে না?

অদ্বৈতবাদী বলেন যে, জগৎ মায়া; সুতরাং এস্থলেও অদ্বৈতবাদ কার্য্যে পরিণত হইলে হাস্যাস্পদ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। যদি কোন ব্যক্তি সম্মুখে শকট দেখিয়া না সরে,—জ্বলন্ত অনলে হস্ত দিতে যায়,—ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু আসিলে না পলায়,—গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহা হইতে বাহির না হয়,—শিলা বৃষ্টির সময় গৃহ হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে সে বাহ্য বস্তুকে মায়া বলিল বলিয়াই কি শকট তাহার গায়ে লাগিবে না,—জ্বলন্ত অনলে কি তাহার হস্ত পুড়িবে না;—ব্যাঘ্রাদি তাহাকে কি সংহার করিবে না,—দাহ্যমান গৃহ হইতে নির্গত না হইলে সে কি পুড়িয়া যাইবে না,—শিলা-

বৃষ্টির সময় বাহির হইলে কি সে শিলার আঘাত পাইবে না ? এই প্রকার আর আর কর্ম্ম করিলে, সে কি তাহার ফলভোগ করিবে না ? এক মায়াবাদী এক শকট আসিতে দেখিয়া সরিয়া গেলেন, আর এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি জগৎকে মায়া মনে করেন, তবে শকট দেখিয়া সরিয়া গেলেন কেন ?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আমাকে যে শকট দেখিয়া সরিয়া যাইতে দেখিলেন, ইহাও এক মায়া।" কথার ছল, যাহাই হউক, তিনি না সরিলে তাঁহাকে যে ঐ শকটের আঘাত পাইতে হইত, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? অতএব ব্যবহারতঃ যে সকল বস্তু আমরা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহাদিগকে মায়া বলিলে কেবল তাহা বলা মাত্রই সার হয়।

অতএব কি নৈতিক বিষয়ে, কি সামান্য কার্য্যে, কি বাহ্য বস্তুতে, সকল স্থলেই আমরা সকলেই দ্বৈতবাদীর মত কার্য্য করি, তবে যদি কেহ বলেন যে, ব্যবহারতঃ আমরা সকলেই দ্বৈতবাদী বটি ; কিন্তু তত্ত্বতঃ অদ্বৈতবাদই প্রকৃত বাদ। যেহেতু যেমন স্বর্ণ হইতে কুণ্ডল হয়, মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, সেই-প্রকার ব্রহ্ম হইতে জীব হয়। আর যেমন স্বর্ণজাত কুণ্ডলও স্বর্ণ এবং মৃত্তিকাজাত ঘটও মৃত্তিকা, তেমনি ব্রহ্মজাত জীবও ব্রহ্ম। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, কুণ্ডল ঘুরাইলেই যেমন সকল স্বর্ণ ঘুরাণ হয় না, ঘট ঘুরাই-লেই যেমন সকল মৃত্তিকা ঘুরাণ হয়, না, সেইরূপ ব্রহ্মজাত জীব অল্পজ্ঞাদি হইলে, ব্রহ্মও অল্পজ্ঞাদি হয় না। আর যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটজাত হইলেও মৃত্তিকাও ঘটের মত দগ্ধীভূত হয় না এবং স্বর্ণ হইতে কুণ্ডল-জাত হইলেও স্বর্ণমাত্রই দগ্ধ ও কুণ্ডলাকারে পরিণত হয় না, সেইরূপ জীব ব্রহ্ম হইতে জাত হইলেও, সে ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় নহে। অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও, সে ব্রহ্মে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতে পারে না। যতকাল জীবের জীবত্ব থাকিবে, ততদিন আর সে আপনাকে ব্রহ্ম বলিতে পারিবে না। তবে ব্রহ্ম চৈতন্যময়, জীবও চৈতন্যময়; সুতরাং চৈতন্যাংশে উভয়ে এক-প্রকার, ইহা স্বীকার্য্য বটে। কোন জীব এক সময়ে কোন সুকৃতি বা দুষ্কৃতি করিলে, অন্য সময়ে যেমন তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে; সেই প্রকার সেই জীব এলোকে কোন সুকৃতি বা দুষ্কৃতি করিলে পরলোকে তাহার ফলভোগ করিবে। অতএব সকল স্থলেই কার্য্যতঃ আমাদিগকে দ্বৈতবাদী হইতে হয়। কেহ রাজা না হইয়াই, যদি মনে করে যে, আমি রাজা হইয়াছি, সেও যে প্রকার কথা বলে, ব্রহ্ম না হইয়াই যে জীব আপনাকে ব্রহ্ম বা সোঽহং বলে, সেও সেই প্রকার কথা বলে। ব্রহ্ম না হওয়া পর্য্যন্ত সকলকেই যখন জীবের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে জীবের জীবত্ব থাকা পর্য্যন্ত কেহই অদ্বৈতবাদী হইতে পারে না। তবে এক অংশে মনুষ্য অদ্বৈতবাদী হইতে পারে : ব্রহ্ম হইতে যখন জীব উৎপন্ন হইয়াছে, তখন সে যে ব্রহ্মের এক প্রকার অংশ, ইহা বলা যাইতে পারে। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইলেই যে, উভয় বস্তুই এক হইবে,

ইহার কোন ব্যবহারিক প্রমাণ নাই। পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই কি সে বলিতে পারে যে, আমি ও আমার পিতা উভয়েই এক? যদি রাম ও তাহার পুত্র কুশ উভয়েই এক হন, তবে তাঁহাদের মধ্যে আবার পার্থক্য থাকে কেন? তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কি প্রকারে যুদ্ধ ঘটিল এবং একের শয়ন, ভোজন, উপবেশনাদিতে অন্যের শয়ন, ভোজন, উপবেশনাদি সম্পন্ন হইল না কেন? এই প্রকারে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীবও ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হইতে পারে না? স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন কুণ্ডল যেমন স্বর্ণ নহে, এবং মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটও যেমন কেবল মৃত্তিকা নহে, কিন্তু যথাক্রমে কুণ্ডলাকারে আকারিত স্বর্ণ এবং ঘটাকারে আকারিত মৃত্তিকা, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে উৎপন্ন জীবচৈতন্যও কেবল ব্রহ্মচৈতন্য নহে; কিন্তু জীবচৈতন্যের অবস্থা-প্রাপ্ত ব্রহ্মচৈতন্য। চৈতন্যাংশে উভয়েই এক বটে; কিন্তু ব্রহ্মত্ব ও জীবত্ব এই দুই বিষয়ে উভয়ে ভিন্ন।

মূঢ় লোকদিগের ভ্রম নিবারণার্থেই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।* জগৎপূজ্য মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ অতীব উচ্চ দার্শনিক বিষয়। তিনি জীবাত্মার স্বভাব ও পরমাত্মার স্বভাব এই দুইটী আলোচনা করিয়াই উভয়েই এক প্রকার পদার্থ ইহাই বলিয়াছেন। বাস্তবিক জীবাত্মাও যখন আত্মা, পরমাত্মাও আত্মা, তখন উভয়েরই সাধারণ আত্মত্ব আছে। তবে জীব ও পরম এই দুইটীতেই ভিন্নত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে মায়াযুক্ত আত্মা জীব ও মায়ামুক্ত আত্মা শিব। এইমত হিন্দুশাস্ত্রেই অত্যন্ত প্রবল। মহামান্য শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম ও জীবের সেব্য সেবকভাবও অতি প্রবলভাবে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহারা জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে অসমর্থ, তাহারা প্রতিমাদি পূজা করিতে পারে। শাস্ত্রও অসমর্থের পক্ষে প্রতিমা পূজার বিধি দিয়াছেন। পরমেশ্বর স্বরূপতঃ অচিন্ত্য ও অব্যক্ত ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মত। হিন্দুশাস্ত্র কেবল এই পর্য্যন্ত বলেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, আনন্দময়, মঙ্গলময়, বিশ্বনিয়ন্তা ও আদিকারণ; আর জীব অণু, অল্পজ্ঞ, সুখদুঃখভোগী, বিশ্বাধীন ও সৃষ্ট। সুতরাং ঈশ্বর ও জীব স্বভাবতঃই ভিন্ন।

৺কিশোরীলাল রায়।

*আমরাও এইজন্য প্রবন্ধটী প্রকাশিত করিলাম। নতুবা "আর্য্য-দর্পণের" স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গ্রাহকমাত্রেই প্রকৃত দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ কাহাকে বলে অবগত আছেন। দেহ বা দৈহিক ধর্ম্মের বিচারের নাম দ্বৈতাদ্বৈত বিচার নহে। এই অর্ব্বাচীনযুগে অধ্যাত্ম দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বিচার কিরূপে সাধারণের বুদ্ধিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহারই উদাহরণ স্বরূপ এই প্রবন্ধটী "আর্য্যদর্পণে" স্থান পাইয়াছে। যাহারা কেবলশাস্ত্র পাঠ করিয়া দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে যান, তাঁহারা নিশ্চয়ই দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদানুসারে সাধন করিতে করিতে যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখন দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না। লেখকের মত সাধকাবস্থায় যাহারা ঈশ্বর ও জীব স্বভাবতঃই ভিন্ন বলিয়া জানেন, সমাধি অবস্থায় তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বর ও জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ব্যবহারিক পদার্থে ব্যবহার্য্য নহে। আত্মার দ্বৈতবুদ্ধিই ভ্রান্তি; কারণ বেদের মূল মন্ত্র "একমেবাদ্বিতীয়ং"। সেই আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়; সুতরাং অদ্বৈত বৈদিক মত সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ। আঃ দঃ সঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম।

(পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

কার্য্য করিতে হইলে অর্থবল ও লোকবল চাই; সেবকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগুরুদেবের গৃহস্থ শিষ্যগণ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন এবং সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ দেহ-মন-প্রাণ দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করেন। আমাদের গুরুদেবের সর্ব্বপ্রকারের আয় সেবাকার্য্যে ব্যয়িত হয়। তদ্ভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তিগণেরও সাহায্য পাইয়া থাকি। এই সকল কারণে উৎসাহিত হইয়া ভগবানের অপার করুণার উপর নির্ভর করতঃ বিগত পাঁচবৎসর যাবৎ যথাসাধ্য সেবা-কার্য্য করিয়া আসিতেছি।

এক্ষণে স্থানীয় শিক্ষিত সজ্জনগণের নিকট নিবেদন এই যে, আপনারা আমাদের সহিত যোগদান করতঃ দেশের অভাবাদি আমাদিগকে অবগত করাইবেন এবং পরামর্শদ্বারা আমাদিগকে পরিচালিত করিবেন। আশাকরি, এক্ষণে আপনারা আমাদিগকে পর না ভাবিয়া আপনাদের "দেশের সেবক" ও হিতৈষী মনে করিবেন এবং আমাদের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইবেন।

অত্র সেবাশ্রমের নিকটবর্ত্তী "শান্তি-আশ্রম" নামক যোরহাট ষ্টেট্ রেলের (Jorhat State Railway) ষ্টেশনটী হঠাৎ উঠিয়া যাওয়ায় আশ্রমবাসিগণের এবং সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের পক্ষে বড়ই অসুবিধা হইয়াছে; ঐ ষ্টেশন হইতে আশ্রম পর্য্যন্ত একটী রাস্তা তৈয়ার করার বন্দোবস্ত হইতেছিল; এমন কি, সেইজন্য অনেকে নিজ নিজ ভূমি পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু সহসা ষ্টেশনটী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সমস্ত সংকল্পই ব্যর্থ হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত ষ্টেশন ও রাস্তাটীর অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে; অশাকরি স্থানীয় সর্ব্বসাধারণ এই অভাব দুইটী দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আর চেষ্টা করিলে উহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

এক্ষণে বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া সর্ব্ব ভূতের মঙ্গল কামনাকরতঃ উপসংহার করিলাম।

"মাতাচ পার্ব্বতীদেবী পিতা দেব মহেশ্বরো।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্॥"

ওঁ! শান্তি! শান্তি! শান্তি! হরি ওঁ॥

জিজ্ঞাসা।

(সেদিন) স্বপনের মাঝে, হেরিলাম তব
স্নিগ্ধ মুরতি খানি।
যেন সুবিমল শারদ আকাশে
উদিত ফুল্ল শারদমণি॥

হেরিয়ে তোমার ও রূপ মাধুরী
পুলকে ভরিল প্রাণ।
(কি জানি কি) ভাবের আবেশে বিভোর হইনু
হারাইনু "আমি"-জ্ঞান॥

তব সুগঠিত সুকোমল কায়ে
মিশিল আমার কায়।
যেন মধুমাসে নবঘন মাঝে
হাসিয়ে বিজলী লুকায়॥
সেইদিন হ'তে জীবন কুঞ্জে-
ধরিল কোকিলা মধুর তান।
সুপ্ত হৃদয় জাগায়ে দিয়ে ছুটিল তরঙ্গ
আনন্দে ভাসায়ে প্রাণ॥

বল বল ও গো প্রাণের দেবতা
হেন শুভদিন কবে বা হবে?
(যেদিন) আমার "আমিত্ব" তোমাতে মিশায়ে
তোমাতে বিলীন হবে।

দীন—কৃষ্ণদাস।

—:0:—

মহাপ্রভু অনন্ত।

জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিবশতঃ বিগত ১৩২১ সালের চৈত্র মাসে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা ও সাধু মহাসম্মিলনী দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একমাসের অধিককাল নানা সম্প্রদায়ের সাধুগণের সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। একদিন আমরা গোরক্ষনাথী সম্প্রদায়ের সুবৃহৎ সাধুদরবারে বাবা গম্ভীরানাথকে দর্শন করিতে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম যে, গোরক্ষপুরে একজন সিদ্ধমহাপুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার বয়স প্রায় দুইশত হইবে। অতি বৃদ্ধ বলিয়াই তিনি কুম্ভে আসিতে পারেন নাই। কি জানি কেন—সেই অবধি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া পড়ে। কুম্ভ অন্তে গুরুমহারাজ শ্রীমৎ পরমাত্মানন্দ পরমহংসদেব হায়দ্রাবাদ গমন করেন; আমাদিগকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। অনন্তর নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বে গুরু-দোয়ারে—শ্রীশ্রীকাশীধামের নিরঞ্জনী মঠে—প্রত্যাগমন করি। কাশী আসিয়াই সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য গোরক্ষপুর যাইতে তীব্র বাসনা জন্মিল। যথাসময়ে গুরুমহারাজের অনুমতি লইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

গত অগ্রহায়ণ মাসে শুভ অবসর পাইলাম। একদল পশ্চিমোত্তর নিবাসী সাধু গোরক্ষপুর যাইতেছেন শুনিয়া, আমিও তাঁহাদের সঙ্গী হইলাম। বেনারস-ছাউনী ষ্টেশনে গাড়ীতে চাপিয়া ভাট্‌নি হইয়া যথাসময়ে গোরক্ষপুর পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া জানিতে পারিলাম যে, উক্ত মহাপুরুষের নাম অনন্ত মহাপ্রভু; গোরক্ষপুর হইতে কিছু দূরে বরহজ নামক স্থানে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। আমি আরও তিনজন সাধুর সহ বরহজ গ্রামে উপস্থিত হইয়া একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলাম। ব্রাহ্মণ পরম যত্নে আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমরা আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া সাধু সন্দর্শন মানসে রওনা হইলাম। গ্রামের প্রান্তভাগে একটী আম্রবাগানের মধ্যে মহাপ্রভু অনন্ত অবস্থিতি করেন। বাগানের

মধ্যে তিন চারিখানা খোলার ঘর—একটী আম্র বৃক্ষের গোঁড়া পাকা বাঁধানে, সাধু তাহারই উপরে বেলা ৮টা হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত এক ভাবে বসিয়া থাকেন। এই সময় সাধারণ লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। অন্য সময় তিনি ছোট একখানি খোলার ঘরে নিজ আসনে অবস্থিতি করেন, সে সময় কেহ তাঁহার দর্শন পান না। অন্য ঘরগুলি তাঁহার ভক্ত-সেবকগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। প্রত্যহ দূর দূরান্তর হইতে শত শত ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। তিনি আর এখন কাহাকেও কোন শিক্ষা বা উপদেশ দেন না। একটু হাসিয়া সকলকে "আনন্দে রহ" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন মাত্র।

আমরা যখন আশ্রমে উপনীত হইলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বহু-লোক চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও দুই তিন শত লোক নীরবে বসিয়া সাধু-দর্শন করিতেছে। আমরা আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, তিনি বেদীর উপর বজ্রাসনে বসিয়া আছেন। পরিধানে লেংটী মাত্র; কিন্তু গায়ে একখানি উৎকৃষ্ট জালালপুরি ধোসা জড়ান। কণ্ঠে তুলসী-কাষ্ঠের বড় বড় মালা এবং ফুলের মালা রহিয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মত তিলক ও চিহ্নাদি বর্ত্তমান। চুলগুলা চূড়ার আকারে মস্তকের সম্মুখে বাধা এবং তাহাতে ফুলের মালা জড়ান। দেহ ক্ষীণ হইয়াছে বটে, কিন্তু লাবণ্যশূন্য নহে। মুখে বালকের ন্যায় মধুর-হাস্য বিরাজিত; দৃষ্টি স্নেহ-করুণা-মাখা; মহাপুরুষকে দর্শন মাত্রে যেন হৃদয়ে আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলাম। তিনি সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আমি কি শান্তি! কি আনন্দ! পাইলাম তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিব? শেষে কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিলাম।

তিনি সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমরা একটু দূরে সরিয়া বসিয়া পড়িলাম। তাঁহাকে দেখিয়া ৬০।৬২ বৎসরের অধিক বয়স বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যায় না। একটু পরেই সন্ধ্যা হইল; তাঁহার ভক্তবৃন্দ ধূপ দীপ লইয়া তাঁহাকে আরতি করিলেন। চারিদিক আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। জীবন্ত বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা কৃত-কৃতার্থ হইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মহাপুরুষ সাধারণকে বিনীত-ভাবে জানাইয়া নিজ আসনে চলিয়া গেলেন। তাঁহার জনৈক ভক্ত উপস্থিত ব্যক্তিগণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ বিতরণ করিলেন। আমরাও গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বরহজ গ্রামে আমরা তিন দিন অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা মহাপুরুষের সঙ্গলাভ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া যথাসময়ে কাশীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও সাধন সম্বন্ধে আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

পুণ্যভূমি অযোধ্যা প্রদেশে লক্ষ্ণৌ নগর; এই নগরের সওয়াদতগঞ্জ মহল্লায় শিবনন্দন বাজপেয়ী নামক এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনীর নাম বলিরাজ কুঁওরি। কাণপুরে রাই ও ঘৃতের কারবার

করিয়া শিবনন্দন প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম বয়সে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় ঐশ্বর্য্যে তাঁহারা সুখী হইতে পারেন নাই। শিবনন্দনের ভক্তিমতি ভার্য্যা স্বামীর বংশরক্ষা হইল না ভাবিয়া সর্ব্বদা ম্রিয়মানা থাকিতেন। নিয়ত নারায়ণের নিকট প্রার্থনা এবং ভোগবিলাসে মন না দিয়া ব্রত নিয়ম ও উপবাসে কালযাপন করিতেন। কিছুদিন পরে ভগবান সতীর মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন; তিনি গর্ভবতী হইলেন। যথা সময়ে অনন্ত মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিলেন: ব্রাহ্মণ-দম্পতীর আনন্দের সীমা নাই; তাঁহারা দুই হাতে দীন দরিদ্রকে অর্থ বিতরণ করিলেন। অনন্ত ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই।

পুত্র ও পত্নী লইয়া শিবনন্দনের মহাসুখে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না;—দিনের পর রাত্রি,—সৃষ্টির পর প্রলয়,—জন্মের পর মৃত্যুর ন্যায় সম্পদের পর বিপদও অবশ্যম্ভাবী। এই সুখের সময়ে শিবনন্দনের শত্রু বৃদ্ধি হইল; অকারণে তাঁহার জ্ঞাতিগণ শত্রুতাসাধন করিতে লাগিল। নানাপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াও তাহারা নিরস্ত হইল না; একদিন গোপনে শিবনন্দনকে হত্যা করিল। ঘাতক অনন্তকেও হত্যা করিতে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু অন্ধকারে তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় বিধাতার কৃপায় বালকের জীবন রক্ষা হইল। অনন্তের জননী পুত্রকে লইয়া কাণপুরে পলায়ন করিলেন এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অনন্ত যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তিনি জ্ঞাতিগণের শত্রুতা ও পিতার হত্যার কথা অবগত হইয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে প্রতিহিংসা-বৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি তন্ত্রোক্ত ক্রূর কর্ম্মের সাহায্যে শত্রু-বিনাশের সংকল্প করিলেন। এই সময়ে শত্রুগণের চক্রান্তে তাঁহাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য মোহকম্ সিংহের কয়েদ হইল। এই ঘটনায় তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। নানাস্থানে ঘুরিয়া নানাপ্রকার তান্ত্রিক সাধকের শরণাপন্ন হইলেন, কত অর্থ ব্যয় করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না, সকল পরিশ্রম পণ্ড হইল। তাঁহার বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ভৃত্য জেল হইতে ফিরিলে, বাঙ্গালা দেশে বড় বড় তান্ত্রিক সাধক আছে জানিতে পারিয়া, তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। কলিকাতা আসিয়াও কোন সুবিধা হইল না দেখিয়া, তিনি বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া কামাখ্যা যাত্রা করিলেন। পথে শ্রীহট্ট জেলার বালাগঞ্জে এক বৈষ্ণব সাধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সাধুর উপদেশে তাঁহার পূর্ব্ব সংকল্প পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি শত্রু মিত্র ভুলিয়া ভগবানের প্রেমে মজিয়া পড়িলেন। অনন্তের প্রাণ অনন্তের দিকে উধাও হইল। তিনি সেই বৈষ্ণব সাধুর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন, আত্মমুক্তি ও জগতের কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। সাধুসংসর্গে অনন্ত আজ সাধু হইয়া গেলেন।

অনন্ত গুরুদেবের অনুমতি লইয়া প্রথমতঃ নবলশা নামক পর্ব্বতে গমন করিয়া তিনি বৎসর কাল যোগাভ্যাস করেন। তৎপরে

নানাস্থান ঘুরিয়া চন্দননগরে উপস্থিত হইয়া তথায় এক বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলেন। তথা হইতে কাশীধামে যাইয়া নয় বৎসর অবস্থিতি করেন। এইসময়ে ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ও নানাবিধ ভক্তি-শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন। নানা সম্প্রদায়ের সাধুসঙ্গ করিতেও বিরত হন নাই।

কাশী হইতে অনন্তদেব টিকারী গমন করিলে, টিকারীর মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত আদর ও সম্মান করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করিতে গুজরাটে গিয়াছিলেন। পরে জগন্নাথধাম ও দাক্ষিণাত্যের নানা তীর্থ ভ্রমন করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপনীত হন। তথা হইতে দক্ষিন ও মধ্যভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি পর্য্যটন করিয়া অনন্তপ্রভু কাশ্মীরে গমন করেন। কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া তিনি বিশ বৎসর পাতিয়ালার নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতে এবং দশ বৎসর লুধিয়ানা নগরের সমীপে অন্য একটী পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি সর্ব্বদা সাধনভজনে বা ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিতেন। সর্ব্বদা যোগমগ্ন থাকিতেন। এইসময়েই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। অনন্ত মহাপ্রভু প্রথমতঃ বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু এখন হইতে তিনি বিধি-নিষেধ রহিত স্থিতি কো পহুঁছগয়ে হৈ।

অনন্তদেব সিদ্ধিলাভ করিয়া পঞ্জাব হইতে বাহির হইলেন এবং উত্তরাখণ্ডের নানাস্থান ভ্রমন করিতে করিতে নৈমিষারণ্য হইয়া জন্মভূমি-দর্শন মানসে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করেন। তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিয়া অযোধ্যাধামে উপস্থিত হইলেন। অযোধ্যা মোক্ষদায়িকা সপ্ত পুরীর অন্যতম। এখানে সাধু-সন্ন্যাসিদিগের বহু মঠ, মন্দির, আশ্রম ও কুটীর বর্ত্তমান। প্রায় সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণ এখানে অবস্থিত করেন। অনন্ত মহাপ্রভু এখানে আসিবা মাত্র সাধুগণ তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। সাধু-সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সাধুগণ দর্শন করিতে আসিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া থাকিতেন। তিনি সকলের সহিত হাস্যমুখে ধর্ম্মালাপ করিতেন। অতি অল্পদিনেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে দলে দলে সাধু সমাগম হইতে লাগিল। ফুল ফুটিলে যেমন চারিদিক হইতে ভ্রমর আসিয়া জুটে, তদ্রূপ দেশ-দেশান্তর হইতে লোকসকল তাঁহাকে দর্শন করিতে,—ধর্ম্মোপদেশ লাভকরিতে,—দীক্ষাশিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিতে লাগিল। কত রাজা, মহারাজা, তালুকদার তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। কত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গোঁসাই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তিনি সকলকে সমভাবে গ্রহণ করিয়া অধিকারানুরূপ ধর্ম্মামৃত দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শত শত শিষ্যভক্ত ও সেবক জুটিয়া গেল। তাঁহার অবস্থিতি স্থানে প্রত্যহ অসংখ্য লোকের জনতা হইয়া মহা-মহোৎসবে সময় অতিবাহিত হইত।

অযোধ্যার কয়েকটী মঠের মহন্ত অনন্তপ্রভুকে আপন আপন "গদি" ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বিনীতভাবে তাহা অস্বীকার করেন। বাবাজীকে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেই অসাধারণ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মান করিতেন। অতুল

ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তিনি দীনহীন কাঙ্গাল ছিলেন। ধীর, শান্ত, আনন্দময় বাবাজীর পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

অনন্ত মহাপ্রভু দিবসে সমাগত সাধুদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ এবং সাধারণকে উপদেশাদি প্রদান করিতেন; কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভজন কুটীরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিতেন এবং সারারাত্রি আসনে সমাধিস্থ থাকিতেন। এইরূপে অযোধ্যাধামে তাঁহার বহু বৎসর অতিবাহিত হয়। তিনি নানা প্রকারে জীবের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন; দেশ-দেশান্তরে তাঁহার মহিমা প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি একদিন রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া দুইটী প্রিয়তম চেলা মাত্র সঙ্গে লইয়া সহসা অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। পরদিন কেহ তাঁহার কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া অনন্তপ্রভু একদম নেপাল যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় পশুপতিনাথ, মুক্তেশ্বরী, ধুনিয়া পর্ব্বত, সিদ্ধাশ্রম প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে বর্ত্তমান অবস্থিতির স্থান গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত বরহজ গ্রামে উপস্থিত হইয়া একটী বৃক্ষতলে আসন স্থাপন করিলেন। গ্রামবাসী ফল মূলে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; অল্পদিনেই তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া সকলে চিনিতে পারিল। এখানেও বহু ভক্ত, শিষ্য, চেলা জুটিয়া গেল। ক্রমশঃ বৃক্ষ মূলে কুটীর নির্ম্মিত, চারিদিকে বৃক্ষ রোপিত ও কূপ খনিত হইল। বর্ত্তমানে বৃহৎ দীর্ঘিকা, প্রকাণ্ড বাগান ও বড় বড় খোলার গৃহাদি বাবাজীর প্রভাব এবং গ্রামবাসীর স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও সাধুসেবার সাক্ষ্য দিতেছে।

আজ প্রায় ৩৭ বৎসর যাবৎ মহাপুরুষ এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মুখে কেহ কখন আত্ম-প্রশংসা শুনেন নাই, কার্য্য দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারেও তিনি কাহারও নিকট নিজকে বড় বলিয়া জানান্ না। তিনি কখনও কাহারও নিন্দা করেন না। কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন না; নিজের অথবা জগতের কোন না কোন একটা কল্যাণকর অনুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন। সর্ব্ব জীবে তাঁহার সমান দয়া। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি বৃক্ষলতাদির পর্য্যন্ত দুঃখে তাঁহার সহানুভূতি—অন্যের সমস্ত অবস্থা নিজের বলিয়া অনুভব করেন। কাহারও কখন উদ্বেগের কারণ হন নাই, বা কেহ কখন তাহাদ্বারাও উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় নাই। কেহ কখন তাঁহাকে বিষন্ন, বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট দেখে নাই। বাবাজীর আশ্রমটী যেন ঠিক মুনিঋষিদের তপোবন। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্রই চিত্তটী প্রফুল্ল হইয়া উঠে। সাধন-ভজনের একটা আশ্চর্য্য শক্তি ও গাম্ভীর্য্য আশ্রমে উপস্থিত হওয়া মাত্রই অনুভূত হয়। আর মহাপুরুষের আনন্দঘন হাসিমাখা সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রাণ শীতল হয়, হৃদয়ে শান্তিধারা বহিয়া যায়।

এই মহাত্মা এতদ্দেশে অনন্তমহাপ্রভু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব ও শক্তি সম্বন্ধে ইতর শ্রেণীর লোকের নিকট নানারূপ গল্পও শুনিলাম। তন্মধ্যে বয়স সম্বন্ধে তাহাদের ধারণাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। সকলেই দুই শত হইতে পাঁচশত

বৎসরের মধ্যে বয়স প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইল। আমরা তাহার যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাতে আমাদের অনুমান তাঁহার বয়স এক্ষণে ১৫২ বৎসর হইতে পারে। আজ কাল তাঁহার আহার এক পোয়া দুগ্ধ মাত্র। "আর্য্য-দর্পণের" স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গ্রাহকগণের মধ্যে যাহারা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমন করিতে আসিবেন, তাহারা অবশ্য এই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া যাইবেন। জন্মান্তরে সুকৃতিসঞ্চয় ও গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত মহাপুরুষের দর্শন সৌভাগ্য সচরাচর ঘটে না। তাই, সজ্জন সমীপে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এ সুযোগ কেহ ত্যাগ করিবেন না। কে জানে কোন দিন প্রভু অনন্ত—অনন্তে আত্ম গোপন করিয়া ফেলিবেন। ওঁ তৎসৎ।

দীন—সত্যানন্দ।

—:0:—

স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের উক্তি।

অ—বলে অর্পণা মাকে অর্চ্চ অবিরাম,
অন্তিমে মা অন্নপূর্ণা কোলে দিবে স্থান।

আ—বলে আত্মজ্ঞ হও যাবে যম ভয়,
আত্মা ব্রহ্ম, আত্মা বিষ্ণু, আত্মা বিশ্বময়।

ই—বলে ইহ অমুত্র ফল পরিহরি,
ইন্দ্রিয় সংযম করি ভজ ভাই হরি।

ঈ—বলে ঈশ্বরনিষ্ঠ হও ঈর্ষা ত্যজি,
ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয় জীব ঈশ ভজি।

উ—বলে উমা মায়ের কোথায় উপমা,
উন্নত, উদাসী সদা জপে উমা, উমা।

ঊ—বলে ঊর্দ্ধরেতাঃ ঊর্দ্ধ লোকে যায়,
ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধদেবে চায়।

ঋ—বলে ঋত্বিকগণ ঋক্ বেদ পড়ে,
ঋণমুক্ত ঋষিগণ স্বর্গে বাস করে।

৯—বলে আমার অর্থ মহেন্দ্র মহেশ,
ৠ—বলে আমি রুদ্র ঋষিকেশ।

এ—বলে একান্তে ভজ এলোকেশী মাকে,
এক ব্রহ্ম, এক জন একভাবে ডাকে।

ঐ—বলে ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব পরিহর,
ঐকান্তিক ভক্তিভরে মাকে পূজা কর।

ও—বলে ওঙ্কার নাম জপ অবিরাম,
ওতপ্রোত ভাবে ওঁ বিশ্বে বিদ্যমান।

ঔ—বলে ঔদ্ধত্য ত্যজ মদমত্ত জীব,
ঔদার্য্য, ঔদাস্য গুণে জীব হয় শিব।

ক—কহেন কালী কৃষ্ণ কভু ভিন্ন নয়,
কেহ কালী, কেহ কৃষ্ণ এক ব্রহ্ম কয়।

খ—বলে খেলিতে হরি ভক্তগণ সঙ্গে,
খগেন্দ্রে চড়িয়া নিত্য মর্ত্তে আসে রঙ্গে।

গ—বলে গোবিন্দ ভজ গুরু বাক্য ধর,
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর।

ঘ—বলে ঘুমের ঘোরে জীব অচেতন,
ঘনশ্যাম রাম নাম লয় না এখন।

ঙ—বলে স্মরি জীব শঙ্কর শঙ্করী,
সঙ্কট-সঙ্কুল ভব-নদী দেও পারি।

চ—বলে চৈতন্য দেবে চিত্ত অনিবার,
চিত্তশুদ্ধি হলে চিত্তে দেখা পাবে তাঁর।

ছ—বলে ছিন্নমস্তা মায়ের পূজা কর,
ছয় রিপু জ্ঞান ছুরি মারি জয় কর।

জ—বলে জিতেন্দ্রিয় হয়ে জগজ্জন,
জগদম্বা মার নাম জপ অনুক্ষণ।

ঝ—বলে ঝটিতি ছাড় সংসারের মায়া,
ঝাট চল বৃন্দাবন ঝুলি কাঁথা নিয়া।

ঞ—বলে জ্ঞানিগণ জ্ঞান দীপ জ্বালি,
জ্ঞান চক্ষে বিশ্বময় ব্রহ্ম হেরে খালি।

ট—বলে টাকা কড়ি সাথের সাথী নয়,
টিক্ টিক্ করে ঘড়ী সদা ইহা কয়।

ঠ—বলে ঠাকুরদাদা ঠাকুর পূজা কর,
ঠাকুরালী ছাড়ি এবে ঠিক পথ ধর।

ড—বলে ডাকাত মত ডাক দেখি ভাই,
ডঙ্কা মেরে সবে মিলে মার কোলে যাই।

ঢ—বলে ঢেঁকি যদি স্বর্গ ধামে যায়,
ঢেঁকিশালে যেয়ে তবু ধান ভানে হায়।

ণ—বলে কৃষ্ণ নাম কর জীবগণ,
নামের সহিত নামী ফিরে অনুক্ষণ।

ত—বলে তরী বিনা তরিতে ভব নদী,
তারকব্রহ্ম কৃষ্ণনাম গাও নিরবধি।

থ—বলে থাকে যারা ভুলে ভগবানে,
থর থর কাঁপে তারা শমনের নামে।

দ—বলে দয়াময় দীনে কর দয়া,
দিব্য চক্ষু দেও, দেখি, তব দিব্য কায়া।

ধ—বলে ধর্ম্মজ্ঞ হও, ধৈর্য্য ধর মন,
ধার্ম্মিকেরা কার ধার ধারে না কখন।

ন—বলে নিস্ত্রৈগুণ্য হও নরগণ,
নানা রঙ্গে ভক্ত সঙ্গে খেলে নারায়ণ।

প—বলে পতিতপাবন বনমালী,
পতিতে পবিত্র কর দিয়ে পদধূলি।

ফ—বলে ফকিরগণ ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়,
ফিকিরের তরে কেন বাড়ী বাড়ী ফের।

ব—বলে বলরাম বিষ্ণু অবতার,
ব্রহ্মপদ লাভ হয় নাম নিলে যার।

ভ—বলে ভগবান ভক্ত প্রাণধন,
ভক্ত সঙ্গে ভগবান ফিরে অনুক্ষণ।

ম—বলে "মা", "মা" বলে কাঁদ ভোলা মন,
মা আসিয়া কোলে নিবে শুনিলে রোদন।

য—বলে যুগে যুগে যোগেশ্বর হরি,
যুগ ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন ভূভার হরি।

র—বলে রাধারমণ জগতের গুরু,
রাখাল বেশ ধরিয়াছে প্রেমকল্পতরু।

ল—বলে লোকনাথ লোক স্থিতি তরে,
লোকালয়ে লোক সঙ্গে লীলাখেলা করে।

ব—বলে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, আর মহেশ্বর,
ব্রহ্ম হতে সমুদ্ভব সগুণ ঈশ্বর।

শ—বলে শমনের কিবা রাখি ভয়,
শক্তির তনয় আমি শঙ্কর তনয়।

ষ—বলে ষড় রিপু কর ভাই জয়,
ষোড়শী মা কোলে স্থান দিবেন নিশ্চয়।

স—বলে সদ্ প্রসঙ্গে স্বর্গবাস হয়,
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সর্ব্ব ঘটে রয়।

হ—বলে হরিভক্ত হরিগুণ গায়,
হরি হর না ভজিলে জন্ম বৃথা যায়।

ক্ষ—বলে ক্ষণজন্মা পুরুষ যাহারা,
ক্ষণ কাল বৃথা কাজে কাটে না তাহারা।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

—:0:—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(২১)

আপত্তির অবয়ব কি অদাহ্য ?

আপত্তির স্বভাব হইতেছে সুন্দরকে অসুন্দর করা, ভালকে মন্দ করা; সুতরাং তাহার স্বধর্ম্ম লইয়া অবশ্যই ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের 'এক' একত্ব বা অভেদত্ব বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন অস্বাভাবিক নহে। এই-জন্যই "পূর্ব্বোক্ত বিচারে" দুইটী আপত্তি গ্রহণ করা যায়। "প্রথম",—ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম শব্দ দ্বয় যখন একার্থবোধক,—অভেদ ও অখণ্ড বস্তু-বিশেষ, আর বাক্য মনের অগোচর সনাতন, অচ্যুত বস্তুই যখন পূর্ণ পরব্রহ্ম-স্বরূপ,—তখন ভূমা নামক পদার্থের স্বরূপও ঐ রূপ। এরূপাবস্থায় বাক্য মনের অগোচর বস্তুর পক্ষে, শ্রুতি মন্ত্রের "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" এই দ্বৈত ভেদমূলক বিশেষণ পদটী নিরর্থক হইয়া পড়ুক,—বা ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক বস্তুর 'এক' একত্ব,—"অর্থাৎ অভেদ ভাব" ভঙ্গ করুক। অভি-প্রায় এই যে,—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি" শব্দের অর্থ হইতেছে, যাহাতে অন্য বা অপর কিছু দর্শন করে না—"অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভাবে যাহাতে জগৎ থাকে না" এবম্বিধ বস্তুই ভূমা স্বরূপ; গতবারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে দর্শন করে না—"অর্থাৎ যে বস্তু দর্শনাদি সর্ব্ব ব্যবহার রহিত" তাহাই ভূমা স্বরূপ;—এইরূপ বাক্য দ্বারাও দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভাবে "যাহাতে জগৎ থাকে না" ঐরূপ অর্থই প্রকাশ পায়। এরূপা-বস্থায়, 'ন'—'অন্যৎ' লইয়া যে "নান্যৎ" পদ সিদ্ধ হয়,—পরন্তু যাহা (অর্থাৎ অন্যৎ বা অপর কিছু ইত্যাদি বাক্য) দ্বৈত ভেদমূলক সংযোগ সহজেই আনিয়া বস্তুর 'এক' একত্ব ভঙ্গ করে,—এবম্বিধ 'অন্যৎ' পদটী অকারণ বা নিরর্থক না হইবে কেন? যে অন্য কিছু দর্শন করে না বাক্য দ্বারা, "কোন কিছু দর্শন করে,"—এইরূপ অর্থ সংযোগ হইয়া ভূমা নামক পদার্থে দ্বিত্বাদি সংযোগ দ্বারা, "ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক" বস্তুর "এক" একত্ব,—অর্থাৎ অভেদ ভাব' ভঙ্গ না করিবে কেন?

"দ্বিতীয়,"—যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না,—এই বাক্য দ্বারা অন্য কোন বস্তু দর্শন স্থলে,—চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা কেবল আত্মা দর্শন করে,—এইরূপ অর্থ সংযোগ হইয়া দৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব,—"অর্থাৎ জগতের বিদ্য-মানতা,—" প্রতিপন্ন না হইবে কেন? বাক্যটী জটিল হইয়া পড়িল;—একটু বিস্তার প্রয়োজন। মনে কর,—নটবর বাবুর পুরোহিত রামতোষণ ভট্টাচার্য্য শিরোমণি মহাশয়, বিষ্ণুমন্দিরে পূজা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইত্যবসরে নটবর বাবু তাহা দেখিতে গিয়া যদ্যপি দেখেন যে,—বিষ্ণু মন্দির শূন্য,—অর্থাৎ সেখানে পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও নাই, আর "শালগ্রাম শিলা" বিষ্ণুঠাকুরও নাই,—তবেই তিনি তৎক্ষণাৎ বলিবেন যে,—"ঐ মন্দিরের ভিতর ত—কিছুই দেখিতে পাইলাম না"। কিন্তু তাঁহার এইরূপ বাক্য দ্বারা, তিনি মন্দিরের চুণ, সুরকি, দেওয়াল,—

বা নিজের শরীর পর্য্যন্ত দেখিতেছেন না,—তাহা নহে ; পরন্ত নিশ্চয়ই তিনি তাহা দেখিতেছেন;-ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । তাঁহার নয়নের সম্মুখে দৃশ্য-অদৃশ্য, সু-কু, সমস্তই উপস্থিত আছে । তথাপি তাঁহার মনের অন্তর্মুখী বৃত্তি,—বা মানসিক প্রবৃত্তির মূল শক্তি, "পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে" দেখিবার জন্য নিবদ্ধ থাকায়, বহির্মুখী বৃত্তির কার্য্যকারিণী শক্তি পরাহত হইয়াছিল অর্থাৎ মন্দিরের চূণ, সুরকি, দেয়াল ইত্যাদি বাহ্য দৃশ্যের বিদ্যমানতা স্বত্বেও, নটবর বাবুর মানসিক বৃত্তি—সে দৃশ্য পরিত্যাগকরতঃ উদ্দেশ্য বিষয় "দৃশ্য পুরোহিত" দর্শনেই প্রবৃত্ত ছিল ।—এইজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন,—"কৈ মন্দিরের ভিতর ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না" । তাই বলিয়া চূণ, সুরকি ইত্যাদি দৃশ্য বস্তুর বিদ্যমানতা লোপ পায় না,—বা বাহ্য দৃশ্যেরও অভাব থাকে না । লোক মধ্যেও ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে । অর্থাৎ গৃহ-মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য বস্তু দেখিতে না পাইলে,—তৎক্ষণাৎ সে বলিবে,—"গৃহ শূন্য, কিছুই দেখিতে পাইলাম না ইত্যাদি" ।

তদ্রূপ—"যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না" এই বাক্যের অর্থ স্থলে,—কোন ঈশ্বরপরায়ণ মহাপুরুষের মানসিক প্রবৃত্তির মূলস্থান যদ্যপি পরমেশ্বরেই নিবদ্ধ থাকে—অর্থাৎ চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা যদ্যপি পরমেশ্বরেই আত্মসমর্পণ করিয়া অবস্থান করে,—তাহা হইলে তিনি বলিবেন যে, "আত্মা ভিন্ন" কৈ অন্য কিছুই ত দর্শন করিলাম না । ইহা দ্বারা (চূণ, সুরকি, দেওয়াল ইত্যাদির বিদ্যমানতা স্বত্বেও যেমন ব্যবহারিক জগতে বলা হয়,—'কৈ মন্দিরের ভিতর কিছুই দেখিতে পাইলাম না';—সেইরূপ) দৃশ্য বস্তু জগতের বিদ্যমানতা লোপ পাইবে কেন ? বা যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, তাহাই সেই ভূমা;—এই বাক্যের সারভাব দ্বারা ভূমাবস্থায় জগতের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইয়া, ভূমা ও বাক্যমনের অতীত পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক বস্তুর 'এক' একত্ব ভঙ্গ না হইবে কেন ?

হাঁ ;—উত্তম আপত্তি । আপত্তি দুইটীর মূল ভিত্তি একই উপাদানে গঠিত ।—অর্থাৎ উভয়াপত্তির মূল উদ্দেশ্য হইতেছে,—ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক পরম বস্তুর 'এক'-একত্ব বা অভেদত্ব ভঙ্গ করা । কিন্তু বীজ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, যেমন সেই বীজ আর অঙ্কুরোৎপাদনে সক্ষম হয় না,—তদ্রূপ বিচার রূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা আপত্তি-দ্বয়ের অবয়ব দগ্ধ হইলে,—বাস্তবিকই ঐ আপত্তি আর কার্য্যকরী হইতে পারে না । এক্ষণে দেখা যা'ক, কি উপায়াবলম্বনে আপত্তি দ্বয়ের অবয়ব দগ্ধ হইয়া,—ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক বস্তুর 'এক' একত্ব বা অভেদত্ব চির অটুট থাকে ।

একটু স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখ,—কেবলমাত্র শ্রুতি মন্ত্রের "নান্যৎ" এই পদটিই উল্লিখিত আপত্তির অবয়ব স্বরূপ হইতেছে । অর্থাৎ 'ন' অন্যৎ লইয়া যে "নান্যৎ" পদ—সেই পদের অন্যৎ (অন্য বা অপর কিছু) এই বাক্যটীই ভূমা নামক বস্তুতে জগৎ ভাব আনিয়া ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের 'এক' একত্ব বিষয়ে অপেক্ষা-বুদ্ধি সংযোগ করিতেছে । তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে,—ভূমা একটী পৃথক

বস্তু,—আর পূর্ণ পরব্রহ্ম একটী পৃথক বস্তু। এইরূপ ভেদোৎপত্তিতে দ্বিত্বোৎপত্তির কারণ হইতেছে। কিন্তু "প্রাথমিক পক্ষে" এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ, অপেক্ষা-বুদ্ধিই ভেদোৎপত্তির কারণ, বা অপেক্ষাবুদ্ধির সংযোগেই দ্বিত্বাদি সমুদ্ভূত হয়। আর যে বুদ্ধি দ্বারা একই বস্তুকে বিভিন্ন আকারে জ্ঞান হয়, পরন্তু যাহা প্রমা জ্ঞান নহে, তাহা-কেই অপেক্ষা-বুদ্ধি বলা হয়। তবেই দেখা গেল যে,—অপেক্ষা-বুদ্ধিই দ্বিত্বাদি উৎপাদিকা বা দ্বিত্বাদি জ্ঞান "অর্থাৎ দুই দুই ভাব" অপেক্ষা-বুদ্ধিজনিত। এই অপেক্ষা-বুদ্ধির নিবৃত্তি হইলে যে ভাব থাকে,—সে ভাব একমেবাদ্বিতীয়ম্।

যদি বল, অপেক্ষা-বুদ্ধিই যে দ্বিত্বাদি উৎপাদিকা, বা দ্বিত্বাদি জ্ঞান যে অপেক্ষাবুদ্ধি-জনিত তাহার প্রমাণ কি? ভালকথা;—একটু প্রণিধান করিয়া দেখ, প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইলে, প্রথমেই সামান্য একত্ব জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই মানস ধর্ম্মের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উদাহরণ স্বরূপ এক খানি "দশ টাকার নোট" ক্ষেত্রে ব্যবহার কর। "দশ টাকার নোট" এই কথা বলিবা-মাত্র সর্ব্ব প্রথমেই এক খণ্ড চিত্রিত কাগজ ও তাহার অবয়ব-জ্ঞান সহজেই আমাদের মনোমধ্যে উদিত হয় কি না? "অবশ্যই হয়,বলিতে হইবে। ইহা আর অস্বীকার করিতে পার না। এই যে দশ টাকার "এক খণ্ড কাগজ রূপ„ একত্ব জ্ঞান, ইহাই সামান্য একত্ব-জ্ঞান মাত্র। আর "দশ টাকার নোট„ এই বিষয়ের সহিত আমাদের মন, বুদ্ধ্যাদি করণগণের বা ইন্দ্রিয়গণের যে প্রাথমিক সন্নিকর্ষ, ইহা—(অর্থাৎ ঐ একত্ব জ্ঞান) তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল বিশেষ। তবেই দেখা গেল যে, প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইলে, সামান্য একত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়;—ইহা অবাস্তব নহে।

অতঃপর একটু অগ্রসর হইয়া দেখ,—দশ টাকার,—বা দশের ঐ একত্ব জ্ঞান, যদ্যপি চিরদিন অচল, অটল ভাবে দৃঢ় থাকে,—তাহা হইলে আর কোন কথাই থাকে না। কিন্তু ঐ একত্ব জ্ঞান ভাঙ্গিতে হইলে, অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করে কি না? বা উহার স্পন্দন আবশ্যক হয় কি না? নিরপেক্ষ-ভাবে বলিলে, বলিতে হয় যে, 'নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে বা আবশ্যক হয়।' যদ্যপি তাহা হয়, তবে সে অপেক্ষনীয় বস্তুটী কি? সে বস্তু অন্য কিছুই নহে,—কেবল দশটী ভিন্ন ভিন্ন এক লইয়া যে দশ হয়,—এরূপ বুদ্ধির উদয় মাত্র। অর্থাৎ দশটী এক লইয়া দশ হয়, বা দশ অনেকাশ্রিত বস্তু,—এইরূপ ভেদমূলক দ্বিত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে,—আর একত্ব-জ্ঞান থাকে না। অতএব দ্বিত্ব-জ্ঞান একত্ব জ্ঞানের নাশক। তবেই হইল,—যে বস্তুর অপেক্ষা করিয়া একত্ব-জ্ঞান ভাঙ্গিয়া যায়,—বা যাহা দ্বারা অচল অটল একত্ব জ্ঞান স্পন্দিত হয়,—সে বস্তু ভেদমূলক দ্বিত্ব জ্ঞান,—"অর্থাৎ দুই দুই বুদ্ধি মাত্র"। অপেক্ষা-বুদ্ধির সংযোগেই ঐ দুই দুই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়,—বা অপেক্ষা-বুদ্ধির উদয়েই দ্বিত্বাদির প্রকাশ। অতএব অপেক্ষা-বুদ্ধিই দ্বিত্বাদি উৎপাদিকা,—বা দ্বিত্বাদি জ্ঞান অপেক্ষা-বুদ্ধিজনিত; ইহা সর্ব্বথা বিবাদ শূন্য। আর যে বুদ্ধি একত্ব জ্ঞানের প্রতিযোগিনী,—

অর্থাৎ একই বস্তু যাহা দ্বারা পৃথক আকারে জ্ঞান হয়,—বাস্তবিকই যাহা প্রেমা নহে, তাহারই নাম "অপেক্ষা বুদ্ধি"। এবম্ভূত অপেক্ষা বুদ্ধির শক্তি চমৎকারিত্বে ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক বস্তুর 'এক' একত্ব ভগ্ন হইয়া যে 'দ্বি' পৃথকত্ব বিষয়ক হইবে,—অর্থাৎ উভয়ের দুই দুই পৃথক আকারে জ্ঞান হইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ?

বর্ত্তমান আলোচ্য "প্রথম" আপত্তির অবয়ব ঐ অপেক্ষা-বুদ্ধি সম্ভূত। কারণ,—"অন্যৎ বা অপর কিছু" এই বাক্যই বা "নান্যৎ"—এই পদটীই ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের 'এক' একত্ব বিষয়ে সন্দেহ জন্মাইয়া ভেদমূলক দুই দুই ভাব আনিতেছে। কাজেই, উহা উল্লিখিত বিচারানুসারে"—অপেক্ষা-বুদ্ধি সম্ভূত না হইয়া পারে না। দ্বিতীয় আপত্তির অবয়ব পার্থিব বস্তুর অন্তর্ভূত। অভিপ্রায় এই যে,—আত্মা, অনন্ত অনাদি বস্তু-বিশেষ। অনন্ত বস্তু দৃশ্য বা দর্শনযোগ্য নহে; বাক্য মনের অতীত। অনন্ত বস্তু বাক্য মনের অতীত না হইয়া দর্শন পথে আসিলে তাহার অনন্তত্ব বজায় থাকে না; সীমাবদ্ধ বস্তু বিশেষ হইয়া অনিত্য ও বিনাশী হইয়া যায়। কাজেই সে বস্তু নিজের নিতত্ব রক্ষায় অসমর্থ হইয়া অক্ষয় পদ বাচ্য হয় না; সাধারণ পদার্থ মধ্যে গণ্য হয়। আরও দেখ,—সে বস্তু "অর্থাৎ আত্মা,"—সর্ব্ববিজ্ঞাতা ও সর্ব্বগতং বস্তু বিশেষ। সর্ব্ববিজ্ঞাতাকে আবার কি উপায়ে জানিবে ? বা সর্ব্বগতং "অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী" বস্তুকে আবার কি উপায়ে দর্শন পথে আনিবে ? তবে যদ্যপি দ্বিতীয় আপত্তির মর্ম্মানুসারে,—"নটবর বাবুর বিষ্ণু মন্দির দর্শন তুলনায়";—কোন ঈশ্বর পরায়ণ মহাপুরুষ চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা আত্মা দেখিয়া থাকেন,—ভালই; কিন্তু আমরা বলি, সে আত্মা অনাদি, অনন্ত নিত্য বস্তু নহে, বা তাহা সনাতন, নিশ্চল, অচ্যুতও নহে। দর্শন পথে আসায় অবশ্যই সে বস্তু অনুভব গম্য হইয়া মনের অধিকারে আসিতেছে। কাজেই তাহা মনের অধিকার শূন্য না হওয়ায়, জগতের অন্তর্ভূত বস্তু বিশেষ;—বাক্য মনের অতীত পরম বস্তু "পূর্ণ পরব্রহ্ম" নহে। নটবর বাবুর "বিষ্ণু মন্দির দর্শন" উদাহরণও তথৈবচঃ।

অতএব প্রথম আপত্তি বিষয়ক-অপেক্ষাবুদ্ধি বা—দ্বিতীয় আপত্তির বিষয়ীভূত জগতের অন্তর্ভূত বস্তু দ্বারা ভূমা ও পূর্ণপরব্রহ্ম নামক পরম বস্তুর 'এক' একত্ব বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া দ্বিত্বাদির সংযোগ হওয়ায়, জগতের অন্তর্ভুক্ত বস্তু বা দ্রব্যমাত্রেই ঐ অপেক্ষা-বুদ্ধির সম্পর্কীয় বা জগৎ ঐ অপেক্ষা বুদ্ধির বিপর্য্যাস শক্তি বিশেষ। সুতরাং জগৎ ভাব লোপ পাইলে আর অপেক্ষা-বুদ্ধি থাকে না, বা অপেক্ষা-বুদ্ধি নিবৃত্তি হইলে আর জগতের অবিস্থিতও অবশ্যম্ভাবী নহে। এরূপ হইলে—অর্থাৎ অপেক্ষা-বুদ্ধি বা জগৎ না থাকিলে, প্রথম আপত্তির অবয়ব (অপেক্ষা-বুদ্ধি সম্ভূত নান্যৎ পদ লইয়া আপত্তি) বা দ্বিতীয় আপত্তির অবয়ব (নটবর বাবুর বিষ্ণু মন্দির দর্শন তুলনায় আত্মা দর্শন ইত্যাদি পার্থিব বস্তু বিষয়ক আপত্তি) আর থাকিতে পারে না, একবারেই লোপ পায়। পরন্তু জগৎ লোপ পাইলে জগতের অবিদ্যমানে যাহা থাকে, তাহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

অভিপ্রায় এই যে, মনোবাণীর অতীত বস্তু এক, দুই, ইত্যাদি নিরুক্ত শব্দের নির্দ্দেশার্হ নহে। তথাপি তাহা যেমন "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে, পরন্তু ঐ বাক্য মনের অতীত পরম বস্তুকে প্রকাশ্যরূপে আনিতে হইলে, তাহার সহকারীরূপে কোন পদার্থ বিশেষের প্রয়োজন অসম্ভব নহে,—এইরূপ যে ধারণা তাহাও যেমন ঐ "অদ্বিতীয়ম্" পদ দ্বারা প্রতিষেধ হইতেছে'—অর্থাৎ তিনি ভিন্ন অন্য পদার্থই নাই,—কেবল এক বস্তুই আছে, এইরূপ অর্থ ঐ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পদ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। তদ্রূপ বাক্য মনের অতীত বস্তু "ভূমা" এক অখণ্ড বস্তু বিশেষ হইলেও, তাহাকে প্রকাশ্যরূপে আনিবার জন্য 'যত্র' এই ভেদবোধক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, বা নিরুক্ত শব্দের নির্দ্দেশ যোগ্য করা হইয়াছে। আর ঐ ভেদবোধক বিশেষণ দ্বারা ব্যবহারিক ভেদ দৃষ্টিতে যদিস্যাৎ ভূমা নামক বস্তুতে অন্য কোন ভেদমূলক পদার্থের বিদ্যমানতা অসম্ভব নহে,—এরূপ কোন ধারণা হইরা যায়, তাহা নিবারণ জন্য,—অর্থাৎ নিষেধাভিপ্রায়ে 'ন অন্যৎ পশ্যতি' এইরূপে বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রুতি মন্ত্রের "নান্যৎ" পদটী নিরর্থক বা অনর্থক নহে। পরন্তু ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ভূমা নামক বস্তুতে কোন ভেদ-দৃষ্টি বা জগৎ-ভাব কিছুই নাই। তাহা "মনরূপ" সাংসারিক ব্যবহারের অতীত, অনন্য-প্রয়োজন-বিশিষ্ট ও শাশ্বত। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। এবম্ভূত বস্তুর নামান্তরই "পূর্ণ পরব্রহ্ম"। অতএব ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম 'এক' অভিন্ন বস্তু-বিশেষ। অর্থাৎ ভূমাও যাহা, আর পূর্ণ পরব্রহ্মও তাহা;—দুই, দুই ব্যবহার কস্মিন্‌কালেও ইহাতে নাই। সুতরাং আপত্তি টিকিল না;—নগণ্য হইল। অর্থাৎ আপত্তির অবয়ব বিচারাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হইল;—"অদাহ্য হইল না"।

অতএব আলোচনা দ্বারা দেখা গেল যে,—এ মতেও আপত্তিদ্বয়ের অবয়ব দগ্ধ হইয়া, তাহাদের কার্য্যকারিণী শক্তি লোপ পায়। পরন্তু "ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক" পরম বস্তুর 'এক' একত্ব নিষ্কণ্টক হইয়া যায়; কোনরূপ শঙ্কাকলঙ্কাঙ্কুরের সম্ভাবনা থাকে না। অধিকন্তু প্রতিপন্ন হয় যে,—"আপত্তি অদাহ্য নহে"।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

সন্তোষপুর, হুগলী।

——:0:——

যোগানন্দ লহরী।

সুরটমল্লার (১৮) একতালা।

মন, চল শান্তি-নিকেতনে,

পূণ্য শ্মশানধামে, হেরব পরিণামে, গরব সংহার হয় যেখানে॥

বিবেক বৈরাগ্য সেথা বিরাজেরে,
নাহিক মমতা অনিত্য সংসারে,
মৃত্যুঞ্জয় পিতা সদা বাস করে,
শ্মশান-রঙ্গিনী শ্যামা সনে ॥

আছে অগণিত মৃতের কঙ্কাল,
চিতা-ভস্ম সনে আছে অস্থিমাল,
সহাস্যে চাহিয়ে নরের কপাল,
বিকট আকৃতি দর্শনে ;—

বলে যেন তারা সগর্ব্বে মানবে,
এই পরিণাম ভবের বিভবে !
মজেছিলে যাহে সুধাসিন্ধু ভেবে,
(এবে) হের তব প্রিয় স্বজনে ॥

সেই প্রেমক্ষেত্রে বিরাজে সমতা,
রাজা ভিখারীতে অভেদ সর্ব্বথা,
পাপ, তাপ, দুঃখ দূরে যায় সেথা,
জীব-লীলা অবসানে ;—

দু'দিনেরি তরে এসেছ এই ভবে,
কি ফল মজিয়ে বিষয় বিভবে,
শরণ লহ রে (সেই) মহাকাল-ভবে
এড়াইবে যদি শমনে ॥

——:0:——

কাহার শরণাগত হইব ?

জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মনঃ প্রাণ যখন অস্থির হইয়া উঠে,—যখন বিষয় সুখে মনের শান্তি হয় না,—যখন না জানি কোথা হইতে রাশি রাশি সন্তাপ আসিয়া হৃদয়কে বিদগ্ধ করিতে থাকে, যখন সংযোগ, ভোগ-বিয়োগ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হয়, তখন কি জানি কোথায় গেলে যেন হৃদয় শীতল হইবে—যেন সংসার ছাড়িয়া কোথায় পলাইলে,—লুকাইলে,—যেন কোন স্বচ্ছ সরোবরে ডুবিলে

প্রাণ জুড়াইবে, এই ভাবিয়া মন মাতিয়া উঠে। যাহা কখন দেখি নাই,—যাহা কখন শুনি নাই,—যাহা কখন ভাবি নাই, তার জন্য প্রাণের এত টান কেন? কষ্টের সময়,—বিপদের সময় যাহার কোলে গিয়া মনঃপ্রাণ জুড়াইতে চায়,—রোগে শোকে অবসন্ন হইয়া যাঁহাকে ডাকিলে মনে পবিত্র বলের সঞ্চার হয়, বাল্যে যিনি হৃদয় সখা, বিপদে যিনি কাঙ্গালের বন্ধু, ক্ষুধার সময় যিনি মা অন্নপূর্ণা, রোগশয্যায় যিনি বাবা বৈদ্যনাথ, তাঁহাকে না দেখিলে, তাঁহাকে না পাইলে, আমি কাহাকে লইয়া এই জীবন সার্থক করিব? যদি তাঁহারই পবিত্র সুগন্ধ চরণে জীবন-পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ না করিলাম, তবে সংসারে কোন কুহকিনী মায়া-রাক্ষসীর কুহকজালে পড়িয়া ভুলিলাম? মায়ায় মজিলাম, সংসারে ডুবিলাম, আপনাকে আপনি ভুলিলাম, যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইলাম; কিন্তু যাহার জন্য আসিলাম, তাহার কি করিলাম? হাসিলাম, খেলিলাম, বেড়াইলাম, ঘুমাইলাম, গোলমালে আপনাকেও হারাইলাম, কিন্তু যে কার্য্যের জন্য নানা জন্মে নানা বেশধারণ করিলাম, তাহার করিলাম কি? এই মর্ম্ম-বিদারক প্রশ্ন সর্ব্বদাই মোক্ষান্বেষী জীবকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে।

এ প্রশ্নের গুপ্তরহস্য ভেদ করিয়া কে আমার তাপিত, পিপাসিত প্রাণ সুশীতল করিবে? সাধক! তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, তুমিই আমাকে অকুল পাথারে, ঘোরান্ধকার মধ্যে ধ্রুবতারা দেখাইয়া দাও, তাহা ভিন্ন পথ নির্দ্দশনের অন্য কোন উপায় নাই। আমি মা বাপকে একথা জিজ্ঞাসা করিব না; তাঁহারা স্নেহপরবশ হইয়া আমাকে কার্য্যের কথা খুলিয়া বলিবেন না। আজ যদি কয়াধু বা সুনীতির মত মা পাইতাম, তবেই আমার হৃদয়ের দুঃখ দূর হইত; তাপিত প্রাণের জ্বালা যন্ত্রনা জুড়াইত। শিশু প্রহ্লাদ বিষমিশ্রিত অন্ন কিরূপে ভগবানকে নিবেদন করিবেন, তাই ভাবিয়া আকুল, দুনয়নে অবিরল ধারে ধারা বহিতে লাগিল; মা কয়াধু বলিলেন, বৎস প্রহ্লাদ! তুই এতদিন ভগবানের ভজনা করিতেছিস, তাঁহার মহিমা কি তুই জানিস্ না? তাঁহার কাছে কি গরল ও অমৃতের প্রভেদ আছে? তাঁহাকে সরল বিশ্বাসে ও ভক্তি-ভরে যাহা নিবেদন করিবি, তাহা হলাহল হইলেও অমৃত হইয়া যাইবে। প্রহ্লাদ মায়ের কথা বিশ্বাসকরতঃ প্রাণভরে ভগবানকে ডাকিলেন, ভক্তবৎসল অমনি শিশুর সম্মুখে শিশুর বেশে আসিয়া দুটী ভাইয়ের মত একত্রে বসিয়া অগ্রভাগ ভোজন করিলেন; বিষ অমৃত হইয়া গেল, দৈত্যকুল পবিত্র হইল। শিশু ধ্রুব মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা আমাদের দুঃখ মোচনের কর্ত্তা কে? অমনি মায় (সুনীতির) দুনয়নে জল আসিল; মা বলিলেন, বাছা! পদ্ম-পলাশলোচন ভগবান হরিই আমাদের ন্যায় দীনহীন কাঙ্গালের বিপদভঞ্জনকর্ত্তা। মায়ের প্রাণস্পর্শী উপদেশে ননীর পুতুল—দীনহীনা কাঙ্গালিনীর একমাত্র অঞ্চলের নিধি ঘোর নিশীথ রজনীতে গহন বনে হরিপদ লাভের জন্য যাত্রা করিলেন। তাই বলি সাধক! আজকালের মাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিব না। মায়ের মত মা আর

নাই। গুরুগিরী ব্যবসায়ী স্বার্থপর গুরুকে, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিব না। কৃচ্ছসাধনশীল তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেও তৃপ্তিলাভ হইবে না। যাঁহারা কেবল বেদান্ত-শাস্ত্রের লম্বা চৌড়া ব্রহ্মজ্ঞানের কথাবার্ত্তা কহিয়া ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া আপনাকে আপনি ফাঁকি দিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করিলে আমার তৃষ্ণা মিটিবে না,—যাঁহারা প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন দ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের মন্ত্রণা শুনিলে আমার চিত্ত চরিতার্থ হইবে না। আমার তাপিত প্রাণ সেইদিকে যাইতে চায়, যে দিকে বিশ্বাসের শীতল বায়ু বহিতেছে,—যে দিকে উত্তুঙ্গ গিরির শৃঙ্গে শৃঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে স্ফটিক-স্বচ্ছ ভক্তির নদী ঝির্ ঝির্ করিয়া, কোথাও বা তরতর বেগে, আবার কোথায়ও বা তরঙ্গের পর তরঙ্গ মালায় বহিয়া যাইতেছে। চতুরশীতি লক্ষ যোজন পথ ভ্রমনে ক্লান্ত ও ভব ভারাক্রান্ত পথিকের পক্ষে সরল ভক্তির শীতল ছায়া-পথই পরম সুখকর; সরল ভক্তিই বিষ্ণু-পাদোদ্ভবী গঙ্গা, ভক্তি ত্রিতাপানল-বিদগ্ধ-ভস্মাবশেষ জীবাত্মার একমাত্র কল্যাণকারিণী। কোন কোন পাশ্চাত্য বিদ্যানুরাগ-রঞ্জিত পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, "ভক্তি স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা মাত্র।" তাঁহারা দেখিয়াছেন, স্নায়-বীয় দুর্ব্বলতাযুক্ত ব্যক্তি অতি অল্পেই কাঁদিয়া ফেলে, অতি অল্পেই ভয় পায়, অতি অল্পেই হতবুদ্ধি হইয়া মহাভাবে সমাধিস্থ হইয়া পড়ে। ভক্তির লক্ষণেও সেই অশ্রুপাত, সেই রোমাঞ্চ, সেই আবেশ মূর্চ্ছা; সংসারের অতীত কোন দিব্য জ্ঞানে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে। অতএব অহৈতুকী ভক্তি স্নায়বীয় দুর্ব্বলতাই স্থির মীমাংসা হইল। ঈদৃশ বিচারবান পুরুষই ন্যায় শাস্ত্রের ধূম দর্শনে "পর্ব্বতো বহ্নিমান" মীমাংসা সিদ্ধান্ত করিতে সাহস করেন। সাধনসিদ্ধ সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ভিন্ন মধু অপেক্ষা সুমধুর ভক্তি রস পান করিবার সামর্থ্য কাহারও জন্মে না। ভগ-বানকে লাভ করা ভক্তির ফল নহে, অধিকন্তু ভগবানকে লাভ করিলে তবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। যে কর্ম্ম (নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য আদি) উপাসনা, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়, তাহা অহৈতুকী পরাভক্তির উপাদান স্বরূপ "গৌণী ভক্তি।" সমগ্র সাধনতত্ত্বের চরম পরিপক্ক ফলের নামই পরাভক্তি। বিধিপূর্ব্বক সাধনা করিলে, অল্পদিনের মধ্যে ভগবদ্দর্শন হয়, (ইষ্টদেবের); ভগবদ্দর্শন লাভ হইলে, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হয়, এইরূপে ভগবানের কৃপা দৃষ্টি হইলে পর "পরাভক্তির" প্রকাশ হয়।

ভক্তি সাধক কখন বঞ্চিত হয়েন না, শত্রুনাশ করিবার জন্য,—অন্যের বাড়ীতে চুরি করিবার জন্য, তুমি ভক্তিপূর্ব্বক মা কালীর পূজা কর, তবু নাস্তিক অপেক্ষা ভাল হইবে, লোকে ভাল বলিবে বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে যাও, তত্রাচ যথাক্রমে ভক্তির উন্নত স্তরে আরূঢ় হইবে। অন্যের দেখাদেখি পূজা করিতে যাও, তবু ভক্তি-লাভ হইতে পারে। "ধনং দেহি, পুত্র দেহি, মানং দেহি" বলিয়াও যদি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা কর, তথাচ ভক্তির বাতাসে জীবাত্মায় আনন্দের সঞ্চার হইবে। ব্যাধি নিবারণের জন্য পাপ

নিবারণের জন্য, ভগবানে যে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাহাই ক্রমশঃ অহৈতুকী ভক্তির দিকে আকর্ষণ করে, এই পবিত্র অহৈতুকী ভক্তির ঘাটে স্নান করিলে সকল কামনা মিটিয়া যায়,—ভেদাভেদ বুদ্ধি ধুইয়া যায়, আমাতে তাহাতে মিশিয়া যায়, সাধক ভক্তগণের সকল সাধ পূর্ণ হইয়া যায়; তখন ভক্তগণ উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার মধুময়ী কীর্ত্তিগাথা শ্রবণ করেন, কখন বা আত্মহারা হইয় আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে উর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহার গুণ-গরিমা স্মরণ করতঃ বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন; কখন বা তৎপদ সেবনে, অর্চ্চনে ও বন্দনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন; কখন আমি দাস, তিনি প্রভু, কখন তিনি আমার প্রাণের সখা জ্ঞান করিয়া, আবার কখন বা আপনাকে একবারে তাঁহার চরণে বিক্রয় করিয়া চরিতার্থ হয়েন। যথাযথ লাভ করিতে পারিলেই জন্ম সফল, জীবন সার্থক, মনঃ প্রাণ সুশীতল ও আত্মা পরম পরিতৃপ্ত হয়।

মনের কথা, প্রাণের ব্যথা খুলিয়া বলিতে ভরসা হয় না। বাহ্য জগৎ সদাই ভৈরব নাদে ভীম খড়্গ লইয়া হৃদয়কে ভয় দেখাইতেছে; বাহিরের কথায়, বাহিরের ব্যাপারে, বাহিরের পাপপুণ্যময়ী মোহিনী ছবির ছায়ায় মন ভুলাইতে চায়; মন তাহা মানে না, মন সে সব কথা শুনে না। "আমার" ব'লে, "আমার" হয়ে যিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বিহার করিতেছেন, তাঁহাকে না পাইলে কি আমার প্রাণ শীতল হয়? পীড়ার অসহ্য যাতনায় কাতর হইয়া ভক্তিভরে 'কায়মনোবাক্য ডাকিবামাত্র যে মা আমার ঔষধ বলিয়া দিলেন, শোকভয়ে ভীত হইয়া কাঁদিবামাত্র যিনি আসিয়া ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা করিলেন, আমি সেই চিন্ময়ীকে ছাড়িয়া,—আমি সেই চৈতন্যরূপিনীর চরণে শরণ না লইয়া কোথায় গিয়া দাড়াইব? না মা! আমি আর কোথায় যাইতে চাই না। মা! আমি দায়া পুত্র, ঋদ্ধি সিদ্ধির ভিখারী নহি; মা! আমি যেন সংসার ভুলিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আপনাকে ভুলিতে পারি। তুই মা আমার "মা" থাকিতে আমার ভাবনা কি? শ্রীমন্ত! তুমিই মাকে চিনিয়াছিলে; "কমলেকামিনী দেখিয়া রাজকোপে প্রাণ যায় যায় হইল, আর "মা" বলিয় কাঁদিয় উঠিলে, মা আর থাকিতে পারিলেন না। অমনি পদ্মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "পদ্মা বল প্রাণ চঞ্চল কেন হ'লো বল কিসের কারণ? কে বুঝি কাঁদে, পড়িয়া বিপদে, প্রাণভয়ে আমার লয়েছে শরণ" বলিতে বলিতে মা আসিয়া বধ্যভূমিতে শ্রীমন্তকে রক্ষা করিলেন। মা আমার শ্রীমন্তকে রক্ষা করিলেন। মা আমাকে শ্রীমন্তের মত কাঁদিতে শিখাও, মা! আমায় বিপদে ফেলিয়া কাতরে "মা" বলিয়া ডাকিতে শিখাও।

সাধক সাধিকাগণ, কেন অকারণে মাতৃহীনা হইয়া রহিয়াছেন (মাকে ঘুমাইয়া রাখিয়াছেন)? বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'লো কোন দিন ভবের পটল তুল্‌তে হবে, মহা বায়ু দ্বারা মায়ের নিদ্রাভঙ্গ করুন ও প্রাণভরে ব্যাকুলভাবে "মা," "মা," বলিয়া ডাকুন, নিশ্চয়ই মা দেখা দিবেন। সাধক! বলিতে গা শিহরিয়া উঠে, একজন দস্যু বৃদ্ধাবস্থায় যখন অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন একদিন নিজ রাজ্যেশ্বরের নানাভরণে ভূষিত একমাত্র পুত্রকে একাকী দেখিয়া তাহাকে বধ করতঃ

অলঙ্কারগুলি হরণ করিবে এই ইচ্ছা করিল। সুবোধ শিশু হঠাৎ নিকটে আসিবা-মাত্র ধূর্ত্ত দস্যু বলিল "বাবা! বড় পিপাসা হইয়াছে, যদি একটু জল পান করিতে দেও, তবে প্রাণ বাচে।" দয়ার শরীর শিশু সরল বিশ্বাসে জল আনিতে উদ্যত হইলে, দস্যু বলিল, তুমি দীক্ষিত না হইলে তোমার হাতে জল খাইব না। শিশু (দীক্ষা কাহাকে বলে জানে না,) বলিল, তবে আমাকে দীক্ষা দাও। দস্যু বলিল, চল নদী তীরে স্নান করাইয়া তোমাকে দীক্ষিত করিব। সরল শিশু চলিল, দস্যু একটা নির্জ্জন ঘাটে গিয়া বলিল; "ঐ সমস্ত অলঙ্কারগুলি খুলিয়া এইখানে রাখিয়া জলে ডুব দেও, আমি না ডাকিলে তুমি উঠিও না। তারপর তোমাকে দীক্ষা দিয়া ভগবদ্দর্শন করাইব।" সুবোধ শিশু বৃদ্ধ গুরুকে জলপান করাইবে, ভগবানের দর্শন লাভ করিবে, এই আহ্লাদে আট খানা হইয়া তাহাই করিল। শিশু জলে ডুব দিবামাত্র দস্যু অলঙ্কারগুলি লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে ভগবদ্দর্শনেচ্ছু বালক "গুরু ডাকিবেন," এই আশায় ডুব দিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কৈ গুরু ত ডাকেন না; সে ত আর জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না, পেট যে ফুলিয়া উঠিল। ভক্ত শিশুর প্রাণ যায় দেখিয়া ভগবান কি আর স্থির থাকিতে পারেন! অমনি একজন প্রহরীর রূপ ধারণ করিয়া দস্যুর কেশাকর্ষণকরতঃ ফিরাইয়া আনিলেন, তীব্র তাড়নাসহ বলিলেন, "পামর! শীঘ্র আমার বাছাকে ডাক, আমিই ডাকিতে পারিতাম,—কিন্তু বাছা যে গুরু বাক্যের প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি ডাকিলে সে উঠিবে না।" দস্যু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া শিশুকে ডাকিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শিশু মাথা তুলিয়া তাকাইয়া দেখে, শঙ্খচক্র গদাপদ্ম-ধারী বিষ্ণু সাক্ষাৎ হইয়া বলিতেছেন, "বৎস! জল হইতে উঠ, তোমাকে দর্শন দিবার জন্যই আমি আসিয়াছি।" বালক বৃদ্ধকে মূর্চ্ছিত ও অলোকসামান্য পুরুষকে দেখিয়া প্রেমাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার চরণে পতিত হইল। অনাথনাথ অমনি নিজরূপ সম্বরণ পূর্ব্বক প্রহরীবেশে শিশুকে ক্রোড়ে করতঃ রাজদ্বারে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সাধক! বল দেখি সরল হৃদয়ের পরম সখা ভগবানের আশ্রয় না লইয়া আর কাহার শরণাগত হইব?

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায়।

—:0:—

প্রার্থনা।

(১)

সংসার বারিধি বক্ষে ক্ষুদ্র জীর্ণতরী,
ষড়রিপু আকর্ষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ি।
হইতেছে নিমজ্জিত, নাহি কর্ণধার,
রক্ষা কর জগদ্ধাত্রি! জননী আমার।

(২)

অনন্ত-লালসা-লুব্ধ-নাবিক চঞ্চল,
হারায়েছে ক্ষুদ্র শক্তি যা' ছিল সম্বল,
(এবে) অক্ষবান শিশু-সম অশ্রু শুধু সার,
ধর বক্ষে জগদ্ধাত্রি! জননী আমার।

(৩)

কালোর্ম্মি-নির্ঘোষ-ঘোর-ভৈরব-কল্লোল,
পশ্চাত্তাপ-ভীম-বহ্নি-বাড়ব-হিল্লোল।
নিপীড়িছে অনুক্ষণ, নাহি সহে আর,
রক্ষ দেবী রক্ষয়িত্রি! জননী আমার।

(৪)

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি হেতু কত মত সাধি,
সংযম সাধনা সিদ্ধি, তাহে ঘোর বাদী,
চিরাভ্যস্ত উশৃঙ্খল ইন্দ্রিয় বিকার,
দাও শক্তি শক্তিরাণি! জননী আমার।

(৫)

বিপথ বিক্ষিপ্ত-তরী কাল-ঘূর্ণী-বায়
ছুটিতেছে উল্কাবেগে না জানি কোথায়,
ভীষণ তমসাচ্ছন্ন পঙ্কিল পাথার,
করিছে ভৈরব নাদে বিকট হুঙ্কার,
ভীত ত্রস্ত কর্ণধার করে হাহাকার।
দান শান্তি শান্তিদাত্রি! জননী আমার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

———:0:———

বিকাশ।

দেব!

"নবজীবনের" রম্য নবীন প্রভাতে,
মুছাইয়ে দিয়ে যত অতীতের স্মৃতি,
কলঙ্ক কালিমা রেখা করিয়ে ক্ষালন,
নীরস, বন্ধুর চিতে লাবণ্য ঢালিয়ে,
ফুটাইয়ে প্রেমফুল হৃদি মরু মাঝে,
নব তেজে, নব বলে করি বলীয়ান,
নবীন উদ্যমে দেব! পুনঃ মাতাইয়ে,
উশৃঙ্খল, দুর্ব্বিনীত চঞ্চল হৃদয়—
প্রশান্ত বারিধি সম করি তারে স্থির,
সত্ত্ব, শুদ্ধ, নিরমল করি নিজগুণে,
মেঘমুক্ত নীলাকাশ তারকার সনে,
শোভে যথা লয়ে বুকে পূর্ণিমার শশী,
(সেইরূপে) অহৈতুক কৃপাসিন্ধু করুণা বিতরি,
স্ব-রূপে "বিকাশ" হও "স্বরূপের" মাঝে।

দীন—উমেশচন্দ্র।

———:0:———

হিন্দু-ধর্ম্ম।

"Religion is the manifestation of the divinity already in man",

স্বামী বিবেকানন্দ।

মানব হৃদয়স্থ ঐশী শক্তির বিকাশই ধর্ম্ম। এই শক্তি মানবের স্বাভাবিক। অন্তর্নিহিত এই সূক্ষ্ম শক্তি বিকাশ হইয়া স্থূল জগতে বৃত্তিরূপে পরিণত হয়। অতএব ধর্ম্মকে চিত্তের বৃত্তিবিশেষও বলা যাইতে পারে। এই বৃত্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া জীব জগতে কর্ম্মজীবন পরিচালিত করিতেছে। সাধুর ন্যায়-নিষ্ঠায়, অত্যাচারীর উৎপীড়নে,

দস্যুর পরস্বাপহরণে, যোগীর তপস্যায়, সর্পের ক্রূরতায় ও ব্যাঘ্রের হিংসায় এই বৃত্তি বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। জীবনের স্তর-ভেদে, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে এই বৃত্তির বা ধর্ম্মের ব্যবহারেরও তারতম্য হইয়া থাকে। স্বাভাবিক এই বৃত্তিকে সুশৃঙ্খলিত করিয়া বিশ্বপ্রেমের প্রতি আকৃষ্ট করাই সাধন এবং বহির্ম্মুখীন এই বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিয়া অন্তর্ম্মুখীন করাই যোগ। যথা—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।"

পাতঞ্জল দর্শন।

আর যদ্দারা সাধনমার্গে এই বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাই ধর্ম্মানুশাসন বা শাস্ত্র। মানবেতর জীব এই সাধনে অধিকারী নহে এবং অনুশাসনেও বাধ্য নহে। এক মাত্র মানবই এই সাধনে অধিকারী এবং অনুশাসনে বাধ্য। মানব নানাবিধ বাধা বিঘ্ন দূরীভূতকরতঃ বিষয়মুখী বৃত্তিকে ভগবদ্মুখী করিয়া প্রেমময়ের প্রেম-প্রবাহ হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হয় বলিয়া ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা ও ধার্ম্মিক নামের যোগ্য। অন্যথায় পশ্বাদিতে ও মানবে কি প্রভেদ বর্ত্তমান আছে? যথাঃ—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
জ্ঞানমেতেষাং অধিকং বিশেষঃ
জ্ঞানেন হীনা পশুভি-সমানাঃ।

উত্তর-গীতা।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, পশু ও মানবে সমভাবেই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু মানবের জ্ঞান (ধর্ম্মজ্ঞান) আছে ইহাই বিশেষত্ব। জ্ঞানহীন মানব পশুর সমান।

কাজেই সাধনা দ্বারা ধর্ম্মের উৎকর্ষ সম্পাদন মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ধর্ম্ম লাভের জন্য নানাবিধ মত ও পথ প্রচলিত আছে। দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে, সম্প্রদায়ে বিভিন্ন মতানুসারে এই ধর্ম্মের সাধনা যুগযুগান্তর হইতে হইয়া আসিতেছে। এইরূপ যে কোন মতের সাধক হইলেই যে, একমাত্র সত্য স্বরূপ ধর্ম্ম বস্তু লাভ হয়, তাহা ভারতবর্ষীয় আর্য্যঋষিগণই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কালক্রমে নানাবিধ তর্কজালে মানব-চিত্ত আবৃত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে বুঝিয়া তাঁহারা এই সমন্বয়-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম জগত ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। মানব ইহারই আশ্রয়ে দাঁড়াইবার শক্তিলাভ করিয়া জগতে মানব নামে অভিহিত হইতে সক্ষম হইয়াছে। ধর্ম্ম অরূপ, কিন্তু জীবগণের অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট। ধর্ম্ম না থাকিলে,—মানব ধর্ম্মের আচরণ না করিলে, মানব-হৃদয় কোমল বৃত্তি পরিশূন্য হইত এবং তাহাতে সর্ব্বদা পশুভাব বিরাজিত থাকিত। পশুরও ধর্ম্ম আছে, কিন্তু ধর্ম্মভাব নাই, ধর্ম্মের অনুপ্রাণনা নাই এবং ধর্ম্মের উন্নতিরও উপায় নাই। অপর, যেমন ব্যাঘ্রের ধর্ম্ম জীবহিংসা করা, সর্পের ধর্ম্ম দংশন করা তেমনি মানবের ধর্ম্ম নিজকে জগতে বিলাইয়া দেওয়া,—নিজকে ভুলিয়া জগতকে আপনার করা। অন্তর্নিহিত এই ধর্ম্মের উৎকর্ষ লাভের স্থান একমাত্র মানব হৃদয়। মানব স্বীয় শক্তিপ্রভাবে পুরুষকার অবলম্বন করিয়া ইহার উন্নতি অবনতি সাধন করিতে পারে। যাহা আশ্রয় করিয়া মানব তাহার পুরুষকার পরিচালনা

করে তাহা ধর্ম্মের অনুপ্রাণনা এবং যাহা এই অনুপ্রাণনা নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাই ধর্ম্মের অনুশাসন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে এই ধর্ম্মানুশাসন বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেমন হিন্দুর বেদ ও পুরাণ, মুসলমানের কোরাণ এবং খৃষ্টিয়ানের বাইবেল। ধর্ম্ম অনন্ত—প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম অপর হইতে পৃথক। এই বিভিন্ন ভাব হইতে সামঞ্জস্য বাহির করিয়া কোন কালে কোন দেশ বিশেষের অধিবাসী মানবসঙ্ঘের উপযোগী করিয়া এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভারতে হিন্দুধর্ম্ম, ইউরোপখণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম, আরব ও পারস্যাদিতে মুসলমান ধর্ম্ম এবং চীন ও জাপানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মের বা ধর্ম্মমতের শ্রেষ্টত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে তাহার উদারতার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। যে ধর্ম্মে যত অধিক উদার মত প্রচলিত, তাহা তত অধিক উন্নত। যেহেতু সঙ্কীর্ণতা মানব চিত্তকে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর করিয়া মানবত্বের উচ্চ ভূমি হইতে ক্রমে পশুত্বের নিম্ন ভূমিতে সজোরে আকর্ষণ করিতে থাকে। কাজেই সার্ব্বভৌম উদার-ভাবই ধর্ম্মের জীবন। এই ধর্ম্মের মূলে একমাত্র ভগবান। তাঁহার প্রেরণাই জীবের প্রাণে প্রাণে একতার, প্রেমের ও প্রণয়ের অনুভূতি। এই এক মূল হইতে অনন্ত শাখা প্রশাখা সমন্বিত ধর্ম্মবৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জগতে জীবের প্রাণে প্রাণে শান্তির ছায়া বিতরণ করিতেছে। জীব এই বৃক্ষের আশ্রয়ে আসিয়া সংসার-দাব-দাহ দগ্ধ প্রাণ সুশীতল করিতেছে। এই ধর্ম্মবৃক্ষ কিরূপ তাহা শ্রীভগবান গীতায় প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

ঊর্দ্ধ মূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তংবেদ স বেদবিদ্॥
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা,
গুণ প্রবৃদ্ধ বিষয় প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলন্যনু সন্ততানি,
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥

ঊর্দ্ধ মূল এবং অধঃশাখা একটী অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষ। বেদ সকল ইহার পত্র, এতাদৃশ অশ্বত্থ বৃক্ষকে যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি বেদবিৎ। এই বৃক্ষের শাখা সকল সত্ত্বাদি গুণরূপ জল সেচনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং কামনা রূপ পল্লববিশিষ্ট হইয়া অধঃ ও উর্দ্ধে বিস্তৃত। মনুষ্যলোকে ইহার মূল সকল কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ। এই বৃক্ষই ধর্ম্মরূপে জগতে শ্রীভগবানের বিকাশ। দেশদেশান্তরে এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হইয়াছে। শ্রীভগবান স্বয়ং অংশ বা কলারূপে আবশ্যক মত জন্মগ্রহণ করিয়া দুস্থ জীবগণের শান্তি-বিধান জন্য এই সকল ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিমুখে তিনি বেদগাথা গান করিয়াছেন এবং নিজে নরদেহ ধারণ করিয়া তাহা আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি যীশুরূপে আত্মদান করিয়া জীবগণকে হিংসা হইতে নিরস্ত করিয়া প্রেমশৃঙ্খলে বাধিয়াছেন, মহম্মদ-রূপেও তিনি এক মহা জাগরণ অনুপ্রাণনার সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই সকল ধর্ম্মমতেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সকল মতই তাঁহাকেই লাভ করিবার উপায় ইঙ্গিত করিতেছে। ইহাই হিন্দুর মত, হিন্দু ধর্ম্মের মজ্জাগত

পারত্ব। এই হিন্দু-ধর্মতত্ত্বে সকল ধর্মেরই মূল নিহিত আছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শুধু হিন্দুর নয়, ইহা সমগ্র মানব জাতির, সমগ্র পৃথিবীর। কোরাণের দোহাই দিয়া মুসলমান মৌলবিগণ বলেন "আমাদের মতে, আমাদের ভাবে, অনাদি অনন্ত, এক খোদাতাল্লার ভজনা কর, বেহেস্তের অধিবাসী হইবে। অন্যথায় নহে; বাইবেলের দোহাই দিয়া ক্রিশ্চিয়ান পাদরীগণ বলিতেছেন"—পরম দয়াল, ত্যাগের অবতার, ঈশ্বরের পুত্র যীশুকে ভজনা কর, পাপ হইতে মুক্ত হইবে, অন্যথায় নহে।" এইরূপে যাঁহার যে ধর্ম্মমত, যিনি যে ভাবে অনুপ্রাণিত, সেই ভাব বা মত-বিশেষ অবলম্বন করিয়া জগতকে উদ্ধারের পথে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্য-হিন্দুঋষিগণ হিন্দু-ধর্ম্মকে এমন কোন গণ্ডীপ্রদান করেন নাই; তাঁহারা যোগবলে দেখিয়াছেন, প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব এই গণ্ডীর পরপারে। তথায় বাদ নাই, বিসম্বাদ নাই, আত্মপর ভেদ নাই, তথায় অনাহতের অনন্ত সঙ্গীত সুধা,—তথায় অনন্ত প্রেমাধারের অনন্ত প্রেমপ্রবাহ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে
মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

"হে পার্থ! যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করি। মানবমাত্রই সর্ব্বদা আমার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকে।" অর্থাৎ যে তাঁহাকে যীশুরূপে আরাধনা করে, তিনি তাঁহার নিকট যীশুরূপে প্রকট হইয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূরণ করেন; যে মহম্মদরূপে তাঁহাকে ডাকে, তাহাকে মহম্মদরূপে বা যে কালী বা কৃষ্ণ, যে কোনরূপে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করে, ইচ্ছাময়, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তিনি ভক্তের তত্তৎ ভাবপ্রণোদিত হইয়া সেই সেই অভিপ্সিত মূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভগবান ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছাই এ জগতের বিকাশ এবং তিনিই জীবগণের ইচ্ছারূপে আবির্ভূত হন। অতএব যে যে ভাবে তাঁহাকে ডাকে, যে যে বস্তুর জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি সেই ভাবেই তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাহা তিনি না করিলে, না পারিলে তাহাকে অনন্ত শক্তিশালী, অনাদি ঈশ্বর নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। তিনি যখন সর্ব্ব ভাবেই জীবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তখন "কোন ধর্ম্ম বিশেষের মতানুবর্ত্তী না হইলে, তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, বা কোন ধর্ম্মের মতানুসারী হইলে তাঁহাকে লাভ করা যাইবে" ইত্যাকার ধারণাগুলি অনন্ত শক্তিমান শ্রীভগবানের অনন্তত্বে ব্যাঘাত জন্মাইয়া কেবল মানব চিত্তের অবিশ্বাস প্রকাশ করে। যে একটীতে মনোযোগ করিতে পারে না, সে কোনটীতেই পারিবে না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, যাহার যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের অনুশাসন কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিয়া ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলেই ভববন্ধন মুক্ত হওয়া যাইবে। হিন্দুধর্ম্মে এমন কোন মতবাদ নাই যে, মুসলমান কি ক্রিশ্চিয়ান,

আল্লা কি যীশু ত্যাগ করিয়া হিন্দুর আরাধ্য কালী, কৃষ্ণ কি শিবের ভজনা না করিলে মুক্ত হইতে পারিবে না। বরং

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পর ধর্ম্ম ভয়াবহঃ।

এই মতই সমধিক প্রচলিত। যাহার ধর্ম্মমতে যে সত্য আছে, তাহাতে মনোনিবেশ করিলেই তাহার অনুসন্ধানে আপনা ভুলিয়া ডুবিতে পারিলেই সত্য বস্তু লাভ হইবে এবং সেই সত্যের আলোকচ্ছটায় হৃদয় আলোকিত হইবে ও সর্ব্ব সংশয় দূর হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন, যথাঃ—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ
পর ধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে বিধিনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ গীতা ৩। ৩৫

সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত পর ধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ সধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

যিনি নিজ জাতি ও ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য জাতি ও ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তিনি কখনও মুক্ত হইতে পারেন না। কারণ স্বভাবের অনুকুল বিষয়ে আসক্তি ও প্রতিকুল বিষয়ে অনাসক্তি বা বীতরাগ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ম। কাজেই বাহ্যিক আড়ম্বরময় ধর্ম্মের সাধনা বা সম্প্রদায় বিশেষ দেখিয়া মুগ্ধ হওতঃ তাহা গ্রহণ করিলে, ঐ ধর্ম্ম স্বভাবানুযায়ী না হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ সহজে ঐ নূতন ভাব গ্রহণ করে না। ফলে অশ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়, সংশয়ও সহজে দূর হয় না। শ্রদ্ধাহীন ধর্ম্মলাভ করিতে অক্ষম হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয় যথা—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ
সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ংলোকেস্তি ন পরো,
ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥
গীতা ৪। ৪০।

অনভিজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াকুল চিত্ত মানব নাশপ্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মার ইহকালও নাই, পরকালও নাই, সুখও নাই ॥

অশ্রদ্দধানা পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং, নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি
গীতা ৯। ৩

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "হে পরন্তপ অর্জ্জুন। ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন মানব মৃত্যুময় সংসার পথে পরিভ্রমন করিয়া থাকে অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীন কখনও মুক্ত হইত পারে না।" অতএব সকলেরই নিজ নিজ জাতীয়তায় তৃপ্ত ও ধর্ম্মে আস্থাবান হওয়াই তাহাদের জাতি ও ধর্ম্মের উন্নতির মূলমন্ত্র। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সার। ইহাই হিন্দুর হিন্দুয়ানী, ইহাতেই হিন্দুজাতির ও ধর্ম্মের মহত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশদেশান্তর হইতে কত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ এই ভারতে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলোৎপাটন করিতে সক্ষম হন নাই। কারণ ইহা অতি পুরাতন, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। শত ঝঞ্ঝাবাতেও এই ধর্ম্ম অক্ষুন্ন আছে এবং থাকিবেও। বর্ত্তমানে যে সকল সংকীর্ণতা জাতিভেদ লইয়া দৃষ্ট হয়, তাহাও হিন্দুর মজ্জাগত নহে। যে হিন্দু কুকুরকে পর্য্যন্ত দেবতার আসন প্রদান

করিতে কুণ্ঠিত হন না,' যে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা "ঘটে ঘটে বিরাজ করেন" তিনি কোন জাতি বা সমাজবিশেষকে ঘৃণার চক্ষে কখনও দেখিতে পারেন না। দৃশ্যতঃ এই সংকীর্ণতার মূল কারণ বর্ত্তমানে সামাজিক ও ধর্ম্মের বিপ্লবকালে আত্মরক্ষার চেষ্টা। ভিন্ন জাতির সহিত ব্যবহার বিষয়ে জাতীয়তা রক্ষার জন্য সমাজ-শাসনের যোগে এরূপ কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ না করিলে, এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে আর সনাতন বলিয়া গর্ব্বকরা যাইত না। বহুযুগ পূর্ব্বে ইহাও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় দেশ বহিষ্কৃত হইয়া রাজ-প্রচারিত ধর্ম্মের স্থান করিয়া দিত। এরূপ পূর্ব্ব সতর্কতার সহিত নিয়মের প্রতিষ্ঠায় তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের দূরদর্শীতাই সম্যক পরিস্ফুট।

ধর্ম্ম জগতে স্তরভেদে দৃশ্যমান পার্থক্য বা ভেদভাবগুলি চিত্তের উচ্চ ও নিম্ন অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। চিত্ত ক্রমে উন্নত হইতে থাকিলে ক্রমে উন্নত ভাবেরও বিকাশ হইতে থাকে এবং এই ভেদভাব দূরীভূত হইয়া সর্ব্বধর্ম্মের মূল, সারাৎসার একমাত্র অনাদি, অনন্ত, প্রেম-স্বরূপ শ্রীভগবানই বিভুরূপে প্রকাশিত হন। নিম্নভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিলে প্রত্যেক ভূমি-খণ্ড যে ভিন্ন ভিন্ন মানবের অধীন তাহা তাহাদের সীমাচিহ্ন দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু ক্রমে যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করা যায়, চিহ্ন-গুলিও ততই ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হইয়া শেষে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং একমাত্র ভূমিই দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ, যতক্ষণ নিম্ন স্তরে অবস্থান করা যায়, ধর্ম্মেরও বিভিন্ন মত ও পথ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কিছুদিন সাধন ভজন করিয়া উচ্চস্তরে আরোহণ করিলে দেখা যায় "একই সুমহান, গরীয়ান, বিভু আত্ম-বিস্তারে জগতে প্রকাশ পাইতেছেন।" খোদা, আল্লা, গড, হরি, কি কালী দৃশ্যতঃ নাম ও রূপে বিভিন্ন হইলেও একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভাবে বা রূপে অভিব্যক্তি মাত্র। যেমন সমুদ্রের জলরাশি বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ক্রমে মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, তুষার আদি নানারূপে জগতে পরিদৃষ্ট হয় এবং পরিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় নদীর আকার ধারণ করিয়া ক্রমে নাম ও রূপ ত্যাগকরতঃ পুনরায় সমুদ্রেই মিলিত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও সর্ব্বধর্ম্মের আধার একমাত্র শ্রীভগবান হইতে প্রকাশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়া জগতের উন্নতি বিধানকরতঃ শ্রীভগবানেই পুনর্ম্মিলিত হয়। অতএব যে যে ভাবে ভগবানের আরাধনা করে বা যে কোন ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিয়া যে কোন রূপে তাঁহার পূজা করে শ্রীভগবান সেই ভাবেই তাহার সহায় হইয়া থাকেন। যথাঃ—

যো যো যাবং যাং যাং তনুং ভক্তঃ
শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং
তামেব বিদধাম্যহম্॥
গীতা ৭।২১

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "যে যে ভক্ত (ভগবানের) যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাদিগকে তাহাদের সেই সেই কার্য্যে অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি।"

অতএব দেখা যাইতেছে, যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার প্রতিপালনই তাহার মুক্তির কারণ। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টয়ান কোন প্রভেদ নাই। যিনি ধর্ম্মের এই সার্ব্বজনীন ভাব হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু। হিন্দুর মতে তিনিই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলে প্রকৃত মুসলমান এবং খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইলে প্রকৃত ক্রিশ্চিয়ান।

এই পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে, তৎ সমস্তই সেই অনন্ত প্রেমাধারের প্রেম-কণিকার বিস্ফুরণ। দয়াময় ত্রিতাপক্লিষ্ট মানব প্রাণে শান্তিবারি ঢালিয়া দিবার জন্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন এবং জীবগণকে তাঁহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করাইয়া পরমানন্দের অধিকারী করিয়াছেন। সময়ের চক্রে এই সকল ধর্ম্মমতে অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া জীবগণকে উন্মার্গগামী করে। তাহাতে ধর্ম্ম অধর্ম্মাচরণে পরিণত হয়, সাধু অসাধুর ন্যায় প্রতীত হয়। এইরূপ সময়ে শ্রীভগবান এই জগতে আবির্ভূত হইয়া সত্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। যথাঃ—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
গীতা।

শ্রীভগবান বলিতেছেন।——
"যে যে স্থানে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আচরিত হয়, সেই স্থানে আমি অবতার গ্রহণ করি। সাধুগণের রক্ষার জন্য এবং পাপিগণের নাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

অতএব ইহাতে স্পষ্ট-দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ, মহম্মদ বা যীশু সকলরূপেই সেই একই পরমদয়াল প্রেমস্বরূপ হিন্দুর ভগবান মুসলমানের আল্লা, এবং ক্রিশ্চিয়ানের গড্ (God) পূর্ণ কলা বা অংশ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সময়, দেশ ও মানবের উপযোগী ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের মতবাদের কিছুই নাই। ধর্ম্মজগতে মতবাদের সৃষ্টি হইলে পরস্পরের ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া মানব চিত্ত কলুষিত করে ও মানবকে ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট করে। কলুষিত চিত্তে ধর্ম্মের কোমল ভাবগুলি স্থান না পাওয়ায় চিত্ত মরুময় হয়। কাজেই ধর্ম্ম আলোচনা করিতে আসিয়াও অধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব এরূপ মত-বাদ সর্ব্বথা মুক্তি পরিপন্থী এবং হেয়। এইরূপ ধর্ম্মমত লইয়া মতবাদের গোঁড়ামী রক্ষার জন্য এরূপ কোন গর্হিত কার্য্য নাই, যাহা জগতে সাধিত হয় নাই। ধর্ম্মের গোঁড়া হইতে অগ্রসর হইয়া শেষ ধর্ম্মজ্ঞান লোপ হইয়া যায় এবং কেবল মাত্র গোঁড়ামীই অবশিষ্ট থাকে। ইহাই মতবাদের প্রধান দোষ। হিন্দুধর্ম্মে মতবাদের এই গোঁড়ামী স্থান পায় নাই। নিরীশ্বরবাদী পর্য্যন্ত এই উদার হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছে। তাই ইহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জনয়িতা সকল দেশের, সকল মতের পরিপোষক ও রক্ষক।

ধর্ম্মের সত্য ও তত্ত্ব জগতে দিন দিন প্রচারিত হইতেছে। সমন্বয়ের এই মৃদুমধুর হিল্লোল আবার ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। এইভাব ভারতেই আর্য্য ঋষিগণের সাধন ক্ষেত্রে জন্ম লাভ করিয়াছে এবং ভারত হইতেই

দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে তাই আধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের লীলা রঙ্গভূমি শ্রীভগবানের ক্রীড়া-নিকেতন এই ভারত জগতের ধর্ম্ম-গুরু।

ওঁ তৎসৎ ওম।

দীন—সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

—:0:—

আত্মোপদেশ।

(৪)

জগৎ ও গুরু।

যার গুরু নাই, তার কোন আশা নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও পরস্পর পরস্পরের গুরু ও শিষ্য অর্থাৎ কার্য্য কারণ ভাব সদাই অগ্র পশ্চাৎভাবে ঘুরিতেছে। সুতরাং আমার "পূজ্য, স্মরণযোগ্য" কেহই নাই, একথা কোন দেহধারী বলিতে পারে না।

যে উপস্থিত বিষয় বা অবস্থা জানে, তাহার নাম শিষ্য এবং যে উপস্থিত বিষয় বা অবস্থার কারণ জানে তার নাম গুরু।

যিনি কার্য্যের কারণকে জানেন, তিনি মানুষই হউন, বা নিরকার ব্রহ্মই হউন, তিনিই গুরু সমান। কার্য্যকে কারণ স্মরণ করিতে হয় এবং কারণকেও কার্য্য স্মরণ করিতে হয়। কারণ অবস্থায় কার্য্যকে স্মরণ করিতে হয়, তখন কার্য্যই স্মরণীয় গুরু। এবং কার্য্যাবস্থায় কারণকে স্মরণ করিতে হয়, তখন কারণই গুরু।

দেশ কাল পাত্ররূপ সূত্রবদ্ধ মন।

মন যতক্ষণ দেশ কাল ও পাত্ররূপ সূত্রের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, ততক্ষণ এই ত্রিবিধ উপাধি-জনিত ভাব সকল ক্ষণে ক্ষণে মনে উদয় হয়; অর্থাৎ "অমুক এই প্রকার, অমুককে এই বলিব, অমুকের সহিত এই আচরণ করিব" ইত্যাদি ততক্ষণ মন জগদাতীত অসঙ্গ পুরুষ ও প্রকৃতির সহিত সঙ্গ করিতে পারে না।

নারায়ণের অনন্তশয্যা—ক্ষীরোদ সত্ত্বগুণের সমুদ্র।

যাহারা নারায়ণের অনন্ত শয্যা ধ্যান করে, তাহাদের সহস্রাধিক ফল ভোগ করিতে হয়—অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন সহজে হয় না; যতদিন ব্রহ্মদর্শন না হয়, ততদিন জন্ম মৃত্যুরূপ তরঙ্গ নিবৃত্ত হয় না। একটি তুচ্ছ কল্পনা, বা রজঃ ও তমোগুণের ধাক্কায় ক্ষীরোদে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, সে তরঙ্গ লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ বহুকালাবধি বিস্তার করিতে থাকে, কিছুতেই ক্ষীরোদকে স্থির করা যায় না। ক্ষীরোদ না স্থির হলে ব্রহ্মদর্শন হয় না।

শক্তির দুই মুখ।

শক্তির দুই মুখ, গোড়ার দিকে, আর আগার দিকে, গোড়ার দিক অর্থাৎ যেদিক

থেকে, শক্তি বহির্ভূত হয়, সেটা অন্তর্মুখ সেইদিকে শক্তির ভাণ্ডার আর যে দিকে মুখ করে শক্তি ঠেলে বেরোয়, সেটা বহির্মুখ—সেদিকে ক্ষয়ের মুখ।

কার্য্যের উপাস্য বস্তু।

কার্য্যের কারণকে উপাসনা করাই মঙ্গল; কারণ-কার্য্য কারণের আত্মসম্ভূত সে কারণের আপনার লোক, এবং কারণ গর্ভসম্ভূত। সে যদি নিজ কারণকে ছাড়িয়া কার্য্য ধ্যানে বিভোর হয়, তাহা হইলে তাহার দেহ পোষণ কোথা থেকে হবে? পুষ্টি ত ডগার দিকে আসে না। আত্মহারা হইলেই যে প্রমাদ, জীব স্থির হবে কোথায়?

উপাসনা।

মা! সূর্য্যই হউন, আর চাঁদই হউন, আকাশই হউন বা পঞ্চভূতই হউন, সকলই তো তোর কার্য্যদেহ। তুই তো তিল থেকে তাল হয়েছিস। মা তুই আমাকে অমন করে মাঝে মাঝে গুলিয়ে দিস না।

মা! আমি যদি তোর সঙ্গে ভেদাভেদ না করি, তোকে পর না ভাবি, তাহলে কি তুই আমায় গায়ে পড়ে ভিন্ন করে দিতে পারিস।

কথাটার মানে কি দাড়াচ্ছে।

যে ব্রহ্মের ভিতর অনন্তকাল হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যথানিয়মে তালে তালে হইতেছে, সেই ব্রহ্ম নিজের ভিতরে রয়েছে।

সুতরাং রামই বল, আর কৃষ্ণই বল, আর রাধাই বল, আর বিষ্ণুই বল, আর তেত্রিশ কোটি দেবতাই বল, নিজের ভিতরে যে কেহ নেই, তাহা ত বলতে পারা যায় না। তারা সব গেলে শক্তির আদিম খনিতে মিশে গেছে। কিন্তু ব্রহ্ম সকল সংস্কার টুকুকে রেখে-ছেন। তিনি যখন ইচ্ছা যে মাল চাহেন, স্মরণ করিতে পারেন। তখন আর আমি জাতিস্মর, আমি অন্য জন্মে রাম ছিলাম, কি দত্তাত্রেয় ছিলাম বলে জাক করাব কি ফল? তবে শুভ সংস্কার জাগালে যে শুভফল হয় এতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

অহংকার।

যাহার শরীরে রস বেশী অর্থাৎ যে শক্তি এক নাম বিহীন, অসীম, অনন্ত ব্রহ্ম সত্তাতে খণ্ড খণ্ড নাম জাতি দিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। তারই নাম অহঙ্কার। এই অহংকারটা আস্ত গুলিখোর মিছে পণ্ডশ্রম করে মরে। যা হবার নয় তাও কি কখন হয়? কাজেই বেদান্তিদের বলত হয় যে, সৃষ্টিটা বিবর্ত্ত বা তাহা গুলিখোরি।

কল্পনা।

কল্পনা চিৎসমুদ্রে ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ-জনিত ঢেউ।

তুমি গোড়া ভুল না। ভুল না—ভুল না, চিৎশক্তি আর ক্রিয়াশক্তি বা পুরুষ ও প্রকৃতিকে ভুলনা ভুলনা। ভুলনা—প্রেম আর ভক্তি এদেরেও খবরদার হারাইও না।

দুই চার বার মা, মা, মা, বলবেই। তাহা হইলে কল্পনা মেঘগুলা, যাহা মনকে ঘেরে একটা অন্ধকার উৎপাদন করে, কেটে এবং যাবে মাও বাবা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—:0:—

নিবেদন।

দেব!

আজি টুটিয়াছে মোর মোহের বন্ধন।
গেছে লজ্জা, গেছে শঙ্কা, জেগেছে ক্রন্দন॥
খুলিয়া দিয়েছে কেবা হৃদয়ের দ্বার।
মরমের কথা যত লুকাতে পারি না আর॥
সরল অন্তরে তাই করি "নিবেদন"।
অতীতের কথা সব হয়ে বিস্মরণ॥
"তোমার" মনের মত করিয়ে গঠন।
তব পথে, তব মতে করগো চালন॥
বিশ্বাস না হয় যদি অবিশ্বাসী বলে।
অবিশ্বাসী, প্রতারকে কেল পায়ে ঠেলে॥
থাকিব না আর কাছে দহিতে তোমায়।
হাসিমুখে তোমা হ'তে লইয়ে বিদায়॥
মনে মনে তব নাম করিয়ে স্মরণ।
এ পাপ দেহের দেব করিব বর্জ্জন॥

দীন—হরিদাস।

—:০:—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের প্রতি।

মফঃস্বল হইতে পত্রিকা পরিচালন করা যে কত কষ্টসাধ্য,—তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। আমরা নগণ্য, কৌপীনমাত্রেক সম্বল, দরিদ্র সন্ন্যাসী; সুতরাং সমস্ত কাজই আমাদিগকে নিজে করিয়া নিতে হয়। "মঠ" হইতে যোরহাট সহর সাত মাইল দূরে অবস্থিত। সপ্তাহে ২।৩ দিন আসিয়া পত্রিকার প্রুফ দেখিয়া দিতে হয়। কম্পোজিটারগণ আসামদেশীয়, তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই সব প্রতিকুল অবস্থায় পড়িয়া আমরা একমাত্র শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ সম্বল করতঃ প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে পত্রিকা প্রকাশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। প্রত্যেক মাসের ১ম কি ২য় সপ্তাহ মধ্যে পত্রিকা হস্তগত না হওয়ায় অনেক গ্রাহক আমাদিকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়াছেন এবং প্রায়ই ২।৪ খানা পত্র পাইতেছি। সকলকে ভিন্ন ভিন্ন পত্র দ্বারা উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই সহৃদয়, ধর্ম্ম-প্রাণ গ্রাহকগণকে সানুনয়ে জানাইতেছি যে, আমাদিগকে কেহ অবিশ্বাস করিবেন না—আমরা প্রত্যেক মাসের ১৫ই হইতে ২২শে তারিখ মধ্যে পত্রিকা ডাকে দিতে চেষ্টা করিব, কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা শ্রীশ্রীগুরুদেবই জানেন—নিবেদন ইতি।

—:০:—

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, } শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(২২)

সন্দেহ পদার্থটী কিরূপ ?

[পক্ষান্তরে] একটু প্রণিধান করিয়া দেখ, এই যে ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক বস্তুর "এক" একত্ব বিষয়ে "দুই দুই আপত্তি দ্বারা" সন্দেহারোপ হইতেছে, এই সন্দেহ কোথা হইতে উদ্ভূত হয় ? আমাদের অন্নব্যঞ্জনাদি ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম রূপ বাহাত্তর হাজার "হিতা নামক" নাড়ী বা শিরা দেহ মধ্যে বিদ্যমান আছে। তাহারা দেহের হিতসাধন করে বলিয়া তাহাদের নাম "হিতা"। প্রত্যেক দেহীর দেহ মধ্যে ঐ সকল হিতা নাড়ী অবস্থিত। অশ্বত্থ পত্র যেমন শিরাজালে জড়িত, তদ্রূপ আমাদের সমস্ত দেহই ঐ সকল নাড়ী দ্বারা আবৃত। নাড়ীগুলি আমাদের হৃৎপদ্ম হইতে,—অর্থাৎ হৃদয়াখ্য মাংসপণ্ড হইতে বিনির্গত হইয়া "উল্লিখিত অশ্বত্থ পত্রের ন্যায়" সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের গতি বহির্মুখী;—অর্থাৎ বাহিরের দিকে। ঐ গতি অন্তর্মুখী করিতে হইলে যে পদার্থের প্রয়োজন হয়, সে পদার্থের নাম "বুদ্ধি"। বুদ্ধির স্বাভাবিক বাসস্থান ঐ হৃদয়াখ্য মাংসখণ্ড, বা হৃদ্পদ্মমণ্ডল। আমাদের চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ঐ হৃদয়স্থিত বুদ্ধির অধীন। কাজেই নাড়ীগুলিরও "বুদ্ধির" অধীন না হইয়া পারে না।

অভিপ্রায় এই যে,—'বুদ্ধি' আর 'মন' একই পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত পদার্থ-বিশেষ। মন আবার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি দশবিধ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ। পরন্তু মনের স্বাভাবিক বাসস্থান হৃদ্পদ্মমণ্ডল বা হৃদয়। সুতরাং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ এবং উল্লিখিত

হিতা নাড়ীগুলি সমস্তই বুদ্ধির অধীন না হইয়া পারে না। মাকড়শা যেরূপ নিজের লালা রূপ সূত্রজাল বিস্তার করতঃ এক-স্থানে অবস্থিত হইয়াই দূরস্থ কীট পতঙ্গাদি গ্রহণ করে, হৃদয়স্থ বুদ্ধিও ঠিক সেইরূপ স্ব-স্থানে থাকিয়াই ঐ সকল নাড়ীগুলি ইন্দ্রিয়-স্থানে প্রসারণ পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী বিষয় সকল গ্রহণ করে। সু-কু, [illegible] ইত্যাদি বিষয় সকল নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত বিচারে প্রবৃত্ত হয়। আর সঙ্কোচন কালে,—"অর্থাৎ মাকড়শা যেরূপ সূত্র জাল [illegible] একত্রিত করে,—সেইরূপ [illegible] একত্রীকরণকালে,"—বুদ্ধি [illegible] সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এই—সঙ্কোচ[illegible] —জীবের "নিদ্রা"।

অতএব জীব যখন নিদ্রা[illegible] থাকে, তখন তাহার ইন্দ্রি[illegible] বিষয় গ্রহণ-সামর্থ্য, সাংস[illegible] সুখ দুঃ[illegible] গ্রহণ, বস্তুর ভেদাভেদ জ্ঞা[illegible] ক্রি[illegible] লোপ পায়। পরন্তু মন [illegible] বু[illegible] 'কোন কিছু' বিশেষ বিজ্ঞানই থাকে না। সমস্তই "সুষুপ্ত্যবস্থায়" স্ব-স্বরূপে [illegible], নিরুপাধি রূপ প্রাপ্ত হয়। এই—প[illegible]ত্র রূপের—সৌষ্টবকেই—"সৎ-স্বরূপ" [illegible]ম অভিহিত করা হয়। অভিপ্রায় এই যে,—সুষুপ্তি সময়ে জীবের মন,—বুদ্ধ্যাদি করণগণ—উপসংহৃত হয়,—বাগাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও একরূপ নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়;—কাজেই কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম এবং সাংসারিক সুখ দুঃখ, ভাল-মন্দ, হর্ষ, শোক প্রভৃতি অযথার্থরূপ আর জীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। তখন মন নামক বস্তু একরূপ সর্ব্ব ক্রিয়া পরিশূন্য হইয়া অত্যন্ত বিশুদ্ধ, সত্যস্বভাব বিশেষ গণ্য হয়। এই-জন্যই সুষুপ্ত্যবস্থাকে সৎ-স্বরূপ-বিশেষ বলা হয়। —আর ঐ রূপ অবস্থার উৎকর্ষই পার্থিব বস্তুর স্বরূপে অবস্থান, যা তাহাই "সৎস্বরূপ" নামে অভিহিত হয়। তবেই দেখা গেল, স্বরূপ বিচ্যুত হইয়া "জাগ্রতাবস্থায়" বুদ্ধি স্বয়ং জীবের হৃদয়ে অবস্থান করতঃ হিতা নাড়ীগুলির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিস্তারিত করিয়া,—সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, বস্তুর ভেদাভেদ জ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে। সুতরাং ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের 'এক' একত্ব [illegible]ষয়ে যে বিভিন্ন সংযোগ বা সন্দেহের [illegible]য় তাহাও বুদ্ধির স্বরূপ বিচ্যুতাবস্থায়ই—[illegible]অর্থাৎ জাগরণাবস্থায়ই) কোন কিছু ক্রিয়া [illegible]শেষ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে,—বুদ্ধি স্ব[illegible]প অ[illegible]স্থান কালে "সৎ-স্বরূপ" হইয়া য[illegible] [illegible] তখন আর দ্বৈত, দুই ভাব ইত্যাদিতে কোন রূপ সন্দেহ, বা ভেদাভেদ জ্ঞান ইত্যাদি কোন কিছুই থাকে না। যাহা থাকে, অবশ্যই তাহা অনাবিল, অনুপম, অকৃত্রিম। সুতরাং ঐ পরম রূপ হারাই-লেই সকল সন্দেহের উদয় অবশ্যম্ভাবী হয়। অতএব স্বরূপ বিচ্যুতাবস্থায়ই কোন কিছু ক্রিয়া-বিশেষ হইতে, জীবের সন্দেহ নামক পদার্থ উদ্ভূত হয়;—ইহা অযৌক্তিক নহে।

জীব,-স্বরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে, অভ্যাসের দৃঢ়তায় তৎসাযুজ্য লাভ করে, বা তন্ময় হইয়া যায়। তখন স্বরূপের স্বাভা-

বিক রূপ অবশ্যই বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ পাথরের সহিত পাথর ঘর্ষণ করিলে, বা কাষ্ঠের সহিত কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেমন অগ্নি প্রকাশিত হয়—তদ্রূপ স্বরূপের স্বাভাবিক রূপ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। মতান্তরে ঐরূপ প্রতিফলনকেই আত্মদর্শন বলা হয়। পরন্তু তখন আত্মা—"জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ইত্যাদি রূপ" অনুভূত হন। কিন্তু সে অনুভবের ভাব, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অতীত "আত্মার" যে পরম ভাব,—"অর্থাৎ যাহা সনাতন, নিশ্চল ও অচ্যুত"—তাহা নহে। বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হওয়ায় উহা আত্মার "বিজ্ঞানময়" প্রভাব বিশেষ মাত্র। এই প্রভাব প্রদীপ্ত হইলে, জীব সর্ব্ববিদ্ হইয়া যায়। বস্তুর ভেদাভেদ জ্ঞান, এক বস্তু অন্যরূপে দর্শন ইত্যাদি সকল প্রকার ভেদ বুদ্ধি আর থাকে না। ভেদাভাবে যাহা থাকে, অবশ্যই তাহা প্রশান্ত, নির্ম্মল ও অটুট। কাজেই তখন সহজে বোধগম্য হইয়া যায় যে—

জীবের সুষুপ্তি সময়ে যে বস্তু বাহিক বিকার পরিত্যাগ করতঃ মন, বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি করণগণের সহিত স্বরূপে গমন করিয়া 'এক'—অভিন্ন "নিরাকার" রূপে অবস্থান করে,—সেই "গন্তা", যেখানে গমন করিয়া অবস্থান করে,—সেই "গন্তব্য", আবার যেখান হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার মন, বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি করণগণের সহিত নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়,—"অর্থাৎ কর্ম্মতৎপর হয়"—সেই "অপাদান" সমস্তই "এক "আত্ম বস্তু" ভিন্ন কদাচ দুই, দুই নহে। অভিপ্রায় এই যে, কোন একটা বড় রকম পুকুরের জল পাহাড় ছাপিয়া নালায় পড়িলে, সেই জলের নাম হয়,—"নালার জল"। কিন্তু জল নামক বস্তু 'বাস্তবিকই' স্বরূপে এক ভিন্ন, দুই নহে;—অর্থাৎ পুকুরেতেও যাহা, আর নালাতেও তাহা। তথাপি ব্যবহারিক জগতে তাহার নাম হয়,—"নালার জল"। এই নাম বা উপাধির কারণ কি? কারণ আর অন্য কিছুই নহে, কেবল জল নামক বস্তুর স্বস্থান-চ্যুতিই (অর্থাৎ পুকুর হারাণই) তাহার এক মাত্র কারণ। কিন্তু সে জল পুকুরে থাকিলে, তাহার আর নাম হয় না যে, "নালার জল।" সেইরূপে, "জীবের" সুষুপ্তি সময়ে" যে বস্তু মন, বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি করণগণের সহিত বাহিক্য বিকার পরিত্যাগ করতঃ যেখানে গিয়া নিশ্চেষ্ট, শান্ত ও নির্ম্মল হইয়া যায়,—"যাহাকে উদাহরণ ক্ষেত্রে" সৎ স্বরূপ, বা পার্থিব বস্তুর স্বরূপে অবস্থান বলা হয়,—সেই বস্তুর সে নিশ্চেষ্টরূপ ভাঙ্গিলেই, অর্থাৎ স্বস্থান বা স্বরূপ হারাইলে "জাগরণাবস্থায়"—তাহাই মন, বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি করণ,—হিতা নাড়ীর উদ্দীপন এবং তজ্জাত আলোচনা, বিবেচনা, সন্দেহ ইত্যাদি বহুবিধ গুণ ক্রিয়ায় বহুবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু "সুষুপ্তি" সময়ে সৎ স্বরূপে অবস্থান কালে আর বলা যায় না যে, এইটী বুদ্ধির কার্য্য,—এইটী মনের কার্য্য,—এইটী নিশ্চয়ই সন্দেহের কার্য্য ইত্যাদি। তখন সমস্তই নিরাকার, নিরুপাধি রূপ "এক" অভিন্ন বস্তু-বিশেষ। সেই "এক" অভিন্ন বস্তুর স্বরূপ হারাইলে নালার জলের মত"—মন, বুদ্ধি,

হিতা, সন্দেহ আলোচনা, বিচার ইত্যাদি নামের সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয়। এইজন্যই গন্তা, গন্তব্য ও অপাদান সমস্তই এক অভিন্ন আত্ম-বস্তু বিশেষ বলা হয়। তবেই দেখা গেল যে, সন্দেহ নামক পদার্থটী আর কিছুই নহে,—উহা স্বরূপ বিচ্যুতিরই অবস্থান্তরিত অবস্থা বিশেষ, বা স্বরূপ বিচ্যুতির কোন কিছু প্রকার হইতেই উদ্ভূত। ইহা আর অস্বীকার করিতে পার না।

অতঃপর স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখ,—ঐ স্বরূপ বিচ্যুতির রূপ ও প্রকারটী আবার কি রূপ? যে হিতানাড়ী প্রত্যেক দেহীর দেহ মধ্যে অবস্থিত, সেই হিতানাড়ী এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধির স্বাভাবিক আকার জ্ঞানীর মধ্যেও যেরূপ, আর অজ্ঞানীর মধ্যেও সেইরূপ; অর্থাৎ আমরা যাহাকে পরম জ্ঞানী বলি, সেই জ্ঞানী ব্যক্তির শরীর যন্ত্রের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ,' মন, বুদ্ধি ইত্যাদির স্বাভাবিক আকার ও গঠন যে রূপ, আর অজ্ঞানী লোকের শরীর যন্ত্রের মধ্যেও ঠিক সেই এক রূপ। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়াদির আকার ও গঠন বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ দেখা যায় না। পরন্তু আহার, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি বিষয়ে এতদুভয়ের স্বাভাবিক বিভিন্নতা কিছুই নাই। তবেই দেখা গেল, স্বরূপ বিচ্যুতি হইলে প্রত্যেক দেহীর দেহ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং আহার, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণতঃ কোন রূপ প্রভেদ থাকে না। তবে প্রভেদ কি? "স্বার্থত্যাগে—ন্যায়ের উপর বলিলে বলিতে হয়,"—প্রভেদ আর কিছুই নহে; কেবল বোধ বিষয়েই প্রভেদ হয়। অনাদি অনন্ত কাল এই প্রভেদ চলিয়া আসিতেছে। অতএব বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে,—স্বরূপ-বিচ্যুত হইলে যখন কেবল মাত্র বোধ বিষয়েই প্রভেদ লক্ষিত হয়, তখন স্বরূপ বিচ্যুত না হইলে,—স্বরূপের স্বাভাবিক রূপ বাস্তবিকই প্রভেদশূন্য হইয়া পূর্ণ বোধরূপে —"অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞান রূপে" চির অব্যাহত থাকে, বা তাহাই পূর্ণ জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ হয়। সুতরাং দাঁড়াইল এই যে, যাহা স্বরূপের নিশ্চিত রূপ তাহাই" পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ"। অর্থোপলব্ধির নিমিত্ত "উদাহরণ ক্ষেত্রে" জীবের সুষুপ্তি অবস্থাকে ঐ রূপের সহিত তুলনা করা হয়।

জীব, ভ্রমাংশ অবলম্বন না করিলে কদাচ ঐ স্বরূপ জ্ঞান হইতে বিচ্যুত বা স্খলিত হয় না,—বা যে বস্তু পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ,—তাহা ভ্রম-কলঙ্কাবৃত না হইলে কদাচ তাহার বৈলক্ষণ্য হয় না। তবেই দেখা গেল যে, স্বরূপ বিচ্যুতির প্রকার বা রূপটী আর কিছুই নহে; কেবল ভ্রমাংশ মাত্র। অতএব গন্তা, গন্তব্য ও অপাদান রূপে যে বস্তু 'এক' অভিন্ন প্রতিপাদিত হইয়াছে,—সেই পূর্ণজ্ঞান বস্তুর সহিত (নামান্তর কূটস্থ চৈতন্যে) ভ্রমাংশ অবলম্বন করিয়াই জীব স্বরূপ বিচ্যুত স্বরূপ পরম হয়। আর তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে হৃদয়স্থ বুদ্ধি; হিতা নাড়ীর সহিত ভ্রমাংশ অবলম্বন করিয়া, ঐ সকল ভ্রমপূর্ণ নাড়ীগুলি চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্থানে প্রসারণ পূর্ব্বক,—এক বস্তুকে অন্য রূপে দর্শন,—সৎ বস্তুকে অসৎবস্তু-রূপে গ্রহণ,—বস্তুর একত্ব বা অভিন্নত্ব বিষয়ে দ্বিত্বাদি সংযোগ দ্বারা চতুর্দ্দিকেই দুই, দুই,

সন্দেহ স্বপ্ন ইত্যাদি নানারূপ ভ্রমের কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়। এ ভ্রম দু,এক দিনের নহে; "মূলীভূত", চিরন্তন। এই জন্যই "উপরে বলা হইয়াছে"—হিতা নাড়ীগুলির গতি বহির্মুখী। কিন্তু ঐ বুদ্ধি যদ্যপি "প্রথমাবধি" কেবল স্বরূপ চিন্তায় নিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে হিতা নাড়ীগুলির গতি অবশ্যই অন্তর্ম্মুখী হইয়া তদনুকূল হিত সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কাজেই স্বরূপের স্বাভাবিক রূপ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইয়া,—"অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণরূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া"—জীব বিজ্ঞানময় হইয়া যায়, বা স্বরূপের সারূপ্য লাভ করে। পরন্তু স্বরূপ অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞান প্রতিফলিত হওয়ায়,—সহজেই বোধগম্য হয় যে,—গন্তা, গন্তব্য, অপাদান ইত্যাদি উদাহরণে যে বস্তুর 'এক' একত্ব বা অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, তাহা কেবল অর্থোপলব্ধির নিমিত্ত এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যথায়, সে বস্তু কদাচ সেরূপ নহে। অর্থাৎ তাহা গন্তাও নহে, গন্তব্যও নহে, আর আপদানও নহে। তাহা শব্দাতীত, অনুপমান বস্তু বিশেষ। ভ্রমাংশ অবলম্বনেই তাঁহার বৈলক্ষণ্য ভাববা শব্দ বাচ্যে তিনি বহুরূপী। আর যখন ভ্রম দূরীভূত হয়, তখন তিনি অনাশ্রয়, অসঙ্গ, 'এক', অখণ্ড, পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ।

অতএব "পক্ষান্তর" আলোচনা দ্বারা দেখা গেল যে, সন্দেহ নামক পদার্থটী আর কিছুই নহে; কেবল ভ্রমাংশ মাত্র। পরন্তু ভ্রমেরই বিপর্য্যাস শক্তি হইতে উহা উদ্ভূত, বা আত্মস্বরূপ বিচ্যুতিরই নামান্তর মাত্র। সুতরাং এবম্ভূত সন্দেহ দ্বারা "ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক" পরম বস্তুর 'এক' একত্ব বিষয়ে দ্বিত্বাদি সংযোগ, "অর্থাৎ দুই দুই আপত্তি" অস্বাভাবিক নহে। অন্যথায় চিত্ত বিচারপরায়ণ হইলে বাস্তবিকই উল্লিখিত রূপ বিচারে সন্দেহ নামক পদার্থটীও সেই 'এক'—অভিন্ন পরম পদার্থের প্রতিপাদক হইয়া যায়। কাজেই ভূমা ও পূর্ণপর ব্রহ্মের এক একত্ব বা অভিন্নত্ব চির অব্যাহত থাকে। এরূপ হইলে, হিন্দু ধর্ম্মের বিভিন্ন মতাবলম্বী ধর্ম্ম প্রচারকদের ভেদবুদ্ধিমূলক বাক্য— "যথা নিষ্কামের পর ভূমা, আবার ভূমা হইতে ব্রহ্মত্ব ইত্যাদি"—একবারেই পণ্ড হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, ঐরূপ বাক্য দ্বিত্বাদির আশঙ্কা থাকায়, উহা "শ্রুতি-নিন্দিত"। কারণ, দুই দুই ভাব কখন শ্রুতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইতে পারে না,—বা তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। এইজন্যই ঐ সকল বাক্য "শ্রুতি-নিন্দিত", আবার যাহা শ্রুতি-নিন্দিত, তাহা দ্বারা প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎকারণত্ব প্রতিপাদন ত দূরের কথা, সংসার ভয় নিবারণের আশাও সুদূরপরাহত। সুতরাং তাহা কখনই ধর্ত্তব্য নহে, ভ্রমাংশ জ্ঞানে সর্ব্বদাই ত্যাজ্য। "আলোচ্য সন্দেহ পদার্থটীও তথৈবচঃ"।

শ্রীরঙ্গলালদেব শর্ম্মা।

সন্তোষপুর; হুগলী।

আত্মোপদেশ।

(৫)

মন্ত্র।

সব মন্ত্রই বাজে—প্রেম বা ভক্তির সহিত মা বলে, নিরাকারাকে, ডাকা বা জাগানই আসল মন্ত্র। প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও লক্ষ্যই মন্ত্রের অঙ্গ। সে মাগি আর মিন্‌সে শূন্যে শূন্যে লুকিয়ে থাকে। শূন্যকে লক্ষ্য করে, চোক কান বুজে প্রাণভরে মা, মা বলিলেই দুটোই দেখা দেয়।

ধ্যানের সময় বীজের ধ্যান।

ধ্যানের সময় নিজের দেহ, জগতের দেহ, চন্দ্র সূর্য্য, সব দেহকে ভুলে, শুধু সেই বীজ ও কারণ রূপের ধ্যান করিতে হয়। অক্ষয় সত্বার।

অস্তিত্ব।

তোমার এত বড় দেহটার মধ্যে—তোমার অস্তিত্ব টুকু, বা চিৎ ও ক্রিয়া শক্তিটুকুই আসল, বাকী সব ভুসী মাল।

ভয়, বিস্ময় আসে কোন দিক দিয়ে ?

"ভয়, বিস্ময়" আসে ডগার দিক দিয়ে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এগুলো দুর্ব্বল, গোড়ার খবর জানে না বলে, এই ধার দিয়ে ভয় ঢুকে।

গোড়ার দিকটা অক্ষয়, অজর, কিছুতেই কিছু হয় না—সেইজন্য যে গোড়ার খবর রাখে, আর গোড়ায় চাড়া দিয়ে গিয়ে বসে, তার আর ভয়, বিস্ময় ঢুকবার পথ নাই।

অবিশেষ পর্ব্ব।

তুমি সীমাশূন্য অবিশেষ পর্ব্বে চালা বান্ধিয়া চিরদিনের জন্য, নিঃশঙ্কচিত্তে সেই শূন্যময় ও শূন্যময়ীর দেশে বিহার কর পরন্তু ভক্তি ও প্রেমকে সেই মহাশূন্যে পাহারা রেখ, ভক্তি বা প্রেম যদি গা ঢাকা দেয়, তাহা হইলে উপদেবতারা তোমার চালা-শুদ্ধ তোমাকে বিশেষ পর্ব্বে ছুড়ে ফেলে দিবে।

রূপ কল্পনা নানা রকমের।

রূপ চুক্‌লেই পাপ চুকে, কারণ রূপ দেখেই লোকে আকুল হয়, ভয়, বিস্ময় আদি ভাব সব রূপই মনে জাগিয়ে দেয়।

ধ্যান থেকে রূপ ত্যাগ হলেই, থেকে যায়, নিরাকার অক্ষয় পদার্থ অর্থাৎ নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত, খাঁটি মাল।

মৃত্যুকালে-সংস্কার সাক্ষাৎ।

মানুষের মরিবার সময় মা বা বাপ কাছে না থাকিলে, মুমূর্ষু ব্যক্তি মা-রে, বাবারে বলে মাঝে মাঝে শূন্যে আওয়াজ দেয়।

সে সাকারকেই ডাকুক, আর নিরাকার-কেই ডাকুক, তার মন্ত্রটি ঠিক। সে ভাল-বাসার জিনিষ দেখা দিলে, আবার একটু জীবন সঞ্চার হয়।

বিশ্বাস ও আশা ভরসার বোনেদ।

আমরা আমাদের আশা ভরসা ও বিশ্বাসের বোনেদ বাহিরে, অর্থাৎ দৃশ্যাদিতে পাকা

করিয়ে জমিয়ে রেখেছি।

প্রকৃত বোনের, কিন্তু অন্তরে অর্থাৎ "নিরাকার আত্মা"। অনেকেই আত্মাকে জানে না, এবং ধর্ম্মশূন্য হইয়া এবং ধর্ম্মশূন্য হয়ে একেবারে ভুলে গেছে।

প্রেম

ভালবেসে যে উদ্যমই কর, তাহাই সুখকর।

কারণ ও কার্য্য।

"কারণ" যখন, নিজগুণ বিকাশ করিয়া কার্য্যদেহ বিস্তার করে, তখন কারণ ধর্ম্ম কিছুই ক্ষীণ ভাব ধারণ করে এবং কার্য্যের একটা ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া উহার সহিত মিলিত হয়। তাহার পর কার্য্য যদি নিজ পৈত্রিক ধর্ম্মে ঔদাস্য এবং নূতন ধর্ম্মে আসক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষীণ পূর্ব্ব ধর্ম্ম ও পুষ্ট নব ধর্ম্ম এই উভয়ের মিশ্রণ হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আর একটী ধর্ম্ম দাড়ায়। এইরূপে কার্য্যের ক্রম যত বৃদ্ধি হয়, ততই কারণ-ধর্ম্মের ক্ষীণতা এবং কামের (বিকৃত ধর্ম্মের) বিবিধ ভাবে বিস্তার হইয়া থাকে। যথা:—শীতল জল, অগ্নিরূপ কারণ সংযোগে, প্রথমে ঈষৎ উষ্ণ, পরে যদি তাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া যায়, তাহা হইলে উষ্ণ হইতে উষ্ণতর হইতে হইতে ক্রমশঃ বাষ্প হইয়া শীতলতার ও রস গুণের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। জলের পূর্ব্ব ধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইয়া গেল।

আবার জল সামান্য উত্তাপের সংযোগ হওয়ার পর যদি তাপ বৃদ্ধি না হইয়া কমিয়া যায় অর্থাৎ অগ্নির ধর্ম্ম ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে, জল আবার পূর্ব্বের ন্যায় নিজের শীতলতা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে।

দেহ দাড়ায়ে থাকে, ইন্দ্রিয়বলে; ইন্দ্রিয় দাড়ায়ে থাকে, মনের বলে; মন দাড়াইয়ে থাকে বুদ্ধি বা নিশ্চয়ের বলে; বুদ্ধি দেহ দাড়াইয়া থাকে নিজ বলে বা নিজ ধর্ম্মে।

দেহের কারণ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের কারণ মন, মনের কারণ বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণ সত্তা, এই সত্তাই একমাত্র নিত্য বস্তু; ইনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, চিদানন্দ স্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপী। ইনি স্বপ্রত্যক্ষ্য অর্থাৎ নিজ অস্তিত্ব নিজে অনুভব করেন মাত্র এবং আর কোন অস্তিত্ব অনুভব করেন না।

চৈতন্য, আনন্দ এবং ইচ্ছা শক্তির একত্র সন্নিবেশই তাহার স্বরূপ বা স্বধর্ম্ম।

যিনি বুদ্ধি, তিনি ব্রহ্ম নহেন, তিনি চিৎ শক্তির এবং ক্রিয়া শক্তির কার্য্য।

ব্রহ্মের স্বধর্ম্মের এবং বুদ্ধির স্বধর্ম্মের মধ্যে একটু ব্যবধান আছে। সে ব্যবধানটি কল্পনার। বুদ্ধি বিবিধ অস্তিত্ব অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন যে, তিনি আছেন এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ইচ্ছাশক্তি এবং চিদানন্দ স্বরূপ, একটি নিত্য কারণ আছেন।

মন, অনুভব করেন, আমরা, আমি আছি, বুদ্ধি আছেন, এবং বুদ্ধির কারণ ব্রহ্মরূপ নিত্য বস্তু আছেন।

ইন্দ্রিয়েরা মনে করেন, আমরা আছি, মন আছেন, বুদ্ধি আছেন, ব্রহ্ম আছেন। দেহ মনে করেন, ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে,

এবং ব্রহ্ম আছেন।

মনুষ্য এই কয়বিধ কার্য্যকারণ সমন্বিত যন্ত্র। সৃষ্টির এই যে উপরোক্ত কয়েকটী সম্মিলিত অঙ্গ বা অবয়ব ইহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম্ম আছে এবং সেই নিজ ধর্ম্মের অন্তর্গত আপন আপন কারণের ধর্ম্মও বর্ত্তমান আছে।

দেহ যদি নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার কারণ ইন্দ্রিয়দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়েরা যদি নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে মনের ইষ্ট সাধন করিতে হইবে। মন নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার কারণ বুদ্ধিকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

বুদ্ধি যদি নিজ ধর্ম্ম বজায় রাখিতে চায়, তাহা হইলে তাহার সত্যকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

কার্য্য ও কারণের যুদ্ধ।

একটি দেহ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কার্য্য-ধর্ম্মের ও কারণ-ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ হয়।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই গুলিই প্রধান অস্ত্র। এই অস্ত্র মনের উপর বর্ষণ হয়।

মনের উপর সর্ব্বদাই শব্দাঘাত, স্পর্শাঘাত, রূপাঘাত, রসাঘাত ও গন্ধাঘাত হইতেছে। মন যদি সর্ব্বদা বুদ্ধিকে স্মরণ করে, তাহা হইলে শব্দ স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধাঘাতে মূর্চ্ছিত ও বিচলিত হয় না।

বুদ্ধি যদি অক্ষর, সচ্চিদানন্দকে স্মরণ করে, তাহা হইলে কিছুতেই বিচলিত হয় না। যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকাশ, আনন্দরূপ জয় লাভ করে।

ব্রহ্ম ধ্যানী।

যাহারা ব্রহ্মধ্যানী, কখনই ব্রহ্মকে ভুলেন না এবং অপর কোনরূপের ধ্যান করেন না, তাহারা সেই সত্যের আরাধনাবলে প্রত্যুৎপন্নমতিস্বরূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। তাহাদের বুদ্ধিক্রিয়ার ও মননক্রিয়ার আবশ্যক হয় না। বিষয় ও ব্রহ্ম শক্তির মধ্যে কোন প্রকার কল্পনাদিরূপ ব্যবধান নাই। ব্রহ্ম সকলের কারণ বলিয়া আত্মস্বরূপে সকলকেই ভেদ ও পরাজয় করিয়া বসিয়া আছেন।

ব্রহ্মভূতাত্মা।

কেহই নাই, একমাত্র নিত্য পদার্থ আমিই আছি; যাহা দেখিতেছি, ইহা অতি চঞ্চল ক্রিয়া শক্তি—আমি ইহার আদি ও অন্ত দেখিতে পাইতেছি না। এবম্বিধ বোধপ্রাপ্ত হওয়াকে "ব্রহ্মভূত" বলা হয়।

শ্রুতি ও স্মৃতি।

যে যেমন শ্রোতা, সে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় সম্বন্ধে, সেইরূপ "শ্রুতি", এবং যে যেমন দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা, সে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় সম্বন্ধে তদ্রূপ স্মৃতি প্রাপ্ত হয়।

মহর্ষিরা, ব্রহ্মধ্যানে নিরত হইয়া ব্রহ্ম কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টির আদ্যাবস্থায় যে শব্দ ও শব্দার্থ (বা শব্দ জনিত মূর্ত্তি) ব্রহ্মাকাশে প্রকাশ পায়, উহা বুদ্ধিতে ধারণ করিয়া রাখেন।

কারণ বা বিশ্বাসের ভিত্তি।

তুমি কি আপনাকে সুখদুঃখভোগী এবং জন্ম-মৃত্যু-ধর্ম্মশীল দেহ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছ? অথবা অজর, অমর, সর্ব্বজ্ঞ, নিরাকার আত্মা (পুরুষ ও প্রকৃতি) বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছ? তুমি মহৎ সম্পদ ও ঘোর বিপদে আপনাকে কি চক্ষে দেখ অর্থাৎ কি ভাব? বিপদে তোমার বল বুদ্ধি হয়, কি বিপদ মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তোমার শক্তি ও জ্ঞান ক্ষয় হয়?

তোমার উৎপত্তি বিলয়ের ভূমি কি তুমি অষ্ট প্রহর প্রত্যক্ষ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ? এই জগৎটা কি তোমার চক্ষে ভাসে বা তুমিই ভাসে?

আলোক ও অন্ধকার।

যে লোক বাহ্যলোক ও অন্ধকারের অধীন হয়, যাহা আত্মজ্যোতিতে সুব্যক্ত, সে লোক কি তোমার উদয় হইয়াছে?

সিদ্ধলোক।

ব্রহ্মলোক সিদ্ধলোক ইহা আত্মলোক; এখাতে আত্মা আপনার স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত, এখানে কল্পনারূপ সাধনের প্রয়োজন হয় না। এখানে হাতড়াইবার কিছুই নাই। চিৎশক্তি, ক্রিয়াশক্তি যাহা সৃষ্টির মূল কারণ বা ভিত্তি তাহা এখানে স্বরূপে উপস্থিত।

নিরহংঙ্কারতা বা নিষ্কামতা।

যতক্ষণ মনুষ্যের অহংঙ্কার মোহ থাকে, অর্থাৎ আমি অপর অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী এইরূপ বিশ্বাস মনে থাকে এবং যতদিন বিবিধ সুখাদির কামনা থাকে, ততদিন তাহার আত্মজ্ঞানোদয় হয় না। যে মন আত্ম-জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের কামনা আশ্রয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ অনাত্ম ভোগাদি বিষয়ে আসক্ত, সে মন আত্মার স্বরূপ দর্শন পায় না।

প্রেম ও ভক্তি।

প্রেম ও ভক্তি বা অকপট অনুরাগ, অভ্যাস করা হয়, উহা আত্মোপলব্ধির সহায় হয় বলিয়া; পরন্ত অভ্যস্ত হইয়া গেলে উহা সংসার আচরণে বিশেষ কার্য্যকারী হয়। যে ব্যক্তি দুঃসাধ্য সূক্ষ্মকে সাধিত করে সে কি আর স্থূলকে আপনার করিতে পারে না?

ব্রহ্মপদ লাভ।

ব্রহ্মপদ লাভ হইলে, ব্রহ্মাণ্ড সংস্থান প্রণালী আয়ত্ত হয় বা সদাই প্রত্যক্ষগোচর থাকে এবং উহা দেশ, কাল ও পাত্রাদির দ্বারা সাধিত হয় না।

ক্ষেত্রে কর্ম্মের উপস্থিতি বা আগমন।

যখন কর্ম্ম উপস্থিত হইবে, তুমি মনে করিও যে, অনন্ত চিৎশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি তুমিই স্বয়ং—তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তোমার আয়তনের অন্ত নাই—তোমার অনিচ্ছা ভিন্ন চিৎশক্তির ও ক্রিয়াশক্তির বিয়োগ হইতে পারে না এবং তুমি অনন্ত শক্তিমান হইয়া কি না করিতে পার? কি সংস্কার তোমার মধ্যে নাই? এই মনে করিয়া আত্মপদ সিদ্ধ করিয়া-যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম কর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

:0:

কেন ?

নামটী কেন শুনলে পরে

অবশ অন্তর নাচে মৃদু স্পন্দনে ?

ভাব্‌তে কেন বিবশ হৃদি

হয় গো মুক্ত ষড়-রিপু বন্ধনে ?

ডাক্‌লে কেন আবেগভরে

মন্দাকিনীধারা, বহে হৃদি-নন্দনে ?

দেখতে কেন বিহ্বল চিত্ত

নিভৃত নিবাসে, কাঁদে উচ্চ ক্রন্দনে ?

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত কেন অবিরত

বসায়ে তাহায় ক্ষুদ্র হৃদি-গুল্মনে,

চাহে গো পূজিতে চরণ পঙ্কজে

ভকতি কুসুম প্রেম-অশ্রু-চন্দনে ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—:০:—

বন্ধুর পত্র।

প্রিয়তম সুরেন !

এক বৎসরও পূর্ণ না হইতে তোমার যে এত উন্নতি হইবে বাস্তবিক তাহা আমি আদৌ ভাবি নাই। তোমার এই আকস্মিক উন্নতি দেখিয়া আমি ভীত, স্তম্ভিত এবং পক্ষান্তরে সুখী বটি! সেই দ্রুত, সতেজ পুষ্ট পত্রের হাত ধরিয়া এই শ্লথ, মুমূর্ষু, কঙ্কালাবশিষ্ট পত্র আসিতেছে, এজন্য ভীত, সেই পদ্মার খরস্রোতের ন্যায় তীব্র, উদ্বেলিত, গভীর ভাব-তরঙ্গের পশ্চাতেই যে, এই স্রোতহীন, চঞ্চলতাশূন্য বালখিল্যমুনিগণের নিকট সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান ফল্গুনদীর গোষ্পদ দেখা দিতেছে, এজন্য স্তম্ভিত। আর, সুখী কেন ? তা পরে বলিব।

চিত্তে যাহার স্থৈর্য্য নাই, আত্মায় যাহার বিশ্বাস নাই, প্রেমে যাহার অনুভূতি নাই, কর্ত্তব্য পথে অবিচলিত থাকা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ; তাহার চিত্ত ঝটিকাসংক্ষুব্ধ সমুদ্র-তরঙ্গবৎ চঞ্চল ভীষণ, তাহার আত্মা জলবিন্দুলোলচপলবৎ—ক্ষণস্থায়ী—মিথ্যা; তাহার প্রেম বণিকবৃত্তির [illegible] শব তৈলচিত্র, সুতরাং পৈশাচিক—সে মানব নামের অযোগ্য, পাশব-বৃত্তির পরিচালনশীল যন্ত্র বিশেষ ; যন্ত্রের ত আর হৃদয় নাই, তাহার হৃদয় কামারের হাঁপর ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখ সুরেন, এই বৃত্তির ছায়া না মাড়াইতেও তোমাকে আমি তীব্রভাবে কটাক্ষ করিব,—অনুরোধ করিব,—আবশ্যক হইলে ব্রহ্মাস্ত্র হানিব। এই বুঝি তোমার নির্ম্মল ভালবাসা ? এই বুঝি তোমার একপ্রাণতা ? এই বুঝি আমার আমিত্বে তোমার আমিত্ব ডুবাইয়া দেওয়া ? এই বুঝি তোমার, তোমার আমিত্বে আমার আমিত্ব নিমজ্জিত রাখিবার প্রয়াস ? এই বুঝি তোমার তুমি হওয়া ? এত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হৃদয় তোমার ! এত অপরিণামদর্শী, চটুল স্বভাব তোমার ! এত নির্ম্মম, অন্তঃসারশূন্য, কঠোর প্রাণ তোমার ! এমন স্বৈরবিলাসিনীর চাটুকার

বাক্য তোমার! ধিক্ তোমার ভালবাসায়, শতধিক আমার নির্ব্বুদ্ধিতায়!

সেইদিন তোমাকে মনে করিতে বলি, যেদিন অস্ফুট সন্ধ্যালোকে স্বর্গীয় ন্যায়-পঞ্চানন মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে তুমি, আমি! সেইদিন তোমাকে মনে করিতে বলি, যেদিন তোমার শ্বশুর ঠাকুরের বকুলতলার রাস্তায় গভীর অন্ধকারে তুমি, আমি! সেইদিন তোমাকে মনে করিতে বলি,—যেদিন প্রথম দিন সাত-আনীর বাড়ীতে যইবার রাস্তায় তুমি, আমি, কেন? আমি কি সেই সময় তোমাকে তোমার নিকট প্রতীয়মান বিষয় বাসনা বিমুক্ত তোমার হৃদয়কে সাবধান করি নাই? তোমার ন্যায়, একদল লোক আছে, যাহারা ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট হইয়া অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় দেয়; তাহাদের সংসর্গ আমার লোভনীয় নহে বলিয়া, আমি সেইরূপ আর একটী লোক দ্বারা প্রতারিত বলিয়া, সতর্ক করি নাই? তোমার বালস্বভাবসুলভ অধীরতা যে খেলা না পাইলে, ধীর, স্থির, দৃঢ়ভাবে তোমার আমিত্বকে আমার আমিত্বে দূরের কথা, তোমার নিজের আমিত্বেও অবিচলিত রাখিতে সক্ষম হইবে না, এজগতে কাহারও মর্ম্মের সাথী হইতে পারিবে না,—পুনঃ পুনঃ একথা বলিয়াছিলাম; তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়া আমিও কি ভুলিয়া যাইব? প্রবঞ্চনার জালে তুমি প্ররোচিত করিয়াছিলে না বলিয়া আমি তাহা বিস্মৃত হইব? তাহা কখনই নহে; আমি যত দিন তাহা আবশ্যক মনে করি নাই, ততদিন দূরে দূরে ছিলাম। যখন আবশ্যক বুঝিয়াছিলাম, তখন সরিয়া আসিয়াছি, তোমাকে কোলে করিয়াছি, হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে তোমাকে তোমার ঐ সরল কমনীয় দেবোপম মূর্ত্তিকে স্থাপিত করিয়াছি; আমিও কি নর প্রেত যে তাহা আবার বিসর্জ্জন করিব?

আবার সেই দিন মনে করিতে বলি—হায়! আমার সে দিন কে বহু যুগের কথা—যে দিন পুণ্যসলিলা করতোয়ার জ্যোৎস্না-প্লাবিত সৈকতশয্যায়—বিভোর, আত্মহারা তুমি, আমি। সেই দিন মনে করিতে বলি,—যেদিন মনে হইলে এখন ভয় হয়,—যেদিন রজনী মহাকালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিদ্যুৎ-ঝঙ্কারে, গভীর জীমূতমন্দ্রে ঝড় বৃষ্টির মহা নাটকের অঙ্ক অভিনয় করিয়া মানব হৃদয়ে মহাত্রাস উপস্থিত করিতেছিল, এমন সময়েও বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া তুমি, আমি! সেই দিন মনে করিতে বলি,—যেদিন বর্ষার বারিধারাসিক্ত চূর্ণমেঘকুন্তলজ্যোৎস্নামুখরিত প্রকৃতির কোমল শীতল ক্রোড়ে করতোয়ার শষ্পসমাচ্ছন্ন সুখ শয্যায়—কি যেন কোন্ অপার্থিব শান্তি-রাজ্যের পথে গমনোৎফুল্ল পাশাপাশি এ বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে একা সুষুপ্ত তুমি, আমি! আর জীবনের সেই নূতন অদ্ভুত দিন মনে করিতে বলি, যে দিন—ত্রিজগজ্জননী মায়ের আসন সম্মুখে দুইটী অর্দ্ধদেহ বিজড়িত ভাবে পূর্ণাঙ্গে পরিণত করিয়া মায়ের চরণতলে ভক্তি বিগলিত অশ্রুধারায় অভিসিঞ্চিত প্রণত তুমি, আমি! সেইদিন মনে—না আর না, আর আমি সে দৃশ্য, সে ভাব, সে উচ্ছ্বাস লিখিতে পারিতেছি না—অশ্রু! তুমি সরিয়া যাও। ক্ষণেক আমাকে সেই প্রেম রাজ্যে লইয়া চল, আমি এমন উন্মত্ত আর দিখব না—*** সুরেন্—প্রা ণ সুরেন—প্রাণাধিক সুরেন, তুমি আমার কে? তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছিলে

তুমি কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ ? অসম্ভব নয়; নতুবা এমন পত্রও তুমি লিখ—তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়া আমিও কি ভুলিয়া যাইব ? তুমি সে স্বর্ণপ্রতিমা বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইতে বসিয়াছ বলিয়া আমিও কি নরপ্রেত যে তাহা বিসর্জ্জন দিব ? তুমি কালে যাহা পারিবে, আমি কখনও তাহা পারিব না।

দেখ সুরেন ! তোমার সেই দিনের ও এই দিনের ব্যবহারে কত প্রভেদ; অথবা প্রভেদ নাই, তোমার প্রকৃতিই এইরূপ। এক মুহূর্ত্তেই তুমি স্বর্গে উঠ, আবার অর্দ্ধ মুহূর্ত্তেই তুমি নিজকে গভীর অন্ধ-নিখাতে পতিত দেখ, অন্যায় আব্দার, যখন যা চাই, তখনই তাহা না হইলে হইবে না; তোমার মৌহূর্ত্তিক পরিবর্ত্তনে ইংরেজ কবির সেই "I rose one morn and found myself famous" কথাটা মনে পড়ে। রাতারাতি লাখপতি, কুবের বা আরও কিছু, আবার পর মুহূর্ত্তেই গরীব দীনহীন, পথের কাঙ্গাল। আমরা কর্ম্মভূমি ভারতের লোক, হটাৎ এত উন্নতি দেখিলেই দ্রুত অবনতির কল্পনা করিয়া থাকি; লাউকুমড়া গাছের সহিত তাল, অশ্বত্থ গাছের তুলনায় ক্ষণভঙ্গুর মনে করি। আমরা জানি যে বীজ যত দীর্ঘ-কালে অঙ্কুরিত, বৃক্ষকারে পরিণত হয়, তাহার স্থায়িত্ব তত অধিক, তত দৃঢ়; আমার মনে হয়, এই আশঙ্কাতেই বুড়ীতলা যাইবার রাস্তায় সেতুর উপর বসিয়া সেই রাত্রে বৃদ্ধ চাণক্যের সেই "দিনস্য পূর্ব্বার্দ্ধ পরার্দ্ধ ভিন্না ছায়েব মৈত্রী" শ্লোকটা তোমার নিকট বলিলে তখন তুমি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলে—এখন আবার নাসিকা সম্প্রসারণ কর কেন ?

তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া—আমাদের সেই স্বর্গীয় স্মৃতি পায়ে ঠেলিয়া নয় মাসের বাচ্চা পেটে গাইটা কাসরোগে শয্যাগত কাতর কি না, বাছুরটা এখন কেমন আছে, বড় জোর সু-খবর হইল ত ঠাকুরঘরের দেবী-প্রতিমা খানা বেশ আছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি আবল তাবল গোটাকত খবরযুক্ত তুচ্ছ একখানা পত্র রোজ চাও, তাহা না পাইলে তুমি আর আমার সংসর্গে আসিবে না বলিয়া পরিষ্কার প্রত্যাহার পত্র লিখিয়া বস—কবুল জবাব দাও, তুমি সুরেন,—তুমি যে এই সমস্তের প্রত্যাশী, সুধু এই সংবাদের প্রত্যাশী হইবে, আমার সহিত এত চতুরতা খেলিবে (যাহা জানিবার, বলিবার জন্য দীনহীন পথের কাঙ্গাল অবস্থাতেও আমার লোকের অভাব নাই) তুমি যে আদর করিয়া বুভুক্ষিত আমাকে রাস্তা হইতে ডাকিয়া আনিয়া আহার করাইবার ছলে অন্নে, উত্তোলিত গ্রাসে, কাল হলাহল বিষ দিয়া অকারণে (ভাবিয়া দেখিও আমি তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই) অযথা আমার প্রাণ নাশ করিবে। তোমাকে এই সমস্ত না হইলে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এ সংবাদ শুনাইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। ভাবিয়াছিলাম তোমা দ্বারা আমার অন্তরূপ অতৃপ্ত পিপাসার শান্তি হইবে। হা বিধাতঃ ! তুমি আমার সে সাধেও বাদী হইতে চলিয়াছ।

তুমিই না বলিতে পবিত্র স্মৃতিই মনুষ্যের জীবন—পবিত্র আদর্শই পরলোকের পথ প্রদর্শনের আলো ! তবে কি আমাদের স্মৃতি-পবিত্রা নহে ? আমাদের ঐকান্তিকতা প্রাণের

নহে ? কিন্তু এই দুই দিনেই সে স্মৃতি উড়িয়া গেল ? যদি তাহাই হয়, তবে ওঃ তুমি কি ভীষণ ! কি কুটীল ! তোমার ব্যবহার অস্ত্র কত সুসজ্জিত, নয়ন-মন-প্রীতিকর, অথচ কি প্রাণান্তক তীক্ষ্ম ক্ষুরধার । হায় মানুষ ! এমন হৃদয় লইয়াও তুমি এই বিষম সংসার অগ্নি পরীক্ষায় অগ্রসর, আবার তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার প্রত্যাশী হও ! সুরেন ! একখানা পত্রের মূল্যে তোমার এত মর্ম্মস্পর্শী উচ্ছ্বাসময় প্রাণ চিরবিক্রীত হইতে বদ্ধপরিকর ! একখানা পত্রের আদান প্রদানে তাহার স্থিতি, আবার তাহার অভাবে তিরোধান হইতে কৃতসংকল্প ? ছি ! ছি ! একথা লিখিতে তোমার লজ্জা হইল না ? মনে ধিক্কার আসিল না ? অম্লান অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহার ঘোরাল চিত্র অঙ্কিত করিয়া ডাকের মুখে ফেলিয়া দিলে ? তোমাকে আর কি বলিব ? কত বলিব ? একটা কি দেড়টা পয়সা কি এতই দুর্লভ ? তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি তোমাকে পত্র লিখিয়া সুখী করিবার প্রয়াসী হইব না । তুমিও পার ত এরূপ পত্র লিখিও না । সম্মুখে আমার সহিত সংসারের কথা কয়টা বলিতে, পত্রে তাহার বিপরীত কেন ? কিন্তু দেখিব তোমার শক্তি, দেখিব তোমার দৃঢ়তা, তুমি কেমন করিয়া আমার হাত হইতে এড়াইয়া গিয়া শান্তি লাভ কর ! তুমি জান না কি ঐন্দ্রজালিকের মহা খর্পরে তুমি পড়িয়াছ ? সাধ করিয়া (তোমার ভাষায়) কি অমৃতময় বিষ, (আমার ভাষায়) কি বিষময় অমৃত— আমার এই প্রেমসমুদ্র মন্থন করিয়া তুলিয়াছ । তুমি দুর্ভাগা তাই সেই বিষের জ্বালায় হতচেতন ; আমার অদৃষ্ট ভাল তাই আমি পীযূষধারায় অমর ! তুমি আমাকে বিষ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলেই বাঁচিয়া যাও—আমি তোমাকে—অমৃত পাইয়াছি, পরিত্যাগ করিলেই মরিয়া যাই, শান্তি হারাই । তুমি যদি ছাই ভস্মের জন্য এত স্বার্থপর হইতে পারিলে, আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে—অন্ততঃ তাহাতে কৃতসংকল্প হইতে পারিলে—তবে সেই ছাই ভস্মের জন্য আমি স্বার্থপর হইতে পারিব না কেন ? তোমাকে পরিত্যাগ না করিতে পারিব না কেন ? অবশ্যই পারিব—বুঝিলে এইজন্যই তোমার আকস্মিক উন্নতিতে পক্ষান্তরে আমি সুখী । তুমি ভবিষ্যতে আর পত্র লিখিবে না বলিয়া ধমকাইয়াছ, উহাই তোমার শেষ পত্র বলিয়া ভয় দেখাইয়াছ; কিন্তু আমি ? আমি তোমাকে চিরদিন অবিচ্ছেদভাবে রাখিয়া এই উপস্থিত এই সুদীর্ঘ গালাগালী পূর্ণ পত্র লিখিতেছি— আবার লিখিব বলিয়া সাহস দিতেছি—তবে,— তবে সুরেন ! তোমার ভবিষ্যৎ আমার বর্ত্তমানের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী নয় কি ? আমি বলিব, নিশ্চয় ! অতি নিশ্চয় ! সন্দেহ মাত্র নাই ।

তুমি কত ছন্দোবন্দে, কত পাকে প্রকারে তোমার মরিয়া দাঁড়ান প্রকাশ করিতেছ । কিন্তু আমার জীবনে তাহা হইবে না । তাই, হইবার আগে ঘেঁসিতেছিলাম না ; যখন মুখে তুলিয়াছি, তখন গিলিব, এতে যা হয় হইবে; বাচি ভাল, আর মরি, সেত পরম মঙ্গল । নাম লিখিবার স্থানে—(বেশ লক্ষ্য করিয়া যাইতেছি) কয়েক বারেই সুরেন লিখিয়াছ । তুমি সুরেন্দ্রমোহন, তা বেশ ! সুরেন্দ্রমোহন এখানে কেন ? স্বর্গে যাও, পারিজাত

লোক, ঐরাবতে চড়, নন্দনকাননের হাওয়া খাও, এ অধমের গৃহে সুরেন্দ্রমোহনের স্থান হইবে না। আমি? আমি সেই পুরাতন তুমিই রহিয়া যাইব। আমি মাতৃচরণে অবিশ্বস্ত নই যে, তোমাকে "তোমার" তারাচরণ, ঠিকানা, পিতার নাম, পরিচয় ইত্যাদি লিখিব। যদি তারাচরণই লিখিলাম, তবে "তোমার তারাচরণ" লিখিব কেন? তারাচরণ কি এতই সস্তা যে সেরদরে বাটখারা ধরিয়া বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে দোকান খুলিব? আমার জিনিষ আমার, "তারাচরণ" আমারই থাকুক—"তোমার তারাচরণ" লিখিতে যাইব কেন? সাধক কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"ও পদের মত পদ পাই তো সে পদ লয়ে বিপদ হরি"। সাবধান সুরেন, ফের যদি বেতাল সুরে সেতার বাঁধ, তবে তোমার অকল্যাণ জানিও, এই দেখ তোমার পত্রের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তোমাকে টিট্‌কারী দিয়া আমি লিখিতেছি—

তোমার "তুমি"।

—:0:—

সর্ব্বব্যাপী।

যদি তুমি থাক দূরে
কি হবে উপায় মোর?
হৃদয়ের দুঃখ জ্বালা
কেমনে হবে গো দূর?
কাহারে জানাব আমি
আমার হৃদয়-ব্যথা?
কে আর আপন হয়ে
শুনিবে আমার কথা?
আমার বলিতে ভবে
আর যে গো কেহ নাই,
তবে কি চরণে তব
আমার নাহি গো ঠাঁই?
অকূল পাথারে পড়ে
হয়েছি গো দিশেহারা,
কেমনে পাব গো কূল,
যদি নাহি দেও সাড়া?
কেহ যদি বলে দেব
তুমি মোরে গেছ ছেড়ে,
শুনিয়ে একথা নাথ!
কাঁপিয়া মরি যে ডরে।
জীবনে থাকে না আশা
পরাণ কাঁপিয়া উঠে,
তুমি আছ দূর দেশে
শুনে বুকে শেল ফুটে,
তবে কি শুন না তুমি
আমার মরম গাথা?
তবে কি বুঝ না তুমি
আমার হৃদয়-ব্যথা?
না—না, তুমি আছ কাছে
আমার অন্তর বলে,
পেতে নানা ছলা খেলা
খেলিতেছ নানা ছলে।
ঘটে ঘটে আছ তুমি
মিশিয়ে সবার প্রাণে,
ওই, যে তোমার গীতি
গাইছে মধুর তানে!

পরাণে পরাণ ঢেলে
বিরাজ হৃদয়-স্বামী।
সকলি তোমার জানা
তুমি যে অন্তর-যামী।
হৃদয়-কদম্ব মূলে
কভু বা দাড়ায়ে আসি,
বিবেক বাশরী তানে
আমারে ডাক গো হাসি।
অজ্ঞান, অবোধ আমি
না বুঝি তোমার খেলা,
হেলায় হেলায় মোর
ফুরায়ে আসিল বেলা।
কখন কি ভাবে জানি
ডুবিবে জীবন-তরী,
তুমি না সহায় হ'লে
কেমনে দিব গো পাড়ি?
এস নাথ! এস কাছে
সময় বহিয়ে যায়,
করুণা করিয়ে দীনে,
রাখ গো চরণ ছায়।
বারেক হৃদয় মাঝে
আসিয়ে উদয় হও,
ভুবনমোহন বেশে
পরাণ কাড়িয়া লও,
বারেক তোমারে দেব
হেরিব হৃদয় মাঝে,
এস গো, এস গো নাথ,
মদনমোহন সাজে!
নয়ন ভরিয়ে তোমা
হেরিতে আছে গো সাধ,
পূরাতে দাসের সাধ
সেধ না, সেধ না বাদ।

কেন গো তোমারে নাথ
আমি না দেখিতে পাই,
তোমার মধুর ডাক
কেন না শুনিতে পাই?
সদাই আমার কাছে
তুমি ত রয়েছ নাথ,
কেন না ধরিতে পারি
বাড়াইয়ে দিয়ে হাত?
আমি কি তোমার দয়া
পাব না, পাব না তবে?
সাধের জীবন মোর
তবে কি বিফলে যাবে?
তোমার মঙ্গল-গাথা
গাইছে জগৎ জুড়ে,
কেবল আমি কি নাথ
মরিব বিপথে ঘুরে?
এস নাথ! কাছে এস
দেরী নাহি কর আর,
কৃপা করে দেখা দিয়ে
কমাও হৃদয়-ভার।
বিষম বিপদে পড়ে
কাঁদিয়ে আকুল হ'লে,
তাড়াতাড়ি এসে নাথ
তুলিয়া লও গো কোলে।
বিবেক বাশরী তানে
তখনি ডাকিয়া কও,
"আমি যে গো সর্ব্বব্যাপী
কেন তবে ভয় পাও?"
সত্য যদি ওহে প্রভো!
আছ তুমি বিশ্ব জুড়ে,
লও তবে লও দেব
কোলে তুলে এ দীনেরে।

দীন—উমেশচন্দ্র।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

(২)

(জীবের স্বরূপ)

"আমি নিশিদিন আছি নাথ তব
পথ পানে শুধু চাহিয়া
কোথা তুমি প্রভো! নিমিষে নিমিষে
কত যুগ যায় চলিয়া।

হিয়া চাহে তব হিয়ার সঙ্গ,
প্রতি অঙ্গ মম চাহে প্রতি অঙ্গ,
আকুল তৃষিত পরাণ আমার,
রাখিতে পারি না ধরিয়া।

এস নাথ, এস হৃদয় আসনে,
পুলকিত কর প্রেম পরশনে,
এ অশ্রু বেদনা, এত আকিঞ্চন,
সফল করহ আসিয়া।

প্রাণের পিপাসা হৃদয়ের আশা,
তুমি কি জান না প্রভো?
নয়নে নয়নে রয়েছ লাগিয়া
ভুলিয়া রয়েছ তবু?

লহ নাথ, লহ মোরে,
আর ত পারি না বহিতে এ ভার
ধর হে আমারে আসিয়া,
আমি দরশে পরশে অবশ অঙ্গে
তোমাতে যাইব মিশিয়া॥"

আজ হেমের বিরহবেদনামাখা করুণ-গীতি হরিশের হৃদয়ও স্পর্শ করিল, হরিশ তৃষিত চাতকের ন্যায় ভাবে বিহ্বল হইয়া অনিমেষ নয়নে হেমের মুখ পানে তাকাইয়া গান শুনিতেছিল! গান শেষ হইলে, হরিশ বলিল, ভাই হেম! আজ তোমার গান শুনিয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। তুমি এমন মন-প্রাণমুগ্ধকর গান করিতে পার, তা ত এত দিন জানিতে পারি নাই। এরূপ গান মধ্যে মধ্যে শুনিতে পারিলে সংসার-বিষয়বিষে জর্জ্জরিত প্রাণে—ক্ষণেকের জন্যও আনন্দের হিল্লোল খেলিয়া যায়। তুমি আজ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলে, এখন ঐবিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তুমি কিরূপ ভাবে জীব-তত্ত্ব প্রতিপন্ন কর, আমার জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।

হেম—কোহম্? আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি এবং পরেই বা কোথায় যাইব? এই প্রশ্ন-ত্রয় যেদিন জীবের মনে উঠিবে, সেইদিন তার ধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিবার সময় আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। কেমনা ধর্ম্ম "আমির" উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুধু ধর্ম্ম বলি কেন? সবের মধ্যেই যে "আমি" ওতপ্রোভাবে বিজড়িত। "আমি"কে সুখী করিবার জন্যই ত সকলে ব্যাকুল! ঐ যে চন্দ্রিকাশালিনী—বসন্ত যামিনীতে—মকমলমণ্ডিত পুষ্পশয্যোপরি যুবক আলিঙ্গনাবদ্ধা যুবতীর মৃণাল ভূজলতায় আবদ্ধ হইয়া তদীয় কোমল অঙ্কে ঢলিয়া পড়িতেছে, কিজন্য? "আমি"কে সুখী করিবার জন্য। আবার ঐ যে কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগী, বিষয়বিরাগী সাধু রাজৈশ্বর্য্য ধূলীমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া দীনবেশে তৃণশয্যায় বৃক্ষতলে ফলমূলাহারে দিনযামিনী অতিবাহিত

করিতেছেন, সেও "আমি"কে সুখী করিবার জন্য। আবার ঐ যে প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি স্বীয় রাজ্যাধিকার পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত—লক্ষ লক্ষ নরশোণিতের পরিতর্পণে আপনার অনল তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে, সেও "আমি"কে সুখী করিবার জন্ত। ঐ যে পরহিত ব্রত-ধারী সাধু পরদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত আপনার দেহ দানকরতঃ কৃতার্থ বোধ করিতেছে, সেও "আমি"কে সুখী করিবার জন্ত। আবার কেহ সহস্র সহস্র প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়া নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের পুষ্টি সাধন করিতেছে, সেও "আমি"কে সুখী করিবার নিমিত্ত। ফলতঃ যে কোন বিষয় দেখ না কেন, মূলে "আমি"। এই যে প্রত্যেক বিষয়ের মূলে "আমি" জড়িত রহিয়াছি, এ "আমি" র তত্ত্ব কি সর্ব্বাগ্রে জানা কর্ত্তব্য নয়? পাপে আমি, পুণ্যে আমি, ভালতে আমি, মন্দতেও আমি, সৎএ আমি, অসতেও আমি, ধর্ম্মেও আমি, অধর্ম্মেও আমি, এ হেন "আমি" র স্বরূপ কি জানিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না?

আমি কোথা হইতে আসিয়াছি! পরে কোথায় যাইব, আমি নিত্য না অনিত্য? আর এই যে সুখ দুঃখ, শোকতাপ প্রভৃতি দ্বন্দ্বই বা আমার উপরে আসে কেন, ইত্যাদি বিষয়ে কি মনে প্রশ্ন উঠে না? প্রত্যেকের মনে একদিন না একদিন এ প্রশ্ন উঠিবে, কারণ এখান হইতে যে ধর্ম্মের সোপান আরম্ভ হইয়াছে। আপাততঃ জীব প্রকৃতির রূপ-রসৈশ্বর্য্যের মোহমদিরাপানে আপনাকে ভুলিয়া প্রকৃতিপ্রদত্ত ভোগে উন্মত্ত হইয়া নিজের "স্বরূপ" ভুলিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু প্রকৃতি জীবকে চিরদিন মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না, ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিবে, চমক ভাঙ্গিবে। জ্ঞান-সূর্য্যের বিকাশে মোহ-তম অপসৃত হইবে, তখনি জীব বিবর মধ্যগত সুষুপ্ত অজগরের ন্যায় মস্তোকোত্তলন করিবে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে ধ্বনি উঠিবে "কোহম্"? "আমি" কে, ? কোথা হইতে আসিয়াছি? যে দিন কোথা হইতে আসিয়াছি জীব জানিতে পারিবে, অর্থাৎ "আমি"র স্বরূপ বুঝিতে পারিবে, সেইদিন স্বরূপ লাভের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িবে। আর সেই স্বরূপ লাভের যে উপায়, তাহাকে সাধনা বা উপাসনা বলিয়া থাকে। যে সময় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন শ্রীল সোনাতন গোস্বামী "আমি"র স্বরূপ ও সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিবার জন্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:—

"কে আমি? কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে নাহি জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত।

বস্তুতঃ জীবের যখনই মায়া-ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখনই "আমি"র স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসু হইবে। এখানে দেখা যাউক জীবের স্বরূপ কি?

গত কল্য তুমি আমাকে যেরূপভাবে জীবতত্ত্ব বুঝাইয়াছ, তাহাতে জীব অনিত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কেননা যে বস্তু এক বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাতেই লীন হয়, যাহার নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য বা স্বরূপত্ব বিদ্যমান নাই, যাহা

একবার উৎপন্ন, আবার বিলয় হয় অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু হয়, সে বস্তু কখনই নিত্য হইতে পারে না। লীন অর্থে লয়, লয়ের অর্থ ধ্বংস। যাহা ধ্বংস হয়, তাহা আবার নিত্য? তুমি বলিয়াছ "বুদ্‌বুদ্‌ বিনষ্ট হইলে জলে মিশিয়া জলই হইবে, তদ্রূপ জীবের জীবত্ব বিনষ্ট হইলেই ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্ম হইবে।"

বুদ্‌বুদ্‌ মিথ্যা, তার নিজের কোনই সত্ত্বা বা অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই, সুতরাং বুদ্‌বুদ্‌ অনিত্য। জীব যদি সেইরূপ একবার ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার ব্রহ্মে লয় হয়, তাহা হইলে জীবও বুদ্‌বুদের মত অনিত্য। উৎপত্তি-লয় স্বীকার করিতে হইলেই, জন্মমৃত্যু স্বীকার করিতে হইবে। যে বস্তুর জন্ম মৃত্যু আছে, স্ব-স্বরূপে চিরদিন বিদ্যমান থাকিতে পারে না, প্রকৃতি কর্ত্তৃক রূপান্তর হইয়া থাকে, তাহাকে কখনই নিত্য বলা যাইতে পারে না। পঞ্চ ভূতাত্মক জগৎ অনিত্য বলা হয় কেন? তার কারণ, তার ধ্বংস আছে, স্ব-স্বরূপে চিরদিন বর্ত্তমান থাকিতে পারে না; প্রকৃতি কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ের সময় স্ব-স্বকারণে লয় হইয়া থাকে; অর্থাৎ ক্ষিতি জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি পুরুষে লয় হইবে। আবার সৃষ্টিকালে প্রকৃতি কর্ত্তৃক বিকাশ হইবে। এরূপ একবার সঙ্কোচ, একবার বিকাশ হইয়া থাকে। প্রকৃতি কর্ত্তৃক একবার সৃষ্ট, আবার প্রকৃতিতে বিলয় হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে অনিত্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। যখন একটী বস্তু অন্য একটী বস্তুতে লয় হইবে, তখন পূর্ব্ব বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, সত্ত্বা হারাইয়া ফেলে। ক্ষিতি যখন জলে লয় হইবে, তখন ক্ষিতির অস্তিত্ব থাকে না; না থাকার কারণ, ইহাদের নিত্য স্বরূপ নাই, সুতরাং অনিত্য। প্রকৃতি জীবকে রূপান্তরিত করিতে পারে না, কেবল তার স্বরূপ আবরিত করিয়া রাখে মাত্র।

তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, লয় অর্থ ধ্বংস, কিন্তু ধ্বংস অর্থ একেবারে বিনাশ মনে করিও না; জগতে এমন কোন বস্তুই সৃষ্ট হয় নাই, যাহা একেবারে বিনাশ হইতে পারে। প্রবাহরূপে জগতের সমস্ত বস্তুই নিত্য। একটী বালুকাকণাও অনিত্য নয়, অর্থাৎ একেবারে বিনাশ হয় না। ঐ যে প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক দেখিতে পাইতেছ, এখন উহার সৌন্দর্য্য মাধুরী উছলিয়া পড়িতেছে, দু'দিন পরে এ সৌন্দর্য্য, এ সুষমা থাকিবে না, শুকাইয়া যাইবে। শুকাইয়া কোথায় যাইবে? একেবারে কি বিনাশ হইবে? না বিনাশ হইবে না, যাহা একবার বিনাশ হয়, তাহা আবার উৎপন্ন হইতে পারে না। পুষ্পস্তবক শুকাইলে, উহার সৌন্দর্য্য ও রূপ মাধুরী অব্যক্তাবস্থায় সূক্ষ্ম বীজাকারে অবস্থিতি করিবে। প্রকৃতির গুণে পুনরায় বীজ হইতে বৃক্ষোৎপন্ন হইয়া পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইবে। তখন আবার পুষ্প রূপ-রসে পূর্ণ হইবে, এবং সৌন্দর্য্যমাধুরী বিকিরণকরতঃ জগৎকে মুগ্ধ করিবে। ঐ যে কাষ্ঠখণ্ড প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইতেছে, ঐ কাষ্ঠখণ্ড কি একেবারে ধ্বংস হইবে? অগ্নিতে স্থূল অবয়বের ধ্বংস হইবে বটে, কিন্তু উহার সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি কেহ ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবে না।

তদ্রূপ কোন বস্তুরই একেবারে ধ্বংস হয় না। কেবল রূপান্তর ঘটে মাত্র। এইরূপ যে বস্তুর পরিণাম বা রূপান্তর হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বস্তুকেই অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। অনিত্য অর্থে যার নিত্যত্ব চির-দিন একইরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে না, প্রকৃতি কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হইয়া থাকে, পুনরায় স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। যেমন দুগ্ধ রূপান্তরিত হইয়া দধিতে, দধি মাখনে, মাখন ঘৃতে পরিণত হয়; কিন্তু ঘৃত কখনই আর স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ দুগ্ধ হইতে পারে না। কারণ দুগ্ধ অনিত্য বস্তু, তার নিজের নিত্য স্বরূপ নাই, তন্নিমিত্তই পরিণামী দুগ্ধ আর স্বরূপ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ পরিণামী বস্তুকেই অনিত্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। নতুবা মূলে অনিত্য, (একেবারে ধ্বংস) এরূপ কোন বস্তু উৎপন্ন হয় নাই।

পূর্ব্বে যেরূপ বস্তুর পরিণাম উল্লেখ করা হইল, জীব কি সেইরূপ পরিণামী ও অনিত্য? না, জীব পরিণামরহিত নিত্য। জীবের স্বতন্ত্র নিত্য স্বরূপ আছে। জীব মায়াবরণে যতই আবৃত হউক না কেন, যতই প্রকৃতি কর্ত্তৃক বিবর্ত্তিত হউক না, পুনরায় স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। কেন না জীবের স্বরূপ নিত্য। সুবর্ণকে অন্য কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত করিলে তার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে না; অগ্নিতে পুড়াইলে পুনরায় স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। তদ্রূপ জীব জ্ঞানরূপ অগ্নিতে আপনাকে দগ্ধ করিতে পারিলে, মায়াজাত বিকৃত সংস্কারগুলি বিনষ্ট হইবে। মায়াজাত বিকৃত সংস্কার বিনষ্ট হইলেই, স্ব-স্বরূপ বিকাশ হইবে। এইরূপ যে সমস্ত বস্তুর পরিণাম বা রূপান্তর হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বস্তুকেই অনিত্য বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

"তুমি" বা "আমি" বলিয়া যে জীব, সে জীবও কি ঐ রূপ অনিত্য বা পরিণামী? তোমার যুক্তি অনুযায়ী জীব অনিত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু জীব অনিত্য নয়, নিত্য পরিণাম-রহিত, অজ, অব্যয়, জন্ম মৃত্যু রহিত, স্ব স্বরূপে চিরদিন বিদ্যমান। ঐ শুন ভগবানের শ্রীমুখের বাণীঃ—

" ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো, নিত্যঃ, শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ "
গীতা ২য়, ২০ শ্লো।

আত্মার কখনও জন্ম বা মৃত্যু নাই, তিনি অজ, নিত্য, অক্ষয় ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই।"

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥
গীতা ২য় ১৭।

" যে আত্মা এই সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চে সত্তারূপে পরিব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই, কেহই সেই অব্যয়, স্বরূপের বিনাশ সাধনে সমর্থ হয় না।"

সুতরাং জীবের স্বরূপ নিত্য। জীবের স্বরূপ ও ভগবানের স্বরূপ ভেদ ও অভেদভাবে চিরদিন বিদ্যমান। ভেদ এই অর্থে—জীব কখনই ভগবৎ স্বরূপ লাভ করিতে পারে না, আবার অভেদ এই অর্থে জীবের সত্তা

ভগবান হইতে পৃথক্ নয়। জীব-শক্তি চিদ্রূপ হইয়াও চিদ্রূপ স্বরূপশক্তি হইতে ভিন্ন, এই নিমিত্ত ইঁহাকে তটস্থা শক্তি বলে। মায়াশ্রয়ত্ব বিভুত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বর হইতে মায়ামোহিত্ব, অনুত্বাদিগুণ যোগহেতু জীব ভিন্ন; কিন্তু চিদ্রূপাত্মারূপে ঈশ্বর ও জীব অভেদ। জীব যখন মায়াপাশ ছিন্ন করিবে, তখন সে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করিবে। ইহাকেই বলে মুক্তি। জীব অন্য কোন বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া মুক্তি লাভ করিবে না, কেননা তাঁর স্বতন্ত্র নিত্য স্বরূপ আছে। যে বস্তুর স্বতন্ত্র, নিত্য স্বরূপ নাই, সেই বস্তুই ক্রমোন্নতির পথে, অন্যের সহিত মিলিত হইয়া মুক্তি লাভ করিবে। ক্রমোন্নতির পথে একটী বালুকাকণাও মুক্তি লাভ করিবে বা ব্রহ্মে লয় হইবে, কিন্তু সে কত যুগ, কত কল্প অতীত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই; আর ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারিলে জীব এই মুহূর্ত্তেই মুক্তি বা স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে।

এই নিমিত্ত জীব চিরনিত্য। এই যে জীবের জন্ম-মৃত্যু ও লয়-বিলয়-রহিত চির "নিত্য স্বরূপ", এই অমৃত স্বরূপ-সম্পদ জীবকে ভগবানই দিয়াছেন, কেন না জীব যে তাঁর বড় সাধের! বড় প্রিয়! এবং পার্ষদ! জীব লইয়াই ত তাঁর যত লীলা খেলা। তাই জীবও নিত্য, লীলাও নিত্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীল সোনাতন গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে জীবের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিলেন;

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।"
চৈতন্যচরিতামৃত॥

জীবের স্বরূপ ভগবানের নিত্য দাস। (সখা, সখী, পিতামাতা প্রভৃতি) পরিপূর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর, জীব তদংশ। সূর্য্য কিরণের সহিত সূর্য্যের যেরূপ অংশাংশী ভাব, জীবের সহিত ঈশ্বরেরও সেইরূপ অংশাংশী ভাব। এই নিমিত্ত ঈশ্বরও নিত্য, জীবও নিত্য এবং অবিনাশী। ঈশ্বরের সহিত জীবের সেব্য সেবক, প্রভু—ভৃত্য অথবা পতি পত্নীর ন্যায় ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব ব্যবস্থাপিত আছে॥ ঈশ্বরে জীব লয় হয় না। কিরণ যেমন সূর্য্যে ফিরিয়া যায় না, সেইরূপ জীবও ঈশ্বরে প্রলীন হয় না। কিন্তু কিরণ যেমন সূর্য্য-মণ্ডলের পার্শ্ব পরিত্যাগ করে না, মুক্ত আত্মাও তদ্রূপ ঈশ্বরের পার্ষদ হয়।

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদ এই তিনি শক্তিই ভগবানের প্রধান। আনন্দাংশে হ্লাদিনী—সদংশে সন্ধিনী ও চিদংশে সম্বিদ। এই তটস্থা সম্বিদ শক্তিই জীব নামে অভিহিত। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে আছেঃ—

যৎতটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসম্বেদ্যাদবিনির্গতং।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥

"অর্থাৎ চিৎ পদার্থ, স্বীয় সম্বেদ্য, মূল পরমপূর্ণ পদার্থ হইতে বিনির্গত এবং তটস্থ হইয়া থাকেন, গুণরাগ দ্বারা রঞ্জিত তটস্থ চিদ্রূপই জীব সংজ্ঞায় অভিহিত।" ক্রমশঃ।

দীন—প্রেমানন্দ।

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী।

কেদারা (১৯) একতালা।

তোমারে চাহিয়ে চলিব নাথ, তোমারি প্রেমের ভুবনে।
তোমারি করুণা করিয়ে স্মরণ প্রেমাশ্রু বহিবে নয়নে॥
তব জ্যোতি ভাসে তারকা তপনে,
তোমারি লাবণ্য চন্দ্রমা-কিরণে;
হেরিব তোমারে নীলিম গগনে,
অনল অনিলে, গহনে॥
তব হাসি খেলে কুসুমেরি দলে,
তব প্রেম মাখা তরুলতা ফলে,
তোমারি মাধুরী মলয় হিল্লোলে
বিতরে প্রীতির চন্দনে॥
বিহগ কূজনে, ভ্রমর গুঞ্জনে,
তব প্রেমগাঁথা শুনিব শ্রবণে,
তোমারি রাগিণী নিখিল ভুবনে॥
বাজিছে মধুর সু-তানে॥
অচল শিখরে, বিজন প্রান্তরে
জলধি মাঝারে, অন্তরে বাহিরে,
বিশ্বরূপে প্রভু হেরিব তোমারে
বিমল প্রেমের কিরণে॥

———:0:———

স্বামী রামতীর্থ।

১৯৩০ সংবৎ কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদে পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত গুজরাণওয়ালা জিলায় মুরলিওয়ালা গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে স্বামী রামতীর্থ মহারাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি মহাত্মা তুলসীদাসের বংশধর ছিলেন। শৈশবেই ইহার মাতৃবিয়োগ হয়। কাজেই লালনপালনের ভার তখন হইতে পিতৃ-হস্তেই ন্যস্ত হইল। স্বামীজির পিতা পত্নী-বিরহে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি যখনই তাঁহার মনে হইত যে,

মাতৃহীন শিশুর ভার তাঁহারই স্কন্ধে পতিত হইয়াছে এবং কর্ত্তব্যের বিন্দুমাত্র ত্রুটী ঘটিলে ভগবানের স্যায়দণ্ড তাঁহারই মস্তকে পতিত হইবে, তখনই তিনি শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া পুত্রকে নিজবক্ষে ধারণ করিতেন এবং মাতৃবৎ তাঁহার লালনপালন করিতেন। সিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া স্বামীজি আশৈশব ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠেন।

পিতা যথাসময়ে পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। স্বামীজি স্থানীয় ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি অত্যন্ত তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন বালক ছিলেন। শিক্ষকগণ ও প্রতিবাসী সকলেই তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন। তিনি সকল শ্রেণীতেই সমপাঠীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করেন এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিত শাস্ত্রে এম্, এ ডিগ্রী লইয়া বাহির হন। কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে? এই সময়ে তাঁহার স্নেহময় পিতা স্বর্গারোহন করিলেন? তাঁহার মনে তখন সংসারে বিরাগ জন্মিল, তিনি সংসারকে বিষ সদৃশ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন স্নেহ-মমতায় ও সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে কতকটা আশ্বস্ত করিলেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌরবের সহিত অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রভূত আলোচনা করিয়াছিলেন। কলেজে নির্দ্দিষ্ট সময় অধ্যাপনা করিয়া বাকী সময় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। কোন প্রকার সামাজিক কি রাজনৈতিক আন্দোলনে অথবা সাধারণ আমোদ প্রমোদে আদৌ তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না; কাজেই তিনি এ সমুদায়ে যোগদান করিতেন না। এজন্য তাঁহার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর হইতেই তাঁহার মনে কেমন এক বৈরাগ্যভাবের আবির্ভাব ঘটে। সমাজে বিপুল সম্মান লাভ এবং গৌরবের সহিত অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সংসারকে বিষম বন্ধন বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। সেই বন্ধনের যন্ত্রনায় তিনি অহর্নিশি ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে সন্তাপরাশি আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করিতেছিল; কোথায় গেলে হৃদয়ের অনল নির্ব্বাপিত হইবে,—প্রাণ শীতল হইবে, তিনি কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কখন ভাবিতেন,—কে আমি, পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় আসিয়াছি, কেনই বা আসিয়াছি, আবার কোথায় বা যাইব? এই সকল প্রশ্ন মানসপটে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু কোনরূপ সুমীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। এই ভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল; এই সময় কখন হতাশার গভীর আঁধারে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত, কখন বা আশার ক্ষণিক আলোকচ্ছটায় তাহা উদ্ভাসিত হইত।

আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার ভাববৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিয়া কি উপায়ে তাঁহার মতি-গতির পরিবর্তন করিবেন, কি করিলে তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন, তাঁহারা তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ স্বামীজিকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে মানস করিলেন। তিনি আত্মীয়-গণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি যেরূপ সত্যানুসন্ধিৎসু, জ্ঞানপিপাসু ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ ছিলেন, সেইরূপ অকৃত্রিম বৈরাগ্য ভাবও তাঁহার হৃদয়ে নিহিত ছিল। এইক্ষণে চিত্ত-বিশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম ও তপোনুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিত্তে অহরহ জাগরূক হইতে লাগিল। এদিকে আত্মীয়েরা বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিলেন; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া, একদিন সায়ংকালে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সংসার ছাড়িয়া তিনি হরিদ্বার, বারাণসী, প্রয়াগ, চিত্রকুট, উজ্জয়িনী প্রভৃতি তীর্থস্থানে ভ্রমন ও তত্রত্য বিদ্বান ও সাধুদিগের নিকট বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন-পূর্ব্বক উত্তরোত্তর জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অষ্টাধ্যায়ী পানিনি, মহাভাষ্য. উপনিষদ, ষড়-দর্শন, বেদ ও বেদান্তাদি পাঠে অনধিক সাত বৎসর সার কাল অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা পূর্ণ হইল না,—সত্যলাভ করিতে পারিলেন না। একদা বিন্ধ্যাচলের একজন প্রাচীন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! শ্রীগুরুই উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল ভবার্ণব পারের একমাত্র কর্ত্তা, গুরু ব্যতীত ভবসাগরে এই দেহ তরীকে অন্য কেহ সঞ্চালন করিতে পারিবেন না, গুরু গ্রহণ ব্যতীত চিত্ত-তিমির দূর হইবে না, তুমি গুরু গ্রহণ কর।" মহাপুরুষের বাক্যে তাঁহার চৈতন্য হইল; তিনি গুরুর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে হিমালয়ের কেদারখণ্ডে অদৃষ্টপূর্ব্ব-প্রভাব, অত্যাশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য ও অনন্যসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জনৈক তীর্থসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া রামজী সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক স্বামী রামতীর্থ নামে অভিহিত হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি সর্ব্বদা গুরুর সহিত মহাবাক্য বিচার করিতে লাগিলেন। পুনরায় শারীরিক ভাষ্য, বেদান্তসার, পঞ্চদশী প্রভৃতি বহু বেদান্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন।

জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি ও গুরুসেবার ফলে রামস্বামীর অতি অল্পদিনেই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইল। তিনি নিঃশ্রেয়সরূপে ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার সহজেই ধারণা হইল যে,—আমিই ব্রহ্ম; কিন্তু মায়াপরিশূন্য আমি ব্রহ্ম,—মায়োপাধিক আমিই জীব। জীবে চৈতন্য ও চৈতন্য-চালক শক্তি বিদ্যমান আছে। চৈতন্য ব্রহ্ম, চৈতন্যচালক শক্তি মায়া। যেমন বাসনার সহযোগে জীব নানারূপী, নানাক্রিয়া-পরতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ মায়ার সহযোগে চৈতন্য নানা ক্রিয়াময় হইয়া জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছে। জীব মায়া অধিষ্ঠিত,—চৈতন্য মায়ামুক্ত ব্রহ্ম।

চৈতন্য ও মায়া বিভিন্ন পদার্থ নহে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াময়। যদি চৈতন্য ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হ'ন, তাহাহইলে মায়া চৈতন্যে লয় পায়। মায়া লয় পাইলেই জগৎ

লাভ পায়। চৈতন্যকে প্রকাশ ও ক্রিয়াপর করিবার জন্য কাল ও সৎ এই দুই নিত্য ঈশ্বরাংশ চৈতন্য হইতে যে স্থূল অবস্থা আনয়ন করেন, তাহাই মায়া। অতএব এক চৈতন্যই বাসনাতে পরিবর্ত্তিত। সূর্য্য যেমন আপন শক্তিতে স্থূল ভূতরূপে জলবর্ষণ করেন, আবার সূক্ষ্মরূপে উহা গ্রহণ করেন,—সেইরূপ ব্রহ্ম বাসনা সংযুক্ত হইয়া জীব হয়েন, আবার বাসনাবিমুক্ত হইলে 'স্বয়ং' হয়েন। ব্রহ্ম চৈতন্যের আকর। তাঁহার সক্রিয় ভাব বাসনা তাঁহাতেই লীন হয় বা হইতে পারে, যে অংশে বাসনা বা জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য ও সর্ব্বাধাররূপে বর্ত্তমান। প্রকৃত পক্ষে চৈতন্য এক, বহু নহে। একই আত্মা মনের বহুত্বে নানা রূপে প্রকাশিত; সুতরাং জীব অসংখ্য, আত্মা অসংখ্য নহে। একই আত্মা দেহ-পরিচ্ছেদে নানা দেহে ভেদপ্রাপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। একটী দীপ জ্বালিত বা নির্ব্বাপিত করিলে, যেমন অন্য দীপ জ্বালিত বা নির্ব্বাপিত হয় না, সেইরূপে এক জনের বন্ধনে বা মোক্ষে অন্য জনের বন্ধন বা মুক্তি হয় না। মন প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং সুখ, দুঃখ, শোক, সন্তাপ, জন্ম, মৃত্যু, মুক্তি প্রভৃতিও বিভিন্ন।

এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ-ভাবজন্য অন্তর্য্যামী ঈশ্বরভেদে দুই প্রকার উপাধি হইয়াছে। কারণ ভাব জন্য অন্তর্য্যামী ঈশ্বরোপাধি এবং কার্য্যভাবজন্য অহংপদবাচ্য জীবোপাধি হইয়াছে। ব্রহ্ম অদ্বৈত হইয়াও কার্য্যকারণজন্য দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। জীবের বিবেকজ্ঞান উপস্থিত হইলে জীব ও ঈশ্বররূপ উপাধির নাশ হইয়া কেবল শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অবশিষ্ট শুদ্ধ চৈতন্যই অদ্বৈত ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে।

ব্রহ্ম কিরূপ না, "একমেবাদ্বিতীয়ং";—"এক" অর্থাৎ-স্বগতভেদ শূন্য; "এবং" অর্থাৎ-স্বজাতীয় ভেদশূন্য "অদ্বিতীয়" অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদ-শূন্য। স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়* এই ত্রিবিধ ভেদপরিশূন্য পরম পদার্থই পরব্রহ্ম। তাহাই সৎ, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই অসৎ। অবিদ্যা প্রভাবে ব্যবহারিক দশায় স্বপ্ন সন্দর্শনের ন্যায় অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। যেমন ঘুম ভাঙ্গিলে যে মানুষ সেই মানুষ, তাহার স্বপ্নদৃষ্ট সুখের রাজ্যাদি অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যার ঘুম ভাঙ্গিলে জীব স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্যবহারিক দশায় জীব ও ব্রহ্মে স্বগতভেদ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ব্রহ্ম খাঁটি সোণা, আর জীব খাদ মিশান সোণা। কেহ বা অল্পখাদের, আবার কেহ বা অধিক খাদের। অধিক খাদে অল্পমূল্যের স্বর্ণ, অল্প খাদে অধিক মূল্যের স্বর্ণ। কিন্তু খাঁটি সোণাকেও সোণা বলে, আর অল্পাধিক যেরূপ খাদ মিশানই হউক, তাহাকেও সোণা বলে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ভেদ আছে,—গুণের ও বর্ণের পার্থক্য আছে; কিন্তু স্বর্ণকার যেমন আগুণে গলাইয়া পদার্থ বিশেষের সাহায্যে তাহাকে পুনরায় পাকা সোণা করিতে পারে এবং তখন খাঁটির সহিত যেমন তাহার কোন পার্থক্য থাকে না, তদ্রূপ জীব অবিদ্যা

* বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র পুষ্প-ফলাঙ্কুরৈঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥
পঞ্চদশী।

জনিত বাসনা-কামনায় খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগতভেদসম্পন্ন,—সেই বাসনা-কামনার খাদ-জ্ঞানের হাপড়ে গলাইয়া দূরীভূত করিতে পারিলে, মুক্ত হইয়া জীব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম, হইয়া থাকে।

এই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া স্বামীজি শান্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের আগ্ন নির্ব্বাপিত হইল। শুষ্কহৃদয় সরস ও মুখের ভাব সুপ্রসন্ন হইল। কিন্তু তিনি কেবল সত্য জানিয়া নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট হইতে পারিলেন না, যোগবলে জ্ঞানের হাপড় জ্বালাইয়া আত্মার খাদ দূরীভূত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। শ্রীগুরুর আদেশ গ্রহণ করিয়া এবং যোগিগণের নিকট যোগরহস্য অবগত হইয়া তিনি সাধনোদ্দেশে হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া গেলেন। তথায় তপস্যা ও নানাবিধ যোগের অনুষ্ঠান করিয়া দিনাতিবাহিত করিতেন। নির্জ্জন পর্ব্বত কন্দরে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, বাহ্যজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ইন্দ্রিয়সকল অন্তর্ব্বিষয়ে লীন এবং স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া একস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সাধনা করিতেন। তিনি ধ্যান-ধারণায় এরূপ নিমগ্ন থাকিতেন যে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা তাহার ব্যাঘাত সম্পাদনে অসমর্থ হইত। কোনদিক দিয়া সময় অতিবাহিত হইত, তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর হইত না। এইরূপ দিবারাত্র কঠোর সাধনা করিয়া তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি গিরি কন্দর পরিত্যাগ করিয়া ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, রাজধানী, ও নগরগুলি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইসময় তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতিতে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার কারণ সকল নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অনুদিন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। ভারতের অবস্থা চিন্তাকরিয়া স্থির করিলেন যে, হিন্দুজাতি নানা কারণে অত্যন্ত বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, পাশ্চাত্য জাতির বাহ্যৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহারা কেবল তাহাদিগের অনুকরণ করিতেছে এবং দিন দিন নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে নামিয়া পড়িতেছে। স্বয়ং হীন হইয়া স্বদেশী ও স্বধর্ম্মের মহিমা ও গৌরব বুঝিতেছে না,—স্বদেশীকে বিশ্বাস করিতেও পারিতেছে না। পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং এই সময়ে পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে যদি সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারাযায়, তাহা হইলে সহজেই হিন্দুরা স্বধর্ম্মে আকৃষ্ট হইবে। সাহেবদিগের মুখে স্বধর্ম্মের সুখ্যাতি শুনিলে সাধারণের চৈতন্য হইবে। এইরূপ ধারণা দৃঢ়নিশ্চয় হওয়াতে তিনি সভ্য ও উন্নত দেশসমূহে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েন, এবং অবিলম্বে কলিকাতা হইয়া জাপান যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে জাপানে উপস্থিত হইয়া স্বামীজি সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। সমুন্নত জাপানী তাঁহার বিদ্যাবত্তা, ধর্ম্মানুরাগ ও ত্যাগ-বৈরাগ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল। অল্পদিনেই তথায় তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার পর রাম-স্বামী আমেরিকা গমনোদ্দেশে জাপান হইতে রওনা হইলেন।

আমেরিকা পৌঁছিয়াই তিনি ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন।

সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, আর্য্য-শাস্ত্রের গৌরব ও মাহাত্ম্য এবং আর্য্যেতর অন্যান্য ধর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক তিনি সর্ব্বত্র জয়লাভ করিলেন। খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহার চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনেক সময় দুরাত্মাগণ তাহাকে বহু প্রলোভন দেখাইয়া, কখন বা তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার জন্য উদ্যত হইয়াও তাঁহাকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। এদিকে তাঁহার সারগর্ভ বেদান্ত-উপদেশ, তাঁহার অসীম প্রতিভাবলে আমেরিকার এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বড় বড় পণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুরূহ প্রশ্নাবলী স্বামীজি অতি সহজে এরূপ ভাবে সমাধান করিয়া দিতেন যে, তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতেন। তাঁহার মুখারবিন্দ নিঃসৃত হৃদয়গ্রাহী সত্যোপদেশ শ্রবণে, লোকের চিত্ত এরূপ আকৃষ্ট হইত যে, অনেকেই তাঁহার উপদেশ শ্রবণের অব্যবহিত পরেই বহুকালসেবিত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত মত গ্রহণ করিলেন। এইরূপ অনেকেই বেদান্ত-ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন এবং বেদান্ত শাস্ত্রের পঠন, পাঠন জন্য স্থানে স্থানে সমিতি ও বেদান্ত-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। রামতীর্থ মহারাজ পূর্ণ এক বৎসর আমেরিকা অবস্থিতি করিয়া সনাতন বেদান্তশাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ববোধের বিধানপূর্ব্বক, মানবের কল্যাণমার্গ প্রশস্ত করিয়া দিয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হন। যে সকল মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিমল স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া পাশ্চাত্য মহাদেশগুলিকে উদ্ভাসিত ও সনাতন ধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামতীর্থ ও বাবা প্রেমানন্দ ভারতী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াও স্বামীজি লোক-কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। বিদ্যা ও সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি আমরণ চেষ্টাযত্ন করিতে ত্রুটী করেন নাই। বেদান্তোপদেষ্টা স্বামী রামতীর্থকে বিদ্যা ও ধর্ম্মের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। আমৃত্যু তিনি ভারতের কল্যাণ-চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। রামতীর্থ স্বামীর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সবল ও কার্য্যপটু ছিল। ১৮২৯ শকে কার্ত্তিক মাসে শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে গড়ওয়াল জিলায় স্নানকালে সহসা স্বামীজি মানবলীলা সংহরণ করেন।

স্বামী রামতীর্থ একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, অকপটস্বভাব, বিদ্বান্, যোগী ও নিঃস্বার্থ ধর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার লিখিত অনেকগুলি ইংরাজি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, বহু অপ্রকাশিতও রহিয়াছে। তিনি যে সকল বক্তৃতা বা উপদেশ দিতেন, আমেরিকা ও ভারতের প্রসিদ্ধ ইংরাজি সংবাদপত্রে তাহা যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক, প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও উপদেশসমূহ বেদান্ত শাস্ত্রমূলক। তিনি সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বন করতঃ নিঃস্বার্থভাবের আদর্শ পুরুষ হইয়া জগদ্ধিতায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃভক্তি,

বিদ্যা ও বিভব সত্ত্বেও বৈরাগ্য, সত্যানুসন্ধান, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, রিপুবিবর্জ্জিতত্ব, ঘৃণা-অসূয়াদি দোসরাহিত্য এবং সর্ব্বোপরি শাস্ত্রাধিকার ও ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিলে জীবন পবিত্র হয়। জীবনে দুই চারি জনের উপকার করা অপেক্ষা যিনি আদর্শ হইয়া লোক শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করিয়া দেন, তাঁহাপেক্ষা ভারতের উপকারী বন্ধু আর কে? যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীরা স্বামী রামতীর্থের এইসকল দেবদুর্লভ গুণাবলী অভ্যাস না করিবে, ততদিন তাহাদিগের বাস্তবিক উন্নতি সম্ভবপর নহে। এরূপ মহাত্মার আবির্ভাব ভারত ও ভারতবাসীর গৌরব ও মঙ্গলের নিদান।

কুমার চিদানন্দ।

———:0:———

ভক্তি-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীব দুই প্রকার; নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। সেই কারণে ভক্তিও দুই প্রকার, রাগাত্মিকা ভক্তি ও সাধন ভক্তি বা উপায় ভক্তি।

প্রথমে রাগাত্মিকা ভক্তির বিষয় ২।৪ কথা বলিয়া পরে উপায় ভক্তির বিষয় লিখিব।

রাগাত্মিকা ভক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। কারণ শুদ্ধ রাগ মাত্র ইহার স্বরূপ। তাহা নিত্যমুক্ত জীবদের অর্থাৎ ব্রজবাসীদের মাত্র আছে।

কেহ বলিতে পারেন যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ইহার অঙ্গ হউক। তাহা হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞান আধার, ভক্তি আধেয়, অতএব আধার আধেয়ের অঙ্গ হইতে পারে না, সেইরূপ বৈরাগ্য ও রাগ ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। বৈরাগ্য অর্থ রাগাভাব; অতএব অভাবরূপী বৈরাগ্য রাগরূপী ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। জড় হইতে রাগ তিরোহিত হওয়ার নাম বৈরাগ্য। মুক্ত জীবগণের রাগ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যদিকে নাই; এইজন্য তাঁহাদের বৈরাগ্যের আবশ্যক নাই।

যদি কেহ বলেন,—সেবা রাগভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও নহে। কারণ ভক্তি রাগরূপা, অতএব ক্রিয়া রূপা। কৃষ্ণানুশীলনই এক মাত্র ক্রিয়া, যাহাকে মুক্তাবস্থায় সেবা বলে, সেবা স্বয়ং ভক্তি, এজন্য সেবাকে ভক্তির অঙ্গ বলা যাইতে পারে না।

যদি বল সাধুসঙ্গ রাগভক্তির অঙ্গ হউক, তাহাও নহে। বদ্ধাবস্থায় সাধুসঙ্গ কৃষ্ণ বিষয়ে রুচি উৎপাদন করে (১) মাত্র; ভক্তির অঙ্গ নহে।

পুনশ্চ মুক্তাবস্থায় নিত্যমুক্ত জীবগণের পরস্পর অনুরাগরূপ আকর্ষণকে যদি সাধুসঙ্গ বলা যায়, তথাপি তাহা ভক্তির অঙ্গ

(১) শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ নিষেবণাৎ।

নহে। তাহা স্বয়ং ভক্তি। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে পরস্পর অণুচৈতন্য জীবগণের পরস্পর অনুরাগ-রূপ আকর্ষণ ও সমস্ত অণু চৈতন্য জীবগণের শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকর্ষণই রাগরূপা ভক্তি। "শ্রীকৃষ্ণ" নামটী আকর্ষণ বাচক। তিঁনি অণু-চৈতন্য জীবদিগকে আকর্ষণ করেন, এই-জন্যই "শ্রীকৃষ্ণ" নামটী মুখ্য নাম। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অণুচৈতন্য জীবগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে রাগবিলাস, তাহাই জীবদিগের নিত্য অভিধেয় তত্ত্ব। সেই রাগবিলাস বা রাসবিলাসে জীবদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও সমস্ত জীবদিগের কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকর্ষণই রাগরূপা ভক্তি। সেখানে ইতর রাগ নাই যথাঃ—

আনন্দবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিত বেণুনা
সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতর রাগ বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর
নস্তেহধরামৃতং।

এই শ্লোক দ্বারায় প্রকাশ হইতেছে যে, যেখানে কৃষ্ণের প্রতি রাগ বলবান, সেখানে ইতর রাগ থাকে না।

সাধন ভক্তি
বা
উপায় ভক্তি।

নানা প্রকার উপায় দ্বারা ভক্তিকে বিকৃত পথ হইতে ফিরাইয়া প্রকৃত পথে আনিতে হয় বলিয়া কোন কোন মহাত্মা ইহাকে উপায় ভক্তি বলেন।

উপায় ভক্তির দুইটী অঙ্গ স্বীকার করা যায়। পরানুশীলন ও প্রত্যাহার। পরানুশীলনই (কৃষ্ণানুশীলনই) আনন্দরূপা প্রবৃত্তির সংস্কার বিশেষ। প্রত্যাহারই চিৎস্বরূপ জীবের স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তির উপায় বিশেষ। জীব বাসনাদোষে জড়বদ্ধ হইয়া জড়ের সহিত ঐক্যলাভ করতঃ অধোগতি লাভ করিয়াছে, সেই জড়াশক্তি রহিত করিয়া কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত করাই প্রত্যাহার। প্রত্যাহারই মুক্তির সাধক। (১) অবিদ্যা দ্বারা অন্যথাকৃত রূপকে প্রকৃত পথে আনিয়া জীবের প্রকৃত স্বরূপ প্রদান করার নাম মুক্তি। মুক্তিই চেতন রূপ জীবের পঙ্কোদ্ধার বলিতে হইবে। যেমন পুরাতন পুকুর পঙ্ক-পূর্ণ থাকিলে, সেই পঙ্ককে স্থানান্তরিত করিলে সেই পুকুর পূর্ব্ববৎ হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা দ্বারা জীবের যে বদ্ধ দশা হইয়াছিল, প্রত্যাহার দ্বারা তাহা ঘুচাইয়া, ইহার স্বরূপাবস্থা প্রদান করিলে জীব মুক্ত হয়। জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস; মায়ার দাস হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল। প্রত্যাহার সাধন দ্বারা তাহা ঘুচিয়া যায় এবং পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণদাস্য প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণদাস্যই জীবের মুক্তি, মুক্তি শব্দের যে নানা প্রকার কুব্যাখ্যা আছে, তাহা জ্ঞানের বিকৃত অবস্থার বাদ মাত্র।

প্রত্যাহারের সহিত রাগের অনুশীলন না করিলে, রাগের উন্নতি হয় না। কেননা ইতর রাগের প্রাবল্যে ভক্তির উন্নতির স্রোত বন্ধ হয়। রাগের লক্ষণ অশ্রু, পুলক ইত্যাদি বটে; কিন্তু লক্ষণই যথেষ্ট নহে। কাহার কাহার স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, অর্থ, অলঙ্কার, পশু, পক্ষীর প্রতি এরূপ রাগ থাকে যে, সেই সকল বস্তুর সংযোগ-বিয়োগে, অপচয়-উন্নতিতে উক্ত রাগের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ রাগকে ছায়া রাগ বলে। (২) তাহা রতির ন্যায় দুঃখহারিণী হইলেও স্থায়ী নহে। এইজন্য প্রত্যাহারের সহিত রাগের অনুশীলন না করিলে ছায়া মাত্রই থাকে। পরমেশ্বরে রাগরূপা ভক্তির উদয় হয় না।

---

(১) মুক্তি হীনান্যথারূপ স্বরূপানি ব্যবস্থিতি।

(২) ক্ষুদ্র কৌতূহলময়ী চপলা দুঃখহারিণী। রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিত্তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী।

যদিও শুদ্ধ রাগের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায় না, কিন্তু জড়কুণ্ঠিত রাগে প্রত্যাহার অবশ্যই অঙ্গ রূপে পরিগণিত হইবে। ঐ জড়কুণ্ঠিত রাগের উর্দ্ধগামী চেষ্টার নাম পরানুশীলন, তাহার পক্ষে যে ভয়ঙ্কর বিক্ষেপরূপ প্রতিবন্ধক আছে, তন্নিবারণের নাম প্রত্যাহার। বদ্ধাবস্থায় প্রতিবন্ধক নিবারণের সহায়তা না পাইলে রাগের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কোন মনুষ্যে যদি রাগের লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যাহার লক্ষিত না হয়, তাহার সেই রাগকে ছায়া রাগ বা কৃত্রিম রাগ অথবা ইতর রাগে পরানুরাগ ভ্রম বলিতে হইবে। কারণ প্রকৃত রাগভক্তি থাকিলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইবে এবং অন্য বিষয়ে গরিষ্ঠ রাগ থাকিলে তাহাও দূরীভূত হইবে (১)

আর একটী সুন্দর প্রক্রিয়া আছে, যদ্দারায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহার উভয় কার্য্যই সাধিত হয়। যথা চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ জড় বিষয়ানুশীলনে নিযুক্ত হইয়া থাকায় আমাদিগকে পরানুশীলনে অক্ষম করে। যদি ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনীয় বিষয়ে পরানুভব মিশ্রিত করা যায়, তবে চিত্তের বিক্ষেপ ঘুচিয়া একই কার্য্যের দ্বারায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহার সাধিত হয়। এই প্রক্রিয়ার মূলে অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গ চাই; যথা যদি চক্ষু সর্ব্বদাই শ্রীমূর্ত্তি ও সাধুদর্শন করে, কর্ণ যদি সর্ব্বদা কৃষ্ণকথা ও সাধুদের কথা শ্রবণ করে, নাসিকা যদি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত পুষ্প, তুলসী, চন্দনাদির আঘ্রাণ লয়, জিহ্বা যদি ভগবদর্পিত প্রসাদ ভোজন করে, এবং হরিকথা ও সাধুদের চরিত্র বর্ণন করে, ত্বক যদি শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ বা সাধু স্পর্শ করে এবং হস্তপদ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ কেবল ভগবানের সেবা কিম্বা সাধুসেবা করে, তাহাহইলে ইন্দ্রিয়গণের ইতর রুচি নিবৃত্ত হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয়। চিত্ত প্রসন্ন ও বিক্ষেপশূন্য হইলে ভগবানে রতি হয়।

সাধন ভক্তির আর অনেক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ আছে, তাহা ক্রমশঃ লিখিব।

বৈষ্ণব দাসানুদাস—
শ্রীললিতলাল ঘোষ।

(১) কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিধ্যতি।
রুচিমুদ্বহত স্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষ গরিষ্ঠোপি রাগ প্রায় বিলীয়তে॥

—:0:—

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের ত্রৈবার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

(১৩১৯ সনের পৌষ হইতে ১৩২২ সনের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।)

আয়।*

দান প্রাপ্তি— (২য় বর্ষ)

ধুগুড়ু বান্ধব বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ— ॥০

সেক্রেটরী-লোন আফিস,-আলিপুর দুয়ার ৯৮/০

* ইতিপূর্ব্বে যথাসময়ে "আর্য্য-দর্পণে" ব্যক্তিগত হিসাবে দাতাগণের নামের তালিকা ও দানের পরিমাণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

শাহাবাজপুর (ময়মনসিংহ)	১৭৲
দিনাজপুর	১১৭॥০
রায়গঞ্জ	১৭।০
কাটিহার	২৭৶০
মালদহ	৫৸০
চঞ্চল	৮।০
গোদাগারী	২৷৵০
রামপুর বোয়ালিয়া	১৩॥৵০
জিয়াগঞ্জ	৫॥০
আলিপুরদুয়ার	৩৬৸০
জনৈক হিতৈষী	২৵৫
হরনাথ চক্রবর্ত্তী	১৲
রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়,—রাজগঞ্জ	১০৲
শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় উকীল, দিনাজপুর	৫৲
„ কুমুদবন্ধু বসু	।৶০
ধনিরাম বরা যোরহাট টেলিগ্রাফ আফিস	৩৲
হাইলাকান্দী হইতে শ্রীযুত আনন্দমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রেরিত	৪০৲
মরিয়ানি চা বাগান	॥০
শ্রীযুত বঙ্কবিহারী বিশ্বাস—যোরহাট	১।০
„ সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা কোকিলামুখ-ঘাট	১৲
„ আবুল হোসেন মুন্সী	॥০
শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ রায়, ধীতপুর	৫৲
„ হরিপদ চৌধুরী কলিকাতা	২৲
জনৈক হিতৈষিণী মহিলা, কাঁথি	৩৫৲
	৩৬৮৸৵৫

তৃতীয় বর্ষ ।

শ্রীযুত বিভূতিভূষণ মজুমদার	২৲
„ জয়গোবিন্দ চৌধুরী	২৲
„ রায় পরশুরাম খাউন্দ বাহাদুর ডিব্রুঘর	৬।০
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৲
শ্রীযুত সজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	॥০
জনৈক হিতৈষী	৫৲
শ্রীযুত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
„ হরিলাল মুখার্জ্জি	১৲
„ দেবেন্দ্রনাথ রায়	১০৲
„ নগেন্দ্রনাথ রায়	১০৲
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৭।০
„ নূতনচন্দ্র দে	২৲
শিলচর হইতে দানপ্রাপ্তি	১৪॥১০
জনৈক হিতৈষিণী	৮৲
শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সরকার	১৲
কয়েক জন মহিলা	২।০
শ্রীযুত মুরারীমোহন সিংহ	২৲
„ টুনীরাম বরুয়া যোরহাট	৵
জনৈক হিতৈষিণী	৫৲
ডিব্রুগড় হইতে দান প্রাপ্তি	২৸০
তেজপুর	২৩৴০
গৌহাটী	১৬৸০
	১৩৩॥৶১০

৪র্থ বর্ষ

গোয়ালপাড়া	১৭॥৴০
গৌরীপুর	৬৲
তিস্তা জংসন	১৲
কাকিনা	১০।৶
পাটগ্রাম	২৲
জলপাইগুড়ী	৪॥০
শিলগুড়ী	২০।০
সৈদপুর	৸৶
রংপুর	৭।৶
সেরপুর, বগুড়া	৩৷৶
দিনহাটা	২৶০

দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে দানপ্রাপ্তিঃ—

কে, সি, দে সইদপুর স্কুল	৫৲
ধীরেনবাবু, জলপাইগুড়ী	১৲
আশুতোষ ঘোষ, মাথাভাঙ্গা	৫৲
রংপুর জনসাধারণের পক্ষ হইতে	
শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল লাহিড়ী	২৫৲
ধর্ম্মসভা স্বলেশ্বরীতলা, বগুড়া	৫৲
শ্রীযুতা লীলাবতী দেবী, হলদিবারী	২৲
শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন গুহ, পার্ব্বতীপুর	১৲
মহানন্দ সরকার	।০
বনবিহারী বাবু	২।০
চৌধুরী এণ্ড কোং ষ্টীমলঞ্চ ওউনার হীলষ্ট্রীট আকিয়াব	১৫৲
চট্টগ্রাম হইতে দানপ্রাপ্তি	৩০৴
কেয়ক্ত হইতে	৭৫।০
মিহং হইতে	২৩॥০
আকিয়াব হইতে	১৪৭॥৶০
মঠের পক্ষ হইতে :—	
মফস্বলের সেবকগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত	২৬৮৸৶০
আশ্রম সেবকগণ কর্ত্তৃক যোরহাট হইতে সংগৃহীত	৯৫৸/০
সুরেন্দ্রনাথ ও অতুলচন্দ্র ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত	১৫০৲
	৯৩৮।৶০৫

ব্যয়ের বিবরণ।	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থবর্ষ	মোট।
খোরাকী ...				
অনাথ-আশ্রম বিভাগে ...	[illegible]৪৩॥০	৭৭০৴১০	১০৪২৸৶৫	
অতিথি ও অভ্যাগতের জন্য ...	৬৪।।০	১০১।।০	৮০।।	
কাপড় ও কম্বল :—অনাথ আশ্রমবিভাগে...	৭২।/৫	৩৬॥৶১৫	৫০৶৫	
বাহিরের দরিদ্রগণের জন্য ...	৬৶১০	২।।০	২।।০	
শিক্ষাবিভাগের খরচ ...	১৪৩॥০	১৩১৸০	১৭২৸৶১০	
বাহিরের ছাত্রদের সাহায্য ...	৫৭॥৶১৫	৮০৲	১০৶০	
ঔষধ পথ্যাদি ও আসবাবের জন্য সেবাবিভাগে	২৪৸১৫	৫৬।৶৫	৫৮৸/১০	
গৃহাদিনির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে ...	১৬৯।১০	৪০৲	৬৪৲	
পুষ্করিণী খনন ও মাটী কাটা ইত্যাদিতে ...	৫২৯৸/০	২৫।।০	১৪৲	
সেবকগণের সেবা ও ভিক্ষার্থ যাতায়াত খরচ...	১২[illegible]৶০	৪১[illegible]	৭[illegible]।০	
বাহিরের কুষ্ঠরোগী গণের সাহায্য ...	৬৫৲	১৬।০	৩৬৸০	
ছাপা খরচ ও পোষ্টেজ ইত্যাদিতে ...	৫/০	৮।০	৩৲৫	
দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য বীরভূমি রিলিফ্ ফণ্ডে ...	৩০।/০	+	+	
বর্দ্ধমান-রিলিফফণ্ডে ...	৪০৲	×	×	
কাঁথিকেন্দ্রে সেবকগণ কর্ত্তৃক বিতরিত ...	১৯৪৲	×	×	

ব্যয়ের বিবরণ।	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪থ বর্ষ	মোট।
শ্রীহট্ট—বানিয়াচঙ্গ প্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষে সেবকগণ কর্ত্তৃক বিতরিত ...	×	১৬০৲	×	
চাঁদপুর দুর্ভিক্ষফণ্ডে ...	×	×	৫০॥০	
শিলচর দুর্ভিক্ষফণ্ডে ...	×	×	৭৫৸	
শ্রীহট্ট দুর্ভিক্ষফণ্ডে ...	×	×	২৫।০	
যোরহাট—খাটোয়াল কেন্দ্রে সাহায্য ...	×	×	২৪৬।০	
একুনে—— ...	২৬৬৫৲ ১৫	১৪৩০ । ১০	২০০৩৸৶১৫	

	মোট আয়	মোট ব্যয়
সাধারণ হইতে প্রাপ্ত		
২য় বর্ষ	৩৬৮।৵৫	২৬৬৫৲১৫
৩য় বর্ষ	১৩৩॥৶১০	১৪৩০।১০
৪র্থ বর্ষ	৯৩৮।৶৫	২০০৩৸৶.৫
	১৪৪০৸/০	৬০৯৯।/০

মন্তব্য—আলোচ্য তিন বৎসরে মোট ৬০৯৯।/০ ব্যয় হইয়াছে; তন্মধ্যে সাধারণের সাহায্য প্রাপ্ত ১৪৪০৸/০ বাদে অবশিষ্ট ৪৬৫৮৷৷০ সারস্বতমঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

স্বাক্ষর
স্বামী স্বরূপানন্দ।
কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম।
যোরহাট।

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

দানপ্রাপ্তি-স্বীকার— আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ডিব্রুগড়ের সহৃদয়, পরদুঃখ-কাতর শ্রীযুত রায় পরশুরাম খাওন্দ বাহাদুর কর্ত্তৃক অত্র সেবাশ্রমে প্রদত্ত ২০৲ কুড়ি টাকা প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। এই দরিদ্র সেবাশ্রমের উপর যে তাঁহার মত সজ্জনের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, ইহা সেবাশ্রমের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ভগবান দাতার মঙ্গল বিধান করুন ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

—:0:—

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, } ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

পাগল মানুষের কথা।

[মানকরের সিদ্ধ মহাপুরুষ পাগল রাধা-মাধবের কথামৃত]

(প্রশ্নোত্তর চ্ছলে উপদেশ।)

প্রশ্ন। "জাতি ভেদ জ্ঞান থাকিতে ভাগবত পাঠে অধিকার নাই।" তবে কি ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত জাতিভেদ প্রথাটা একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে, নতুবা ভাগবত পাঠে অধিকার হইবে না। এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের মত। জাতিভেদ ও জাত্যভিমান এক কথা কি?

উত্তর। প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা ভগবানের প্রবর্ত্তিত নহে। সত্যযুগে জাতিভেদ ছিল না। ত্রেতাযুগে যজ্ঞবিস্তার হয়, এবং জাতিভেদ সৃষ্ট হয়।

মুখ বাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্তাশ্রৈমঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥"
চরিতামৃত ২২শ পঃ।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।
গীতা।

গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে জাতিভেদ সৃষ্ট হইলেও ইহা ভক্তির কণ্টক। যথা—

"জাতি বিদ্যা মহত্বঞ্চ রূপ যৌবনমেবচ।
যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ পঞ্চৈব ভক্তি কণ্টকাঃ॥"

ধর্ম্মের চরমে জাতিভেদ প্রথা থাকিতে পারে না, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবুদ্ধদেবও অবতার হইয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা বল্লালসেন প্রবর্ত্তিত। পূর্ব্বে চারি বর্ণ, চারি আশ্রম ছিল। এক্ষণে ১০৮ বর্ণ এবং ১০৮ প্রকার উপধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"
"জাতি কুল নিরর্থক যে জানাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে ঈশ্বর আজ্ঞাতে॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতের গর্ব্ব করিতে বিনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করেন ভক্তির প্রকাশ॥"

শ্রীমৎ নারদ গোস্বামী, শ্রীভাগবত প্রচার করিবার জন্ম, ভগবান বেদব্যাসকে উপদেশ দেন। ভাগবত বক্তা শুকদেব গোস্বামী; পাঠক, লোমর্ষণ সুত। ইঁহাদের সকলেরই কোন আশ্রম চিহ্ন ছিল না। সকলেই প্রেমিক বাউল।——

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভয় করিয়া বলিয়াছি, "জাতিভেদ জ্ঞান থাকিতে ভাগবত পাঠে অধিকার নাই।" পাগলের কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইবেন না। যুক্তি দ্বারা উক্তিগুলির খণ্ডন করুন। (শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।)

শ্রীচৈতন্যভাগবত, রামপ্রসাদের সংগীতগুলি, মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, আমার কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। জাত্যভিমান ছাড়িতে পারি, কিন্তু—জাতিভেদ "নাশ করিতে পারি না," এরূপ বলিলে কপটতা প্রকাশ হয় মাত্র। আপনার অন্তর্য্যামী—শ্রীভগবানকে এ কথা জিজ্ঞাসা করুন, দেখুন কি উত্তর পান; আপনি নিজ নামের পরে "দাস" না লিখিয়া অপরাধ করিতেছেন মাত্র।

ভক্ত্যা ভাগবতঃ গ্রাহ্যং ন চ বুদ্ধ্যা, ন চ টীকয়া ॥

বিশ্বেশ্বরের শ্রীমুখ নিঃসৃত, এই বাণী হইতে কি উপলব্ধি হয়? জাতিভেদ জ্ঞান থাকিতে ভাগবত পাঠে অধিকার নাই"—ইহা কি এই উক্তি দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে না?

প্রশ্ন। মালা ধারণ ও তিলক পরাও শুভকর্ম্ম, অতএব উহা ভক্তির বাধক।" একথা কি ভক্তিশাস্ত্রসিদ্ধ? যদি তাহাই হয়, তবে ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু" ও "শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসে" মালা তিলকের নিত্যতা ও মাহাত্ম্যাদি এত লিখিত, হইল কেন? পরন্তু উহা ভক্তির বাধক না হইয়া ভক্ত্যঙ্গযাজন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আরও রাগমার্গীয় ভক্তগণেরও মালা তিলক ধারণের আবশ্যকতা আছে। অতএব মালাতিলকধারণ শুভকর্ম্ম নহে;—উহা ভক্তির বহিরঙ্গ-যাজন।

উত্তর। মালা তিলক ধারণের নিত্যতা বিধি ব্রাহ্মণের জন্য—

"যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায় ॥"
চরিতামৃত। অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ।

সগুণ হৈতুকী ভক্তিরই বিধি আছে, নিষ্কাম অহৈতুকী রাগ মার্গের কোন বিধি নাই। গোস্বামী ধর্ম্ম, রাগ-ধর্ম্ম, কোন বিধি নিষেধের অন্তর্গত উহা নহে।

"কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌলমপি মূল্যমেকলং, জন্ম কোটী-সুকৃতৈর্ন লভ্যতে।"

সাধুসঙ্গ ভিন্ন রাগমার্গ জানিবার অন্য উপায় নাই। বিধিপক্ষ হইলে মোক্ষ পর্য্যন্ত হয়—আবার, মোক্ষবাঞ্ছা—প্রধান কৈতব—যথা চরিতামৃতে—

"তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।"

বিধির গতি মোক্ষ পর্য্যন্ত। ইহাতে মহাপ্রভুকে জানিবার উপায় নাই।

"এই গুপ্ত ভাব সিন্ধু, ব্রহ্মা না পান এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইলেন সংসারে।"

রাগমার্গে মালা তিলক ধারণের আবশ্যকতা আছে, ইহা কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন?

দীন—রসিকলাল দে।

:0:

অর্থ ও পরমার্থ।

অর্থ বলে আমি এক মানবের ভোগ্য,
পরমার্থ বলে তুমি দানবের যোগ্য।
অর্থ বলে আমি ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।
পরমার্থ বলে তুমি জগতের বিষ্ঠি।
অর্থ বলে সংসারের আমি শান্তিসুখ,
পরমার্থ বলে তুমি অহৈতুকী দুখ।
অর্থ বলে আমি বিশ্বে সর্ব্ব কর্ম্মসূত্র,
পরমার্থ বলে তুমি ঘৃণ্য মলমূত্র।
অর্থ বলে মম স্পর্শে দূরে যায় ক্লেশ।
পরমার্থ বলে মূঢ়! সৃজ হিংসা দ্বেষ।
অর্থ বলে আমা হেতু কীর্ত্তি, মান, যশ।
পরমার্থ বলে তুই দুষ্কৃতের বশ।
অর্থ বলে মম শক্তি সর্ব্ব শক্তিশির।
পরমার্থ বলে সে ত পদ্মপত্রে নীর।
অর্থ বলে আমি এক জ্ঞান, বিদ্যা, ঋদ্ধি,
পরমার্থ বলে তুমি অবিবেকী সিদ্ধি।
অর্থ বলে বিশ্ব-জীব আমাতেই লিপ্ত,
পরমার্থ বলে তারা সারমেয় ক্ষিপ্ত।

অর্থ বলে মম লাগি বিশ্বের গৌরব,
পরমার্থ বলে যথা শাল্মলী সৌরভ!
অর্থ বলে মম বলে বিশ্বে নর কৃতী,
পরমার্থ বলে যথা জলবিম্ব ধৃতি।
অর্থ বলে আমি আছি তাই বিশ্ব চলে।
পরমার্থ বলে তুমি দাও রসাতলে।
অর্থ বলে মম স্পর্শে বিশ্ব মধুময়,
পরমার্থ বলে তুমি জগত-প্রলয়।
অর্থ বলে নরনারী মম অনুরক্ত,
পরমার্থ বলে প্রাজ্ঞ তোতে অনাসক্ত।
অর্থ বলে দীন জন না পায় সম্মান,
পরমার্থ বলে তারা বিশ্বের কল্যাণ।
অর্থ বলে বিশ্ব মোতে বশীভূত হয়,
পরমার্থ বলে করি ব্রহ্মপদে লয়।

দীন—দেবেন্দ্রনাথ।

———:0:———

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

জীব ভগবানের নিত্যদাস, সুতরাং পার্ষদ। অনাদি অনন্ত কাল জীব ভগবানের সহিত নিত্যলোকে ভেদ ও অভেদ ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া লীলানন্দ উপভোগ করিয়াছে; মায়াপরিচ্ছিন্ন জীব সেই আনন্দস্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, সেই আনন্দের আস্বাদ বা তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই। পারে নাই বলিয়া যেখানে আনন্দের অনুভূতি এবং বিকাশ দেখিতে পাইতেছে, সেইখানে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইতেছে। ভ্রমর যেমন মধুর নিমিত্ত ফুলে ফুলে ভ্রমন করিয়া থাকে, জীবও তদ্রূপ আনন্দের নিমিত্ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, কিন্তু তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে না; কেন না জীব যতটুকু আনন্দের কাঙ্গাল, যতটুকু আনন্দ পাইলে তাহার অভাব দূর হইয়া সদানন্দের লহর হৃদয়ে খেলিবে, ততটুকু আনন্দ কোন বস্তুর মধ্যে খুজিয়া পায় না। প্রকৃতি-

সম্ভূত কোন বস্তুর মধ্যে সে আনন্দ নাই, একমাত্র ভগবানের মধ্যেই সে আনন্দ আছে এবং এক মাত্র দাতাও সেই ভগবান। তাই একদিন না একদিন, সেই নিত্যানন্দ লাভের জন্ত—যেখান হইতে আনন্দের কণা উৎসারিত হইয়া এই মায়িক জগতে আসিতেছে, সেই পূর্ণানন্দের আধার সচ্চিদানন্দময় ভগবানের দ্বারস্থ হইবে! সেখানে না গেলে কাহারও প্রাণের পিপাসার শান্তি হইবে না, কাহারও অভাব দূর হইবে না। করুণাসাগর শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রত্যেকের প্রাণে এই অভাব রাখিয়া দিয়াছেন। এই অভাব না থাকিলে যে, জীব প্রকৃতিপ্রদত্ত ভোগে বিভোর হইয়া ভগবানকে চিরদিনের তরে ভুলিয়া যাইত! ভগবানের এই পরম গূঢ় গভীর মঙ্গল উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া, অনেক সময় অভাবময় সংসারযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়া থাকি। কিন্তু সমাহিতচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, "অভাবই" ভাবময় ভগবানলাভের প্রধান উপায়।

তুমি বলিয়াছ "সোহং" আমি সেই "ব্রহ্ম" অর্থে আমি সেই ব্রহ্ম বুঝায় না, সঃ—অহং—সোহং আমি সেই—অর্থাৎ আমি মন নই, আমি বুদ্ধি নই, আমি কাম, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি কোন বৃত্তি বিশেষ নই। আমি সেই চিদানন্দ স্বরূপ। "আমির" স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া দিতেছে। সোহং অর্থে যদি "আমি" সেই ব্রহ্ম বুঝায়, তাহা হইলে জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম হয়; ব্রহ্ম যদি জীবের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে জীব নিত্য হইতে পারে না। ব্রহ্ম ও সমস্তই, ব্রহ্ম ছাড়া কি? জীবের স্বরূপ স্বতন্ত্র, কিন্তু সে স্বতন্ত্র এমন নয়, যাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত।

হরিশ—তুমি দেখি প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইতেছ?

হেম—কিরূপে দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইতেছি?

হরিশ—জীব যদি চিরদিনই ব্রহ্ম হইতে পৃথক থাকে, জীবের সত্তা যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে কি দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হইল না? আর তুমি বলিতেছ, জীব যখন মুক্তি লাভ করিবে, তখনও ব্রহ্মে লীন হইবে না, পৃথক থাকিবে। ঐ শুন শাস্ত্রে কি বলে—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
গীতা, ৫, ২৪

"যিনি সর্ব্বদা অন্তঃসুখে সুখী, অন্তরে যিনি বিহার করিয়া থাকেন, অন্তরেই যাঁহার জ্যোতিঃ দেদীপ্যমান, সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ যোগীই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

"যাঁহাদের সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইয়াছে, সেই সংযতচেতা সর্ব্বপ্রাণিহিতনিরত ঋষিগণই সমস্ত পাপপুণ্য হইতে বিমুক্ত হইয়া, ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন।"

কামক্রোধবিমুক্তানাং বিমুক্তীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

"যে যতিগণ কাম ক্রোধাদি হইতে বিমুক্ত ও সংযতচেতা হইয়া আত্মার অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা এই জীবনে এবং মৃত্যুর

পরে—উভয়ত্রই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।”

প্রোক্ত গীতার বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে, জীব মুক্তাবস্থায় “ব্রহ্মনির্ব্বাণ” অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে; : সুতরাং কিরূপে তোমার যুক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি? তোমার যুক্তিতে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব নষ্ট হইতেছে, কেন না! জীবের সত্ত্বা যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ব্রহ্মের পূর্ণ সত্ত্বার বিলোপ হইতেছে। পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে যদি একটী বালুকাকণাও পৃথক করা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্মের পূর্ণত্ব থাকে না। এইমাত্র তুমিই নিজেই গান করিলে, “আমি দরশে অবশ অঙ্গে তোমাতে যাইব মিশিয়া।”

হেম—আমার যুক্তিতে ব্রহ্মের পূর্ণত্বের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয় নাই। তুমি আমার কথা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই। ব্রহ্ম দ্বৈত কি অদ্বৈত তাহা আমি কোনরূপ বিশেষণে বিশেষিত করি নাই। ব্রহ্ম অদ্বৈত বলিলে, দ্বৈত বলিয়া আর একটী বস্তু আছে বুঝায়; যেমন দিন বলিলে রাত্রি আছে, সুখ বলিলে দুঃখ আছে বলিয়া বুঝায়, তদ্রূপ ব্রহ্ম অদ্বৈত বলিলে, দ্বৈত বলিয়া আর একটী বস্তুর সংজ্ঞা দিতে হয়। দ্বৈত বলিয়া আর একটী বস্তুর সংজ্ঞা দিতে হইলে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়; আমি যেরূপ ভাবে ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ বুঝাইয়াছি, তাহাতে ঈদৃশ কোনরূপ দ্বন্দ্ব আসিতে পারে না।

ভগবানের স্বরূপ হইতে জীবের স্বরূপ পৃথক বলিয়াছি, সে কিরূপ পৃথক বলিয়াছি? যেমন বায়ু অপরিচ্ছিন্নরূপে সর্ব্বত্রই প্রবাহিত, কোন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না; এবং কেহই বায়ুকে পরিচ্ছিন্ন করিতেও সক্ষম হয় না। বায়ু অপরিচ্ছিন্নরূপে সর্ব্বত্রই প্রবাহিত বটে, কিন্তু তার মধ্যে কি কোন বৈষম্য নাই, বা কোন প্রকার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না? পুষ্পোদ্যানের বায়ু, পায়খানার বায়ু কি এক? মলয়পর্ব্বত প্রবাহিত মলয় মারুত এবং আবর্জ্জন পরিপূর্ণ গৃহমধ্যাগত বায়ু কি এক? পুষ্পোদ্যানের বায়ু সুগন্ধ, আর পায়খানার বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত। বায়ু অখণ্ডরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও পুষ্পোদ্যানের বায়ু ও পায়খানার বায়ুতে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে। অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন বায়ু হইতে, পুষ্পোদ্যানের বায়ু ও পায়খানার বায়ুতে যতটুকু প্রভেদ, ভগবৎস্বরূপ হইতে জীবের স্বরূপ ততটুকু প্রভেদ; আবার বায়ু হইতে ফুলের গন্ধ যেমন পৃথক করা যায় না, অথচ বায়ু এবং ফুলের গন্ধ একটী বস্তু নয়, দুইটী বস্তু; তদ্রূপ ভগবান হইতে জীবকে পৃথক করা যায় না, অথচ পৃথক বলিয়া বোধ হইতেছে। এই জীবেশ্বর বিভেদ ও অভেদ অচিন্তনীয়।

আমি ভগবান্ ও জীব পৃথক বলি নাই, ভগবৎস্বরূপ হইতে জীবের স্বরূপ পৃথক বলিয়াছি। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি ভগবান ও জীব ভেদাভেদে নিত্য বর্ত্তমান। শাস্ত্রে আছে যথা—

তস্মিনস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ॥

নারদ ভক্তিসূত্র।৭২।

“শ্রীভগবানে ও ভক্তে ভেদ না থাকাতেই ঐরূপ হইয়া থাকে।”

এই যে ভেদ ও অভেদের কথা বলা হইল, এ কিরূপ ভেদ ও অভেদ ? চৈতন্যাংশে জীব ভগবানের সহিত অভেদ। এবং ভাবাংশে বিভেদ। "জীব" শব্দ উপাধি । এই উপাধির বিনাশ হইলেই জীব চৈতন্যাংশে অর্থাৎ সত্যাংশে অভেদ। জীবের "আমির" বিনাশ কখন হয় না; মুক্তাবস্থায় জীবের "আমি" ভাবের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন থাকে। ভাব নিত্য, যিনি যে ভাব লাভ করিবেন, তিনি ভাবময় মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করতঃ ভাবময় নিত্যলোকে লীলাবিলাস করিবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণে নিত্যদাস" অর্থাৎ পিতা মাতা, সখাসখী ইত্যাদি। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ ভাবই প্রধান। এতন্মধ্যে যিনি যে ভাব লাভ করিবেন (ভাব লাভার্থে যার যে ভাব পূর্ব্বে ছিল) তিনি সেই স্বরূপ ভাবে চিদ্‌ঘন বিগ্রহে লীলা-পরিকরগণ মধ্যে স্থান লাভ করতঃ চৈতন্যাংশে ভগবানের সহিত অভেদ থাকিয়া, ভাবাংশে ভেদরূপে অবস্থিতি করিবেন।

পূর্ণব্রহ্ম হইতে একটী বালুকাকণা বাদ দিলে ব্রহ্মর পূর্ণত্বের ক্ষতি হয় কিরূপে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রহ্ম অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন। অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম হইতে একটী বালুকাকণা কিরূপে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, আর একটী বালুকাকণা পৃথক করিলেই অনন্তের অনন্তত্ব কিরূপে নষ্ট হয় ? যে বস্তু অনন্ত, তার মধ্য হইতে যত কেন বাদ দেও না, তাতে অনন্তের কোন ক্ষতি হইবে না, যে বস্তু অনন্ত, তাহা চিরদিনই অনন্ত, অনন্তের অংশ অনন্ত। অংশেরও পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায় না। যদি অংশেরও পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যাইত, তাহা হইলে ব্রহ্মের অনন্ত সত্বারও পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যাইত। কিন্তু তার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায় না। যাহা অনন্ত, তাহার সবই অনন্ত।

তুমি নিজ মত সমর্থনের জন্য গীতা হইতে "নির্ব্বাণের" যে তিনটী শ্লোক শুনাইয়া যেরূপ ব্যাখ্যা করিলে, "নির্ব্বাণের" অর্থ কি ঐ রূপ ? "নির্ব্বাণের" অর্থ কি "আমির" বিনাশ হইয়া ব্রহ্মে লয় হওয়া ? যদি "আমির" বিনাশ হইবে, তবে স্বরূপ লাভ করিবে কে ? কে মুক্তি লাভ করিবে ? ঐ গীতাতেই আছে,—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥

"সংযতচিত্ত যোগীপুরুষ মন নিরোধ করিয়া আমার স্বরূপ-ভূত নির্ব্বাণ মুক্তিস্বরূপ পরম শান্তি অর্থাৎ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন।"

যদি "আমির" নাশই হইবে, যদি ব্রহ্মে "আমির" লয়ই হইবে, তবে নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করিবে কে ? নির্ব্বাণের অর্থ "আমির" বিনাশ হইয়া লয় হওয়া নয়। তবে নির্ব্বাণের অর্থ কি ? অগ্রে "নির্ব্বাণ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি, দেখা যাউক,—

"বাণা নশ্যীতি নির্ব্বাণং" বাণের অভাবকেই নির্ব্বাণ বলে। বাণ শব্দের অর্থ তৃষ্ণা বা কামনা "নির্ব্বাণং মুক্তি" (বোপদেব) নির্ব্বাণং নিবৃত্তৌ মোক্ষে বিনাশে গজমজ্জনে "(যাদব) অর্থাৎ নির্ব্বাণ শব্দ নিবৃত্তি, মোক্ষ, বিনাশ, গজমজ্জনে ব্যবহৃত হয়। রাগদ্বেষ, মোহক্ষয়াৎ পরিনির্ব্বাণম্" অর্থাৎ রাগদ্বেষ ও মোহক্ষয়ের নাম নির্ব্বাণ।

"মুক্তিঃ কৈবল্যনির্ব্বাণং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়-- সামৃতং
মোক্ষোঽপবর্গোহথাজ্ঞানাবিদ্যাহননমিতিস্ত্রিয়াঃ ॥
অমরকোষ ।

মুক্তিঃ, কৈবল্য, নির্ব্বাণ, শ্রেয়ঃ, নিঃশ্রেয়স্, অমৃত, মোক্ষ, অপবর্গ অজ্ঞান ও অবিদ্যা নাশ।

"ছন্দরাগ বিনোদনং পদমচ্যুতং ।

বাসনা ও অনুরাগের অপনোদনই অচ্যুত নির্ব্বাণ পদ।

ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেনঃ—

এস এব মনোনাশস্তু বিদ্যানাশ এব চ ।
যদ্ যৎ সম্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থা পরিবর্জ্জনম্ ।
অনস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থা পরিগ্রহ ॥
যোগবাশিষ্ঠ ।

যে যে বস্তু সংরূপে বিদ্যমান আছে, তাহাতে যে আস্থা পরিত্যাগ, তাহাই মনোনাশ এবং অবিদ্যানাশ । এই অনাস্থারূপ যে মনোনাশ তাহাই নির্ব্বাণ।

মনোলয়াত্মিকা মুক্তিরিতি জানীহি শঙ্করী ॥
কামাখ্যাতন্ত্র ।

যে অবস্থায় মনের লয় হয়, তাহাকেই মুক্তি বলিয়া জানিও।

অদ্বৈত বাদিগণ "নির্ব্বাণস্তু মনোলয়",

অর্থাৎ নের লয়কে নির্ব্বাণ বলিয়া থাকেন। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেনঃ—

কস্যাস্তি মনসো হি মোক্ষ ।
মণিরত্নমালা ।

কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হয়? মনের নাশ হইলে । সুতরাং কোন শাস্ত্রেই নির্ব্বাণার্থে "আমির" নাশ বা ব্রহ্মে লয় হওয়া বলিয়া উল্লেখ নাই। জীবের কামনা বাসনার মূলীভূত কারণ "মন"। সেই মন যখন বিনাশ হইবে, যখন বিন্দুমাত্রও প্রকৃতির গুণের তরঙ্গ খেলিবে না, মন যখন নির্ব্বাত, নিষ্কম্প, দীপশিখার ন্যায় অবস্থিতি করিবে, মনের তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্তির নামই নির্ব্বাণ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

পুরুষার্থা শূন্যানাং গুণীনাং প্রতিপ্রসবঃ ।
নির্ব্বাণং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তিরিতি ॥

গুণ অর্থাৎ প্রকৃতিদেবী যখন পুরুষ ত্যাগিনী হন, যখন তিনি আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কার-আদি-রূপে প্রকাশ হন না, পুরুষকে বা চিৎরূপ আত্মাকে রূপ,রসাদির প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে পারেন না, আত্ম-চৈতন্যে যখন প্রকৃতির কোন গুণই প্রতিবিম্বিত হয় না; বিকার-বিহীন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, জীবের ঐরূপ নির্ব্বিকার বা কেবল হওয়াকে কৈবল্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

"মুক্তি হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতঃ" ।

অতএব জীবের স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্তির নামই "নির্ব্বাণ"। কখনই জীব সত্বার লয় হয় না।

"দরশে পরশে অবশ অঙ্গে তোমাতে যাইব মিশিয়া" এ মিশিয়া যাওয়ার অর্থ কি লয় হওয়া? না, এ মিশিয়া যাওয়ার অর্থ

ভক্ত-ভগবানের মিলন ।

হরিশ—জীবের স্বরূপ বুঝিলাম, কিন্তু সেই স্বরূপাবস্থা লাভ করিবার জন্য অন্যের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন কি? যাহারা কাপুরুষ, দুর্ব্বল, তাহারাই অন্যের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নয়, সে কিরূপে আত্ম-স্বরূপ লাভ

করিবে ? জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাত হইয়া তল্লাভার্থে যত্ন করাই পুরুষের কর্ত্তব্য। তজ্জন্ত প্রভো দয়া কর, "প্রভো, দয়া কর," বলিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন করিতে হইবে ? ক্রমশঃ।

দীন—প্রেমানন্দ।

——:0:——

নিবেদন।

ওহে দয়াময়, হও হে উদয়,
হৃদয় গগনে মোর।
হয়ে স্বপ্রকাশ, কর তমোনাশ,
এই বাঞ্ছা অধিনীর॥
আমি দীনহীনা ভকতিবিহীনা,
না জানি স্তুতি মিনতি।
(তুমি) নিজ গুণে আসি, করুণা প্রকাশি,
জ্বালাও জ্ঞানের বাতি॥
(তুমি) পতিতপাবন, অধম তারণ,
একথা শুনেছি আমি,।
(তাই) বড় আশা করে, তোমারি দুয়ারে,
দাড়ায়েছি ভবস্বামী॥
(তুমি) হয়ো না কো বাম, পূর মনস্কাম,
বাঞ্ছাকল্পতরু হরি।
(তুমি) বিমুখ হইলে, ফিরে না চাহিলে,
গতি কি হবে আমারি॥

দীনা—শৈলবালা।

——:0:——

আত্মোপদেশ।

(৭)

গুণক্রিয়া—শব্দ ও ভাবোদয়, বা মূর্ত্তির উৎপত্তি।

গুণক্রিয়া না হইলে শব্দোৎপত্তি ও ভাবোৎপত্তি হয় না। সত্বগুণ ক্রিয়মান হইলে, সাত্বিক শব্দ ও ভাব হৃদাকাশে দেখা যায়। এইরূপে রজ এবং তমোগুণ ক্রিয়মান হইলে রাজসিক ও তামসিক শব্দাদি ভাব হৃদাকাশে উদিত হয়। এই ত্রিবিধ গুণের ক্রিয়া পূর্ব্ব সংস্কার অবলম্বন করিয়াই আরম্ভ হয়। যাহার যে গুণ প্রিয়, সেই গুণের কার্য্যাদির মূর্ত্তির ও তৎসংক্রান্ত শব্দাদি চিন্তা ও ব্যক্ত করে।

কার্য্যালোক ও কারণ-লোক।

সূর্য্যের আলোক সৃষ্টিটা দেখবার জন্ত দরকার হয়।

বাহ্য পদার্থ দেখিবার জন্ত বাহ্যলোক বা সৃষ্টা লোকের দরকার হয়। আত্মাতে দেখি-

বার জন্য আত্মালোকের বা আত্মচৈতন্যের দরকার হয়—সূর্য্য সৃষ্টির প্রকাশক এবং আত্মচৈতন্য সূর্য্যেরও প্রকাশক।

কৃষ্ণ কে ?

কৃষ্ণ প্রেমের দেবতা প্রেমলোকই বিষ্ণু-লোক—অতিসুখময় লোক; সুতরাং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচরিত্র স্মরণ রাখা জীবের পক্ষে অতি দরকার। টাকাটা যেমন সুদে খাটায়ে মানুষ অত্যন্ত ধনী হয়ে পড়ে, তেমনি সামান্য প্রেমের পুঁজি লয়ে খাটাতে আরম্ভ করিলে, ক্রমে মানুষ একটা কৃষ্ণ, বিষ্ণুর মধ্যে, হয়ে দাড়ায় অর্থাৎ তাহার প্রেমময় স্বভাব হইয়া পড়ে।

বিষ্ণু ফাঁকি দিয়ে দুষ্টকে মজান।

কৃষ্ণই হউন, আর বিষ্ণুই হউন কাহার কাহাকেও ফাঁকিদিবার সাধ্য নাই। সকল কার্য্যের দরুণ কারণই জিম্মেদার। শিব বিষ্ণুকে মিছে দোষ দেওয়া; যে মৃত্যুবীজ না পোতে কার সাধ্য তাকে মৃত্যুফল দেয় ?

ভ্রমে কর্ম্ম, কিন্তু ফলের নিয়ম বাধা।

লোকে যখন কর্ম্ম করে, তখন শিব বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসাকরে করে না, তার পর যখন মৃত্যু, দুঃখ, রোগ, শোকরূপ ফল পায়, তখন বলে শিবের দোষ, বিষ্ণুর দোষ, ইত্যাদি।

কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মযন্ত্র।

ছুতোর যেমন যন্ত্র বিনা কোন কার্য্য করিতে পারে না, তেমনি কর্ম্মক্ষেত্রে বা সাধন-ক্ষেত্রে অনেক প্রকারের শক্তিরূপ যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। ধারণারূপ বেড়ী দিয়ে আত্মাকে সর্ব্বদা ধরে থাকতে হয়। এই বেড়ী দিয়া আর কিছু ধরিলে আর আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না। ধারণা আল্‌গা হলেও সব ফস্‌কে যায়।

ব্রহ্ম মণ্ডপ।

ব্রহ্মমণ্ডপের গণ্ডীর বাহিরেই কল্পনারাজ্য, এই রাজ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল নরকাদি কত অনন্তলোক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ব্রহ্ম মণ্ডপটি স্থির; পরন্তু উহার বাহিরে সব টলমল কর্‌ছে। বেশী-ক্ষণ এই জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারা যায় না। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গে, দেব-লোকে, পিতৃলোকে, নানাবিধ নরকে, মর্ত্ত্যে কতবার যে উঠবস্‌ করিতে হয় ও ঠাই নাড়া-চাড়া করিতে হয়, তাহা আর কি বলব। কিন্তু এমনই অভ্যাসের দোষ যে, মানুষ মণ্ড-পের বাহিরে পা না দিয়া থাকিতেই পারে না; যেন মাথার দিব্যি দেওয়া আছে।

দেহবোধ অন্তরায়িত অবস্থা।

আত্মধ্যানও আত্মসঙ্গ করিতে করিতে যখন মনুষ্যের এরূপ অবস্থা হয় যে, নিজের দেহরূপ পরিচ্ছন্ন সম্বন্ধীয়, কোন চিন্তাই মনে আর উদয় হয় না। জীবন ও মরণ সম্বন্ধীয় কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প উদয় হয় না, তখন আত্মার প্রকৃত ভাব আভাসের ন্যায় একটু একটু প্রকাশ হইতে থাকে; এবং ইচ্ছা মাত্র সর্ব্বত্র উপস্থিতি ও ফলাফলের বীজাদি প্রত্যক্ষ হয়। সেইজন্যই দেবতারা পীড়িত হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের আরাধনা করিলে তাহারা স্বয়ং বর দেন, কখন বা অপরের নিকট পাঠান।

কালের অর্থ সৃষ্টি নিরোধ।

কল্পনার অবকাশকে কাল বলে। পুরুষ যখন গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করেন, তখন তাহার স্বধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হয়; অর্থাৎ চৈতন্যের উপর প্রকৃতির আভাস পড়িয়া, একটা জড় ধর্ম্মের দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন। কতকটা মানুষের ভুতে পাওয়ার মত অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এইটাকেই বিবর্ত্ত বলা যাইতে পারে।

পুরুষের প্রকৃতিকে ঈক্ষণরূপ যে অবকাশ বা ফাঁক (যাহাকে আমরা কাল বলি) উহা অবলম্বন করিয়া, প্রকৃতি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং তদাত্মক ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ ও ব্যোম পুরুষের চৈতন্যে ধারণা করাইয়া ফেলেন।

চৈতন্য প্রকৃতির মিশ্রণে, মননধর্ম্ম, বুদ্ধি-ধর্ম্ম প্রভৃতি বহুবিধ মিশ্র ধর্ম্মও উৎপন্ন হয়।

ফল কথা তুমি "কালকে" নিরোধ করিতে পারিলে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপী যে জড় ধর্ম্ম চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে, উহা অনায়াসে বদ্ধ করিতে পারিবে।

কল্পনাকে, অবসর না দিলেই, কাল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। চৈতন্য যদি কল্পনা দেহে স্থিত না হইয়া, স্বরূপে স্থিত হইয়া পূর্ব্বাভ্যাস-বশতঃ, শক্তির আদ্যাবস্থা মাত্র লইয়া দর্শন, শ্রবণ, বাক্যোচ্চারণ, গমন, ভক্ষন, পান রূপ কর্ম্মাদি করেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই স্বধর্ম্ম বা স্বতঃসিদ্ধ কৈবল্য লাভ করিতে পারেন, এবং পরধর্ম্ম ত্যাগ হইতে পারে। জগতের সহিত হাঁ ও নার অতিরিক্ত চৈতন্যাবকাশ দিও না।

যদি বল, আহার করিব, কিন্তু আস্বাদ লইব না; দেখিব, কিন্তু ধারণা করিব না; শুনিব কিন্তু প্রবেশ করিব না; যাহা করিব, তৎ সম্বন্ধে কিছুই ভাবিব না; তাহা হইলে এটা কি রকমে সম্ভব? অবকাশশূন্য চৈতন্যের, সত্য-জ্ঞান ও ক্ষেত্রজ্ঞান রূপে যে সিদ্ধি, উহা নিত্য সহচর বা নিত্যৈশ্বর্য্য।

কারণ যে চৈতন্যে, কাল ও ত্রিবিধ শরীর ধর্ম্ম প্রবিষ্ট নহে, যে চৈতন্যের মধ্যে ইচ্ছারূপিনী আদ্যাশক্তি মাত্র লুক্কায়িত থাকেন, সে চৈতন্যে, যে ইচ্ছা পরিদৃশ্যমান, তাহাই হয়। ইচ্ছা পরিদৃশ্যমান না হইলে বুঝিবে যে, এখনও অভিব্যক্তির অবসর উদয় হয় নাই। ইচ্ছা উদয় হইলে ব্যক্ত করিও।

আদ্যার সহিত সাক্ষাৎ।

আদ্যাশক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, উহা নিমিষের শতাংশ কালের মধ্যে নিষ্পন্ন করিতে হয়। চকিতের ন্যায় সঙ্গ হয়। আদ্যাশক্তি ইচ্ছার বীজরূপ—এই বীজ অতি শীঘ্র অঙ্কুর পত্রাদিরূপ দেহ বিস্তার করিয়া ফেলে; সুতরাং বীজশক্তির দ্বারা যাহারা কর্ম্ম করে, তাহারা অঙ্কুরাদিরূপ ধারণ হইবার পূর্ব্বেই করিয়া ফেলে।

তাহারা ইচ্ছার বিস্তৃত, স্থুল মূর্ত্তি দেখি-বার জন্য বিলম্ব করার কোন আবশ্যকই দেখে না, বরং উহাতে অধর্ম্ম ও জড়তা বৃদ্ধিরই আশঙ্কা করে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—:0:—

কার এ সমাধি ?

(পাগল রাধামাধবের সমাধি দর্শনে ভাবোচ্ছ্বাস।)

বৈষ্ণব ধর্ম্মের গ্লানি করিবারে দূর,
করিলেন দধীচির মত আত্মদান ;
সপ্ত রথী সুবেষ্টিত অভিমন্যু শূর ;
ঠিক সেই মত যিনি ত্যজিলেন প্রাণ।
"অপরাধ শূন্য নামে প্রেমের প্রকাশ"
এই তত্ত্ব পরচারে যাহার যতন।
অনুরাগী ভক্ত পেলে, প্রবল প্রয়াস,
কিসে করিবেন গূঢ় রস আস্বাদন।

নির্লোভ, নিস্পৃহ, ভক্ত, প্রেমিক পাগল,
মুক্ত বৈরাগ্যের ছবি, আদর্শ মহান্;
গৃহী হয়ে কিবা ত্যাগী, চিত্ত নিরমল,
বিত্ত তুচ্ছ যাঁর কাছে, মায়ামুক্ত প্রাণ।
নিবৃত্তির পথে, দেখালেন প্রেম-নিধি,
যে মাধুর্য্য-ভক্ত, তাঁর এই ত সমাধি ॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

—:০:—

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(২৩)

ভূমা ভেদনে নবোল্লাস।

ভূমা শব্দের আভিধানিক অর্থ,—বহুত্ব বা অনেকত্ব। এই বহুত্ব শব্দের অর্থ হইতেছে যে,—বহু বস্তু বা বহু পদার্থের যে এক সাধারণ ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের নামই বহুত্ব বা অনেকত্ব। যেমন বহু দ্রব্যের যে এক সাধারণ ধর্ম্ম, তাহার নাম দ্রব্যত্ব ; বহু গুণের যে এক সাধারণ ধর্ম্ম, তাহার নাম গুণত্ব ইত্যাদি। অতএব বহুত্ব শব্দটী একরূপ বহু বা অনেক পদার্থেরই প্রতিপাদক। আবার অন্যপক্ষে দেখিলেও প্রকাশ পায় যে,—"বস্তু" বহু না হইলে তাহাতে কদাচ বহুত্ব থাকা সম্ভবপর নহে ; যেমন দ্রব্য না থাকিলে দ্রব্যত্ব, গুণ না থাকিলে গুণত্ব, ক্ষিতি না থাকিলে ক্ষিতিত্ব, কস্মিন্‌কালেও উল্লেখযোগ্য নহে ; সুতরাং উভয় পক্ষেই দাঁড়াইল যে,—বহুত্ব শব্দটী বহু-বোধক, বা বহু জ্ঞানোৎপাদক। অতএব, যে বস্তু বহুবোধক,—অর্থাৎ বহু পদার্থের বোধ জন্মাইয়া দেয়, বা যাহা বহু জ্ঞানোৎপাদক,—অর্থাৎ দুই দুই জ্ঞানের উৎপত্তিকারক,—তাহারই নাম বহুত্ব, বা নামান্তরে তাহাই সেই "ভূমা"।

পক্ষান্তরে,—"উল্লিখিত" বহু শব্দটী জগৎ-বাচক;—পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। জগদ্বাচক হইলেই আলোচ্য প্রকৃতি-তত্ত্বের মতে, উহা প্রকৃতিরই একটী অবস্থা বিশেষ হয়;—অর্থাৎ প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থা বুঝিতে হয়। অতএব বহু বস্তু বা বহুপদার্থের যে এক সাধারণ ধর্ম্ম,—সেই ধর্ম্মের নামই বহুত্ব। ইহা দ্বারা বুঝিতে হয় যে,—প্রকৃতির

বৈষম্যাবস্থায় স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর ইত্যাদিতে পরিদৃশ্যমান জগতের যে এক সাধারণ ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের নামই বহুত্ব বা অনেকত্ব, বা তাহাই সেই "ভূমা"। সুতরাং উভয় মতের মীমাংসায় দাঁড়াইল এই যে,—জগতের যে এক সাধারণধর্ম্ম (যাহার নাম বহুত্ব) সেইধর্ম্মই বহুবোধক;—অর্থাৎ বহু পদার্থের বোধ জন্মাইয়া দেয় কি না—জগতের বোধ জন্মায়,—বা তাহাই জগৎ-কারণ হয়। অতএব যাহা জগৎকারণ-তাহাই সেই "ভূমা"।

আলোচ্য প্রকৃতি-তত্ত্বের মতে,—প্রকৃতিই বিশ্ব-সংসারের মূল; সকল কার্য্যের কারণ, নিত্য বস্তু। ইহার অন্য নাম জগদ্‌যোনি, জগদ্বীজ, অব্যক্ত গুণ-কেন্দ্র ইত্যাদি। ইহার সাম্যাবস্থায় সত্ব,—রজ, তম গুণত্রয় সমভাবে থাকে,—ন্যূনাতিরিক্ত হয় না; এইজন্যই তাহা অব্যক্ত। অতএব যাহা অব্যক্ত, তাহাই সাম্যাবস্থা,—নামান্তর প্রকৃতি। এবম্ভূত অব্যক্তাবস্থায় কোন কিছু দর্শন করে না, কোন কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না। অতএব "যত্র নান্যৎ পশ্যতি ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রের—"যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, তাহাই সেই ভূমা এই বাক্যের সার ভাব দ্বারা "যত্র"—(যাহাতে) এই বিশেষণটী ঐ অব্যক্তরূপী সাম্যাবস্থাকেই বুঝাইয়া দেয়। ঐ অব্যক্তরূপী সাম্যাবস্থার নামই "জগৎ-কারণ প্রকৃতি"। সুতরাং—যাহা "জগৎ-কারণ" প্রকৃতি, তাহাই সেই ভূমা, ইহাই প্রাপ্ত হইল।

অতএব, "ভূমার" আভিধানিক অর্থালোচনা দ্বারা দেখা গেল যে, প্রকৃতি-তত্ত্বের সহিত—আভিধানিক অর্থ (বহুত্ব বা অনেকত্ব) ঠিক 'এক' ঐক্য হইয়া যায়। আর তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে প্রকাশ পায় যে, এতদিন ধরিয়া যে 'ভূমা' 'ভূমা' করা গেল, সে ভূমা আর কিছুই নহে;—জগৎ-কারণ প্রকৃতিরই নামান্তর মাত্র। এবম্ভূত উপদিশ্যমান ভূমা যদ্যপি "পূর্ব্বাপর বিচারে"—জগতের অতীত বস্তু, আকাঙ্ক্ষাদি-দোষরহিত, নির্ব্বিকল্প, পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত 'এক' অভিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে ভূমায় আর জগদ্ভাব থাকে না; প্রকৃতির সাম্যাবস্থাই ভূমার অবয়ব স্বরূপ, এরূপ কথাও আর দাঁড়ায় না। পরন্তু সাম্য না দাঁড়াইলে, সাম্যাভাবে বৈষম্যাবস্থায় জগৎ সৃষ্টিও কস্মিনকালে বিহিত হয় না। কাজেই প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব, নিত্যত্ব সব পণ্ড হইয়া যায়। এইজন্যই বাদীর আগ্রহ যে,—ভূমা যাহাতে জগতের অতীত বস্তু পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত সকল বিষয়ে একাকার হইয়া 'এক' অভিন্ন হইয়া না যায়। অভিপ্রায় এই যে, ভূমায় জগদ্ভাব প্রতিপন্ন হইয়া ভূমা যেমন প্রকৃতির সাম্যাবস্থাবোধক "প্রকৃতির তুল্য মূল্য" আছে, তাহাই থাকে; আর পূর্ণ পরব্রহ্ম যেমন (এই তত্ত্বের মতে পুরুষবৎ উদাসীন) আছেন তাহাই থাকেন। এরূপ হইলেই বাদীর অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। পরন্তু বলাও চলে যে,—মহাবিষ্ণু জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা করিলে গুণের আশ্রয়ে ভূমার দিকে একটা স্পন্দন দ্বারা প্রকাশিত হন, নতুবা ভূমা হয় না। আবার নিষ্কামের পর ভূমা, (প্রকৃতির সাম্যাবস্থা) ভূমা হইতে ব্রহ্মত্ব ইত্যাদি।

কিন্তু ঐ ভূমা যদ্যপি জগতের অতীত বস্তু, অনন্ত-প্রয়োজন বিশিষ্ট, সনাতনস্বভাব,

পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত এক অভিন্ন হইয়া পরম বস্তুরূপে পরিণত হয়, তাহাহইলেই হইল; সব পণ্ড, সব বিফল, সব বৈয়র্থ্যাৎ। এইজন্যই আপত্তি হইতেছে যে, ভূমায় জগদ্ভাব আছে,—দুই দুই ভিন্ন ভাব,—অর্থাৎ দ্বিত্বাদি সংযোগ আছে;—সুতরাং ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম পরস্পর পৃথক বস্তু। এক, একত্ব সম্ভাব ইহাদের নাই;—ইহাই আপত্তির মূল ভিত্তি। এই আপত্তি গত বারে ভ্রমাংশ মাত্র সাব্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে যদ্যপি তাহাই স্বীকার করা হয়, তাহাহইলে ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের এক একত্ব নিষ্কণ্টক হইয়া পড়ে; অর্থাৎ প্রকারান্তরে একরূপ অকাট্য হইয়া যায়। ভবিষ্যতে আর কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন প্রাসঙ্গিক হয় না। আর এক কথা এই যে,—প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ-কারণত্ব রক্ষার জন্য শ্রুতিমূলত্ব আশ্রয় করিতে গিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,—প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রুতি প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ-কারণত্ব সমর্থনের অনুকূল নহে। বর্ত্তমানে কেবল ভূমা বিষয়ক প্রসঙ্গেই প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব নির্ভর করিতেছে। সেই ভূমা যদ্যপি সহজেই জগতের অতীত বস্তু পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত 'এক', অভিন্ন হইয়া যায়,—তাহাহইলে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব ও নিত্যত্ব ত হইবেই হইবে,—অধিকন্তু মুখ্য বিষয়জ্ঞান ও ভক্তির এক একত্ব বা অভেদত্ব প্রতিপাদন সহজসাধ্য হইবে। অতএব, ভূমা নামক আলোচ্য বস্তুকে,—যে কোন প্রকারে হউক, পূর্ণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক করিবার নিমিত্ত একবার শেষ চেষ্টাকরা অবশ্য কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে ঐ চেষ্টার নামান্তরই-ভূমা ভেদনে নবোল্লাস।

"প্রথম উল্লাস"। (পূর্ব্বপক্ষ)— আচ্ছা স্বীকার করা গেল,—ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম 'এক' অভিন্ন বস্তু বিশেষ। ইহাদের 'এক' একত্ব সর্ব্বথা বিবাদশূন্য। কিন্তু এই এক একত্ব শব্দের অর্থ কি? একটু সরলভাবে না বুঝাইলে ইহাতে একটী প্রধান সংশয় থাকিয়া যায়। যথা,—'এক'-একত্ব শব্দের অর্থ হইতেছে, অভেদত্ব বা অভিন্নত্ব;—অর্থাৎ 'এক' ঐক্য বিশেষ। সহজ অর্থ এই যে, ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক বস্তুকে অভেদ বা অভিন্ন ভাবে দেখা। কিন্তু এই অভেদ শব্দটী আপেক্ষিক শব্দ বা সাপেক্ষ; অর্থাৎ অভেদ শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে, যাহা ভেদশূন্য তাহাই অভেদ;—যাহাতে ভিন্ন ভেদ নাই, তাহাই অভেদ,—এইরূপ অর্থ-সংযোগ দ্বারা, একটী ভেদ নামক পদার্থের প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়। যদি কোথাও ঐ ভেদ নামক পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তবেই তদপেক্ষায় অভেদ শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু যদি ভেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন কোন পদার্থ না থাকে, তাহাহইলে "ন—ভেদ, অভেদ," এইরূপ সমাস বা যোগশব্দ কস্মিনকালেও সঙ্গত হইতে পারে না। এইজন্যই অভেদ শব্দ দ্বারা একটী ভেদ পদার্থের সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, বা অভেদ শব্দটী সাপেক্ষ হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যখন ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক বস্তুর এক একত্ব অর্থাৎ অভেদ ঐক্য—প্রতিপাদন পক্ষে যথেষ্ট আয়োজন হইতেছে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে,—ইহাদের ভিন্ন-ভেদ বাস্তবিক প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ ইহাও সত্য

যে,—বস্তু সমান, বা একাকার থাকিলে, আর নূতনভাবে তাহাকে সমান বা একাকার করিতে কেহই প্রয়াস পায় না। ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম অবশ্যই অসমান বস্তু। এইজন্যই তাহাদিগকে সমান 'এক' ঐক্য করিবার জন্য, অর্থাৎ তাহাদের "এক" একত্ব বা অভেদত্ব প্রতিপাদনপক্ষে,—এইরূপ প্রয়াস প্রকাশ পাইতেছে। এতএব ঐ "এক" একত্ব বা অভেদত্ব বাক্যই প্রকারান্তরে দুই দুই ভাব আনিয়া, অর্থাৎ অসমান ভাব আনিয়া ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক বস্তুর ভিন্ন ভেদ সমর্থন করিল। অর্থাৎ আপত্তির যাহা মূল ভিত্তি, সেই পৃথককরণ ভিত্তির সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া একরূপ আপত্তিরই তুল্য মূল্য হইল, বা আপত্তির সহিত একাকার হইয়া গেল। সুতরাং আপত্তি অমূলক বা মূল্যহীন নহে, বা তাহার অবয়ব ভ্রমাংশ মাত্র, দাহ্যবস্তু বিশেষ ইত্যাদি বলা যায় না। এরূপ হইলে, ভূমা প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব ও নিত্যত্ব অবাস্তব হয় না, বা তাহা বৃথা-নহে।

"উত্তর পক্ষ"— হাঁ, উত্তম উল্লাস। এ উল্লাসঘটিত আপত্তি যে কেবল ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের 'এক' একত্ব বিষয়ে প্রতিযোগিনী, তাহা নহে। পরন্তু জীব ও ব্রহ্মের যে একত্বজ্ঞান, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে একত্বজ্ঞান, তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারা যে একত্বজ্ঞান,—অর্থাৎ একরূপ সকল একত্বজ্ঞান উহার শক্তি বিচিত্রতায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। উহার সারভাব একরূপ অর্থে "ক্ষণভঙ্গবাদের সহিত মিলিত হইয়া বাক্যকথন বন্ধ করিয়া দেয়, অন্যরূপ অর্থে ঈশ্বরত্ব লোপ করিয়া বসে। সুতরাং এবম্ভূত উল্লাস কদাচ উপেক্ষনীয় নহে। আর এক কথা, জ্ঞান রূপ অনন্ত সমুদ্রে এবম্ভূত উল্লাসরূপ তরঙ্গ "নানা কারণে" অবশ্যই উত্থিত হয়;—কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞান রূপ বারিধি কখন টলায়মান হয় না, বা তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার স্বরূপ রূপান্তরিত হয় না। অতএব, "ঘুরাইয়া ফিরাইয়া" যত রকমের নূতন আপত্তি, নূতন মূর্ত্তিতে আনা হউক না কেন,—বিচার দ্বারা সে সকলের নিষ্পত্তি যাহা হয়,-অবশ্যই তাহা হইবে। তবে দেখিবার বিষয় এই যে,—সে বিচার, অধম উপাধির অন্তর্ভূত না হয়;—অর্থাৎ তাহা বিতর্ক বা বিতণ্ডায় পরিণত না হয়।

অভিপ্রায় এই যে, ঐশ্বরিক পরম তত্ত্ব বা পারমার্থিক তত্ত্বের অপূর্ব্ব রূপ কোন রূপ ভাষা বা সামান্য বিশেষণ দ্বারা" প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। পরন্তু তাহার আর এক বিশেষত্ব এই যে,—অভিনব শিশুর বুদ্ধিগম্য যে ভাষা, সেই ভাষায় তাহা প্রকাশ করিলেও অপর সাধারণে তাহার অর্থবোধ করিতে পারে না;-অর্থাৎ ভাষা সরল হইলেও তাহার ভাব গভীর এবং জটিল হইয়া পড়ে। তথাপি তাহার সূক্ষ্মবোধ বা তত্ত্ব নিরূপণ উপলক্ষে যে কথা উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিচার। সে বিচার সাধারণতঃ চারি প্রকার;—যথা (১) বাদ, (২) জল্প, (৩) বিতর্ক, (৪) বিতণ্ডা। তন্মধ্যে ঐকান্তিক যত্ন সহকারে কেবল মাত্র পরমতত্ত্ব নিরূপণ করা যে বিচারের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার নাম "বাদ"। পরম তত্ত্বের পরম রূপ দুর্ব্বোধ্য বস্তু বিশেষ;—এইজন্য পক্ষ প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া তাহার তত্ত্ব নিরূপণার্থ ঐ বাদানুকূলে যে

বিচার হয়, তাহার নাম "জল্প"। বাদ ও জল্প এ উভয় বিচারই শ্রেষ্ঠ বা উত্তম স্থান অধিকার করে। আর তত্ত্ব নির্ণয় দূরে রাখিয়া,—অর্থাৎ তত্ত্ব-নির্ণয় দিকে লক্ষ্য না করিয়া,—কেবল নিজ নিজ মত সমর্থনই যে বিচারের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহার নাম "বিতর্ক"। যেখানে তত্ত্ব-নির্ণয় দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই, পরন্তু নিজের কোনরূপ মত বা উদ্দেশ্য থাকে না—কেবল পরপক্ষ খণ্ডন করাই একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহার নাম "বিতণ্ডা"। এই বিতণ্ডা ও বিতর্ক একরূপ তুল্য মূল্য পদার্থ,—অর্থাৎ ইহাদের ওজন প্রায় সমান। এই কারণবশতঃ বিচার তিন প্রকার বলিলেও কোনরূপ দোষ-দুষ্ট হয় না। ইহাদের ভিত্তি বিতুষ্টিজনক ও অশোভন। কাজেই, ইহা (বিতর্ক বা বিতণ্ডা) অধম আখ্যা প্রাপ্ত-হয়। এবম্ভূত অধম পক্ষ-পুষ্ট বিচার দ্বারা ঐশ্বরিক পরম তত্ত্ব বা পারমার্থিক তত্ত্ব নিরূপন কস্মিনকালেও সম্ভবযোগ্য নহে। এইজন্যই উপরে বলা হইয়াছে যে, ভূমা ভেদনে যে নূতন আপত্তি, নূতন মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিতেছে, তাহার নিষ্পত্তি যে বক্ষ্যমান বিচারে হইবে,—সে বিচার যেন উল্লিখিত বিতর্ক বা বিতণ্ডার ন্যায়—অধম দোষ-দুষ্ট বা অশোভন না হয়।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।
সন্তোষপুর, হুগলী।

—:0:—

অহৈতুকী কৃপা।

মাগো!

তব দরশন, ভুলেও চাহিনি
তবু নিজগুণে দেখা দিয়েছ।
আমি ত তোমারে চিন্তি নাই কভু
দয়াকরে চিন্তাপথে এসেছ।
আমি ত তোমারে চাহিনি ধরিতে
তুমি নিজ হ'তে ধরা দিয়েছ।
চাহিনি বলিয়ে তাড়ায়ে দিয়েছি
তবু কি আমার মানা শুনেছ?
জুড়িয়ে আমার হৃদয় কুটীর,
বসিবার ঠাই করে নিয়েছ।
চিনি নাই বলে, যতন করিনি
তুমি নিজ হতে চিনা দিয়েছ।
দুই হাতে ঠেলে সরায়েছি দূরে,
তবু দীনে কোলে করে বসেছ।
মায়াবিনী বলে চাহি নাই ফিরে,
সন্তান বলিয়ে বুকে (তুলে) লয়েছ।
কতদিন তুমি সোহাগের ভরে,
স্তন্যধারা মুখে ঢেলে দিয়েছ।
"আমি প্রেমময়ী প্রেম নেরে বলে"
কতদিন বুকে চেপে ধরেছ,
আমি ত তোমার অকৃতী সন্তান
তবু দীনহীনে কৃপা করেছ।
ক্ষমি অপরাধ রেখো পদতলে
(যেমনি) স্নেহচ্ছায় মুখ তুলে চেয়েছ।

দীন—উমেশচন্দ্র।

—:0:—

গোসাই রামকৃষ্ণ।

ন্যূনাধিক সাড়ে তিনশত বর্ষ অতীত হইল, পুণ্যভূমি শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বানিয়াচঙ্গ পরগণার রীচি গ্রামে এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বনমালী দাস এবং মাতার নাম জাহ্নবী দাসী। ইঁহারা দাস জাতীয়। রামকৃষ্ণের পিতা যেমন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, নির্ম্মল স্বভাব, এবং দীনদুঃখী প্রতি-পালক ছিলেন, মাতাও তেমনি উন্নতহৃদয়া এবং পতিগতপ্রাণা ছিলেন। উভয়ে পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের শীতল ছায়ায় সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেও তাঁহাদের সংসারে অনেক দিন পর্য্যন্ত একটী বস্তুর বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। সেটী আর কিছু নহে, পুত্রমুখ। বহুদিন ধরিয়া এই দম্পতিযুগল পুত্র-কামনায় কত দেবদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে হতাশপ্রাণে জীবনের অবশিষ্ট কাল কোন তীর্থস্থানে কাটাইবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথপ্রভুর দ্বারে ধন্না দেন। অনাহারে দুই দিবস অনিদ্রায় অতীত হইলে, তৃতীয় দিবসে তাঁহারা স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইলেন,—"তোমরা স্বগৃহে গমন কর, অচিরে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আমি তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য প্রচার করিব। এরূপে তাঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহানন্দে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ কালযাপন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে পুত্ররত্ন লাভ করিয়া দম্পতিযুগল কৃতার্থমন্য হইলেন। কথিত আছে যে, রীচি গ্রামের সন্নিকটস্থ মাছু-লিয়া আখড়ার মোহন্ত "শান্ত গোসাই" নামক এক বৈষ্ণব মহাপুরুষ এই শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই স্বপ্নযোগে সমস্ত জানিতে পারেন এবং স্বয়ং রীচি গ্রামে আসিয়া শিশু-টীকে দেখিয়া যান ও তাহার নামকরণকালে "রামকৃষ্ণ" নাম রাখিবার জন্য তাঁহার পিতা-মাতাকে অনুরোধ করেন। বনমালী তাঁহার পুত্রমুখ নীরিক্ষণ করিতে এই মহাপুরুষ আগমন করিয়াছেন দেখিয়া নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন এবং যথাকালে পুত্রের নাম "রামকৃষ্ণ" রাখেন।

রামকৃষ্ণ পিতামাতার স্নেহে ও যত্নে লালিত-পালিত হইয়া শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিন বর্ষ অতীত হইতে না হইতেই করাল কালবশে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ ছায়া রামকৃষ্ণের বালক-হৃদয় সরস রাখিতে পারিল না। মাতা স্বর্গগতা হইলেন। বনমালী দাস পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী জাহ্নবী দাসীকে হারাইয়াও, রামকৃষ্ণের দেবদুর্ল্লভ, সুন্দর আননখানি নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীশোকে কতক পরিমাণে ধৈর্য্যাবলম্বনে সক্ষম হইলেন। মাতার ন্যায় যত্নে রামকৃষ্ণের লালনপালন করিতে লাগিলেন। বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? রামকৃষ্ণ ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে পিতাও পরলোক গমন করিলেন। বালক রামকৃষ্ণ জগত শূন্য দেখিলেন। তাহার সরস বালক-হৃদয় মরুভূমিতে পরিণত হইল। সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়,—দুদিনের লীলা খেলা। সংসার তাঁহাকে বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করিল। উদীয়মান আশা, আকাঙ্ক্ষা ঝঙ্কা-

বিরুদ্ধে বৈরাগ্য তাহার জীবনের হাল শক্ত করিয়া ধরিল; গতি বিভিন্ন মুখীন হইল । এই সময়ে রামকৃষ্ণের মাতুল মহাশয় না থাকিলে, তিনি হয়তঃ তখনই গৃহত্যাগী হইতেন ; কিন্তু তাঁহার মাতুল, বনমালী দাসের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই রীচি গ্রামে আসিয়া রামকৃষ্ণকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন এবং অতি যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন । ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ।

বাল্যকালে রামকৃষ্ণ গোচারণ করিতে খুব ভালবাসিতেন । মাঠে গিয়া রাখালবালক-গণকে লইয়া নানাবিধ খেলা করিতেন । তাঁহার খেলার মধ্যে নদীতীরে বসিয়া বালুকার ভোগ প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে অর্পণ করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি ঐরূপে ভোগ দিয়া রাখাল বালকদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন । প্রবাদ এইরূপ যে, ঐ বালির ভোগ নানাবিধ মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদিতে পরিণত হইত, এবং রাখাল বালকেরা পরম পরিতুষ্টির সহিত তাহা ভক্ষণ করিত । রামকৃষ্ণ বাল্যকালে অতীব ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিত । যাহা হউক রামকৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্বন্ধে আর অধিক কথা জানা যায় না । মোটের উপর এই বালক যে কালে মহাপুরুষ হইবেন, তাহার আভাস তাঁহার বাল্যকালেই বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছিল ।

মাতুলালয়ে থাকিবার কালে রামকৃষ্ণের সংসার-স্পৃহা দিন দিন হ্রাস হইতে থাকিল, এবং বৈরাগ্যভাব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । তাঁহার আত্মীয়বর্গ ইহা জানিতে পারিয়া বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য রীতিমত প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল । রামকৃষ্ণ একদিন মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত মাছুলিয়া আখড়ার মহান্ত "শান্ত গোঁসাইর" শরণাপন্ন হইলেন । মাতুলালয়ে বাস করিবার কালে রামকৃষ্ণ "শান্ত গোঁসাই" সম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ পাইতেন, এবং তিনি যে মহাপুরুষ এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি যে তাহাকে উক্ত ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, এ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; কাজেই রামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট আত্ম-নিবেদন করিলেন । গোঁসাইপ্রভুও তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন । রামকৃষ্ণ এখন হইতে মাছুলিয়া আখড়ায় বাসকরতঃ গুরু-সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । অগ্নি কখনও অপ্রকাশিত থাকে না । রামকৃষ্ণের দিন দিন জ্ঞান-বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; তাঁহার মধুর ব্যবহারে গুরুভ্রাতাগণ এবং সমাগত ভক্তগণ আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন । এদিকে রামকৃষ্ণ অকপট গুরুভক্তি ও গুরু-সেবার ফলে গুরুকৃপা লাভে সমর্থ হইলেন । রামকৃষ্ণ জীবনে ধন্য হইলেন ।

অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ক্রমকালে রামকৃষ্ণ তাঁহার গুরুসন্নিধানে ও গুরুভ্রাতাগণের নিকট বিদায় লইয়া তীর্থভ্রমনে বহির্গত হন । তিনি ভারতের নানাস্থান ও তীর্থ পরিভ্রমন করতঃ অবশেষে ঢাকানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন । এই সময়ে ঢাকায় ত্রিপুরা-রাজ-বংশের উৎসবনারায়ণ * অবস্থিতি করিতে-ছিলেন । তিনি রামকৃষ্ণের গুণগান শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন এবং উপদেশাদি

শ্রবণ করিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরগণ রামকৃষ্ণের শিষ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া আসিতেছেন।

ঢাকায় অবস্থিতিকালে এক দিবস রামকৃষ্ণ ভ্রমনে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন একস্থানে কতকগুলি সাধু সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদিকে দেখিয়া রামকৃষ্ণও তথায় গিয়া আসন পরিগ্রহণ করিলেন। সমবেত সাধুগণ এই নবাগত সাধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ?" রামকৃষ্ণ উত্তরে যাহা বলিলেন,—তাহাতে সাধুগণ তাঁহাকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া উপহাস করেন ও সেইস্থান ত্যাগ করিতে বলেন। রামকৃষ্ণ নিঃশব্দে তথায় বসিয়া থাকায় এবং সাধুগণের আদেশ প্রতিপালন না করায়, জনৈক বলিষ্ঠ সাধু ক্রোধবশে রামকৃষ্ণের ভূপ্রোথিত যষ্টি উত্তোলন করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হন; এবং রামকৃষ্ণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্ম হস্তীসাহায্যে ঐ যষ্টি উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিয়াও যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন সাধুগণ রামকৃষ্ণের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। এই সময়ে উৎসবনারায়ণ আসিয়া রামকৃষ্ণকে সাদরে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। যাইবার কালে রামকৃষ্ণ প্রোথিত যষ্টি অবলীলাক্রমে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এই ব্যাপারে উপস্থিত জনবৃন্দ সকলেই বিস্মিত হইলেন। এই ঘটনার পর হইতে ঢাকানগরীতে রামকৃষ্ণ বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার নিকট উপদেশাদি লাভ করিবার জন্য দলেদলে লোক সমাগম হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি নির্জ্জনে থাকিয়া উপাসনাদি ক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকিতে ভালবাসিতেন। এইজন্ত তিনি ফরিদাবাদের জঙ্গলে থাকিতেন; এখানেও লোক সমাগম হইতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই ফরিদাবাদের জঙ্গলে এক বৃহৎ আখড়া প্রতিষ্ঠিত হইল, রামকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শিষ্য "ব্রহ্ম গোসাইকে" এই আখড়ার মোহন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাছুলিয়া গমন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি গুড়ই নামক স্থানে সপ্তাহকাল অবস্থিতি করেন; এখানেও এক আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধিও সেই আখড়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

রামকৃষ্ণের মাছুলিয়া আখড়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই মোহন্ত শান্ত গোঁসাই দেহরক্ষা করিলেন, কাজেই আখড়ার নিয়মানুসারে প্রধান শিষ্য রামকৃষ্ণই মোহন্ত পদে বৃত হইলেন। এখন হইতে রামকৃষ্ণ "গোঁসাই রামকৃষ্ণ" নামে পরিচিত হইলেন।

রামকৃষ্ণের মহিমায় শীঘ্রই মাছুলিয়া আখড়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল, এবং তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময়ে সৈয়দ মহম্মদহোসেন নামক একব্যক্তি মোগল বাদসাহের অধীনে এতদ্দেশ শাসন করিতেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া একসময়ে তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু গোমাংস পাঠাইয়াছিলেন কথিত আছে যে, রামকৃষ্ণের অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে ঐ মাংস নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছিল।

একসময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্ম্মচারী ইমামকুলি খাঁ রাজ্য পরিদর্শন জন্য শ্রীহট্টাভিমুখে গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে শূল-

বেদনা উপস্থিত হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। এই সময়ে তিনি রামকৃষ্ণের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে নানা কথা অবগত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। রামকৃষ্ণের কৃপায় নবাব কর্ম্মচারী আরোগ্যলাভ করিলেন এবং তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট লইয়া যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। রামকৃষ্ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, ইমামকুলি খাঁ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে নওয়াবাদ নামক স্থানে নবাবী নাম্নী কোন অশীতিবর্ষ বয়স্কা ধার্ম্মিকা রমণী প্রচুর অর্থ দিয়া রামকৃষ্ণকে উদ্ধার করেন এবং স্বগৃহে রাখিয়া তাহার সেবা করিতে থাকেন।

এই সময়ে হরাই ও সুরাই নামক দুইজন দস্যু নওয়াবাদের নিকটবর্ত্তী বিথলঙ্গের জঙ্গলে থাকিয়া দস্যুবৃত্তি করিত। তাহারা উপরোক্ত ঘটনায় নবাবীর প্রচুর অর্থ আছে, এরূপ বিবেচনা করিয়া একদিবস রাত্রে নবাবীর বাটীতে দস্যুবৃত্তি করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। রামকৃষ্ণ তখন নবাবীর বাটীতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। দস্যুদ্বয় রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্রই যেন আবিষ্ট হইয়া পড়িল, এবং তাহার চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা ও কৃপাভিক্ষা করিল। রামকৃষ্ণ তাঁহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে হারাই ও সুরাই রামকৃষ্ণকে বিথলঙ্গের জঙ্গলে লইয়া যায়। রামকৃষ্ণ ঐ জঙ্গলের সৌন্দর্য্য দর্শনে আনন্দিত হইয়া তথায় নির্জ্জন বাস করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ভক্তগণ ক্রমশঃ এখানেও সমবেত হইতে লাগিলেন। দলে দলে লোকজন আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। বিথলঙ্গের জঙ্গলে এক সুবৃহৎ আখড়া প্রতিষ্ঠিত হইল। ভক্তগণ আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকিলেন। এই আখড়াই এক্ষণে "বিথলঙ্গ আখড়া" নামে এতদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ।

এই আখড়া স্থাপনের কয়েক বৎসর পরে এক দিবস তাঁহার শিষ্যগণকে আহ্বানকরতঃ প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়া প্রকাশ করিলেন যে, তিনি সেই দিবসই দেহরক্ষা করিবেন। শিষ্যগণ প্রভুর এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সময়োপযোগী কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইলেন। গোসাঁই রামকৃষ্ণ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধ কাটাইয়া মহাসমাধি লাভ করিলেন।

এইরূপে অকপট গুরুভক্তি ও কঠোর সাধনার ফলে যে চরিত্র গঠিত হইয়াছিল এবং যাহার মধুময় ফল উপভোগ করিয়া কত সংসারতাপক্লিষ্ট ভবরোগীর ভবরোগজ্বালা দূর হইতেছিল, তাহা অদ্য স্বপ্নে বিলীন হইল। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু এরূপ জীবনই সার্থক।

রামকৃষ্ণের বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহ করা অসম্ভব। অন্যান্য মহাপুরুষের জীবনী [illegible] এই মহাপুরুষের জীবনীও দুর্ব্বিজ্ঞেয় [illegible] আমরা রামকৃষ্ণের লীলা বা কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যাহা বর্ত্তমানে বিদ্যমান দেখিতেছি, তাহাতে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তিনি মুসলমান আধিপত্যের পূর্ণ বিকাশ সময়ে ধর্ম্মকার্য্যে নানারূপে নির্য্যাতিত হইয়াও যে আদর্শ ও ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, এতৎ প্রদেশের জনগণ অদ্যাপিও তাহার মধুময় ফলভোগ করিতে-

ছেন। তাঁহার ধর্ম্মমত অবশ্য বৈষ্ণব এবং রামানুজ সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইলেও নির্গুণ ব্রহ্মই তাঁহার উপাস্য ছিলেন। এই পরব্রহ্মই গুরুরূপে প্রকাশিত; সুতরাং গুরু-সেবাই ব্রহ্মোপাসনা। রামকৃষ্ণ হইতে যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে "রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়" বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মতে "গুরুসত্য পূর্ণব্রহ্ম" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গুরুকেই প্রত্যক্ষ দেবতা ধারণা করিতে হয়। বৈষ্ণব ও সাধুসেবা করিতে হয়, তাঁহারাই প্রত্যক্ষ দেবতা; সুতরাং দেববিগ্রহের স্বতন্ত্র উপাসনা নিস্প্রয়োজন। "সর্ব্বজীব পরব্রহ্ম"-তাঁহাদের মূলতত্ত্ব রামকৃষ্ণ বিরচিত "নির্ব্বাণ-সঙ্গীত" গান করা উপাসনার অঙ্গ। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের জনগণ দুইভাগে বিভক্ত—গৃহী ও উদাসীন। গৃহীরা সাধারণভাবে জীবন যাপন করিবেন; কিন্তু উদাসীনদিগকে স্ত্রীত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিতে হইবে। রামকৃষ্ণের উদাসীন শিষ্যগণের মধ্যে "ব্রহ্ম গোসাঁই" ঢাকা ফরিবাদের মঠে থাকিয়া ও নারায়ণ গোসাই মাছুলিয়া আখড়ায় থাকিয়া রামকৃষ্ণের ধর্ম্মমত সমধিকরূপে প্রচার করেন। "ব্রহ্মগোসাঁই" অতিশয় ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাধনার বলে পশুপক্ষীও বশীভূত হইত। তিনি যুক্তিতর্কের দ্বারা নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে উক্ত সম্প্রদায়-পরিচালিত প্রায় চারিশত আখড়া আছে, তাহার মধ্যে বিথলঙ্গের আখড়া সমধিক প্রসিদ্ধ। এই সকল আখড়ার উদাসীন শিষ্য ব্যতীত প্রায় পঞ্চাশ-সহস্রাধিক গৃহস্থ শিষ্য আছে। বিথলঙ্গের আখড়ার ন্যায় বৃহৎ আখড়া শ্রীহট্ট জেলায় আর দ্বিতীয় নাই। ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যবাহাদুর সর্ব্বপ্রথম এই আখড়ার অট্টালিকাদি নির্ম্মান করিয়া দেন। এই আখড়ায় সাধুসন্ন্যাসী এবং গৃহী যে কেহ গমন করিলে, আখড়ার বৈষ্ণব সাধুগণ অতি সমাদরে তাঁহাদের অতিথিসৎকার করিয়া থাকেন। উক্ত আখড়ায় কোন মূর্ত্তি পূজিত হয় না। পূর্ব্বে গোময় ও তুলসীর ব্যবহার ছিল না, বর্ত্তমানে তাহা প্রচলিত হইয়াছে। এই আখড়ার বার্ষিক আয় প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। এতদ্ব্যতীত ভূসম্পত্তিও আছে। জগন্নাথক্ষেত্রকে আদর্শ করিয়া রামকৃষ্ণ এখানে জাতিবিচার উঠাইয়া দেন। বর্ত্তমানে এ নিয়ম সম্যকরূপে প্রতিপালিত হয় না। অনেক পিতামাতা তাঁহাদের শিশু-সন্তানকে এই আখড়ায় দান করিয়া থাকেন, তাহারা আখড়ায় প্রতিপালিত হইয়া ভেক ধারণ করতঃ সেবাকার্য্য চলাইয়া থাকেন। বৈষ্ণবী বা কোন স্ত্রীলোক স্থান প্রাপ্ত হয় না। মোহন্তের দেহত্যাগের পর উপযুক্ত উদাসী শিষ্যই গদী পাইয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ দেহ-ত্যাগকালে তাঁহার শিষ্যগণকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, বৎসগণ! তোমরা চিন্তিত হইও না; আমি এই স্থূলদেহ ত্যাগ করিলেও সূক্ষ্ম দেহে এই আখড়ার মোহন্তের কার্য্য পরিচালনা করিব।

রামকৃষ্ণ জীবিতকালে অনেক সময় ভাবসমাধিতে অবস্থিত থাকিতেন, এবং ঐরূপ ভাবাবস্থায় অনেকগুলি উপদেশপূর্ণ ও ব্রহ্ম-ভাবোদ্যতক সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিতেন। সেইগুলিই "নির্ব্বাণ-সঙ্গীত" নামে প্রসিদ্ধ।

গোসাঁই রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর ক্রমান্বয়ে সাত জন মোহন্ত বিথলঙ্গ আখড়ার গদী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে অষ্টম মোহন্ত "গোঁসাই রামচন্দ্র" মোহন্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ নানকপন্থী সম্প্রদায়ের ন্যায় এই রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়কেও বিশুদ্ধ গুরু-বাদী বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

———:0:———

যোগানন্দ লহরী।

বেহাগ, (২০) কাওয়ালী।

কবে,—ভূবন ভরিয়ে তোমারে হেরিয়ে
আপনা যাইব ভুলিয়া?
কবে,—তোমার পরশে শীতল হইয়ে,
তোমাতে যাইব ডুবিয়া॥
কবে,—অন্তরে বাহিরে তোমারে হেরিব
কৃপাকণা পেয়ে আনন্দে ভাসিব,
সুখ দুখ আমি সমান গণিব,
হাসি মুখে লব বরিয়া॥
কবে,—প্রেমের নয়নে হেরিব জগত,
পুলকে শিহরি হইব প্রণত,
তোমাতে হারাব আমার আমিত্ব
চিরতরে যাব মিশিয়া॥

———:0:———

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব-সংবাদ।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

শ্রীমদভাগবত। ১, ১, ৩

"এই শ্রীমদ্‌ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল; স্বয়ং শুকরূপী ভগবানের মুখ হইতে বিগলিত হইয়া, ধরাতলে অবতরণ করিয়াছে। ইহাতে পরমানন্দরূপ পীযূষরস প্রতিনিয়ত প্রসান্দিত হইতেছে। ইহা সাক্ষাৎ রসস্বরূপ; সুতরাং ইতর ফলের ন্যায় ইহাতে ত্বক্ বা অষ্টি

প্রভৃতি হেয় অংশ কিছুই নাই। অতএব যাঁহাদের সেই রসানুভবে শক্তি আছে, আবার যাঁহারা রসবিশেষ ভাবনায় পারদর্শী, তাঁহারা, যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ ইহা পান করিয়া লউন।"

জ্ঞান ও প্রেম ভক্তির আকর এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্য পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব, প্রেমভক্তির লাভের পঞ্চোপায়ের মধ্যে "শ্রীমদ্ভাগবত" পাঠ অন্যতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা :—

সংসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, "ভাগবত" নাম,
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান।
এই পঞ্চ মধ্যে যদি এক স্বল্প হয়,
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়॥

অমৃত রসান্বিত রসস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রেম-ভক্তি লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ পান করা উচিত। মুমূর্ষু মহারাজা পরীক্ষিৎ একমাত্র ভাগবত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে ডুবিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত কণ্ঠের ভূষণ করিয়া লউন। "আর্য্য দর্পণে" ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদিগের জন্য সর্ব্বরত্নের আকর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উল্লিখিত সুললিত অংশের মর্ম্মানুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি।

শুকদেব কহিলেন,—একদা ব্রহ্মা স্বীয় পুত্রগণ, দেবগণ ও প্রজেশ্বরগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলময় শঙ্কর ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া, মরুদগণের সহিত ইন্দ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আঙ্গিরস, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগগণ, সিদ্ধ, চারণ ও গুহ্যকগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ,—সকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্তধামে প্রকট হইয়া দেহ দ্বারা লোকের মনোরম হইয়া লোক মধ্যে সর্ব্বলোকের পাপবিনাশক যে বিমল যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাদির তাহাই দর্শন করিবার ইচ্ছা।

তাহারা নানা রত্নে পরিশোভিত, সমৃদ্ধিপূর্ণ বিরাজমান নগরীতে অদ্ভুতদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং স্বর্গো-দ্যানস্থিত মাল্যদামে যদুবরকে বিভূষিতকরতঃ মনোরম পদ ও অর্থসম্পন্ন বাক্য দ্বারা জগ-দীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ কহিলেন,—"নাথ! কর্ম্মময় দৃঢ় পাশ হইতে মুক্তি কামনা করিয়া ঋষিগণ হৃদয়-কমলে যাহা চিন্তা করেন, আমরা বুদ্ধীন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বাক্য দ্বারা আপনার সেই চর-ণারবিন্দে প্রণাম করি। হে অজিত! আপনি মায়াগুণে অবস্থিতি করিয়া ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা আপনাতে এই অচিন্তনীয় জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন; অথচ এই সকল কর্ম্মে আপনি কিছু মাত্র সংস্পৃক্ত নন। কারণ আপনি রাগাদি দোষপরিশূন্য; আপনি আচরণরহিত আত্মসুখে নিরত। হে পূজ্য! হে শ্রেষ্ঠ! আপনার গুণকীর্ত্তনে পরিপুষ্টা উত্তম শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুগণের চিত্ত যে প্রকার শুদ্ধি হয়, বিদ্যা, শ্রুতি, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম দ্বারা আসক্তগণ সেরূপ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। হে ঈশ্বর! মুনিগণ মুক্তির জন্য প্রেম-প্রবণ হৃদয়ে আপনার যে চরণ-কমল বহন করিয়া থাকেন, ভক্তেরা তাদৃশ

ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার ইচ্ছায় যাঁহাকে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করেন এবং ধীর ব্যক্তিরা স্বর্গলোভ ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইবার জন্য যাঁহাকে ত্রিকাল অর্চ্চনা করেন, সংযতহস্ত যাজ্ঞিকেরা হবিগ্রহণপূর্ব্বক বেদোক্ত বিধানে যাঁহাকে চিন্তা করেন, আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু যোগিগণ অধ্যাত্মযোগে যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, আর পরম ভাগবতেরা যাঁহাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করিয়া থাকেন,—সেই চরণ-কমল আমাদিগের বিষয়-বাসনা ধ্বংস করুক। বিভু হে! ভগবতী লক্ষ্মী সপত্নীর ন্যায় এই পর্য্যুসিতা বনমালার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তথাপি যে আপনি অভি-সুসম্পাদিত হইয়াছে ভাবিয়া এই বনমালা দ্বারা সম্পাদিত পূজা গ্রহণ করেন, আপনার সেই চরণ যুগল আমাদিগের বিষয় বাসনা সমুহের বিনাশের জন্য ধূমকেতু স্বরূপ হউক। হে ভূমন! হে ভগবন! আপনার যে চরণপদ্ম বলিরাজকে বন্ধনের সময় বিক্রমযুক্ত কেতুস্বরূপ হইয়াছিল, ত্রিপথগামিনী গঙ্গা যাহার পতাকা স্বরূপ, যাহা সুরগণের অভয় এবং অসুর সৈন্যগণের ভয়জনক, যাহা সাধুদিগের স্বর্গ ও অসাধু ব্যক্তিদিগের অধোগমনের নিমিত্ত কারণ,—তাহা আমরা ভজন করিতেছি, আমাদিগকে পাপ হইতে বিমুক্ত করুন। আপনি প্রকৃতি পুরুষের পরবর্ত্তী কালরূপী পরস্পর ক্লিশ্যমান ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল শরীরীই রজ্জুদ্বারা নাসিকাবিদ্ধ বলীবর্দ্দের মত, আপনার অধীনে অবস্থিতি করিতেছেন,—আপনার সেই অভয় চরণ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক। আপনি এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, প্রকৃতি পুরুষ ও মহত্তত্ত্বের নিয়ন্তা বলিয়া খ্যাত। আপনিই ত্রিনাভিসম্পন্ন, সকলের বিনাশে প্রবৃত্ত, গভীর বেগশালী কাল; সুতরাং আপনি উত্তম পুরুষ। অমোঘবীর্য্যশালী পুরুষ আপনা হইতে শক্তিলাভ করিয়া গর্ভের ন্যায়, মায়ার সহিত মহত্তত্ত্ব ধারণ করেন, সেই পুরুষই সেই মায়ার অনুসারী হইয়া বাহ্য আবরণযুক্ত হৈম অণ্ডকোষ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আপনি স্থাবর জঙ্গমের অধীশ্বর; কারণ, হে হৃষীকেশ! মায়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা উপস্থিত বিষয় সকল ভোগ করিয়াও আপনি তাহাতে সংলিপ্ত নহেন; কিন্তু আপনি ভিন্ন আর সকলেই স্বয়ং অসংস্বরূপ হইয়া থাকে। ষোড়শ সহস্র স্ত্রী মৃদুমন্দ হাস্য বিলসিত কুটিল কটাক্ষদৃষ্টি দ্বারা ভাব প্রকাশ, সুরতমন্ত্রসূচক মনোমুগ্ধকর ভ্রূভঙ্গী এবং চতুর মনোমোহন কামকলা দ্বারা আপনার কথারূপ অমৃত জল প্রবাহিনী এবং পাদপ্রক্ষালন-জলনদী ত্রিলোকের কলুষরাশি দূর করিতে সমর্থ। স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্মাবলম্বিগণ,—বেদবিহিত তীর্থ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা, আর পাদজাত তীর্থ অঙ্গ সঙ্গ দ্বারা, সেই উভয় তীর্থেরই সেবা করিয়া থাকেন।

শুকদেব কহিলেন,—শঙ্কর ও ব্রহ্মা দেবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্তব ও নমস্কার করনান্তর অম্বর আশ্রয় করিয়া কহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—"হে অশেষ-অন! হে প্রভো! পূর্ব্বে আমরা পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত আপনাকে জানাইয়াছিলাম, এক্ষণে সে সমস্ত সম্পাদিত হইয়াছে। আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধুগণে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন; সকল লোক পাপনাশিনী কীর্ত্তিও

সকল দিকে বিস্তার করিয়াছেন; সর্ব্বোত্তম রূপ ধারণকরতঃ যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে অখিলাশ্রয় হরি, এখন আপনার কোন দেব কার্য্য অবশিষ্ট নাই, এই যদুবংশও নষ্টপ্রায় হইয়াছে, যদি উচিৎ বোধ করেন, স্বীয় পরম ধামে গমন, বৈকুণ্ঠের কিঙ্কর এবং লোকপাল সহ আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “হে দেবেশ! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমিও স্থির করিয়াছি; ভূভার হরণ করিয়াছি। শৌর্য্য-বীর্য্য-শ্রী দ্বারা উদ্ধত প্রসিদ্ধ যাদবকুল লোক-গ্রাসে উদ্যত; বেলা যেমন সাগরকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, আমিও সেইরূপ যাদবদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যদি দর্পিত যাদব-গণের বংশ ধ্বংস না করিয়া স্বধামে চলিয়া যাই,—তাহা হইলে ইহারা উদ্বেলিত হইয়া এই লোক বিনষ্ট করিবে। এক্ষণে ব্রহ্মশাপে বংশনাশ উপস্থিত। হে নিষ্পাপ ব্রহ্মন্! ইহার অবসানে তোমার ভবনে গমন করিব।”

শুকদেব কহিলেন,—দেব স্বয়ম্ভূ, ভগবানের এইরূপ কথা শ্রবণকরতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, দেবগণের সহিত নিজ ধামে চলিয়া গেলেন। অনন্তর দ্বারকাপুরীতে মহা উৎপাত সকল সমুত্থিত হইল। তাহা দর্শন করিয়া ভগবান যদুপতি সমাগত যাদবদিগকে কহিলেন, আর্য্যগণ! এই দ্বারাবতী নগরীতে মহা উৎপাত সকল উত্থিত হইতেছে; আমাদিগের বংশের উপর ব্রাহ্মণগণের দুরপনেয় শাপও রহিয়াছে; প্রাণের আশা থাকিলে, আমাদিগের এ স্থানে আর থাকা অবিধেয়, অদ্যই পরমপবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করা যাউক, বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্থ চন্দ্র যে তীর্থে স্নান করা মাত্র পাপমুক্ত হইয়া পুনরায় কলাবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আমরাও সেই পাপনাশিনী পবিত্র প্রভাস-তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবতাদিগের তর্পণপূর্ব্বক নানাগুণ সম্পন্ন অন্ন দ্বারা উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাই এবং সেই-সকল সৎপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিব, পোত দ্বারা যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায়, তদ্রূপ এই বিবিধ দান দ্বারা সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইব।

শুকদেব কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! যাদবগণ ভগবানের আদেশে তীর্থ গমনে সমুৎসুক হইলেন এবং যান সকল যোজনা করিতে লাগিলেন। হে রাজন! তদ্দর্শনে ভগবানের বাক্য শ্রবণ ও ভয়ানক উৎপাত সকল নিরীক্ষণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অনু-গত প্রিয় ভক্ত উদ্ধব নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের চরণ কমল-যুগলে মস্তক দ্বারা প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, “হে দেবদেবেশ! হে যোগেশ! হে পুণ্যশ্রবণ! হে পুণ্যকীর্ত্তন! নিশ্চয়ই তুমি এই যদুবংশ ধ্বংস করিয়া লোক পরিত্যাগ করিবে; কারণ, তুমি ঈশ্বর সমর্থ হইয়াও বিপ্রশাপ মোচন করিলে না। হে কেশব! হে নাথ! আমি ক্ষণার্দ্ধের জন্যও তোমার ঐ রাতুল পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না; আমাকেও তোমার সঙ্গে লইয়া চল। হে কৃষ্ণ! মানবগণের পরমমঙ্গলদায়ক, কর্ণের অমৃততুল্য তোমার লীলামাধুরী অস্বাদন করিয়া লোকসকল অন্য কামনা পরিত্যাগ করে; আমরা ভক্ত হইয়া

শয়ন, উপবেশন, বিচরণ, স্থিতি, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনাদিতে প্রিয় আত্মা তোমাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিব ? তোমার উপভুক্ত মাল্যচন্দন, বসনভূষণে চর্চ্চিত হইয়া উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়া জয় করি। নগ্ন, ঊর্দ্ধরেতা, শ্রমণ, শান্ত, শুদ্ধ, সন্ন্যাসী-ঋষিগণ তোমার ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকেন; হে মহাযোগিন্ ! আমরা কিন্তু সংসার মধ্যে কর্ম্মমার্গে বিচরণ করিলেও তোমার ভক্তগণের সহিত তোমার সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া তোমার মানবানুকরণ গতি, হাসাপরিহাস, কর্ম্ম, ও বচনাবলী স্মরণ করিয়া ও স্মরণ করাইয়া দুস্তর অন্ধকার হইতে উদ্ধার লাভ করিব।" শুকদেব কহিলেন—হে নরনাথ ! ভগবান দৈবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া একাগ্রচিত্ত প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবের প্রতি কহিলেন।

অষ্টগুরুর বিনয় বর্ণন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে মহাভাগ ! তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহা সত্য; আমি তাহাই করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। ব্রহ্মা, ভব ও লোকপাল সকলে আমার স্বধামাভিগমন প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি যেজন্য প্রার্থনাক্রমে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই সমস্ত দেবকার্য্য আমি অশেষ প্রকারে সম্পাদন করিয়াছি। বংশ ব্রহ্ম-শাপদগ্ধ হওয়ায় পরস্পর কলহকরতঃ বিনষ্ট হইবে। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে নষ্ট হওয়ায় সমুদ্রই এই নগরীকে গ্রাস করিবে। হে সাধো ! আমি যেমন এই লোক পরিত্যাগ করিব, অমনি ইহার মঙ্গল নাশ পাইবে, কলিও ইহাকে শীঘ্রই আক্রমন করিবে। আমি এই লোক পরিত্যাগ করিলে, তুমি এ স্থানে বাস করিবে না। হে ভদ্র ! কলিযুগে লোকের প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট হইবে। তুমি স্বজন ও বন্ধুগণের স্নেহ সমুদায় পরিত্যাগকরতঃ আমাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করিয়া সমদর্শী হইয়া সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞানকরতঃ পৃথিবী পর্য্যটন কর। যাহা মন, বাক্য, দর্শনেন্দ্রিয়যুগল ও শ্রবণাদি দ্বারা গৃহীত হইতেছে, সেই জগৎকে মনোময়, মায়াময়, ও নশ্বর বলিয়া জানিও। বিক্ষিপ্ত-চিত্ত পুরুষের ভেদবিষয়ক ভ্রমই গুণদোষহেতু, গুণ-দোষ বুদ্ধি পুরুষের কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই এই ভ্রম হয়; সুতরাং যুক্তেন্দ্রিয়, যুক্তচিত্ত হইয়া এই জগৎকে আত্মময় এবং আত্মাকে অধীশ্বর রূপে দর্শন করিবে। আমি—অধীশ্বর এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-যুক্ত আত্মানুভবসন্তুষ্ট শরীরীদিগের আত্মস্বরূপ হইলে, বিঘ্ন দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। যিনি গুণ দোষের অতীত, তিনি বালকের ন্যায় "দোষ" এই বোধ করিয়াও নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হন না। "গুণ" ইহা জানিয়াও বিহিত কার্য্যে আসক্ত হন না; এইরূপ ব্যক্তি সর্ব্বভূতের সুহৃদ, শান্ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিশ্চয় সম্পন্ন হইয়া বিশ্বকে আমার স্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহাকে আর বিপদগ্রস্থ হইতে হয় না।"

শুকদেব কহিলেন,—রাজন ! মহাভাগবত উদ্ধব, ভগবানের এইরূপ অনুজ্ঞা পাইয়া তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় অচ্যুতকে প্রণামকরতঃ কহিলেন,—হে যজ্ঞেশ্বর ! হে যোগবিচক্ষণগণের নিক্ষেপস্বরূপ ! হে যোগাত্মন্ ! হে যোগের উৎপত্তিস্থান ! মোক্ষের জন্ত

সন্ন্যাসরূপ কর্ম্মত্যাগ আমাকে উপদেশ দিয়াছ। হে ভূমন্! যেসকল ব্যক্তিদিগের মন বিষয়াসক্ত, কামনা পরিত্যাগকরা তাহাদিগের পক্ষে দুষ্কর; বিশেষতঃ তুমি সর্ব্বাত্মা—যাহারা তোমার প্রতি ভক্তিহীন, তাহাদিগের কামনা পরিত্যাগ করা অতীব দুষ্কর, এই আমার ধারণা। আমি মূঢ়বুদ্ধি কারণ তোমার মায়া দ্বারা বিরচিত, পুত্রাদিসহিত দেহে "আমি" ও "আমার" এই ভাবিয়া তাহাতে আমি আসক্ত; সুতরাং তোমার পূর্ব্বকথিত ঐ উপদেশ যাহাতে শীঘ্র সাধন করিতে পারি, ভগবন্! ভৃত্যকে তাহা অল্পে অল্পে শিক্ষা দাও। হে ঈশ্বর! তুমি স্বপ্রকাশ সত্য আত্মা, তোমা ভিন্ন আত্মোউপদেশ কে শিক্ষা দিতে পারেন? দেবতাদিগের মধ্যেও এরূপ অন্য কাহাকেও দেখিতে পাই না। ব্রহ্মাদি সকল শরীরিমাত্রই তোমার মায়া দ্বারা মোহিত, ইহারা বিষয়কে প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন। অতএব দুঃখনিকর দ্বারা অভিতপ্ত, সুতরাং আমি নির্ব্বিন্নবুদ্ধি; তুমি আনন্দিত, অনন্তপার, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর, অবিনাশী বৈকুণ্ঠবাসী, নর-সখা নারায়ণ, তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।"

ভগবান কহিলেন,—ভূমণ্ডলে লোক-তত্ত্ব-বিচারক মানবগণ প্রায় আত্মার দ্বারাই আত্মাকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। আত্মাই পশু-আত্মার গুরু, বিশেষতঃ পুরুষের গুরু; কারণ এই আত্মাই প্রত্যক্ষ ও অনুভব দ্বারা মুক্তিফল লাভ করেন। সাংখ্য-যোগবিশারদ পণ্ডিতগণ আমাকে, সর্ব্বশক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত পুরুষরূপেই ভিন্ন ভিন্ন আকারে দর্শন করিয়া থাকেন। একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ, বহুপাদ ও অপাদ প্রভৃতি পূর্ব্ব সৃষ্ট শরীর অনেক আছে, তন্মধ্যে পুরুষ শরীরই আমার প্রিয়। আমি অজ্ঞেয় হইলেও অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ এই শরীরে নিগূঢ় ও চিহ্নদ্বারা অনুমানবলে আমাকে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। এ বিষয়ে অমিততেজা যদু ও অবধূতের কথোপকথন-ঘটিত এক ইতিহাস বর্ণিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ।

দীন—কৃষ্ণদাস।

—:0:—

শ্রেয় ও প্রেয়।

শ্রেয় প্রেয় দুই পথ জগতে বিদিত,
শ্রেয় পথে জ্ঞানিগণ চলে অবিরত।
প্রিয়তম দারাপত্য পরিহার করি,
তরী বিনা ভবার্ণব যায় তারা তরি।
শ্রেয় পথে গেলে জীব মোক্ষধন পায়,
স্বর্গের দেবতাগণ নমে তার পায়।
প্রেয়পথে অবিবেকী মূঢ়গণ ধায়,
আপাততঃ রমণীয় সুখ সদা চায়।
কামভোগে বিমোহিত হয়ে মূর্খগণ,
স্বরগ নরক সদা করে পর্য্যটন।
প্রেয়পথে প্রতি পদে অশান্তি অপার,
কোটি জন্মে নাহি মিলে কভু কুল তার।
ভবার্ণবে ডুবে জীব হাবুডুবু খায়,
বাসনার দাস হয়ে নানা দুঃখ পায়।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

নাচিছে গোপাল।

(১)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল,
আনন্দে নাচিছে হের যশোদাদুলাল।
হাতে লয়ে ক্ষীর ননী, নাচিতেছে নীলমণি,
নন্দরাণী দিতেছে গো দুইহাতে তাল।
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল॥

(২)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল,
হাসিমুখে নাচিতেছে ব্রজের রাখাল।
পা ফেলিয়ে তালে তালে, নাচে গোপাল-
হেলে দুলে,
চরণে নূপুর বাজে শ্রবণে রসাল।
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।

(৩)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল,
ক্ষীর, সর, নবনীতে পূরি দুটী গাল।
এক হাত মুখে দিয়ে, অন্য হাত বাড়াইয়ে,
ক্ষীর, ননী মাগিতেছে নন্দের দুলাল,
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।

(৪)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।
গোপালে বেড়িয়ে নাচে যতেক রাখাল,
চাঁদমুখে মা" মা" বলে, যশোদারে ডেকে বলে,
"ননী দে", ননী দে", মা গো ভরি স্বর্ণ থাল,
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।

(৫)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।
নাচ দেখে নন্দরাণী আনন্দে বেহাল।
ক্ষীর, ননী হাতে লয়ে, আনন্দেতে নেচে গেয়ে,
বিতরিছে সখাগণে শ্রীনন্দদুলাল।
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।

(৬)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।
হের ঐ কি সুন্দর নাচে নন্দলাল।
(কিবা) অপরূপ রূপ তার, বঙ্কিম চাহনি আর,
ব্রজপুরী মজাইয়ে নাচে নন্দলাল।
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।

(৭)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল,
নাচ দেখে স্তব্ধ হ'ল যতেক গো-পাল।
কবলী, ধবলী গাই, তাদের সম্বিৎ নাই,
একদিঠে, আনমনে হেরিছে গোপাল।
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।

(৮)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।
মন প্রাণ কেড়ে নিয়ে নাচে নন্দলাল।
কাহার নাহি সে সাড়া, সবাই চেতনাহারা;
একমনে নেহারিছে সুন্দর গোপাল,
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।

(৯)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।
নিস্তব্ধ ধরণী হের আকাশ, পাতাল।
স্থির শান্ত, ক্ষিতিতল, অতল, সুতল, তল,
(সবে), চিত্রপুত্তলিকাসম হেরিছে গোপাল
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।

(১০)

নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল,
গোপালের নাচে সবে হারায়েছে তাল।
সবাই পাগলপারা, সকলি যে আত্মহারা,
হের ওই ঘরে ঘরে নাচে নন্দলাল।
নাচিছে গোপাল দেখ, নাচিছে গোপাল।

(১১)

আয়রে গোপাল মোর আয় কাছে
আয় রে,
তোরে বুকে নিয়ে মোর পরাণ জুড়াই রে,
ত্রিতাপ-জ্বালায় আমি জ্বলিয়া মলেম রে,
কিছুতে যে পুড়া প্রাণ শীতল না হয় রে,
দারাসুতে কতদিন ধরিয়াছি বুকে রে,
তবু ত হৃদয়-জ্বালা দূর নাহি হ'ল রে,
দিবানিশি তুষানল জ্বলিতেছে হৃদে রে,
পুড়া হৃদি শীতলিতে আয় গোপাল
আয় রে,
তুই বিনে এ দীনের আর কেহ নাই রে।

(১২)

গোপাল !

দীন আমি তোর কাছে এই ভিক্ষা চাই রে,
তোর কৃপাবলে যেন মায়াপাশ কাটে রে,
তোর কৃপাবলে যেন দিব্যদৃষ্টি পেয়ে রে,
সকল শিশুর মাঝে তোরে যেন হেরি রে,
উচ্চ, নীচ না ভাবিয়ে সবে বুকে নিয়ে রে,
এ দগ্ধ পরাণ যেন জুড়াইতে পারি রে।

দীন—হরিদাস।

—:0:—

দেব-কৃপা।

সে আজ প্রায় নয় দশ বৎসরের কথা; শরৎকাল, আশ্বিন মাস, মা জগজ্জননীর আগমনাশায় প্রকৃতিদেবী প্রফুল্লা; সরোবরে দলে দলে প্রস্ফুটিত সরোজ, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ প্রসূনাবলিতে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে। নির্ম্মল নীলাকাশে শরচ্চন্দ্রের বিমল হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিহঙ্গকুলের মৃদু মধুর কাকলী, বর্ষান্তে আবিলতাপরিশূন্য নদ নদীর ভাব, প্রশান্ত নব-কিশলয় দলে সজ্জিত পাদপশ্রেণীর মনোহর বেশ অবলোকন করিয়া,—মল্লিকা, মালতী, যুই প্রভৃতি পুষ্পের সুস্নিগ্ধ গন্ধে মনে কেমন যেন দূর দূর অথচ প্রাণের অতি-নিকটে লুপ্ত স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। প্রকৃতি সুন্দরী নানা সাজে বিভূষিতা হইয়া বরাভয়-দায়িনী মা বিশ্বপ্রসবিনীর আগমনী গাহিতেছে। বৎসরান্তে "মা" আসিতেছেন দেখিয়া সকলের প্রাণেই একটা আনন্দের ক্ষীণধারা প্রবাহিত; কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্দ্ধনী, কি ভিখারী, কি ব্যবসায়ী সকলের মনই প্রসন্ন, সকলের মনেই নূতন উৎসাহ, নূতন আশা। বিশেষতঃ প্রবাসী বাঙ্গালী ভ্রাতাদের ত কথাই নাই,—তাহারা সারাটী বৎসরের পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্থ দেহ মনকে কেহ পনর দিনের, কেহ এক মাসের, কেহ দুই মাসের, কেহ বা তিন মাসের জন্য বিশ্রাম

দিবার অবসর পাইয়াছেন। সকলেই দেশে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কেহ এক বৎসরের, কেহ বা ততোধিক বৎসর পরে পূজনীয় পিতামাতার চরণ দর্শন এবং স্নেহভাজন ভ্রাতাভগ্নিদিগের, কেহ নব পরিণীতা অর্দ্ধাঙ্গিনীর, কেহ পুত্র কন্যার সঙ্গ-সুখ লাভ করতঃ প্রবাসের জ্বালা যন্ত্রনা ভুলিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে প্রস্তত হইয়াছেন। কাহারও বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব না থাকিলেও স্বাভাবিক অনুরাগবশে পিতা মাতার বাস্তভিটাটী দেখিয়া এবং কৈশোর কালের খেলার সাথী ও পাঠ্যাবস্থার সতীর্থদিগের নিস্বার্থ ভালবাসার কথা মনে করিয়া, তাহাদিগকে দেখিয়াও কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভাশায় দেশে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ফলতঃ সকলের মধ্যেই একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দেশময় একটা হৈ চৈ পড়িয়াছে।

আজ পঞ্চমীর দিন, রাত্র সে সময় প্রহরাতীত; শরদিন্দু ডুবিয়া যায় নাই, তখনও চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত শিশিরসিক্ত বৃক্ষপত্র মুক্তামালার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। এমন সময়-অগ্নি-শকটে এলাহাবাদ ষ্টেশনে কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু স্ত্রী ও একটী শিশু পুত্র সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশন আলোকমালায় সজ্জিত। লোকে লোকারণ্য। উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, ছাত্র, মুন্সফ, কেরানী প্রভৃতি সকলেই বাড়ী যাইবার নিমিত্ত ষ্টেশনে আসিয়াছেন। আরোহীদিগের সংখ্যা এত বেশী যে, গাড়ীতে তিলমাত্র স্থান নাই। কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু কোনরূপে মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীতে স্ত্রীপুত্র সহ স্থান লইলেন। গাড়ী ছাপড়া অভিমুখে চলিল, চারি পাঁচটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিলে, কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু দেখিলেন, তাহার শিশুপুত্রটীকে পথে খাওয়াইবার জন্য যে দুগ্ধ ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা ভুলক্রমে বাসায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। পথে অনেক সময় দুগ্ধ পাওয়া যায় না, কোন কোন সময় পাওয়া গেলেও সে দুগ্ধ অতি কদর্য্য, খাওয়া দূরের কথা, দেখিয়াই ঘৃণা হইয়া থাকে। সেকারণ কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু পূর্ব্ব-হইতেই দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন উপায়? কোথায় দুগ্ধ পাওয়া যাইবে? বিশেষতঃ রাত্রি কাল; কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, প্রসূতির স্তনেও তেমন দুগ্ধ নাই, যাহা দ্বারা শিশুর জীবন রক্ষা হইতে পারে। এদিকে গাড়ী ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল, প্রতি ষ্টেশনেই কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু দুগ্ধ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও পাইতেছেন না। দুগ্ধের জন্য শিশু দুই একবার কাঁদিয়াছিল, তবে কোনরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। রাত্র প্রভাত হইলে কৃষ্ণপ্রসন্নবাবুর মনে আশার সঞ্চার হইল, প্রাণে একটু বলও পাইলেন, ভাবিলেন দিনে নিশ্চয়ই কোন না কোন ষ্টেশনে দুগ্ধ পাইবেন। কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু প্রত্যেক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দুগ্ধ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; তাঁহার অদৃষ্ট-বৈগুণ্যেই হউক, বা যে—কারণেই হউক, কোন স্থানেই দুগ্ধ পাইলেন না। শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে, দিন অতীত হইয়া আসিয়াছে, মরীচিমালী এখনই তাহার ময়ুখমালা উপসংহারকরতঃ অস্তাচল শিখরারূঢ় হইবেন। আবার সেই রজনী আসিতেছে; এ পর্য্যন্ত শিশু দুগ্ধ খাইতে পাইল না, শিশু ক্ষুধার যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন

করিতে লাগিল। প্রসূতি পুত্রের অবস্থা দৃষ্টিগোচর করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া করতলে কপোল বিন্যস্তকরতঃ হতাশ ভাবে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার গণ্ড বহিয়া নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল। শিশু দুগ্ধাভাবে ক্রমশই দুর্ব্বল হইতে লাগিল, আর ক্রন্দন করিবার শক্তিও নাই, তদ্দর্শনে প্রসূতি অধীরা হইয়া পড়িলেন। পুত্রের ও স্ত্রীর দুরবস্থা দর্শনে কৃষ্ণপ্রসন্নবাবুর হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। হে ভগবন! অজ কি দুগ্ধাভাবে একমাত্র জীবনপ্রদীপ নয়নানন্দদায়ক পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইবে? পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে তুচ্ছ দুগ্ধের নিমিত্ত নিরপরাধ শিশুর ঈদৃশ শোচনীয় মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে, তাহা ত স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই! হায়! সামান্য দুগ্ধ দ্বারা বুভুক্ষু শিশুর জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম না? হে ভগবন! শুনিয়াছি তুমি বিপদে বন্ধু, অসহায়ের সহায়, আর্ত্তের ত্রাণ-কর্ত্তা, বিপন্নের রক্ষক। অযাচিতভাবে দয়া কর বলিয়া তোমার এক নাম দয়াময়, জগতের দুঃখ হরণ বলিয়া তোমার এক নাম "হরি"; যে যাহা বাঞ্ছা করে, তাহা তুমি পূর্ণ কর বলিয়া তোমার এক নাম বাঞ্ছা-কল্পতরু, দাম্ভিকের দর্প চূর্ণ কর বলিয়া তোমার এক নাম দর্পহারী। হে বাঞ্ছাকল্পতরু হরি! হে দর্পহারী হরি! হে দয়াময় হরি! আমাকে কি এ দুস্তর বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিবে না? আমার বাঞ্ছা কি পূর্ণ করিবে না? আমি কি তোমার দয়া হইতে বঞ্চিত হইব?

এখানে কৃষ্ণপ্রসন্নবাবুর একটু পরিচয় দিতেছি। কৃষ্ণপ্রসন্নবাবুর বাড়ী উত্তর-বঙ্গে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, পাশ করিয়া এলাহাবাদ শিক্ষাবিভাগের মধ্যে চাকুরী লইয়া বিশেষ পারদর্শিতার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু দয়া, দাক্ষিণ্য, শীলতা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। তবে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনালোচনা করিতে করিতে একরূপ নাস্তিকের মত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর যে সমস্ত কর্ম্মের নিয়োজক ও ফলদাতা, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। বলিতেন,—কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল পাইব, কর্ম্ম না করিলে ফল পাইব না। যাহা আমি করিলে পাইব, না করিলে পাইব না, যাহা আমার পুরুষ-কারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাদৃশ কর্ম্মের নিয়োজক এবং ফলদাতা ঈশ্বর হইবেন কিরূপে? এরূপ অন্ধ বিশ্বাস, বিদ্যা-বুদ্ধিহীন অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন মূঢ় ব্যক্তি-রাই বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাহার সত্যতা প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাস না করিয়া অদৃষ্ট বা অনুমানের উপর নির্ভর করিব কেন? কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু এইরূপ অহং-জ্ঞানী, আত্মনির্ভরশীল ও পুরুষকারবাদী ছিলেন।

আমরা মুখে যত বড় দার্শনিক হই, যত বড় জ্ঞানী হই, যত বড় পণ্ডিত হই, নাস্তিক হই বা আস্তিক হই,—ভগবানকে ডাকা আমাদের স্বভাবিক বৃত্তি; অন্যসময়ে মুখে স্বীকার না করিলেও বিপদে পড়িলে অন্তরেই অতি গভীরতম প্রদেশ হইতে সে ধ্বনি নিনাদিত হইয়া থাকে। তখন ক্ষণ-কালের জন্যও অহংজ্ঞান বেগবতী-স্রোত-

স্বতী নিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, সে সময় জীব বুঝিতে পারে, তাহার নিজের কোনই স্বাধীনতা নাই; তাহার যে বিন্দুমাত্র শক্তি আছে, তাহাও কোন অজ্ঞেয় শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত; সে শক্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার তাহার নাই। "বিপদে ত্রাহি মাং মধুসূদন।" আমরা ভগবানকে বিশ্বাস করি বা না করি, কিন্তু বিপদে পড়িলে, "মধুসূদন। এ বিপদ হইতে রক্ষা কর", না বলিয়া থাকিতে পারি না; কেননা ভগবদ্ভজন জীবের স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি, ভগবদ্ভজন বৈমুখ্যতাই অস্বাভাবিক। যদিও কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু ভগবানকে কখনও ডাকেন নাই বা বিশ্বাস করেন নাই, তথাপি আজ বালকের ন্যায় ডাকিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার বিদ্যাভিমান বা মানাপমানবোধ ছিল না।

দয়ার ঠাকুর ভগবান কি জীবকে বিপদ হইতে উদ্ধার না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন? তিনি যে মায়াহ্রদে পতিত বিষয়-বিষে বিদগ্ধ জীবকে তাঁহার চির অমৃতময়, চির নিত্য নূতন প্রেমানন্দের অধিকারী করিবার নিমিত্ত,—জীবকে বিপদে ফেলিয়া শিক্ষা দান-করতঃ মোহমলিন কলুষকালিমা ক্ষালন পূর্ব্বক "স্বরূপে" বিকাশ করিয়া লন। জীব বিপদে না পড়িলে যে তাঁহাকে ডাকে না, বিপদে না পড়িলে যে তাঁহাকে চিনে না, বিপদে না পড়িলে যে মায়া-নিদ্রা ভাঙ্গে না, বিপদে না পড়িলে যে শিক্ষা হয় না। তাই—প্রেমের ঠাকুর শ্রীভগবান করুণা করিয়া জীবের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য কঠোর বিপদে ফেলিয়া থাকেন। জীব যে তাঁর বড় প্রিয়, জীব যে তাঁর প্রাণের, বড় সাধের! সেই জীব কি তাঁকে ভুলিয়া ধূলাখেলায় মত্ত হইয়া থাকিবে? ইহা কি ভগবান দেখিতে পারেন? পারেন না বলিয়াই ত—তাঁর আনন্দে আনন্দিত করিবেন বলিয়াই ত বিপদে ফেলিয়া থাকেন,—

"বিপদ সম্পদের তরে, দিতে পরম পদ তোরে।
বিপদ নৈলে জন্মান্ধ জীব ডাকে না তাঁরে।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

দীন—প্রিয়নাথ।

—:0:—

জন্মাষ্টমী।

(১)

দিয়াছে টানিয়া স্রষ্টা মসীময় যবনিকা জগত জুড়ি।
(আজ) ছাড়িয়া গোলক অনন্ত পুলকে ভূতলে আসিবে শ্রীহরি।
অনন্ত আঁধার দিগন্ত ব্যাপিয়া,
পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে ঢাকিয়া,
হাকিছে পবন, কাঁপিছে গহন,
উঠিছে মেদিনী সভয়ে সঘন,
কম্পান্বিত বিশ্বজীব হেরি বিভীষিকা প্রকৃতি ভয়ঙ্করী;
অন্তরীক্ষ হ'তে কহে "শূণ্যবাণী",—"মাভৈঃ! আজ জন্মে শ্রীহরি।"

(২)

করিছে নীরদ অশ্রান্ত বর্ষণ,
খেলিছে দামিনী করিয়া গর্জ্জন,
উন্মত্ত আবেগ একান্ত বিহ্বল,
কালিন্দী সলিল তুলিয়া কল্লোল,
প্লাবনপীড়ন ছলে ছুটে প্রক্ষালিত করি মথুরাপুরী,
(আজ) বিশ্বের কল্যাণ তরে আসিবে ধরায় রমাবল্লভ হরি।

(৩)

রাখিতে জগতে ধর্ম্মের গৌরব,
বিলাইতে পূর্ণ প্রেমের সৌরভ,
দূর্নীত আচার করিবারে চূর্ণ,
আসিবে ধরায় পর (ম) ব্রহ্ম পূর্ণ
ধর্ম্ম সংস্থাপিতে অনন্ত অসীম ক্ষুদ্র মানব রূপ ধরি।
ছাড়িয়া গোলক অনন্ত পুলকে আজ রমাবল্লভ হরি॥

দীন—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ।

———:0:———

সংবাদ ও মন্তব্য।

আশ্রম-সংবাদ—গত আষাঢ় মাসে আশ্রমাধিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস মহারাজ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন,—আগামী শারদীয়া পূজা পর্য্যন্ত-অত্র মঠেই অবস্থিতি করিবেন।

জন্মোৎসব—গত ২৮ শ্রাবণ শ্রীশ্রীমৎপরমহংসদেব মহারাজের জন্মতিথি উৎসব-যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার—আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে" নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি—শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র দত্ত ১৲, শ্রীযুত বিন্দুচরণ দাস ২০৲ টাকা, শ্রীযুত হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়—১৲ ও শ্রীযুত কাঙ্গাল সরকার ৫৲ টাকা; মোট—২৭৲ টাকা মাত্র।

———:0:———

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, } আশ্বিন ও কার্ত্তিক। { ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব।

এই জগতের সৃজন পালনাদিতে পরব্রহ্মের যে শক্তি নিযুক্ত আছেন, তাঁহরই নাম প্রকৃতি বা মায়া। যথা:—

সা মায়া পালিনীশক্তি সৃষ্টিসংহারকারিণী।
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৫।২৬।

হে মহাভাগ! পরমেশ্বর আপনার যে সৎ ও অসৎগুণযুক্ত শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারই নাম মায়া। বেদান্তশাস্ত্র এই মায়াকে অসৎ বলিয়াছেন। কেন না দর্শনশাস্ত্রে মায়া শব্দের এইরূপ অর্থ ধৃত হইয়াছে—

"মাত্যস্যাং শক্ত্যাত্মনা প্রলয়ে সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টৌ ব্যক্তিঃ যাতীতি মায়া।"

প্রলয়ে শক্ত্যাত্মা দ্বারা সমুদয় জগৎ ইঁহাতে মিলিত বা উপসংহৃত হয়, এবং সৃষ্টিকালে আবার সমস্তই ব্যক্তিভূত হইয়া থাকে; এই অর্থে মায়া,—'মা' শব্দে উপসংহরণ এবং 'য়া' শব্দে ব্যক্তিকরণ। অতএব মায়া-অবিদ্যার ব্যক্তিকরণ ও উপসংহরণ শক্তি মাত্র। এই মায়া আবার সমষ্টি শুদ্ধ সত্ত্ব-ময়ী মহামায়ার বা মূলাপ্রকৃতির বিকার। এজন্য তাহা নির্গুণের পরিণাম। যাহা পরিণামী, তাহাই অসৎ। মায়া-সমুৎপন্ন জীব-জগতের নিয়তই অবস্থান্তর ঘটিতেছে। মায়ার পরিণামের সীমা ও শেষ নাই। জগৎ নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অবস্থা-ভেদ ও পরিণাম সমস্তই অনিত্য,—নিত্য বস্তুর অনিত্য অবস্থা। যাহা অবিদ্যা-স্বভাব—কখন একরূপে নাই, সততই অবিদ্যমান, তাহাই অসৎ। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই নির্ব্বিকার ও সৎ। সেই নির্ব্বিকার সদ্বস্তু হইতে প্রভেদ রাখিবার নিমিত্ত পরিণামী মায়াকে (প্রবাহরূপে নিত্যা হইলেও) অসৎ বলা হইয়াছে।

ত্রিগুণময়ী মায়া নিজ প্রকৃতিবশতঃ অসৎ। এই প্রকৃতি দ্বিবিধ—মায়ার আবরণ শক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি। অগ্রে আবরণ শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

অহঙ্কারাভিমানী জীবে অবিদ্যা সততই কামনার উৎপত্তি করিতেছে। এই কামনা হইতে জীবের কামনাময় সূক্ষ্ম শরীরের সৃষ্টি। এই সূক্ষ্ম শরীরই জীবের প্রকৃত দেহ। এই দেহভূত প্রাণই দেহী বা জীবাত্মা। জীবের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ সেই কামনাময় দেহেরই ভোগশরীর মাত্র। এই কামনাময় দেহই জীবাত্মার পিঞ্জর স্বরূপ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

"ধূমেনা ব্রিয়তে বহ্নি যথা দর্শোমলেনচ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথাতেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা।
কামরূপেন কৌন্তের দুষ্পূরেণানলেনচ॥"
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।৩৮-৩৯।

ধূম দ্বারা যেমন বহ্নি, মলিনতা দ্বারা যেমন দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা যেমন গর্ভ আবৃত থাকে. কামনা দ্বারা সেইরূপ জীবের জ্ঞানও আবৃত হইয়া থাকে। ইহাই জীবের নিত্য-বৈরী এবং দুষ্পূরণীয় ও অনলতুল্য সন্তাপকর। এই কামনা দ্বারাই জীবের জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। কামনাময় মায়ার আবরণ শক্তির প্রভাব এইরূপ। এই আবরণ, কামনার ধর্ম্মাধর্ম্ম জনিত হয়। তজ্জন্ত জীবের সাত্ত্বিকাংশ মলিন হইয়া যায়, তাই অবিদ্যা, সত্ত্বগুণকে মালিন্যময় করে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব আত্মা, মালিন্যময় কামনা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই কামনা অতি চঞ্চলা; তাহার স্থিরতা কিছুই-নাই। মায়া এই কামনাযুক্ত হইয়া সততই অনিত্য-ভাবাপন্ন হইয়া আছেন। এই অসৎ, কামনাময়ী অবিদ্যাধীন হইয়া জীব কর্তৃত্বাভিমানে পূর্ণ হইয়া থাকেন। নিজ কর্তৃত্বে পূর্ণ হইয়া তিনি আর ঈশ্বর কর্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। যেখানে জীব কর্ত্তা, সেখানে ঈশ্বর কে? এই কর্তৃত্বাভিমান জীবের অন্তর্দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তিনি জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে পান না। ইহাই মায়ার ঘোর আবরণ শক্তি।

এই আবরণ শক্তিহেতু মায়ার যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত হয়, তাহা হইতেই মায়ার বিক্ষেপ শক্তির উৎপত্তি। জীবের অভিমান যে মিথ্যাদৃষ্টি সঞ্চার করে, সেই দৃষ্টিহেতু জগতের সমস্ত মায়িক রূপ ও ব্যবহার সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপ সকল কি বাস্তবিক সত্য, না জীবের কল্পনা মাত্র? বেদান্তী বলেন,—জীবের মিথ্যাদৃষ্টি-মায়া জগতের যেরূপ সকলকে বিক্ষেপ করে, তাহাই মায়ার বিক্ষেপ শক্তির পরিচয়; নহিলে জগৎ অনন্ত ব্রহ্মময়।

জীব-দৃষ্টির সহিত ব্রহ্মপদার্থের এক বিশেষ প্রকার সম্বন্ধজনিত জগতের এই বিরাট রূপের কল্পনা। মানুষের চক্ষুর সহিত জগতের সম্বন্ধ এরূপ যে, তাহা বিশেষ বিশেষ রূপ-বিশিষ্ট বোধ হয়। পেচকের চক্ষে পেচকী যেমন সুন্দরী, নরের কাছে নারীও তদ্রূপ সুন্দরী। অতএব রূপ কেবল দৃষ্টির বিশেষ প্রকার সম্বন্ধনিবন্ধন সঞ্জাত হয়; সুতরাং জীবের মানসদৃষ্টি এবং স্থূলদৃষ্টিবশতঃ জগতের সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ। মায়ার অর্থই রূপ-পরিণাম। এ জগৎ তবে ব্রহ্মের সৃষ্ট রূপ নহে, তাহা জীবের কল্পিতরূপ। এই কল্পনাই মায়া ও মিথ্যাদৃষ্টি। এই মায়া কেবল ব্যবহারিক জ্ঞানে বাস্তবিক, নহিলে ইহা পরমার্থ জ্ঞানে অতি তুচ্ছ এবং যুক্তিতে অনির্ব্বচনীয়। যথা:—

"যেমন প্রাকৃত জীব যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হয়; ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বপ্ন সমুদয়কে সত্য বলিয়াই জ্ঞান করে, ব্রহ্মাত্ম-বোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লৌকিক ব্যবহার সকলকে তদ্রূপ জানিবে।"

বেদান্ত-দর্শন, ২।১।১৪।

বাস্তবিক, লোক সকল নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখে, তখন সে কখন সেই স্বপ্নকে মিথ্যা জ্ঞান করে না; নিদ্রাভঙ্গ হইলে তবে সেই স্বপ্নের অলীকত্ব প্রতিপাদিত হয়। সেইরূপ মায়ার অলীকত্ব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় আধ্যাত্মবিজ্ঞান, আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের যোগ প্রকরণ দ্বারা যে সম্যক্ দর্শন জন্মে, সেই দৃষ্টি প্রভাবে মায়ার অলীকত্ব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয়। নহিলে তাহাকে কামনাসম্ভূত সূক্ষ্ম শরীর লইয়া বহু জন্ম-জন্মান্তর এই ঘোর দুঃখময় সংসারে যাতায়াত করিতে হয়, কিছুতেই আত্মা মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। ইহাকেই কামনা-জাত পাপপুণ্য কর্ম্মের বন্ধকত্ব বলে।

মায়া কিরূপে অতিক্রম করিতে পারা যায়? জীবের কামনা-সম্ভূত সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ সাধন করাই মায়া কাটাইবার প্রধান উপায়। কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সে শরীরের ক্ষয় নাই। কর্ম্মফলে অভিলাষী না হইয়া তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলেই কামনা পরিত্যক্ত হয়। শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্মফলাভিলাষ পরিত্যক্ত হয়। প্রবৃত্তিকে এইরূপে নিবৃত্তি-পথে আনিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা করিতে পারিলে, তবে কামনার লয় সাধন করা যায়, তবে কামনাময় শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই কামনাময় শরীরের লয়-সাধন করিয়াও যদি অহঙ্কার (আমিত্ব জ্ঞান) কিয়ৎ পরিমাণেও থাকে, তাহাও ঈশ্বরার্পিত চিত্তে সংহার করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।
দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭।১৩ ১৪।

"এই যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব, এই ত্রিবিধ ভাবে সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং আমি যে ত্রিবিধ ভাবে অপৃষ্ট এবং ইহাদের নিয়ন্তা হেতু নির্ব্বিকার, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না, আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দুস্তরা। কিন্তু যাহারা একান্ত ভক্তি দ্বারা আমারই শরণা-পন্ন হয়, তাহারাই আমার এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারে।"

এইরূপে মায়া অতিক্রান্ত হইলে অহংকার তিরোহিত হইয়া ঈশ্বরের স্বারূপ্য লাভ হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ লব্ধ হইলে, তৎ উপাধি স্বরূপ কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র থাকে। এই সাত্ত্বিক দেহের লয় সাধনার্থ নিস্ত্রৈগুণ্যের সাধনা চাই। নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত হইলেই বিদেহ হইয়া মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্মপদ লাভ করেন। জীব বাসনা-কামনার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগতভেদসম্পন্ন; সুতরাং সাধনার হাপরে গলাইয়া ঐ বাসনা-কামনার খাদ দূরীভূত করিতে পারিলে জীব, ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিতে পারেন।

প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মায়ার সমষ্টিই মহামায়া বা সগুণ ব্রহ্ম। যিনি ভেদাভেদে নিত্য

ব্রহ্মের সহিত বর্ত্তমান আছেন। এই মহামায়াকে আরাধনা করিলে তাঁহার কৃপায় জীব দুস্তরা মায়া অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন; সুতরাং মহামায়ার আরাধনা অবৈজ্ঞানিক নহে। আর্য্য-জাতির প্রবল জ্ঞানোন্নতির সময়ে তাঁহারা মহামায়ার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জ্ঞান ও ভক্তির সরল মার্গে গমন করিয়া সেই মহাশক্তির দর্শন পাইয়াছিলেন। তৎকালে মহামায়া আর্য্যদিগকে ভগবতীরূপে দর্শন দান করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতবাদিগণ এই মহাশক্তিকে জ্ঞানযোগে বিলোড়ন করিয়া উপরিভাগে এক অপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় চিন্ময় পদার্থকে সাক্ষীরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তন্নিম্নে তাঁহারই আশ্রয়ে কর্ত্তৃরূপে এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শক্তির কেন্দ্রীভূত পদার্থকে রক্ষা করিয়া বিশ্বলীলার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন: সুতরাং হিন্দুর আরাধ্য মহাশক্তি এতদুভয়ের বিশাল সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইতেছেন। জড়-অজড়, চর-অচর সমস্তই ইঁহার অনন্ত সত্তার অন্তর্গত হইতেছে। অতএব ইনিই নির্গুণ সময়ে তুরীয়া, সগুণ অবস্থায় সত্ত্ব-রজস্তমোময়ী। এই দেবীই ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিনিশ্চিত হইয়াছেন। যথাঃ—

যদন্তঃ স্থানি ভূতানি যত সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তৎ পরং তত্ত্বং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

ঋগ্বেদ।

স্থূল, সূক্ষ্ম এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ যাঁহাতে সূক্ষ্মরূপে বিলীন থাকে, আবার যাহার ইচ্ছানুসারে সচরাচর জগৎ হইয়া প্রকাশমান হয়, সেই স্বয়ং ভগবতীই পরমতত্ত্ব।

যা যজ্ঞৈরখিলৈরীশা যোগেনচ সমীড্যতে।
যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

যজুর্ব্বেদ।

নিখিলযজ্ঞ ও যোগ দ্বারা যিনি স্তুয়মান হন এবং যাহা হইতে আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছি, সেই স্বয়ং ভগবতীই পরমতত্ত্ব।

যদেবং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যা বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী॥

সামবেদ।

যাঁহার দ্বারা এই বিশ্বসংসার ভ্রমবিলসিত হইতেছে, যিনি যোগিগণের চিন্তনীয়, যাঁহার তেজপ্রভাবেই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, সেই জগন্ময়ী দুর্গাই পরমতত্ত্ব।

যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিণো জনাঃ।
তমোহং পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতী মুনেঃ॥

অথর্ব্ববেদ।

যাঁহার অনুগ্রহাশ্রিত লোকেরাই ভক্তি দ্বারা যাঁহাকে বিশ্বেশ্বরী স্বরূপে দেখিতে পান, সেই ভগবতী দুর্গাই পরম ব্রহ্মতত্ত্ব।

ভগবান্ বেদব্যাসের প্রতি সামাদি বেদচতুষ্টয়ের উক্তি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহামায়া ভগবতীদেবীই পরমতত্ত্ব পরব্রহ্ম। তাই হিন্দুগণ সচ্চিদাময়ী শ্রীশ্রীচণ্ডিকাকে পরম ব্রহ্মরূপিনী জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন। সত্যযুগে সুরথ, ত্রেতায় রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র এই মহাশক্তির পূজা করিয়াছিলেন। এই মহাশক্তি ভগবতী দেবীর আরাধনায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়। যথা:—

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধন কারণম্।
তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মহাদেব বলিতেছেন,—"হে দেবি! তোমার আরাধনার কারণ বলিতেছি; লোকে-তোমার সাধনায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে।" তিনি একদা এই দেবী সম্বন্ধে তাঁহারই নিকট বলিয়াছিলেন,—"হে দুর্গে! তুমিই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি,—তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী। মহত্তত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে, আবার এই নিখিল জগৎ তোমার অধীনতায় আবদ্ধ। তুমিই সমুদয় বিদ্যার আদিভূত এবং সমস্তের জন্মভূমি; তুমি সমুদয় জগৎকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। তুমিই স্থূল, তুমিই সূক্ষ্ম, তুমিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপিনী;—তুমি নিরাকারা হইয়া সাকারা, তোমার প্রকৃত তত্ত্ব কেহই অবগত-নহে। তুমি সর্ব্বস্বরূপিনী এবং সকলের প্রধানা জননী; তুমি তুষ্ট হইলে সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকে। তুমি সৃষ্টির আদিতে তমো রূপে অদৃশ্যভাবে বিরাজিতা ছিলে,—তুমিই পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার বাসনা,—তোমা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্তত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভূত পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ তোমারই সৃষ্ট। সর্ব্বকারণের কারণ পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি সমুদয় জগৎকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন,—তিনি সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, তিনি চিন্ময় এবং সর্ব্ব বস্তুতে নির্লিপ্ত। তিনি কিছুই করেন না,—তিনি সত্য ও জ্ঞান-স্বরূপ,—আদ্যন্তবর্জ্জিত এবং বাক্যমনের অগোচর। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী, তুমি সেই ব্রহ্মের ইচ্ছা মাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাক।" *

এক্ষণে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে সুরথ উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া দেবীতত্ত্ব ও তাঁহার আরাধনার কারণ আলোচনা করা যাউক।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসম্ভূত সুরথ নামাব্যক্তি অবনীমণ্ডলের রাজা হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কোলাবিধ্বংসী ভূপতিগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। অতি প্রবল দণ্ডধারী রাজা হইয়াও দৈববশে সুরথ পরাস্ত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট অমাত্যগণও শত্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়া রাজধানীর কোষাগার ও সৈন্যসামন্তাদি অপহরণ করিল। অনন্তর রাজা সুরথ অপহৃতাধিপত্য হইয়া মৃগয়াব্যপদেশে একটী অশ্বারোহণ করতঃ অতি দুর্গম বনে গমন করিলেন। কিন্তু হায়! বনে গিয়াও তিনি মন বাঁধিতে পারিলেন না। স্বজন-বান্ধব কেহই তাঁহার অনুগমন করিল না। যাহারা তাঁহার বিপদে অন্যকে ভজনা করিল, যাহারা একটী মুখের কথায়ও সান্ত্বনা করিতে বিমুখ হইল, যাহারা তাঁহাকে উৎসবান্তের বাসিফুলের ন্যায় দূরে ফেলিতে কষ্ট বোধ করিল না, তাহাদের মায়ায়,—তাহাদের বিরহে তিনি ব্যথিত, জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। একদা একটী বৈশ্য-জাতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন.—মহাশয়! আপনি কে,

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ৪র্থ উল্লাস দেখ।

কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, আপনাকে শোকাকুল ও দুশ্চিন্তাপরায়ণ দেখিতেছি কেন?

সেই বৈশ্য, ভূপতির প্রণয়ভাষিত এই প্রকার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিনয়াবত হইয়া কহিলেন,—"আমি সমাধি নামক বৈশ্য, ধনসম্পন্নবংশে আমার জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু অসাধুবৃত্ত পুত্রকলত্রগণ ধনলোভে লুব্ধ হইয়া আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে। পুত্রভার্য্যাগণ আমার ধন গ্রহণ করিলে, আমি কলত্র ও পুত্রবিহীন এবং হিতকারী বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ধনার্থ দুঃখিত হইয়া বনোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছি। আমি এখন এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া পুত্রকলত্র ও বন্ধুগণের কুশলাকুশল বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতেছি না। আমার পুত্রাদি এখন কুশলে কি অকুশলে কালাতিপাত করিতেছে, তাহারা কি সদ্বৃত্তিসম্পন্ন কিম্বা অসদ্বৃত্তিপরায়ণ হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না।"

রাজা বলিলেন:—

"যৈর্নিরস্তো ভবাল্লুব্ধৈঃ পুত্র দারাদিভির্দ্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্॥"

অর্থাৎ—আপনি ধনলুব্ধ যে পুত্র ভার্য্যাদি দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আপনার মন স্নেহপ্রবণ হইতেছে কেন? বৈশ্য উত্তর করিলেন;—

"এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্ গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ॥
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈ নিরাকৃতঃ।
পতি স্বজন হার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ॥
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃত মে নিঃশ্বাসো দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্ব প্রীতিষু নিষ্ঠুরম্॥"

অর্থাৎ আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা অতীব সত্য; কিন্তু আমি কি করিব, আমার চিত্ত কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতেছে না। যাহারা ধনলুব্ধ হইয়া পিতৃভক্তি এবং পতিপ্রেম পরিত্যাগকরতঃ আমাকে নিরাকৃত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমার অন্তঃকরণ প্রেমপ্রবণ হইতেছে। হে মহামতে রাজন! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমিও বুঝিতেছি, তথাপি কেন যে সেই গুণরহিত বন্ধুবর্গের প্রতি আমার চিত্ত প্রেমাসক্ত হইতেছে, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাদের নিমিত্ত নিঃশ্বাস নির্গত হইতেছে এবং দুর্ম্মনস্কতা বিরাজ করিতেছে, সেই প্রীতিরহিত বন্ধুগণের প্রতি আমার চিত্ত কিছুতেই মমতাবিহীন হইতেছে না; অতএব আমি কি করিব?

তখন সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ সুরথ ও সমাধি বৈশ্য উভয়ে মিলিত হইয়া জ্ঞানগরিষ্ঠ মেধস মুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই যথানিয়মে মুনির পাদবন্দনাদি করিয়া উপবেশনান্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! মূর্খলোকে যে প্রকার বিষয়াসক্তি দ্বারা পরিমুগ্ধ হয়, আমি জ্ঞানবান্ হইয়াও সেই প্রকার রাজ্যে এবং নিখিল স্বাম্যমাত্যাদি রাজ্যাঙ্গ বিষয়ে মমতাকৃষ্ট হইতেছি, ইহার কারণ কি? আবার দেখুন আমার ন্যায় এই বৈশ্য, পুত্র কর্ত্তৃক নিরাকৃত, স্ত্রী এবং ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং স্বজন কর্ত্তৃক সংত্যক্ত হইয়াও তাহাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রেমবান্ হইতেছে।

এই প্রকারে আমি ও এই বৈশ্য বিষয়ের দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াও মমত্ব দ্বারা আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখভাগী হইতেছি। যাহারা আমাদিগকে পায়ের কণ্টকের ন্যায় দূর করিয়া দিয়াছে,—যাহারা আমাদের শত্রুর বশানুগা হইয়া আমাদের প্রতি নিতান্ত বাম হইয়াছে ও নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, আমরা জ্ঞানহীন নহি—জ্ঞান আছে, সকলই বুঝিতে পারিতেছি,—তথাপি কেন এ মরম ক্রন্দন?—এ আকুল যাতনা? হে মহাভাগ! যাহারা বিবেক-বিরহিত, তাহাদিগেরই মুগ্ধতা সম্ভবে, আমরা জ্ঞানী হইয়াও কি হেতু মুগ্ধ হইতেছি, আপনি ইহার কারণ বলুন॥

মহামুনি মেধস বলিলেন,—"হে মহারাজ! এ সংসারে সমস্ত বিষয়ই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে এবং প্রাণিমাত্রেরই বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, তাই বলিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানী বলা যায় না। দেখ, সকল প্রাণীই বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু যাহা দিবাপ্রকাশমান বস্তু, সেই আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সংসারাসক্ত প্রাণী চিরকালই অন্ধ থাকে, তাহারা কদাপি সেই তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার আত্মরাজ্যে বিচরণশীল মুনিগণ বাহ্য রাজ্যে অন্ধ। অর্থাৎ বহির্ভাব কিছুই তাঁহাদের অনুভূত হয় না। আর যাঁহারা আত্মরাজ্যে উপনীত হইয়া লব্ধজ্ঞান হইয়াছেন, তাঁহারা দিনরাত্রি অন্তর্ রাজ্য ও বহির্ রাজ্য এই উভয় তুল্যরূপে এক আত্মসত্তারই উপলব্ধি করেন, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বত্রই তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। তুমি বলিতেছ, তোমার জ্ঞান আছে, হায় রাজন্! উহা কি প্রকৃত জ্ঞান? উহা বিষয়গতজ্ঞান। ঐ জ্ঞানে কোন প্রকারেই বিবেকের উদয় হইতে পারে না। তোমরা আপনাকে যে ভাবে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেছ, সেইভাবে জ্ঞানী অর্থাৎ বিষয় রাজ্যের জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য-মাত্রই হইয়া থাকে, এ কথা সত্য, কেবল মনুষ্য কেন,—পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতিরাও বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে, সুতরাং তাহা-দিগকেও জ্ঞানী বলা যায়। অর্থাৎ—আহার বিহারাদি বাহ্য বিষয়ে মনুষ্য আর পশুপক্ষ্যাদি সকলেই এক প্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট। তথাপি ঐ দেখ, জ্ঞানসত্ত্বেও পক্ষিগণ নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ আদর সহকারে তণ্ডুলাদির কণা সমস্ত শাবকগণের চঞ্চুতে নিক্ষেপ করিতেছে। হে মনুজব্যাঘ্র সুরথ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, মনুষ্যগণ চরমকালে প্রত্যুপকারলুব্ধ হইয়া পুত্রাদির প্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়া লালনপালন করিয়া থাকে। কিন্তু পশুপক্ষী প্রভৃতির সন্তান প্রতি বৎসরেই জন্মিয়া থাকে—প্রত্যেকবারেই তাহারা জনক জননীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কে কোথায় চলিয়া যায়,—পশু-পক্ষিগণ নিত্য তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই—কোন লাভের প্রত্যাশা নাই,—তথাপি কেন এ ত্যাগ স্বীকার? কেন এই আত্মদান জান না কি?

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপিচেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥

সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেঁতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

ঋষি বলিলেন,—তুমি মনে করিতে পার যে, পুত্রদারাদি দ্বারা প্রকৃত সুখ সম্পাদিত হয় না, তবে কেন মনুষ্যগণ অনর্থহেতু মোহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিপাতিত হয়। বাস্তবিক-পক্ষে কেহই স্বাধীনভাবে আত্ম-অহিত কামনা করে না, কিন্তু যিনি জগতের স্থিতি সম্পাদন করিতেছেন, সেই মহামায়ার প্রভাবেই প্রাণি-গণ মমতা-আবর্ত্ত পরিপূরিত মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়, সর্ব্বদা আত্মহিতানুসন্ধায়ী মানবকেও যে মহামায়া এতাদৃশী দুর্গতি প্রদান করেন, তাঁহাতে তুমি বিস্মিত হইও না। কারণ, অন্যের কথা তোমাকে আর কি বলিব, যিনি জগৎপতি হরি, তিনিও এই মহামায়ার দ্বারা বশীকৃত রহিয়াছেন। ইনি সর্ব্বেন্দ্রিয় শক্তির নিয়ন্ত্রী, ইহার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য। ইনি জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্ব্বক সম্মুগ্ধ করিয়া থাকেন, ইহার দ্বারাই চরাচর সমস্ত জগৎ প্রসূত হয়, ইনি প্রসন্না হইলেই লোকের মুক্তিদাত্রী হয়েন। এই মহামায়া যেমন সংসারগর্ত্তে নিপাতকর্ত্রী, তেমন ইনিই আবার তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপা, ইহার শক্তি দ্বারাই মানব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে; সুতরাং ইনি মুক্তির হেতু, নিত্যবস্তু। ইহার দ্বারা সংসার-বন্ধন হইয়া থাকে, ইনি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বরী।

মহামুনি মেধসের কথা শুনিয়া অশ্রুপরি-প্লাবিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ভগবান্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥
যৎ স্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥"

ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিয়া কীর্ত্তিত করিলেন, তিনি কে? তিনি কেমন করিয়া উৎপন্না হইলেন, তাঁহার কার্য্যই বা কি? হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! তিনি কিদৃক্ স্বভাব-বিশিষ্টা অর্থাৎ নিত্যা বা অনিত্যা; তাঁহার স্বরূপ কি? এই সমস্তই আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তখন ভক্তি-কারুণ্য কণ্ঠে মেধস বলিলেন,—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥"

অর্থাৎ—তিনি নিত্যা, জগন্মূর্ত্তি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার স্বরূপ, তিনি রূপ, তিনি রস, তিনি গন্ধ, তিনি স্পর্শ, তিনি শব্দ,—তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বিভাবিনী, তাঁহার দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও আমাদের ন্যায় তাঁহার উৎপত্ত্যাদি কিছুই নাই, তথাপি লোকে তাঁহার এক-প্রকার উৎপত্ত্যাদি কীর্ত্তন করে, তাহা তুমি আমার নিকট বহুপ্রকারে শ্রবণ কর।

মহামুনি মেধস রাজা সুরথের নিকট শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীর দেবীমূর্ত্ত্যাদির উৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে বলিলেন,—

"তৈয়ত মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥
ব্যাপ্তস্তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া
সৈবকালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতনাং সৈবকালে সনাতনী॥
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথা লক্ষ্মীর্ব্বিনাশায়োপজায়তে॥"

এই দেবীর দ্বারাই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ হইতেছে, ইনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন,

ইহার কাছে প্রার্থনা করিলে ইনি তুষ্টা হইয়া জ্ঞান ও সম্পৎ প্রদান করেন। হে মনুজেশ্বর! এই মহাকালী কর্ত্তৃক অনন্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আছে; ইনি মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাদিগকেও আত্মসাৎ করেন এবং খণ্ড প্রলয়েও ইনি সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। সৃষ্টি সময়ে সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করেন, আবার স্থিতিকালে প্রাণিদিগকে পালন করেন, কিন্তু ইহার কখনই উৎপত্তি হয় না। ইনি নিত্য। লোকের অভ্যুদয় সময়ে ইনি বৃদ্ধিপ্রদা লক্ষ্মী; আবার অভাবের সময়ে অলক্ষ্মীরূপে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে ভূপতে! এই আমি চণ্ডীমাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহাকে আরাধনা করিলে বিত্তপুত্রাদি দান ও ধর্ম্মে শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। এই মহামায়া প্রসন্না হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে। সেই দেবী এই প্রকার প্রভাবসম্পন্না, তাঁহার দ্বারাই এই সমস্ত বিধৃত রহিয়াছে।

"তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে॥
তামুপৈহি মহারাজ, শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥"

ঋষি বলিলেন,—এই দেবী তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অন্যান্য সমস্ত বিবেকিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। হে মহারাজ! তোমরা এই দেবীকে আশ্রয় রূপে গ্রহণ কর, কারণ ইহাকে আরাধনা করিতে পারিলেই ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।"

অনন্তর রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য উভয়ে মহামুনি মেধার পরামর্শে শরতের শুভ অবসরে শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ভোগলুব্ধ রাজা সকাম আরাধনা করিয়া হৃত রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সমাধি বৈশ্যের সংসারে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাই নিষ্কাম আরাধনায় তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দেবীর কৃপায় তিনি ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিয়াছিলেন।

এই সুরথ উপাখ্যানে মহামায়া ও তাঁহার আরাধনার কারণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একমাত্র মহামায়ার আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্না করিতে পারিলে যে, মুক্তির হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা বোধহয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ভারতের সুবর্ণযুগে ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ দেবীমাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই প্রতি বৎসর শরতের শুভ্র সৌন্দর্য্যে মহামায়া শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা, সাধক হৃদয়ের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের বাহ্যবিকাশ মাত্র। নহিলে পূজা অন্তরেই হয়। সকলে মিলিয়া একত্র আমোদ ও পূজা করিব বলিয়াই প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বাহিরে ঢাক ঢোল বাজাইয়া দেওয়া হয়। চণ্ডীতত্ত্ব এবং শারদীয়োৎসবের ইহাই প্রকৃত রহস্য।

অতএব শ্রীশ্রীচণ্ডীর আরাধনা, সেই সগুণ ব্রহ্ম মহামায়ার সাধনা। তাঁহার সাধনা করিয়া মানুষ প্রকৃতির যে সুখ-লালসা, তাহাই উপভোগ করে, এবং মোহাবর্ত্ত বিনষ্ট করে। প্রকৃতির রস উপভোগ করিয়া মায়ার বাঁধন—আকর্ষণের আকুলতা বিনষ্ট করিয়া, মহাশক্তির সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। সেই পরব্রহ্ম-

রূপিনী সচ্চিদানন্দময়ী দেবীকে ব্রহ্মবাদী মনীষিগণ সগুণ ও নির্গুণভেদে দুই প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহার মধ্যে সংসারাসক্ত সকাম সাধকগণ তাঁহার সগুণ ভাব, আর বাসনাপরিবর্জ্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নির্ম্মলচেতা ব্যক্তিগণ নির্গুণভাব সমাশ্রয় পূর্ব্বক আরাধনা করিয়া থাকেন। এই দেবী সর্ব্বস্বরূপিনী এবং সমস্ত জগৎও ইহার স্বরূপ, অতএব আমি সর্ব্বরূপা এই পরমেশ্বরী দেবীকে নমস্কার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরী॥

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

—:0:—

মায়ের প্রতি।

(১)

মাগো!

এত দিন কোথা ছিলি ভুলিয়ে সন্তানে,
পলকের তরে কি গো পড়ে নাই মনে?
কর্ম্মের আবর্ত্তে পড়ে কত না ভুগেছি,
কত না যাতনা মাগো পরাণে সয়েছি।

(২)

মায়া মোহে মজে গিয়ে ভুলেছিনু তোরে,
একবার তোর পানে চাহি নাই ফিরে,
অঙ্গুলি সঙ্কেতে মাগো কত না ডেকেছ,
বিপথে যাইতে মাগো মানা ত করেছ,

(৩)

না শুনে তোমার মানা যেমন গিয়েছি,
তার ফল প্রতি পদে অশেষ পেয়েছি,
মায়ার শৃঙ্খল পড়ে কত না কেঁদেছি,
মা, মা, বলে তোরে মাগো কত না ডেকেছি,

(৪)

কাটিয়াছে মোহ ঘোর এ শুভ প্রভাতে,
আর না ভুলিব আমি মায়ার মায়াতে,
মানসী মূরতি তোর স্থাপি হৃদাগারে,
পূজিব চরণ তোর মানসোপচারে।

(৫)

মাগো!

হ্লাদিনী, সম্বিৎ শক্তি তুই যে সন্ধিনী,
পরাৎপরা তুই মাগো ব্রহ্মসনাতনী,
স্থান দিও রাঙ্গা পদে ফেলিও না ঠেলে,
আমি যে তোমার মাগো আচলের ছেলে

দীন—উমেশচন্দ্র।

—:0:—

হয় না।

চক্ষু বুজে হাত গুটিয়ে
বসলে হয় না ধ্যান,
মস্ত দু'খান পুঁথি পড়লে
হয় না তাতে জ্ঞান।

যুক্তিশূন্য তর্ক করলে
হয় না অনুবাজীৎসা।
বিশ্বাসহন্তা, গুপ্তহত্যা
নয় কো প্রতিবিধিৎসা।

(শুধু) তুলসীমালা তিলক ফোঁটা
নয় কো ভক্তের চিহ্ন।
(যদি) নাহি করে স্বার্থত্যাগ
মায়া-বন্ধন ছিন্ন।
হয় না ভকতি দিবারাতি
শুধু মুখে বলে হরি।
হয় না মুক্তি, দিব্যগতি
দিলে ধুলায় গড়াগড়ি।
(শুধু) গঙ্গাস্নানে, তীর্থবাসে
হয় না ভক্তির বৃদ্ধি।
দৃঢ় বিশ্বাস, সংযম ছাড়া
হয় না সাধনা সিদ্ধি।

দীন—দেবেন্দ্রনাথ।

——:0:——

দেবকৃপা।

(পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।)

বস্তুতঃ আমরা এমন অন্ধ, এমন বধির যে, আমাদের কল্যাণের জন্য ভগবানের মঙ্গল হস্ত নিয়তই প্রসারিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইতেছি না। বিবেক-বাঁশরী মোহন তানে ডাকিতেছে, শুনিতে পাইতেছি না; কেবল মরীচিকায় জলভ্রান্ত মৃগের ন্যায় বিষয়-কাননে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

রাত্র তখন সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু হতাশপ্রাণে বিষাদিত অবস্থায় বসিয়াছেন, গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়াছে। এমন সময় একটী বালক "বাবু! দুধ চাই," "বাবু! দুধ-চাই" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, যে গাড়ীতে কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু ছিলেন, সেই গাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু দুগ্ধহস্তে বালককে সম্মুখে দাঁড়ান দেখিয়াই লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক নীচে নামিয়া আসিলেন, বালকের হস্ত হইতে দুগ্ধের ভাড় (পাত্র) লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুগ্ধের মূল্য কত চাও,? কি পরিমাণ দুগ্ধ আছে?" বালক বলিল, "ভাড়ে আড়াই সের দুগ্ধ আছে, নয় আনা দাম চাই।" কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু আচ্ছা যা চাও, তাই দিব বলিয়া গাড়ীর উপরে উঠিলেন। দুগ্ধ পাইয়া কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন, বালককে দুগ্ধের মূল্য ও ভার দিতে হইবে এ কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে দুগ্ধের মূল্যের কথা মনে হইলে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন, দেখিলেন বালক সেখানে নাই। ইত্যবসরে বালক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও বালককে না দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; এদিকে গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়াছে দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট গমনপূর্ব্বক আদ্যন্ত সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন। এবং বলিলেন, দুগ্ধের ভার ও মূল্য আপনার নিকট রাখিয়া যাই, যদি কল্যও ঐ বালক দুগ্ধ বিক্রী করিতে ষ্টেশনে

আসে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক দুগ্ধের মূল্য ও ভাড়টী তাহাকে দিবেন। ষ্টেশনমাষ্টর কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আপনি কি বলেন? আমি বহুদিন যাবৎ এখানে কাজ করিতেছি, কখনও ত এ ষ্টেশনে দুগ্ধ বিক্রী করিতে দেখি নাই; বিশেষতঃ রাত্রিকাল! গাড়ী ছাড়িয়া যায় দেখিয়া কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু দ্রুতপদে গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, দুগ্ধ গরম ও মিষ্টিমিশ্রিত। দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু পূর্ব্বাপেক্ষা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন-বাবুর স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। এতক্ষণে তাহার মলিন মুখে হাসি দেখা দিয়াছে

কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু যেমন একদিকে মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন পাইয়া পুলকিত ও আনন্দিত হইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ে চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। মনে প্রশ্ন উঠিল, দুগ্ধ কে দিল? আমার বিপদ দেখিয়া কি ছদ্মবেশে কোন্ দেবতা আসিয়া দুগ্ধ দিয়া চলিয়া গেলেন? একদিন বৃন্দাবনের বনে বনে যে রাখাল-বালক দুগ্ধ দিয়া অন্ধ বিল্বমঙ্গলের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আজও কি সেই রাখাল-বালক মৃতপ্রায় শিশুর জীবনরক্ষা করিয়া লুকাইলেন? হায় আমি এমন দয়ার-সাগর ভগবানকে এতদিন বিশ্বাস করি নাই? আমার ন্যায় মূঢ় কে? আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে ধিক্, অমার পুরুষকারে ধিক্। পুরুষকারের গৌরব বৃথা, মিথ্যা অহংত্ব প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সামান্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে অপারগ হইয়া আমাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হইল, দুগ্ধাভাবে অনশনক্লিষ্ট মৃতকল্প শিশুর জীবনরক্ষায় অক্ষম হইলাম, এই ত আমার শক্তি, এই ত আমার বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার, এই ত আমার পুরুষকারের গৌরব। আজ বুঝিলাম, আমার বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতা নাই,—আজ বুঝিলাম তাঁর শক্তি না পাইলে একটী তৃণও আমরা স্থানা-ন্তরিত করিতে পারি না। আমার সাধ্য নাই যে, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি। তাঁর ইচ্ছা না হইলে বৃক্ষের পত্র-টীও নড়ে না, চক্ষের পলকটী পড়ে না; জীব ভগবানের ক্রীড়া পুত্তলী, তিনি যেমনি চালান, তেমনি চলে, যেমনি নাচান, তেমনি নাচে। তিনি সুস্বাদু আহার দ্বারা পোষণ করি-তেও পারেন, আবার অনশনে মারিলেও মারিতে পারেন। জীবের তাহাতে স্বাতন্ত্র্য তা নাই: কিন্তু তিনি এমন নিষ্ঠুর নন যে, জীবকে অনশনে মারিবেন। জীবের প্রতি তাঁহার অপার করুণা। অপার দয়া,। ভগবানের অযা-চিত দয়ার ও মহিমার কথা স্মরণ করিলে পাষা-ণও যে দ্রব হয়! হায়! হায়! আমি এমন করুণাময়, এমন প্রেমময় ভগবানকে অগ্রাহ্য করিয়াছি! আমার মত মূর্খ, আত্মা-ভিমানী কে আছে? নিশ্চয় ভগবান আমার অভিমান ও অহং চূর্ণকরিয়া অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত এ খেলা খেলিয়াছেন। ধন্য ভগ-বানের খেলা! ধন্য তাঁর মহিমা! ধন্য তাঁর জীবের প্রতি অসীম স্নেহ! অবোধ মানব আমি, অভিমানে অন্ধ, তাঁর এ খেলার রহস্য কি বুঝিব?

কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু বালকের ন্যায় রোদন

করিতে লাগিলেন, দরদর ধারায় নয়নাশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত হইয়া যাইতে লাগিল। যতই তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ের ময়লা নয়ন-বারিতে ধৌত হইয়া যাইতে লাগিল। অমনি ভগবত্তত্ত্ব ও তাঁহার রহস্য হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে লাগিল; তাঁহার যুগযুগান্তরের অন্ধকার হৃদয় ক্ষণকালের মধ্যে শ্রীভগবানের কৃপা-কণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত আবেগ বর্দ্ধিত হওয়ায় গাড়ীর মধ্যে লুটাইতে লাগিলেন। তৎকালে কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর অবস্থা দর্শন করিলে ভগবানের কৃপাকটাক্ষপাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা সুন্দররূপে অনুভূত হইয়া দর্শকের হৃদয়ও পবিত্র হইত। এই সামান্য কারণ হইতে কৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর মতি গতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তিনি পরম ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই সহবাসে কত জনের জীবন পূত ও ধন্য হইয়া গেল। ভগবান যে কিরূপে কৃপা করিয়া তাঁহার অমৃতময় প্রেম-রসের অধিকারী করিয়া থাকেন, তাহা মানব-বুদ্ধির গোচরীভূত নয়; মানব তাহা ধারণায় আনিতেও সক্ষম হয় না। এ জটিল রহস্যের মীমাংসা, কেবল যিনি খেলেন, তিনিই জানেন। কি জড় জগতে, কি অন্তর্জগতে নিবিষ্টমনে চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই জীবের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবানের মঙ্গল হস্ত প্রসারিত রহিয়াছে। জীবের নিমিত্ত তাঁহারই করুণামৃত শতমুখে প্রস্যন্দিত হইতেছে। জয় জগদীশ হরে! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

দীন—প্রিয়নাথ।

———:0:———

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(২৪)

[উত্তর পক্ষের কথা] এক্ষণে বিচার করিয়া সার ভাব গ্রহণকরতঃ আপত্তির বলাবল পরীক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভিন্ন বা ভেদ শব্দ অভাবজ্ঞাপক। সমান সমান স্থলে ভিন্ন ভেদ হয় না। ভিন্ন ভেদ—অসমান স্থলেই প্রকাশ পায়। দুইটী বস্তু অসমান হইলে, প্রথমটীর গুণ-ধর্ম্ম ও দ্বিতীয়টীর গুণ-ধর্ম্ম পরস্পর ঐক্য বা অভেদ হয় না; অর্থাৎ প্রথমটীতে যে যে গুণ-ধর্ম্ম থাকে,-দ্বিতীয়টী তত্তুল্য হয় না,—কিছু অভাব লক্ষিত হয়। এই যে অভাব, ইহা ভেদ-জ্ঞান দ্বারাই প্রকাশ পায়। মনে কর, "দুইটী টাকা," আকারে, ওজনে ও ফলে পরস্পর সমান, তুল্যমূল্য বস্তু। যখন তাহারা সমান থাকে, তখন কোন রূপ ভিন্ন ভেদ তাহাতে দেখা যায় না। কিন্তু, একটী টাকার ওজন যদ্যপি বার আনা হয়, তাহাহইলে টাকা দুইটী অসমান হইয়া পরস্পর ভিন্ন ভেদ হইবে। তখন ঐ ভিন্ন ভেদ-জ্ঞানই প্রকাশ করিবে যে,— একটী টাকায় চারি আনা অভাব (কম) আছে। এই যে অভাব, (ন্যূনতা) ইহা ভেদ-জ্ঞান দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ

টাকা দুইটী অসমান হইয়া পরস্পর অনৈক্য হওয়ায়, অর্থাৎ ভিন্ন ভেদ হওয়ায়, তাহাদের অভাব জানা যাইতেছে। তবেই দেখা গেল যে, ভেদজ্ঞান বা ভিন্নভেদ অভাবের প্রতিকারণ, বা ভেদ শব্দ অভাবজ্ঞাপক শব্দ।

অতএব, প্রথম উল্লাসের মর্ম্মানুসারে (গত বারে দেখান হইয়াছে) যদ্যপি স্বীকার করা যায় যে, ভূমা ও পূর্ণপরব্রহ্ম পরস্পর পৃথক বস্তু,—ইহাদের ভিন্ন ভেদ,—সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে,—(অর্থাৎ পূর্ব্ব পক্ষীয় যুক্তি বাস্তবিক সত্য ও অভ্রান্ত) তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহারা (ভূমা ও পূর্ণপরব্রহ্ম) পরস্পর অসমান বস্তু। অসমান স্থলে উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে বস্তুর গুণধর্ম্ম অনৈক্য হইবে;—অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্মে যে যে গুণধর্ম্ম আছে, ভূমায় তাহার অভাব লক্ষিত হইয়া ভিন্ন ভেদ হইবে। কিন্তু যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম,—তিনি পূর্ণ জ্ঞান-স্বরূপ; "পূর্ণ চৈতন্য বস্তু বিশেষ।" তাঁহার গুণও জ্ঞান, ধর্ম্মও জ্ঞান, আর অন্বয়ও পূর্ণজ্ঞান-স্বরূপ; "পূর্ণ চৈতন্য-বিশেষ"। ভূমায় যদ্যপি এবম্বিধ জ্ঞানের (চৈতন্যের) অভাব হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের অভাব ত উপলব্ধিতে আসে না? তবে কি প্রকারে ভূমা ও পূর্ণপরব্রহ্মের ভিন্ন-ভেদ সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ ভূমা একটী পৃথক বস্তু, আর পূর্ণ পরব্রহ্ম একটী পৃথক বস্তু বলা যাইবে। ভেদসিদ্ধ না হইলে,—অর্থাৎ দুই, দুই ভাব না দাঁড়াইলে, তোমাদের উল্লাসঘটিত আপত্তিই বা কি প্রকারে গ্রহণ করা হইবে? অতএব ভেদাভাবে ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম অভেদ 'এক' অভিন্ন বস্তু বিশেষ। উঁহাদের ভিন্ন ভেদ অপ্রসিদ্ধ; প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। সুতরাং, এমতেও আপত্তি নগণ্য হইয়া যায়, উল্লাস-প্রসঙ্গও উপসংহৃত হয়।

পূর্ব্বপক্ষ। যদি বলি, জ্ঞানের অভাব উপলব্ধির বিষয়ীভূত না হওয়ায়, ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের ভিন্ন ভেদ যেমন অপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ ইহারা যে এক,—এ বাক্যও প্রসিদ্ধ নহে। কারণ, দুই না থাকিলে—একের উপলব্ধিই হয় না,—বা তাহা প্রয়োজনেও আসে না। অতএব, ভেদাভাবে এক পক্ষে যেমন ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের ভিন্নভেদ সিদ্ধ নহে, বা তাহা প্রতিপাদ্য বিষয় নহে, সেইরূপ ভেদাভাবে অন্য পক্ষে, ইহারা যে সমান, একাকার বস্তু,—অর্থাৎ অভিন্ন বস্তু তাহার প্রমাণ না থাকায়, এ বাক্যও সিদ্ধ হইবার নহে। অভিপ্রায় এই যে, অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলো,—দুঃখ না থাকিলে যেমন সুখ,—পাপ না থাকিলে যেমন পুণ্য প্রমাণ করা যায় না, তদ্রূপ দুই না থাকিলে, "অর্থাৎ ভিন্ন ভেদ না থাকিলে," এক,—"অর্থাৎ অভেদ বা অভিন্ন ভাব," কখন সিদ্ধ হইবার নহে, বা তাহা প্রমাণ করাও যায় না।

"উত্তরপক্ষ"। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এরূপ আপত্তির ফল কি? যদ্যপি তোমার ইহাই অভিপ্রেত বিষয় হয় যে, একও প্রতিপাদ্য বিষয় নহে,—তাহাহইলেই বা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কৈ? অভিপ্রায় এই যে,—এক ও দুই না হয়, প্রতিপাদ্য বিষয় নাই হইল; কিন্তু জ্ঞানের অভাব উপলব্ধিতে না আসায়, বা তাহা অনুভব-যোগ্য না হওয়ায়,—ভেদাভাবে "ভূমা ও

পূর্ণ পরব্রহ্ম" বস্তু অভেদ, ইহা ত অবশ্য স্বীকার্য্য হইল। ইহা আর অস্বীকার করিতে পার না। কারণ, আপত্তি বা উল্লাসের মূল মন্ত্রই হইতেছে,—যাহা ভেদ-শূন্য,—তাহাই অভেদ; যাহাতে ভিন্ন ভেদ নাই,—তাহাই অভেদ ইত্যাদি। বর্ত্তমানে, জ্ঞানের অভাব উপলব্ধিগম্য না হওয়ায়, ভেদ নামক পদার্থই যখন সাব্যস্ত হইতেছে না,—অর্থাৎ ভেদ নামক বস্তু দাঁড়াইতেছে না, তখন ভেদের অভাবে যাহা থাকে, অবশ্যই তাহার নামের সংজ্ঞা অভেদ, অবিশেষ, অদ্বৈত, অসঙ্গ ইত্যাদি। এরূপ হইলে, ভেদাভাবে যে স্থানের নাম অভেদ হয়, সেই স্থানে আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, পুণ্য ও পাপ ইত্যাদি সমস্ত বস্তুই আপন আপন ভিন্ন ভেদ হারাইয়া একাকার ও অভিন্ন হইয়া যায়। তখন তথায়, উদাহরণ দিবার বস্তু "সেই অভিন্ন ভাব ব্যতীত" পৃথক আর অন্য কিছু থাকে না। অভিপ্রায় এই যে, সেখানে যদ্যপি ভেদ নামক কোন পদার্থই না থাকে, তাহাহইলে "অভিন্ন ভাব ভিন্ন" আর তথায় অন্য কি পদার্থ থাকিতে পারে? অতএব, ভূমাই বল, আর প্রকৃতিই বল; রাধাই বল, আর কৃষ্ণই বল;—অথবা মহাবিষ্ণুই বল, আর পূর্ণ পরব্রহ্মই বল; সেখানে (যে স্থান ভেদাভাবে অভেদ, সেই স্থানে), সমস্তই অভিন্ন, একাকার বস্তু বিশেষ। পরিদৃশ্যমান জগৎও যদ্যপি সেখানে যায়, তাহাহইলে তাহাও ভেদ নামক পদার্থ হারাইয়া ঐ অভিন্ন রূপের সহিত একাকারে 'এক' অভিন্ন রূপ ধারণ করে। এরূপ হইলে, ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের ভিন্ন ভেদ আর সাব্যস্ত হয় না। অপিচ, প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎকারণত্ব আর স্বীকার করিবার উপায় থাকে না। অধিকন্তু, আর এক কথা,—জীব যদ্যপি এইরূপ ভাব হৃদয়ে ধারণ করে, তাহা হইলে সনাতন "বেদ বা শ্রুতির" হিতসাধক মন্ত্র,—"সকল মত ও সকল শাস্ত্রের সহিত ঠিক এক-ঐক্য হইয়া,"—সর্ব্বত্রই সর্ব্ব হৃদয়ে শান্তি ও হিতৈষণার পূত মন্দির প্রতিষ্ঠিত করে। ইহা আর অস্বীকার করিতে পার না।

অতঃপর তোমার অভিপ্রেত বিষয়,—যথা একও প্রতিপাদ্য বিষয় নহে, আর দুইও প্রতিপাদ্য বিষয় নহে—কিরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়,—একবার দেখ। এক,—অর্থাৎ যাঁহার নামের সংজ্ঞা অদ্বৈত ঈশ্বর, (উপরে যাহা ভেদাভাবে অভেদ সাব্যস্ত হইয়াছে) যদ্যপি প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্তর্ভূত না হয়, তাহাহইলে তদ্বিষয়ক আলোচনা, বিচার দ্বারা তাহার অর্থ বোধ করা,—পরন্তু তদনুগত সাধন, ভজন, উপাসনাদি সমস্ত কর্ম্মই—"এক কথায় শ্রুতি বাক্য"—বৃথা ও অনর্থক হইয়া যায়। "দুই,"—অর্থাৎ যাঁহার নাম দ্বৈত ঈশ্বর (উপরে যাহা ভেদ পদার্থ দ্বারা দুই, দুই চলিতেছে) যদ্যপি ঐরূপ হয়,—অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্তর্ভূত না হয়, তাহা হইলে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ত কথাই নাই, অপিচ স্মৃতি, তন্ত্র, মন্ত্র, দর্শন, পুরাণাদি শাস্ত্র,—এক কথায় বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় কাণ্ডই, অনাবশ্যক ও অনর্থকবোধে পণ্ড হইয়া যায়। আর এই উভয় সমস্যার সমীকরণে দাঁড়ায় কি? অন্য কিছুই নহে; কেবল হিন্দু ধর্ম্মের

মূলোচ্ছেদ এবং "ঈশ্বরত্ব লোপ"। অন্য পক্ষে আবার দেখ, "এক" এবং "দুই" যদ্যপি অনর্থক হইয়া বৃথা হয়, তাহাহইলে ইহাও সত্য যে,—তদ্বিষয়ক আলোচনা অকারণবোধে আর মুখে আনিবার প্রয়োজন হয় না। "এক" ও "দুই" মুখে আনিবার প্রয়োজন না হইলে, অনেকের ত কথাই নাই; সুতরাং ঈশ্বরবিষয়ক পরস্পর বাক্যকথন প্রকারান্তরে একরূপ বন্ধ। এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এবম্ভূত উল্লাসের সারভাব একরূপ অর্থে ক্ষণভঙ্গবাদের সপক্ষ হইয়া বাক্যকথন বন্ধ করিয়া দেয়, অন্যরূপ অর্থে ঈশ্বরত্ব লোপ করিয়া বসে। ইহা তোমার অভিপ্রেত বিষয়ের পরিণাম বলিয়া,—অবশ্য তোমার অভিপ্রেত হইতে পারে; লোকায়তিকের অভিপ্রেত বিষয় হইতে পারে; কিন্তু, তাই বলিয়া হিন্দুর কস্মিন্‌কালেও তাহা হইতে পারে না; বাঞ্ছনীয়ও নহে।

উল্লাসোক্ত আর একটী আপত্তি,—"যথা বস্তু সমান বা একাকার থাকিলে, আর নুতন ভাবে তাহাকে সমান বা একাকার করিতে কেহই প্রয়াস পায় না"। এরূপ বাক্য,—যথা তথা প্রয়োগ করা যায় না। ইহার সারভাব, একরূপ অর্থে মূল আপত্তিরই তুল্য মূল্য;—অর্থাৎ ভেদ না থাকিলে অভেদ, অন্ধকার না থাকিলে আলো, দুঃখ না থাকিলে সুখ ইত্যাদির অনুরূপ। অন্যরূপ অর্থে,—হিন্দু ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ,— বা একটী প্রকারান্তর কৌশল-বিশেষ দ্বারা "ঈশ্বরত্ব লোপ"। অভিপ্রায় এই যে,—বস্তু সমান বা একাকার থাকিলে,—অর্থাৎ, ঈশ্বর নামক বস্তু ভেদশূন্য হইয়া অভেদ, বা দুয়ের অভাবে এক হইলে,—পুনর্ব্বার কেহই "এক" প্রমাণের চেষ্টা করিত না। অতএব, তিনি (ঈশ্বর) দুই। অর্থাৎ, এক প্রমাণের চেষ্টা করিলেই বা এক ভাবিলেই,—ঈশ্বর হইলেন "দুই;" আর দুই প্রমাণের চেষ্টা করিলেই, বা দুই ভাবিলেই,—ঈশ্বর হইলেন "এক"। ফলিতার্থ কি হইল? এক বলিলেই দুই, আর দুই বলিলেই এক; অভেদ বলিলেই ভেদ, আর ভেদ বলিলেই অভেদ; আলো বলিলেই অন্ধকার, আর অন্ধকার বলিলেইআলো ইত্যাকার। ইহাই হইল "বস্তু সমান বা একাকার থাকিলে ইত্যাদি বাক্যের" একরূপ অর্থ। আপত্তির মূল ভিত্তিই হইতেছে এইরূপ;—সুতরাং ইহাও আপত্তিরই তুল্যমূল্য. অন্যরূপ অর্থটীর একটু বিশেষত্ব আছে, যথা:—

এক বলিলেই দুই,—আর দুই বলিলেই যখন এক আসিতেছে; আলো বলিলেই অন্ধকার,—আর অন্ধকার বলিলেই যখন আলো নামক একটী পদার্থ দেখা দিতেছে; তখন "নাই" বলিলেই "আছে," আর "আছে" বলিলেই "নাই" নামক কোন কিছু অবশ্যই দেখা দিবে; ইহা আর অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ শূন্য বলিলেই এক, আর এক বলিলেই শূন্য; "সু" বলিলেই "কু" আর "কু" বলিলেও "সু" নামক বস্তু অবশ্যই উপস্থিত হইবে, ইহাও আর বাদ দিতে পার না। ইত্যাকার তত্ত্বের ফলে দাঁড়াইল কি? যাহারা নাই, নাই করিয়া ঈশ্বর নামক বস্তু উড়াইয়া দেয়, তাহাদের পক্ষেও ঐ "নাই" সাধন দ্বারা "আছে" হইয়া যায়। আর যাহারা ঈশ্বর নিশ্চয়ই আছেন বলিয়া তৎ সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হয়,—পরন্ত, যে

সকল মহাপুরুষ গিরি, কন্দরাদি নিভৃত নিবাসে ভগবানের উপর মন প্রাণ সমর্পণ করতঃ,—তদনুগত সাধন ভজনে সিদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞানের দীপ্ত-জ্যোতি দ্বারা জীবনের সহজাত অন্ধকার দূর করেন,—তাঁহাদের পক্ষেও ঐ সকল "আছে" সাধন দ্বারা "ঈশ্বর নাই'' হইয়া যায়। আবার, যদি বলা যায় যে,— আছের ভিতরেই নাই, আর নাই এর ভিতরেই আছে,—অর্থাৎ উভয়ে অখণ্ডাকার বস্তু—; "যেমন বীজের ভিতর বৃক্ষ, আর বৃক্ষের ভিতর বীজ,"—তাহা হইলে অগ্রে "আছের" উৎপত্তি, কি অগ্রে "নাই এর" উৎপত্তি? অর্থাৎ কোনটী অগ্রে, আর কোনটী পরে নির্ণয়োপলক্ষে উৎপত্তি বিষয়ে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়—অগ্রে "আছে" বলিতে পার না; কারণ, "নাই" না থাকিলে "আছে" হয় না। সেইরূপ, অগ্রে "নাই" বলিতে পার না; কারণ, "আছে" না থাকিলে আবার নাই" হয় না। যেমন বীজ না হইলে বৃক্ষ হয় না, আর বৃক্ষ না হইলেও বীজ হয় না। ইহাও তদ্রূপ। অতএব, "ঈশ্বর আছেন" মন্ত্র হইতে "নাই" কিম্বা "ঈশ্বর নাই" মন্ত্র হইতে "আছে" নির্ণয় না হওয়ায়, উৎপত্তি অসিদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ, "আছেও" অসিদ্ধ হইয়া যায়, আর "নাইও" অসিদ্ধ হইয়া যায়। "নাই" নামক পদটী অসিদ্ধ হইয়া নগণ্য হয়—হউক,—বা তাহা না থাকে না থাক; কিন্তু "আছে" নামক পদটী অসিদ্ধ হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ হইয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ।

আবার, যদ্যপি অন্য আর এক ভাবে বলা যায় যে,—'আছে' ও 'নাই' ইহাদের ভাবটী কেমন? না,—যেমন টাকার এ পিট, আর ও-পিট। তাহাতেও তোমাদের কোনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না; পরন্তু, আর এক মহৎ কৌশল বাহির হইয়া পড়ে। কারণ, টাকা বলিয়া পদার্থটীতে আমরা পাই কি? অন্য কিছুই নহে; কেবল মৃত্তিকার পরিণাম বিশেষ যে ধাতু,—সেই ধাতুখণ্ড মাত্র। মৃত্তিকা আবার পার্থিব পরমাণুপুঞ্জেরই অবস্থান্তরিত অবস্থা বিশেষ,—বা নামান্তর মাত্র। তবেই দেখা গেল যে, টাকা বস্তুটীও একরূপ পরমাণুবাচক বস্তু,—বা টাকা বলিলে ধাতুখণ্ড ইত্যাদিতে একরূপ পরমাণুই প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং, অংশ বিভাগ বিহীন নিরবয়ব পরমাণুর যদ্যপি এ পিট, ও-পিট বলিয়া কোন কিছু থাকে, তবেই টাকার এ-পিট, ও-পিট ধর্ত্তব্য হইতে পারে। অন্যথায়, ঐরূপ উদাহরণ কোনই উপকারে আসে না। পরন্তু, ঐ উদাহরণ মন্ত্রটী "পাপ পুণ্যের" স্থলে খাটাইলেই,—প্রকারান্তরে "মহৎ কৌশল বাহির হইয়া" হিন্দু ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড পণ্ড করিয়া দেয়।

আবার, অন্যভাবে দেখ,—আছে—অর্থাৎ "হাঁ" বলিলেই তৎক্ষণাৎ একটী "না" আসিতেছে;—আবার, নাই—অর্থাৎ "না" বলিলেই তৎক্ষণাৎ একটী "হাঁ," আসিতেছে। আবার পুনরায় বল ঐ "হাঁ," "না" ভিন্ন আর অন্য কিছুই পাইবে না। অনাদি অনন্তকাল ঐরূপ বলিলেও, ঐ এক কথা "হাঁ", "না", আর "না," "হাঁ" ভিন্ন আর অন্য কিছুই পাইবে না। কিন্তু ঐ শব্দ দুইটী পরস্পর পরস্পরের ভাব ভাঙ্গিয়া দেয়;—অর্থাৎ উভয়ে

উভয়ের নাশক; আবার উভয়ের নাশ্য। নাশ্য ও নাশক (যেমন আলো ও অন্ধকার) কস্মিনকালেও একত্রে অবস্থান করে না। ইহাদের সদ্ভাব একরূপ অহি-নকুলের ন্যায়। অতএব এমতেও "হাঁ," "না" অথণ্ডাকার বস্তু হয় না। পক্ষান্তরে, "না"—আসিয়া "হাঁ" ভাঙ্গিতেছে, আবার "হাঁ"—আসিয়া তৎক্ষণাৎ "না" ভাঙ্গিতেছে। সুতরাং ইহাও একরূপ "ক্ষণ-ভঙ্গবাদেরই" প্রকারান্তর কৌশল বিশেষ। আর ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিন্দু ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ ও ঈশ্বরত্ব লোপ। আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, পুণ্য ও পাপ ইত্যাদি ঐ মতের যৌগিক উদাহরণগুলিও ঠিক ঐ এক শ্রেণীর অন্তর্ভূত। শূন্য ও এক, ভেদ ও অভেদ, এক ও দুই,—ইত্যাকার যৌগিক শব্দের আপত্তিগুলিও উহা হইতে ভিন্ন নহে। সমস্তগুলির মূল উদ্দেশ্য, উল্লিখিত যুক্তি দ্বারা নিরর্থক হইয়া পড়ে। কাজেই, আপত্তির ভিত্তি দৃঢ় না হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হয়।

অতএব, আলোচনা দ্বারা দেখা গেল যে. "ভূমা ভেদনে নবোল্লাস ঘটিত" প্রথম উল্লাস "জ্ঞানের অভাব উপলভ্যমান বস্তু না হওয়ায়,"—একরূপ অর্থে দোষদুষ্ট হয়। ভিন্ন রূপ অর্থে, 'আছে,' 'নাই' ইত্যাদি যুক্তি দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উচ্ছন্ন যায়; সুতরাং, ভূমা ও পূর্ণ-পরব্রহ্মের একত্ব বা অভেদত্ব অব্যাহত থাকে। অপিচ, প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎকারণত্ব লোপ পায়।

(২৫)

ভূমা ভেদনে দ্বিতীয়য়োল্লাস।

পূর্ব্ব পক্ষ।—প্রথম উল্লাসের মূল প্রশ্নই হইতেছে যে, ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম নামক বস্তুর "এক", "একত্ব" এই বাক্যের অর্থ কি? কিন্তু, গতবারের বিচারপ্রসঙ্গে তাহার কোনরূপ সিদ্ধান্তই প্রকাশ পায় না। কেবল আপত্তি খণ্ডনকরতঃ ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের এক—একত্ব,—অর্থাৎ অভেদ—ঐক্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে। তাহা ভালই হইয়াছে; কিন্তু, "এক-একত্ব" শব্দের সাধারণ অর্থ কি? একটু সহজ-ভাবে না বুঝাইলে, নূতন প্রশ্ন উত্থাপন বিষয়,—অর্থাৎ "ভূমা ভেদনে" দ্বিতীয়-উল্লাস উল্লেখ বিষয়ে, একটু ইতস্ততঃ করিতে হয়। সুতরাং প্রবন্ধের মূলীভূত উদ্দেশ্য আর একবার সহজ ভাবে না বুঝাইলে, পূর্ব্বাপর বিবরণ হয়তঃ সাধারণের স্মরণ পথে আসা সম্ভবপর নহে। অতএব, এ মতেও "এক,—একত্ব" শব্দের অর্থ দ্বারা প্রবন্ধের সার ভাগ আর একবার বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

"উত্তর পক্ষ"। ভাল কথা, এই যে প্রবন্ধ চলিতেছে, ইহার সারভাগ বা মূল উদ্দেশ্য হইতেছে,—জ্ঞান ও ভক্তির অভিন্নত্ব প্রদর্শন। প্রবন্ধের ফলিতার্থ দ্বারাই এ কথা অভিব্যক্ত হয়। জ্ঞান শব্দটী, ঈশ্বর বাচক শব্দ। ঈশ্বর বলিলে বুঝিতে হয়,—যে বস্তু, বাক্য ও মনের অগোচর, বিশ্বাধিপ ও সনাতন, সেই পরম বস্তুর নামের সংজ্ঞাই ঈশ্বর,—মতান্তরে রাম, কৃষ্ণ, হরি ইত্যাদি প্রবৃত্তি রূপ অর্থ ভাবনা দ্বারা আবার তিনিই প্রকৃতি বা ভক্তি;—মতান্তরে রাধা, কালী দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। তবেই দাঁড়াইল যে,—যে বস্তু জ্ঞানবাচক, পরন্তু বাক্য ও মনের অগোচর, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান,—সেই বিশ্বাতীত পরম বস্তুই,—ঈশ্বর

রাম, কৃষ্ণ, হরি,—মতান্তরে, প্রকৃতি, ভক্তি, রাধা, কালী ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। কিন্তু, জ্ঞান বস্তুটী ক্লীবলিঙ্গবাচক বস্তু,—অর্থাৎ পুংলিঙ্গও নহে, আর স্ত্রীলিঙ্গও নহে। ঈশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, হরি এগুলি পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। আর প্রকৃতি ভক্তি, রাধা, কালী, দুর্গা,—এগুলি স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ। তবেই দেখা গেল,—যে বস্তু ক্লীবলিঙ্গবাচক, "জ্ঞান-স্বরূপ"—সেই বিশ্বাতীত", শাশ্বত বস্তুই ঈশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, হরি ইত্যাদি নামে কখন পুংলিঙ্গ, আবার প্রকৃতি, ভক্তি, রাধা, কালী, ইত্যাদি নামে কখন স্ত্রীলিঙ্গ—অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হইতেছেন। কিন্তু লৌকিক জগতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ভিন্ন ভেদ সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। ঐ ভিন্ন ভেদ কথার কথা মাত্র, "জ্ঞান পক্ষে" বাস্তব নহে। অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ সমস্তই জ্ঞানপক্ষে অভিন্ন, একাকার বস্তু বিশেষ;—দুই, দুই ভাব তাহাতে আদৌ নাই। কি প্রকারে একথা—অর্থাৎ ঐ একাকার ভাব স্বীকার করা যায়? এই সমস্যা পুরণের জন্যই হইতেছে, জ্ঞান ও ভক্তির "এক" একত্ব প্রদর্শন;—যাহার জন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গ এত দূর চলিতেছে"। ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের 'এক' একত্ব শব্দের সিদ্ধার্থও ঠিক ঐ—অর্থেরই তুল্যমূল্য। অর্থাৎ,—ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের 'এক' একত্ব শব্দের সার ভাবও ঠিক ঐরূপ অর্থেই, অর্থাৎ—জ্ঞান ও ভক্তির 'এক' একত্ব প্রদর্শন অর্থেই গ্রহণ করা যায়, বা ঐরূপ অর্থেরই তুল্যমূল্য। তাহার ফলে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা এইরূপ—যথা :—

পরমাণু মিলন না হইলে জগৎ নামক পদার্থ আসিতেছে না। অর্থাৎ, এতদূর যে বিচার চলিতেছে, তাহা দ্বারা জগতের কোন কথাই এখন পাকা হইতেছে না। কেবল মাত্র পার্থিব পদার্থের উদাহরণ লইয়া দেখা হইতেছে যে,—বিশ্বের অতীত প্রদেশে কোন "এক" পরম বস্তু আছেন, তিনিই পরম দেবতা, জ্ঞান-স্বরূপ ও শাশ্বত। তাঁহার কোন কিছু নাম বা রূপ নাই। অর্থবোধের নিমত্ত, সেই নিত্য-সিদ্ধ পরম বস্তুই "পূর্ণপরব্রহ্ম" নামে অভিহিত হন। তিনি; (পূর্ণপরব্রহ্ম) এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, বা জগতের কারণ নহেন। ক্ষণভঙ্গবাদ, অপসিদ্ধান্তপাতদোষদুষ্ট; তাহাদের মতও জগতের কারণ নহে। সাংখ্য মতের যিনি প্রকৃতি, তিনিও প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রুতির আলোচনায়, জগতের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হন না।

বর্ত্তমান আলোচ্য ভূমা বস্তুটী, 'শ্রুতি মতে' বিশ্বাতীত পরম দেবতার সহিত (পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত) অভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু, পূর্ব্ব বিচারপ্রসঙ্গে ভূমার আভিধানিক অর্থালোচনায় যেরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ভূমা পদার্থটী আকারে, ওজনে ও ফলে, একরূপ প্রকৃতিরই তুল্যমূল্য হইয়া "স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদার্থ" গণ্য হয়,—বা যাহা ভূমা, তাহাই সেই "সাংখ্য মতে" প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইয়া যায়। এবম্বিধ স্ত্রীলিঙ্গ বাচক "ভূমা" প্রকৃতি, যদ্যপি ক্লীবলিঙ্গ-বাচক জ্ঞান দেবতার সহিত—"অর্থাৎ বিশ্বাতীত পরম দেবতা পূর্ণজ্ঞান পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত" অভিন্ন হইয়া যায়, তাহাহইলে প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ-কারণত্ব একবারে ভুলিতে

হয়। অপিচ, ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ একাকার হইয়া,—অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গবাচক জ্ঞান ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক "ভূমা" প্রকৃতি এক-অভিন্ন হইয়া, প্রকারান্তরে জ্ঞান ও ভক্তির 'এক' একত্ব সমর্থন দৃঢ় করে। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞান বস্তুটী ক্লীবলিঙ্গবাচক বস্তু, আর ভক্তি পদার্থটী স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদার্থ। ক্লীবলিঙ্গ আর স্ত্রীলিঙ্গ যদ্যপি অভিন্ন হইয়া যায়, তাহাহইলে জ্ঞান ও ভক্তি অবশ্যই 'এক' অভিন্ন হইবে, তাহা আর ব্যর্থ-হইবার নহে; কাজেই তাহাদের (জ্ঞান ও ভক্তির) একত্ব বা অভিন্নত্ব দৃঢ় হইয়া যায়। আর এক কথা,—ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ যদ্যপি একাকারে অভিন্ন হয়,— তাহা হইলে পুংলিঙ্গও সহজে তাহাই হইবে। অর্থাৎ, যেরূপ বিচার-প্রসঙ্গে ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এক অভিন্ন সাব্যস্ত হইবে, ঠিক সেইরূপ বিচার প্রসঙ্গেই পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ,—বা কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সমস্তই একাকারে অভিন্ন বস্তু গণ্য হইবে। আর তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে "জগৎ"—অভিনব ভাবে অভিন্ন হইয়া,—জীবের সহজাত ভ্রম নিরাকরণ করিবে। আমাদের ত ইচ্ছা তাহাই যে, ঈশ্বর সেইরূপই করুন। আমরা ত কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, সেইরূপ হইয়া হিন্দুর যোগ, যজ্ঞ, পূজা, উপাসনা সমস্তই সেই বিশ্বাতীত পরম দেবতার জন্যই হউক। স্থাবর, জঙ্গম, চরাচর, তুমি, আমি সেই বিশ্বাতীত অনন্তের সংজ্ঞা-বিশেষ হইয়া পড়ুক। আর একই বহু,—বা বহুই এক, অর্থাৎ একত্বে বহুত্ব,—বা বহুত্বে একত্ব হইয়া প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য. পূর্ণাঙ্গে পরম স্থলে পহুছিয়া যাক।

কিন্তু, তোমাদের (পূর্ব্বপক্ষের) ইচ্ছা-অনুরূপ। তোমার—ভূমা একটী বস্তু, আর বিশ্বাতীত পরম দেবতা—"পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ পরব্রহ্ম"—একটী পৃথক বস্তু,—এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়া প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব সমর্থনে প্রস্তুত। এক-দুই, আলো-অন্ধকার, ভেদ-অভেদ ইত্যাদি যৌগিক শব্দের আপত্তিগুলি ঠিক ঐ রূপ সমর্থনেরই অবশ্যম্ভাবী ফল বিশেষ। ভূমা ভেদনে নবোল্লাস, ঐ ফলেরই প্রকাশ বিশেষ মাত্র। কিন্তু প্রথম উল্লাস, পূর্ব্ব বিচার দ্বারা একরূপ পণ্ড হইয়াছে। এক্ষণে যদ্যপি তাহাই স্বীকার করা হয়, ভালই। কারণ, জ্ঞান ও ভক্তির একত্ব বা অভিন্নত্ব সহজেই অবধারিত হইয়া যায়। অন্যথায় তোমাদের দ্বিতীয় উল্লাস উপচিত হইয়া প্রকাশ্যে আসিলেই যথেষ্ট হয়।

পূর্ব্বপক্ষ। আচ্ছা,—এই প্রবন্ধের প্রথম হইতেই ত বলা হইতেছে যে,—ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান, বাক্য মনের অগোচর বা মনোবাণীর অতীত প্রদেশে কোন 'এক' পরম বস্তু আছেন, তিনি পূর্ণ পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, নিত্যসিদ্ধ, সনাতন। কিন্তু মন, বাক্য, কর্ম্ম যেখানে যায় না, অনুমানও সেখানে স্থান পায় না। অনুমানের যাহা অতীত, তাহা যে কি, তাহা বলা যায় না;—বলিলেও সহজে কোনও বিদ্বান ব্যক্তি তাহা স্বীকার করেন না। আপামর সাধারণ সকলেই বলিতেছে,—ঈশ্বর আছেন; শাস্ত্রাদি বলিতেছে, ঈশ্বর আছেন; আপনিও বলিতেছেন বাক্য মনের অতীত,—বা বিশ্বাতীত প্রদেশে নিত্যসিদ্ধ, স্বভাবস্বচ্ছ ঈশ্বর আছেন। কিন্তু আপনাদের কথায় উপর নির্ভর করিয়া, সাধারণের

বচন মাত্র লইয়া, আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে,—জগতের অতীত প্রদেশে নিত্যসিদ্ধ কোন "এক" ঈশ্বর আছেন। আমরা জানি,—"নহি বচনস্যাতি ভারো নাম;"—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বচনের অসাধ্য কিছুই নাই। বচন-বাহুল্যে সমস্তই সাধ্য হইয়া যায়। কিন্তু, আমরা সে সকল বচনের পক্ষপাতী নই। তবে আমরা চাই কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও তদনুকূল যুক্তি। জগতের এমন নিয়ম কিছুই থাকিতে পারে না যে, তাহার বাহিরে একরূপ, আর ভিতরে অন্য রূপ। অতএব, আপনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও যুক্তি লইয়া যদ্যপি বুঝাইয়া দেন,—তবেই আমরা—বিশ্বাতীত প্রদেশে নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিব। অন্যথায়, আমরা বলিব,—ঈশ্বর কখন নিত্যসিদ্ধ হইতে পারেন না,—বা আপনার নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর-সিদ্ধ করিতে পারে, এরূপ কোন প্রমাণই নাই।

আর এক কথা,—নিত্য বস্তুর কখন রূপ বা গুণ থাকে না। রূপ ও গুণ না থাকিলে, বস্তুর আকার থাকে না;—স্বভাব-স্বচ্ছ নিরাকার হয়। রূপগুণ-বিহীন নিরাকার বস্তু, মন কখন গ্রহণ করিতে পারে না। আবার, মন যাহা ধরিতে পারে না,—তাহার ব্যাপ্তি-জ্ঞান কদাচ সম্ভবপর নহে: সুতরাং তাহা অনুমান করাও চলে না। এইরূপে, আগমও সেখানে পরাস্ত হয়। অতএব, যেখানে মন, অনুমান, আগম ইত্যাদি কোন কিছুই যায় না, সে স্থান একরূপ "সর্ব্বশূন্য"। চতুষ্কোণ গোলক, আকাশের-গোলাপ ফুল, অমাবস্যার পূর্ণিমা ইত্যাদি বাক্য যেমন স্ব-বিরোধী হইয়া অসিদ্ধ হয়,—তদ্রূপ মন, অনুমান ও আগমাদির অধিকারশূন্য যে "সর্ব্বশূন্য" স্থান,—সেই অজ্ঞাত স্থানের নাম ঈশ্বর, পূর্ণ-পরব্রহ্ম ও নিত্য-সিদ্ধ হইলে, তাহাও স্ব-বিরোধী হইয়া চতুষ্কোণ গোলক ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অসিদ্ধ হইবে। সুতরাং এমতেও মনোবাণীর অতীত স্থান,—বা বস্তু নিত্য-সিদ্ধ ঈশ্বর হইতে পারে না। অতএব, আমরা কোন প্রমাণ সাহায্যে নিত্য-সিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করিব? আত্মা বা পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—মুক্ত ও বদ্ধ। এই দুইয়ের মধ্যে যদ্যপি ঈশ্বরকে রাখা হয়,—তাহাহইলে যাঁহার প্রকৃতি-যোগ নাই, ক্রিয়া-শক্তি নাই,—যিনি সতত‍ই উদাসীন, অসঙ্গ, এবম্বিধ আত্মাই মুক্তাত্মা,—বা মুক্তপুরুষ গণ্য হয়। এইরূপ মুক্ত পুরুষকে ঈশ্বর বলিবার প্রয়োজন কি? তিনি কি কেবল মাত্র "ঈশ্বর", "পূর্ণ পরব্রহ্ম" এই নামের অক্ষর কয়েকটী মাত্র লইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন করিবেন? ইহা ত কখন সম্ভবপর নহে। অতএব, ঈশ্বরকে কখনও সদামুক্ত, নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। আবার, যদ্যপি বলা যায়,—ঈশ্বর "সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহাহইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে,-তিনি কেবল মাত্র "-সৃষ্টিকর্ত্তা" এই অক্ষর কয়েকটী সম্বল করিয়া জগৎ সৃষ্টি কখন সমাহিত করিতে পারেন না; সুতরাং, বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার প্রকৃতি-যোগ আছে, ক্রিয়া-শক্তি আছে;—অর্থাৎ তিনি শক্তি ভিন্ন কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। এরূপ হইলে আমরা বলিব,—যে ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তি আছে, সে ঈশ্বর সদামুক্ত, জগতের অতীত

বস্তু, নিত্য-সিদ্ধ নহেন; পরন্তু, তিনি বদ্ধ, গুণবান, সক্রিয়, ইত্যাদি। তবেই দেখা গেল,—ঈশ্বর "ক্রিয়াশূন্য," নিত্য-সিদ্ধ মুক্ত পুরুষ হইলে,—জগৎ সৃষ্টি হয় না; আর সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া সগুণ ও সক্রিয় হইলে, কখন "নিত্য-সিদ্ধ" হন না। যাহাই বলুন, ঈশ্বরের নিত্যত্ব সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। কোনরূপ প্রমাণেই ঈশ্বরের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

এক্ষণে আমাদের কথা এই যে,—আপনি যদ্যপি ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার করেন, তবে অতঃপর বাধ্য হইয়া আপনাকে নিত্যসিদ্ধ, সনাতন ঈশ্বর ভুলিতে হইবে। আর তাহা ভুলিয়া, নিত্য ঈশ্বর স্থলে, "জন্য-ঈশ্বর" মানিতে হইবে। অর্থাৎ—"ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" শব্দ দ্বারা যিনি ঈশ্বর,—(অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যশালী)—তিনিই প্রমাণ-সিদ্ধ প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ ঈশ্বরই, সর্ব্ববিদ্‌, সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বকর্ত্তা ইত্যাদি। ইহা মানিলে, আর কোনরূপ আপত্তিই হইতে পারে না। আর আপনি যে, জগতের অতীত প্রদেশে নিত্যসিদ্ধ, সনাতন-স্বভাব, পূর্ণ পরব্রহ্ম বলিতেছেন, সেই পূর্ণ পরব্রহ্মও ঐরূপ অর্থে নিত্যসিদ্ধ গণ্য হইবেন না। তিনিও, "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর," শব্দ দ্বারা যিনি ঈশ্বর সেই ঈশ্বরেরই অন্তর্ভূত। রাম, কৃষ্ণ, হরি ইত্যাদিও ঐ এক ঈশ্বরের নামান্তর হইতে পারে। অন্যথায়,—আপনি যদ্যপি পূর্ণ পরব্রহ্মকে নিত্যসিদ্ধ ভাবেই রাখিতে চান, তাহা হইলে তিনি ত সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বেশ্বর, জগৎপালক ইত্যাদি হইবেনই না, অপিচ আমাদের অনুমানেও আসিবেন না। এরূপাবস্থায়, তাঁহার নাম মুখে আনিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, মুখে আনিলেই উল্লিখিত চতুষ্কোণ গোলকের মত অসিদ্ধ হইয়া, তিনি নিজের নিত্যত্ব হারাইবেন। অপিচ ঐশ্বর্য্যার্থক ঈশ্বরেরই তুল্যমূল্য হইবেন; সুতরাং তাঁহার নিত্যত্ব রক্ষা করিতে হইলে,—তাঁহার নামটী পর্য্যন্ত যখন মুখে আনা যায় না, তখন আলোচ্য ভূমার সহিত তাঁহার একাকার মিলনের আশা অকারণ মাত্র। অতএব, এমতেও ভূমা একটী বস্তু, আর নিত্য-সিদ্ধ পূর্ণ পরব্রহ্ম একটী পৃথক বস্তু হইয়া পড়েন। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি "ঐশ্বর্য্যার্থক" ঈশ্বররূপী পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত কি ভূমা-মিলনের অভিলাষী? কিম্বা বিশ্বাতীত,—নিত্য-সিদ্ধ কোন কিছু বস্তুর সহিত ভূমা মিলনের পক্ষপাতী? এইটী স্থির হইলেই, ভূমা বস্তুটী পূর্ণ পরব্রহ্ম হইতে অবশ্যই পৃথক হইয়া পড়িবে। সুতরাং, প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব সমর্থন সুদূরপরাহত হইবে না। অপিচ, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের, বা ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের একাকার মিলন রূপ প্রসঙ্গের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, প্রখ্যাত হইবে না; প্রচ্ছন্ন হইবে। ইহাই হইতেছে, "ভূমা ভেদনে দ্বিতীয়োল্লাস"।

"উত্তর পক্ষ"। হাঁ,—ঠিক হইয়াছে; এতদিনে তোমাদের উল্লাস চরমে আসিয়াছে। প্রথম উল্লাসের মূলীভূত আপত্তি, "ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্ম",—"জীব ও ব্রহ্ম" ইত্যাদির একত্ব বিষয়ে প্রতিযোগিনী ছিল,—বর্ত্তমান দ্বিতীয় উল্লাসে উত্থাপিত প্রস্তাব ত ঠিক সেইরূপ আছেই; অধিকন্তু,—এত দিন ধরিয়া যে পূর্ণ পরব্রহ্ম,"—"পূর্ণপরব্রহ্ম" শব্দ দ্বারা নিত্য-

সিদ্ধ পরম বস্তু পরমেশ্বরের কথা বলা হইতেছে, এ উল্লাস সেই সনাতন-স্বভাব, পূর্ণপরব্রহ্মের নাম লোপ করিতে প্রস্তুত। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম শব্দটী 'বৃহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। 'বৃহ' ধাতুর অর্থ বৃহৎ বা বড়। 'পর' শব্দটী শ্রেষ্ঠ বাচক শব্দ; পরন্তু ঐ বৃহতের বিশেষণ। অর্থাৎ, ঐ বৃহৎ-বাচক "ব্রহ্ম" বস্তুটী কেমন? না—শ্রেষ্ঠ, প্রধান, অত্যন্ত ইত্যাদি-বাচক যে "পর" সেইরূপ। 'পূর্ণ' শব্দটী শেষ-বাচক শব্দ; পরন্তু ঐ "পর" বিশেষণের বিশেষণ। অর্থাৎ অত্যন্ত বৃহৎ বাচক "পরব্রহ্ম" বস্তুটী কেমন না,—পূর্ণ, শেষ, সাঙ্গ ইত্যাদি বৎ। অর্থাৎ যে অত্যন্ত শেষ অত্যন্ত,—যাহার অত্যন্ত আর নাই, হইতেও পারে না, সম্ভাবনাও নাই,—এবম্বিধ যে অত্যন্ত বৃহৎ বস্তু,—"পূর্ণ পরব্রহ্ম" শব্দটী তদ্রূপ বস্তুর প্রকাশক মাত্র। অনবস্থার হাত এড়াইতে হইলে, ঐ পূর্ণ পরব্রহ্মবাচক, অত্যন্ত, বৃহৎ বা মহান বস্তুকে,—অনন্তপ্রয়োজন-বিশিষ্ট, অনুপম ও শাশ্বত ইত্যাদি বিশেষণে আনিতে হয়। অন্যথায়, জ্ঞানের আপ্যায়ন কদাচ সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান দ্বিতীয় উল্লাস এবম্বিধ "পূর্ণ পরব্রহ্মের" নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনার বিরোধী। ইহাই বর্ত্তমান উল্লাসের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের ব্যুৎপত্ত্যর্থেই পক্ষান্তরে তোমাদের একটী নাম "নিরীশ্বরবাদী"। এই বিশেষত্বের বলেই,—তোমরা যথা তথা বলিয়া থাক যে,—ব্রহ্ম বস্তুটী, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইলেই "ব্রহ্ম"; আর সগুণ ও সক্রিয় হইলেই "ঈশ্বর,"—অর্থাৎ-ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের এবম্ভূত "মহৎ কৌশল যুক্ত" ব্যাখ্যা করিয়া থাক। কেবল ইহাই নহে,—আবার ঐরূপ বিশেষ স্বর বলেই,—তোমরা প্রকৃতিকে পরহস্তা-রূপা, সং পদার্থরূপিনী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যাত করতঃ—আবার জগতের কারণ, আদ্যাশক্তি ইত্যাদি ব্যাখ্যায় তন্ত্র শাস্ত্রের বাখ্যাতা হও,—বা সাংখ্য ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রকেই জটিল করিয়া তুল। কিন্তু তোমরা নিরীশ্বর-বাদী হও, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তোমাদের মতে,—ব্রহ্ম বস্তুটী নিগুণ ও নিষ্-ক্রিয় হইয়াই ব্রহ্ম;—আর সগুণ ও সক্রিয় হইলেই ব্রহ্মত্ব হারাইয়া ঈশ্বর; এইরূপে একই ব্রহ্ম বস্তু কখন নির্গুণ, কখন সগুণ, আবার কখন নিষ্ক্রিয়,—কখন সক্রিয় ইত্যাদি মিশ্র পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া কাচের পুতুলের মত ক্ষণভঙ্গুর হউক,—তাহাতেও তোমাদের অভিপ্রেত বিষয়ের পরিণাম বলিয়া,—হিন্দুর কোন কিছু আসিয়া যায় না। পরহস্তারূপা প্রকৃতি জগতের কারণ হয়,—হউক; তাহাতেও বর্ত্তমানে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু, তোমাদের অভিপ্রায়ের সহিত,—তোমরা সিদ্ধপ্রবর মহর্ষি কপিলকে জড়াইয়া দাও,—অর্থাৎ মহর্ষিকেও নিরীশ্বর-বাদী করিয়া তুল,—দুঃখ, ইহার জন্যই আপনা হইতে উপস্থিত। আর দুঃখ হয়,—মহর্ষি সাংখ্যকারের হৃদয়নিহিত তত্ত্ব ও তদনুগত সার ভাব,—তোমাদের হাতে পড়িয়া তোমাদের ব্যাখ্যার কৌশলে, হিন্দু ধর্ম্মের মুলোচ্ছেদক হয় বলিয়া। ইহা দ্বারা তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়,—ভালই; কিন্তু, যে বাক্যের বিক্ষেপ শক্তি ঋষিবাক্যের উপর সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়, হিন্দু তাহা অবাস্তব জ্ঞানে দূরে রাখে।

আজ সারা বঙ্গ দুর্গোৎসবজনিত পরমোৎসবে প্রহৃষ্ট। হিমালয়কন্যকারূপ (দুর্গারূপ) যে জ্ঞান প্রদীপ, তাহা আজ শ্রীপতিরূপ চিদ্ঘন আলোকে স্বয়ং প্রদীপ্ত হইয়া, দাক্ষায়নী দীপ্তিতে বঙ্গের প্রতি গৃহেই প্রকাশমানা। এই দুর্গোৎসব-তত্ত্বের পরম রূপ, জ্ঞান দেবতার সহিত এরূপ অভেদ যে, তাহা স্থিরচিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা করিলে, আনন্দে দেহ অভিভূত হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের বিশেষত্বরূপ বুদ্ধি বলে ঐ দুর্গাতত্ত্ব চিন্তা করিলে,—অতি সহজেই ঐ বুদ্ধি-তত্ত্বের ভিত্তি উৎপাটিত করিয়া দেয়:

শাস্ত্র জিনিষটী, তোমাদের ঐ বিশেষত্ব রূপ ব্যাখ্যা দ্বারাই জটিল হইয়া, গহন কাননবৎ হইয়া যায়। ব্যস্ত বর্ণ, প্রতিকূল শব্দ, ঐ কাননের বৃক্ষ-বিশেষ। প্রকৃত অর্থ সঙ্কোচ, ঐ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা-স্বরূপ। মনগড়া কথা, বিচার বিহীন বাক্য,—ঐ বৃক্ষের মঞ্জরীস্বরূপ। আর প্রমাদ, মোহ, ভ্রান্তি,—ঐ বৃক্ষের অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ। এরূপ ফল,—স্বতঃই তিক্ত। এরূপ ফলের আস্বাদনে, তৃপ্তিলাভ দূরের কথা, "জীব যেই তিমিরে, ঠিক সেই তিমিরেই থাকে"। অতএব, তোমাদের উপস্থাপিত দ্বিতীয়োল্লাস বিষয়ক প্রস্তাব তন্ন-তন্ন রূপে বিচার না করিলে,—সাধারণের কস্মিনকালেও উহা গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে;—ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের ভিন্নভেদ সমর্থনে প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব ও নিত্যত্ব সমর্থন ত দূরের কথা।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।
সন্তোষপুর, হুগলী।

:0:

যোগানন্দ-লহরী।

পূরবী (২১) আড়া।

দেখ দেখ, চেয়ে দেখ, দশভূজা আসিল।
ভুবন মোহন রূপে মন প্রাণ জুড়াইল॥
দশদিক আলো করি,
এলো উমা মহেশ্বরী,
কিবা সে রূপমাধুরী,
কোটী ইন্দু প্রকাশিল॥
সিদ্ধিদাতা গণপতি,
সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী,
ঐ যে বিজয় মূরতি,
কার্ত্তিকেয় দেখা দিল॥

সুন্দর শারদ সাঁঝে,
সেজে অপরূপ সাজে,
এল তারা ধরা মাঝে
আনন্দে সবে মাতিল ॥
মঙ্গল আরতি সবে,
কর না ভৈরব রবে,
দুর্গতিনাশিনী ভবে
এতদিনে উদয় হ'ল ॥

—:0:—

স্বরবর্ণের উক্তি।

অ—বলে অন্নপূর্ণা মায়ের পূজা কর।
অহরহঃ মাকে স্মর হইবে অমর ॥
আ—বলে আশুতোষ আশ্রিতবৎসল।
আরাধনা কর তাঁর প্রাণে পাবে বল ॥
ই—বলে ইষ্টদেবে ইষ্টসিদ্ধি তরে।
ইন্দ্রিয় সংযম করি ভজ ভক্তিভরে ॥
ঈ—বলে ঈশ্বরচিন্তা কর ভোলা মন।
ঈশ্বর প্রসাদে শান্তি পাবে অনুক্ষণ ॥
উ—বলে উমা মায়ের কর উপাসনা।
উমেশ প্রসন্ন হবে রবে না ভাবনা ॥
ঊ—বলে ঊষাকালে যারা পূজে মায়।
ঊর্দ্ধরেতা হয়ে তারা ঊর্দ্ধলোকে যায় ॥
ঋ—বলে ঋণজাল ছিন্ন কর ভাই।
ঋণগ্রস্থ মানবের সুখ, শান্তি নাই ॥
ঌ—বলে আমি মেধা, শুদ্ধ, দেবযোনি।
ৡ বলে আমি কৃতী, কামিনী, জননী ॥
এ—বলে একনিষ্ঠ হয়ে জীবগণ।
এলোকেশী মাকে পূজা কর অনুক্ষণ ॥
ঐ—বলে ঐশকৃপা যদি ভাই চাও।
ঐকান্তিক ভক্তিভরে হরিগুণ গাও ॥
ও—বলে ওরে জীব ওঁকার জপ।
ওজস্বিতা বাড়ে তার যারা করে তপ ॥
ঔ—বলে ঔদ্ধত্যের কর পরিহার।
ঔদার্য্যের গুণে মিলে শান্তি অনিবার ॥

ব্যঞ্জনবর্ণের উক্তি।

ক—কহে কত কাল কালে দিবে ফাঁকি?
কালী, কালী জপ জীব যে কদিন বাকী ॥
খ—বলে খেয়া নৌকা ভবপারে যায়।
খেলা ফেলে সবে মিলে এই বেলা আয় ॥
গ—বলে গীতা পড় গুরুবাক্য ধর।
গোলকেতে গতি হবে, গৌরীপূজা কর ॥
ঘ—বলে ঘরে ঘরে বিরাজে ভবানী।
ঘুমে অচেতন জীব দেখে না জননী ॥

ঙ—বলে শঙ্কা কি ভাই ভজ সদা হরি।
দেখা দিবে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী॥
চ—বলে চিরজীবী হয়ে আস নাই।
চিন্তা ত্যজি চিন্তামণি চিন্তা কর ভাই॥
ছ—বলে ছলনা ছাড় ওরে নরগণ।
ছিদ্রান্বেষী জন, শান্তি পায় না কখন॥
জ—বলে জননীকে পূজা কর সবে।
জনক জননী তুল্য গুরু কেবা ভবে॥
ঝ—বলে ঝগড়াঝাটি করা ভাল নয়।
ঝুটা কথা বলা দোষ সর্ব্বলোকে কয়॥
ঞ—বলে জ্ঞান দান তুল্য দান নাই।
অজ্ঞানীরে জ্ঞান দান কর সবে ভাই॥
ট—বলে টোল কর নগরে নগরে।
টাকা কড়ি দান কর সৎকার্য্য তরে॥
ঠ—বলে ঠেটামি ছাড় ঠিক পথ ধর।
ঠাকুর ঘরে যেয়ে ভাই ঠাকুর পূজা কর॥
ড—বলে ডাক মাকে মন প্রাণ খুলে।
ডঙ্কা মেরে যেতে চাও যদি মার কোলে॥
ঢ—বলে ঢাক ঢোল বাজে কালীবাড়ী।
ঢাকী শুদ্ধ সবে মোরা মার নাম করি॥
ণ—বলে জ্ঞানিগণ হরি গুণ গায়।
রাধাকৃষ্ণ না ভজিলে জন্ম বৃথা যায়॥
ত—বলে ত্যাগশীল হও যতিগণ।
ত্যাগ বিনা তত্ত্বজ্ঞান মিলে না কখন॥
থ—বলে থেকো না ভাই কভু মাকে ভুলে।
থেকে থেকে মাকে ডাক মা নিবেন কোলে॥
দ—বলে দয়া কর দীন দুঃখী জনে।
দয়াময়, দীননাথ থাকে দীন সনে॥
ধ—বলে ধন তৃষ্ণা মিটেনারে ভাই।
ধন চিন্তা ছাড়ি ভাই হরি গুণ গাই॥

ন—বলে নিত্যকর্ম্ম কর নরগণ।
নিত্যানিত্য বোধ হলে মিলে নারায়ণ॥
প—বলে পতিব্রতা, পতিপ্রাণা নারী।
পতিসেবা গুণে যায় এ সংসার তরি॥
ফ—বলে ফুল্লমনে ফকিরেরা ভাই।
ফলে ফুলে ভগবানে পূজিছে সদাই॥
ব—বলে বুদ্ধদেব বোধি-তরু তলে।
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মচর্য্যবলে॥
ভ—বলে ভক্তিবলে ভগবান মিলে।
ভক্তি ভরে মাকে ডাক মা নিবেন কোলে॥
ম—বলে মার গুণ শত মুখে গাই।
মা ডাকার মত ডাক ভবে আর নাই॥
য—বলে যতিগণ বসি যোগাসনে।
যোগেশ্বরী মাকে পূজে আনন্দিত মনে॥
র—বলে রাগ মার্গে ভজে রামে যারা।
রমানাথ সনে মিলে বৈকুণ্ঠেতে তারা॥
ল—বলে লক্ষ্মীপূজা কর সবে ভাই।
লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিতে কভু নাই।
ব—বলে বশীভূত ষড়রিপু যার।
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় অনায়াসে তার॥
শ—বলে শিব, শিব জপ অনুক্ষণ।
শিব হতে জীব জন্ম হয় কি কখন?
ষ—বলে ষড়ভূজা পূজা কর সবে।
ষড়রিপু জয় কর কীর্ত্তি রবে ভবে॥
স—বলে সত্য কথা সদা বল ভাই।
সত্যের সমান ধন ত্রিভুবনে নাই॥
হ—বলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যারা।
হরিহরে ভেদ জ্ঞান করে সদা তারা॥
ক্ষ—বলে ক্ষমাশীল হও জীবগণ।
ক্ষণস্থায়ী এ সংসার রাখিও স্মরণ॥

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

:0:

সুখ ও দুঃখ।

জগতে কর্ম্মনিরত সদা ব্যস্ত জীবগণের উদ্দেশ্য পর্য্যালোচনা করিলে আমরা মূলে একমাত্র সুখের তৃষ্ণা ও দুঃখের বিতৃষ্ণাই সম্পূর্ণরূপে প্রকট দেখিতে পাই। সুখের লালসায় মত্ত হইয়া জীব মাত্রেই ভ্রমন করিতেছে; সকলের মুখেই দুঃখের বিতৃষ্ণা সদা প্রকাশমান। এই সুখ ও দুঃখ, পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফল। পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ। শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মই পুণ্য কর্ম্ম এবং শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্মই পাপ কর্ম্ম। কাজেই শাস্ত্রবিধি প্রতিপালনে সুখ ও অপ্রতিপালনে দুঃখের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী কেহ বা শাস্ত্রানুশাসন দ্বারা কেহ বা স্বীয় বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা করিয়া পাপ ও পুণ্য স্থির করতঃ সুখের পথ সুপ্রশস্ত ও দুঃখের পথরোধ করিবার জন্য সদা বদ্ধপরিকর রহিয়াছে। কিন্তু মানবেতর জীবগণ দুঃখবুদ্ধি প্রণোদিত না হইয়াও সুখের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। এই সুখের আকাঙ্ক্ষা জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক। ইহার মূল তত্ত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত কেহই এই সুখের পিপাসা ও দুঃখের বিতৃষ্ণা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না।

স্বভাবানুযায়ী প্রত্যেকের মনেই কতকগুলি বিশিষ্ট ভাবের সমাবেশ আছে। এই সকল ভাবের অনুগত ক্রিয়া দ্বারা চিত্তের যে সরসতা সম্পাদিত হয়, তাহাই সুখ এবং এতদ্বিরুদ্ধ অবস্থাই দুঃখ।

গুণ-ক্রিয়া ভেদে সুখ ও দুঃখ প্রত্যেকেই তিন ভাগে বিভক্ত। ত্রিবিধ সুখ যথা:— সাত্ত্বিক সুখ, রাজসিক সুখ ও তামসিক সুখ।

সাত্ত্বিক সুখ যথাঃ—

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যদত্তগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥

শ্রীশ্রীগীতা-৩৭।১৮

যাহাতে অভ্যাস বশতঃ পরমানন্দ লাভ হয় এবং দুঃখরাশী দূরীভূত হয়, যাহা প্রথম বিষবৎ, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য বোধ হয় ও যাহা আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির প্রসাদ হইতে উদ্ভূত, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। যেমন পরোপকারজনিত সুখ।

রাজসিক সুখ যথা:—

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥

৩৮।১৮ গীতা

যাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে উৎপন্ন হয়, এবং প্রথম অমৃততুল্য ও পরিণামে বিষবৎ, তাহাই রাজস সুখ। যেমন আহার বিহারাদিজনিত সুখ।

তামসিক সুখ যথা:—

যদগ্রেচানুবন্ধেচ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যং প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

৩৯।১৮ গীতা

যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উদ্ভূত এবং প্রথমে ও শেষে চিত্তের মোহ-উৎপাদনকারী, তাহাই তামস সুখ নামে অভিহিত। যেমন কাহারও অপকার সাধনে কৃতকার্য্যতার জন্য সুখ।

এই ত্রিবিধ সুখের মধ্যে সাত্ত্বিক সুখই মানবের একমাত্র বাঞ্ছনীয়। জীবহৃদয়ে প্রকৃত শান্তির উৎস সাত্ত্বিক সুখেই বর্ত্তমান; কিন্তু

পরা শান্তি গুণাত্মিক সুখের পর পারে।

আবার দুঃখও তিনি ভাগে বিভক্ত। যথাঃ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

স্থূল দেহঘটিত রোগাদি ও মন সংসৃষ্ট কামক্রোধাদিজনিত যে দুঃখ, তাহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ।

মনুষ্য, পশু বা অন্য কোন জীবকর্ত্তৃক যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ।

ভূত-যোনি ও অন্যান্য দেবতাদি দ্বারা যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ।

এই ত্রিবিধ দুঃখই জীবের নিকট হেয় এবং ইহাদের কবল হইতে মুক্তি লাভ জন্য জীব সর্ব্বদা ব্যস্ত ও বদ্ধপরিকর। সাংখ্যমতে অজ্ঞানপ্রসূত এই দুঃখত্রয় দূর করিতে পারিলেই পুরুষ-প্রকৃতির ভেদাভেদ জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং পরমানন্দময় অবস্থা লাভ হয়।

জীব জগতে পূর্ব্বোক্তরূপ ত্রিবিধ সুখ ও ত্রিবিধ দুঃখের খেলা হইতেছে। এই সুখ-দুঃখ আশ্রয় করিয়াই এ সংসার সংসাররূপ প্রতীয়মান হইতেছে। ইহারা উভয়েই মনজ। মনেই ইহাদের জন্ম, মনেই ইহাদের অবস্থান এবং মনেই ইহাদের ক্রিয়ার বিকাশ। অতএব মনের নাশে ইহাদের নাশ অবশ্যম্ভাবী; তাই যোগশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ—অর্থাৎ মনের নাশ। মন সদা চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল বিধায়ে সুখদুঃখও সদা পরিবর্ত্তনশীল। যথাঃ—

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে
সুখানিচ দুঃখানিচ।

সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় অবিরাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে অর্থাৎ একের পর অন্যের আবির্ভাব হইতেছে। মানব ইহারই ঘাত-প্রতিঘাতে কখনও আনন্দে আত্মহারা হইয়া জগতকে নন্দনকাননজ্ঞানে পরম পুলকিত হইতেছে, আবার কখনও বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া, ধরাকে প্রেতের আগার মনে করিতেছে। এই যে মহাশক্তিশালী সুখ ও দুঃখ নামক দুইটী পদার্থ আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, ইহারা কি? এবং ইহাদের হাত হইতে জীব মুক্ত হইতে পারে কি না? এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

সুখ ও দুঃখ সদা পরিবর্ত্তনশীল। ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, জাগতিক বিধি। সুখও স্থায়ী নয়, দুঃখও স্থায়ী নয়; এবং কেহই চিরস্থায়ীরূপে মানব মনে ক্রিয়া প্রকাশ করে না। আমরা মানবের সুখ ও দুঃখের পরিমাপক ভাবটী গ্রহণ করিয়া বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই,—যে আজ সুখী, কিঙ্করকিঙ্করীপরিসেবিত হইয়া সুবর্ণ অট্টালিকায় দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শয়ান, সময়ান্তরে হয়তঃ সে দুঃখী, পথের ভিখারী অন্ন বস্ত্র—কাঙ্গাল, শির রক্ষার জন্য একখানি কুটিরেরও তাহার অভাব। আবার আজ যে দুঃখী, অশনবসনের ভিখারী, বৃক্ষ মূলে নিশাতিবাহিত করিতেছে, কালে হয়তঃ সে সকল সম্পদের অধিকারী হইয়া মহানন্দে কালাতিপাত করিতেছে। দৃশ্যতঃ সুখ ও দুঃখাবস্থার এরূপ ক্ষণস্থায়ীত্ব সত্ত্বেও কেহ কি বলিতে পারেন, ঐ যে দীন দরিদ্র, দিনান্তে একমুষ্টি ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিয়া বৃক্ষ মূলে বাহু উপাধানে নিদ্রাভিভূত, সে কি

দুঃখী ? আর ঐ যে ধনী, চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য পেয় দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে, সেই কি প্রকৃত সুখী ? ইহা দূর হইতে মিমাংসা করা সুকঠিন। কারণ বিশেষ অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে সাধারণে সুখী বলিয়া মনে করে, সে হয়তঃ প্রাণে প্রাণে অতীব দুঃখী, বিপদের মলিন ছায়া ঘন আস্তরণে তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সংসারের শত ঘাত প্রতিঘাতে হয়তঃ তাহার হৃদয় খণ্ড বিখণ্ড; কিন্তু ভিক্ষান্নভোজী, কুটীরবাসী দরিদ্র, যাহাকে সকলে দুঃখী বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, সে হয়তঃ সুখী, বিলাস লালসায় তাহার স্পৃহা নাই, সে পরমানন্দে নিজ অবস্থায় তৃপ্ত থাকিয়া দিন কাটাইয়া দিতেছে। এইরূপে যে সুখী ও দুঃখী নিরূপিত হইবে, তাহাও দ্রষ্টার চিত্ত বৃত্তির উপরই নির্ভর করিতেছে। দ্রষ্টার চিত্তে যেরূপ সুখ-দুঃখের আদর্শ বর্ত্তমান, তিনি সেইরূপই সুখী ও দুঃখী, অবস্থা বিবেচনায় নিরূপন করিবেন। অতএব যদি ভিখারী দুঃখী আর রাজা সুখী, ইহা প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে সুখ ও দুঃখ প্রকৃত পক্ষে কি বস্তু তাহাও স্থিরীকৃত হয় না। কিন্তু এই সুখ ও দুঃখ লইয়াই এ সংসার, এই সুখের আশায়, দুঃখের বিতৃষ্ণায় কেহ অরণ্য-বাসী, যোগী, সর্ব্ববিধ বিষয়ভোগবিরাগী, আবার কেহ বিষয়াসক্ত, ভোগী, পর-শ্রীকাতর, পরস্বাপহারক। ইহাতে দেখা যাইতেছে, একই বস্তর লাভে একজন সুখী ও অপরে দুঃখী। অতএব সুখ বা দুঃখ জগতে কোন বস্তু বিশেষে নিবদ্ধ নাই। ইহাদের আশ্রয় স্থান যে, একমাত্র মানব মনই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং সুখ ও দুঃখের নাম ভিন্ন অন্য কোনরূপ প্রকৃত বিভিন্ন সত্বা যে বর্ত্তমান আছে, তাহাও অনুধাবন করা যায় না। পর্য্যবেক্ষনে আরও দেখা যায়, একই মানব, একই বস্তুতে কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ উপলব্ধি করিয়া থাকে; এবং সময়ে চিত্তের পরিবর্ত্তনানুসারে দুঃখের বস্তু সুখকররূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। আজ যাহা চিত্তের আনন্দবিধায়ক, কাল তাহা ঘোর দুঃখের কারণ রূপে প্রমাণিত হইয়া যায়। অর্থাভাবে যে ক্লিষ্ট, সে অর্থ লাভ করিয়া যখন তদানুসঙ্গিক বিপদরাশী প্রাপ্ত হয়, তখন সে তাহার পূর্ব্ব অর্থহীনাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত হয়। কামান্ধ রিপুর উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করে এবং উহাই জীবনের এক মাত্র শান্তি ও সুখ-বিধায়ক বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া নিশিদিন কাম-ভোগে রত হয়; কিন্তু ভোগান্তে শিথিলগ্রন্থি ও রোগাক্রান্ত দেহ খানি লইয়া যখন সে জগতে সন্তপ্ত জীবন যাপন করিতে থাকে, তখন সে তাহার পূর্ব্ব কামান্ধ অবস্থাকে ভ্রমরূপে দেখিতে পায় এবং ঐ অবস্থা যে বর্ত্তমান দুঃখের হেতুস্বরূপ ছিল, প্রকৃত সুখকর ছিল না, তাহা মনে করিয়া অতীব অনুতপ্ত ও ব্যথিত হইয়া স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। এতদনুরূপ বিষয়গুলি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সুখ বা দুঃখ নামে বিশেষ কোন বস্তু নাই। সুখ ও দুঃখ মনের ক্রিয়া বিশেষ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কারণ—মন যখন যে বস্তুকে যেরূপে অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ রূপে উপস্থিত করে,

বুদ্ধি তাহাই গ্রহণ করিয়া জীবকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে। মনের অবস্থানুসারে অনুকূল বা প্রতিকূল বস্তুই কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ রূপে প্রতিভাত হয়; অতএব বিচারে সুখ ও দুঃখের প্রকৃত অস্তিত্বের অভাব দেখা যাইতেছে (অথবা যাহা আছে, তাহা একই বস্তু—বিভিন্ন নহে) কিন্তু এরূপ অস্তিত্বহীন অশ্বডিম্ববৎ কোন বস্তু বিশেষের পশ্চাতে জগৎ অবিরাম ছুটিতেছে, ইহাও সহসা হৃদয়ে স্থান পায় না। অতএব দেখা যাউক, ইহার অন্য কোন পারমর্থিক সত্ত্বা আছে কি না?

জীবমাত্রেই স্বভাবতঃ সুখের প্রয়াসী, তৃপ্তির কাঙ্গাল। মাতৃগর্ভচ্যুত সদ্যভুমিষ্ঠ অজ্ঞান শিশু সুখের লালসায় বিশ্রামের জন্য আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, সুখের জন্য দস্যু পরাস্বপহরণে প্রবৃত্ত হয়, যোগী ধ্যান নিমগ্ন হয়; রাজা শত সুখের অধিকারী হইয়াও সহস্র সহস্র প্রাণ নাশ করিয়া রাজ্য বিস্তারে বদ্ধপরিকর হয়, ভিখারী ভিক্ষার জন্য বহির্গত হয়। ইহারা সকলেই দুঃখের অসুখ অসুবিধার কঠোর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সুখের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয়প্রার্থী। মানবেতর জীবেও সুখের লালসা, তৃপ্তির জন্য উন্মাদ-আবেগ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সুখ-লাভেচ্ছা জীবের স্বভাবলব্ধ ধন। স্বভাবের যাহা দান, মায়ের যাহা আশীর্ব্বাদ, তাহার স্থূলতঃ কোন অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলেও কখনও মিথ্যা নহে। এ সুখ বিষয়ের সুখ নহে। ইহা সুখস্বরূপ আত্মস্বরূপের ম্লান অনুভূতি। সর্ব্বজীব হৃদয়ে এ অনুসন্ধান সেই সুখের অনুসন্ধান; যাহা লাভ করিলে সুখ-দুঃখ দূরে অপসারিত হইয়া প্রাণে শান্তির উৎস উৎসারিত হয়। সুখের অনুসন্ধানে (জ্ঞানীর ভাষায় স্বরূপানুসন্ধান,—ভক্তের ভাষায় ভগবতানুসন্ধান) বহির্গত হইয়া মানব কর্ম্মবশে পথভ্রষ্ট, মায়ার জালে জড়িত, আত্মহারা, আত্মপ্রবঞ্চিত—মুগ্ধ। জলভ্রমে তৃষ্ণার্ত্ত যেমন মরু-মরীচিকার অনুসরণ করিয়া বিফলপ্রয়াসী, ভগ্ন-আশ হয়, সুখপ্রয়াসী মানবও তেমনি সংসারক্ষেত্রে বিষয়সেবায় মনোনিবেশ করিয়া সুখলাভে সদাই নিরাশ হইতেছে; কিন্তু তবুও কি জানি কি এক ঘোর ঐন্দ্রজালিকের কবলে পড়িয়া সুখাশায় উন্মত্ত; সদা অতৃপ্ত মানব বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে উন্মাদবৎ পরিভ্রমন করিতেছে এবং "নেতি নেতি" করিয়া ক্রমে চরম সুখের পরম পদার্থ লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে। এইজন্যই (অর্থাৎ স্বরূপলাভ প্রত্যাশায়ই) মানব সদা অতৃপ্ত, সুখে ও দুঃখে সমান চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পতিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মধুপূর্ণ পুষ্পে নিবিষ্টমনে মধুপানে রত হয়, তেমনি মানব তাহার সুখস্বরূপ আত্মস্বরূপ লাভ না করা পর্য্যন্ত সংসারে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া বেড়ায় এবং ক্রমে নির্ব্বিষয় সুখস্বরূপকে লাভ করিয়া সুখান্বেষণে ক্ষান্ত হয় এবং বৈষয়িক সুখদুঃখের উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হয়। সুখ ও দুঃখ উভয়েই বন্ধন। সুখের বন্ধন স্বর্ণ শৃঙ্খলে, আর দুঃখের বন্ধন লৌহ শৃঙ্খলে; এই যাহা পার্থক্য। এই দুঃখের অতীত পরম সুখময় বস্তু লাভ বা, মুক্তির জন্য জীবজগৎ উন্মাদ। এই সুখানুসন্ধানই জীবের স্ব-স্বরূপানুসন্ধান। স্বভাবের

চক্ষে সর্ব্বপ্রত্যক্ষ ভাবে সর্ব্ব জীবে এই সুখানুসন্ধানই চির সুখস্বরূপের জন্য আকুল স্বাভাবিক সাধনা। অতএব সুখীই হউক, দুঃখীই হউক, সুখানুসন্ধানে ব্যস্তই থাকুক, বা দুঃখ দূরীকরণে রতই থাকুক, জীবমাত্রেই স্বভাব সাধক। কেহই পতিত বা ঘৃণ্য নহে।

পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচনায় ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, বিষয়-সংঘাতে-সৃষ্ট সুখ বা দুঃখ ক্ষণস্থায়ী ও ইহার অতীত অবস্থায় যে সুখ, তাহা চিরস্থায়ী,—জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব সুখ দুঃখকে সমজ্ঞান করিয়া আপন পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে সদ্‌গুরুর কৃপাবলে সকলেই সুখস্বরূপকে লাভ করিয়া প্রেম-সাগরে ভাসিতে পারিবেন ও সুখদুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

:0:

আগমনী।

(১)

হাস্‌ছে বালক, হাস্‌ছে যুবক,
(আজ) হাস্‌ছে সবাই রঙ্গে।
বরষ পরে মা বুঝি মোর,
(আজ) আস্‌ছে আবার বঙ্গে।
সবার মুখে হাসির ফোয়ারা,
খেলছে প্রাণের প্রেমের ঢেউ।
ভাস্‌ছে সবে প্রেমসাগরে,
আজকে বাকী নাই কো কেউ।

(২)

কামার, কুমার, ছুতোর, গয়লা,
কেউ যে আর নাই কো বসে।
আনন্দেতে মেতে সবে,
আপন কাজে মন দিয়েছে।
দোকানী সব দোকান পাট,
সাজাচ্ছে গো মনের মত।
মন ভুলাতে মনোহারী,
কচ্ছে যতন কত মত।

(৩)

আস্‌বে ছেলে বিদেশ হ'তে,
তাতে মায়ের ভাবনা কত।
(সে যে) পথের পানের চেয়ে আছে,
বৎসহারা গাভীর মত।
হেসে হেসে প্রবাস হ'তে
আস্‌ছে ছেলে মা, মা, বলে,
মা আমার আনন্দময়ী,
নিচ্ছে তারে বুকে তুলে।

(৪)

রাজা, প্রজা, দীন ভিখারী,
সবার দেখি হাসিমুখ।
আনন্দময়ীর আগমনে,
ভুলে গেছে দুঃখশোক।
প্রবাস হতে বরষ পরে,
আস্‌ছে পতি সতীর কাছে।
পথের পানে চেয়ে সতী,
আপন মনে দিন গণিছে।

(৫)

নগর পথে যায় না চলা,
হচ্ছে এত লোকের ভিড়।
আস্‌ছে, যাচ্ছে, ঢেউয়ের মত,
এক তিল তারা রয় না থির।
স্কুল, কলেজের বালক সবে,
কচ্ছে কেবল ছুটাছুটী।
কিন্‌ছে তারা নূতন কাপড়;
নূতন খেলনা, নূতন শাটী।

(৬)

পাড়াগেঁয়ে পূজোর ঘরে,
পড়ে গেছে পূজার রোল।
কচি কচি ছেলে মেয়ে,
কচ্ছে এসে হট্টগোল।
পূজোর বাড়ী হুড়োহুড়ি,
আনন্দে সব মেতে গেছে।
জগন্মাতার আগমনে,
সবার প্রাণ উঠ্‌ছে নেচে।

(৭)

নীল আকাশে খেলছে না আর,
নবনীরদ নানান্‌ ছলে।
মুচ্‌কি হেসে সৌদামিনী,
লুকায় না আর মেঘের কোলে।
পট্‌পটাপট্‌ পড়ে না আর,
শিলাবৃষ্টি ধরার মাঝে।
কড়্‌কড়াকড়্‌ শব্দে দেখি,
অশনি আর নাই গরজে।

(৮)

নীল আকাশে উঠছে ফুটে,
শারদশশী হাসি হাসি।
সরসীতে হাস্‌ছে কুমুদ,
হয়ে তার প্রেমপিপাসী।
টুক্‌রো টুক্‌রো হীরার মত,
জ্বল্‌ছে নভে তারার দল।
তা দেখিয়ে চকোরিণী,
হেসে হেসে ঢল ঢল্‌।

(৯)

কল্‌কলিয়ে কল্লোলিনী
ধাইছে বেগে সাগর পানে।
পাল তুলিয়ে নায়ের মাঝি
বাইছে দাঁড় আপন মনে।
ছুট্‌ছে তরী হাওয়ার আগে,
মানছে না গো কোন বাধা।
আরোহী সব আপন মনে,
গাইছে সবে মায়ের গাথা।

(১০)

হরিদ্বরণ সাড়ী পরে,
সাজিয়ে প্রকৃতি সতী।
বরণ ডালা লয়ে করে,
গাইছে আহ্বান-গীতি।
সেফালিকা, জবা, বেলী,
ফুট্‌ছে যত কমলদল।
মা আমার আস্‌ছে বলে,
সবাই হাস্‌ছে খল্‌খল্‌।

(১১).

হাস্‌ছে নগর, হাস্‌ছে কানন,
হাস্‌ছে সবাই পুলকে।
হাস্‌ছে গিরি কন্দর, বন,
হাস্‌ছে সবাই ত্রিলোকে।

ভূলোক, দ্যুলোক, আকাশ, পাতাল,
ধরছে রাগ নূতন তানে।
কি জানি এক নূতন ভাব,
খেল্‌ছে আজ সবার প্রাণে।
নবীন সাজে সেজেগুজে,
বালক-বালিকাগুলি।
দিচ্ছে সবে করতালি,
"জয় মা," "জয় মা," বলি।

(১২)

আনন্দ ধরে না কার,
আজকে মায়ের আগমনে।
খেলিছে আনন্দ আজ,
সবার নিরানন্দ প্রাণে।
রোগী, শোকী, দীনদুঃখী,
সবার মুখে ফুট্‌ছে হাসি।
মায়ের শুভ আগমনে,
দূরে গেছে দুঃখরাশি।

(১৩)

মাগো!
আস্‌লি যদি বরষ পরে,
যেয়ো না আর ফিরে তুমি।
ঘরে ঘরে বিরাজ মা!
আলো করে বঙ্গভূমি।
হউক প্রতি রমণীতে,
তোমার বিকাশ মাতঃ!
মা-গরবে গরবিনী,
হউক রমণী যত।

(১৪)

ফুটে উঠুক জননীত্ব,
তাহাদের দেহ, হৃদয়, মনে।
(তারা,) করুক আলো বঙ্গভূমি,
বসে মায়ের সিংহাসনে।

মাতৃভাব উঠুক জেগে,
বালক, বৃদ্ধ, যুবার মনে।
কেউ যেন আর চাইতে নারে,
কু-নয়নে মায়ের পানে।
রমণী হেরিয়ে মাগো,
সবাই যেন মা, মা, বলে।
হেসে হেসে নেচে গেয়ে,
ঝাপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে।

(১৫)

সেদিন আর নাই কো মাতঃ!
যেদিন সবে মা, মা, বলে।
পাগলপারা হয়ে গিয়ে,
লুট্‌ত মায়ের চরণতলে।
মা, মা, নাকি বলতে মাগো!
বুড়োর চোখেও বইত ধারা।
শিশুর মত মা, মা, ডেকে,
হইত বুড়ো আত্মহারা।

(১৬)

মোদের কপালদোষে মাগো!
সেদিন এখন চলে গেছে।
মাতৃভাবের স্থলে এখন,
কাম-গঙ্গা ঠাই পেয়েছে।
(এখন,) দেখিলে রমণী মাগো!
মাতৃভাব জাগে না কার।
কু-নয়নে মাকে দেখে,
করে ভাবের ব্যভিচার।

(১৭)

(তাই,) এ শুভ মুহূর্ত্তে মাগো!
এই ভিক্ষা চাই।
সন্তানের হৃদি মাঝে,
করহ তোমাই ঠাই

মায়ের ভাবে উঠুক জেগে,
তোমার সন্তান যত।
কাম-কামনা, পাপ বাসনা,
হউক দূরে অপগত।

(১৮)

পাপভাব দূর করে,
পূর ধরা মাতৃ-ভাবে।
মাতিয়া উঠুক সবে,
আনন্দময়ীর ভাবে।
"জয় মা," "জয় মা," রবে,
গাউক মঙ্গল-গীতি।
ভাই, ভাই গলা ধরে,
করুক আনন্দ-প্রীতি।

(১৯)

দূর হোক দলাদলি,
হিংসা, দ্বেষ যাক দূরে।
মায়ের সন্তান সবে,
বাধা হোক এক সুরে।
ঘরে ঘরে হোক পুনঃ
মাতৃ-নামের জয়ধ্বনি।
অব্যয়, অক্ষয় হোক,
তোর মা এ "আগমনী"।

(২০)

(আজি) এশুভ মুহূর্ত্তে সবে,
জবাপুষ্প বিল্বদলে।
দিতেছে গো পুষ্পাঞ্জলী,
তোর রাঙ্গা পদতলে।
আছে আমার মাগো,
কি দিয়ে পুজিব বল।
ধুয়া'তে চরণ তব,
ছিল তপ্ত অশ্রুজল।

(২১)

কপালের দোষে মাগো,
তাও কি গো আর আছে?
অতি দুঃখে, শোকে তাপে,
তাও যে শুকিয়ে গেছে।
পাপেতে মলিন আমি,
আমার যে কিছু নাই।
নিজগুণে কৃপা করে,
চরণে দিও গো ঠাঁই।

(২২)

কাদাধূলা মাখা বলে,
ফেলিও না ঠেলে।
ধুয়ে পুছে মা আমায়,
তুলিয়া লও গো কোলে।
সে শেষের দিনে যবে,
মুদিব নয়ন-তারা।
(তখন,) পারি যেন উচ্চারিতে,
"জয় মা, জয় মা, তারা"।

(২৩)

(তখন,) মনোময়ী মূরতিতে,
দাঁড়ায়ো তুমি মা শিয়রে।
সন্তানে ভুলিয়ে মাগো,
থেকো না, থেকো না দূরে।
(মাগো) আমার বলিতে ভবে,
কেহ মোর নাহি আর।
জীবনে মরণে তুই,
আনন্দময়ী মা আমার।

দীন—মাতৃহারা।

—:0:—

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হেম—এইবার তোমার মূল প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, জীব নিত্যধামে ভগবানের সহিত ভেদাভেদে বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার এমনই অত্যাশ্চর্য্য শক্তি যে, জীবের জ্ঞান শক্তিকে আবৃত করতঃ নিত্যানন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বর্ত্তমানে ত্রিবিধ দুঃখের অধীন করিয়া রাখিয়াছে; মায়াশক্তি জীবকে আবৃত করিতে পারে, কিন্তু ভগবানকে আবৃত করিতে পারে না। যেমন সূর্য্যের অংশ বহির্গত সূর্য্য-কিরণ সূর্য্য হইতে তেজরূপে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, কারণ ছায়া সূর্য্যকে আবৃত করিতে পারে না, বহির্গত কিরণকে আবৃত করিতে পারে। সূর্য্যের এতাদৃশ শক্তি আছে, যাহাতে ছায়া সূর্য্যের নিকট যাইতে পারে না। কিরণে তাদৃশ শক্তির অভাববশতঃ ছায়া তাহাকে আবৃত করিতে সক্ষম হয়। অগ্নিজ্বালাদিও, অগ্নির স্ফুলিঙ্গসমূহ। রাশিকৃত অগ্নি হইতে তেজ স্বরূপে স্ফুলিঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, কেননা অন্ধকার রাশিকৃত অগ্নিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না; কিন্তু স্ফুলিঙ্গকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। রাশিকৃত অগ্নিতে এমন কোন শক্তি নিহিত আছে, যাহাতে অন্ধকার তাহার নিকট যাইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গে তাদৃশ শক্তির অভাবে, অন্ধকার তাহাকে আবৃত করিতে পারে। এই অংশ ভেদ। তদ্রূপ ভগবানে এতাদৃশ কোন অচিন্ত্য শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে মায়া তাহার সম্মুখীন হইতে ভয় করে। জীব চিদ্রূপ হইয়াও তাদৃশ শক্তির অভাব বশতঃ মায়া কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া পড়ে। এই অংশভেদ স্বাভাবিক অর্থাৎ আগন্তুক নহে। বস্তুতঃ মায়ার এমনই প্রভাব, এমনই অসীম ক্ষমতা যে, জীবকে কিরূপে মুগ্ধ করিয়া সে নিত্যধামের নিত্যানন্দ হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ এতাদৃশ অবস্থায় আনিয়াছে, জীব তাহা আদৌ অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। যেমন স্বচ্ছ কাচের নিকট জবাদি কোন পুষ্প ধরিলে, কাচ তদ্রাগে রঞ্জিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বচ্ছ চিৎস্বরূপ জীব-চৈতন্যের নিকট মায়া যেরূপ ও যেভাবে প্রকটিতা হন, জীবেও সেইরূপ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে। জীব যেন মায়ার ক্রীড়নক-বিশেষ; আমরা ভালমন্দ সবই বুঝি, বিহিত-অবিহিত, জ্ঞান-অজ্ঞানও বুঝি, বুঝিয়াও তবু অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ মায়ার প্রভাব যথা:—

> "তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
> মহামায়া প্রভাবেন সংসার-স্থিতি-কারিণঃ॥
>
> মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

প্রাণিগণ জানিয়া শুনিয়াও যিনি জগতের স্থিতি সম্পাদন করিতেছেন, সেই মহামায়া প্রভাবেই মমতা-আবর্ত্ত পরিপূরিত মোহগর্ত্তে নিপাতিত হয়। জীব যে চিৎস্বরূপ, তাহা জীব ধারণায়ও আনিতে পারে না। কারণ তাহার জ্ঞান শক্তি মায়া কর্ত্তৃক আবৃত থাকা-নিবন্ধন স্বরূপোপলব্ধি করিতে পারে না। গুণময়ী মায়া, গুণের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে কিরূপে মোহিত করে, তদ্বি-

সম্বন্ধে গীতায় উক্ত আছে,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥
ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥
৩ অঃ ৩৭—৪০।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—এই যে রজোগুণ সমুদ্ভব মহাশন (যাহা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না) এবং মহাপাপ স্বরূপ অনুরাগ ও বিদ্বেষ দেখিতেছ, ইহাকেই প্রবল বৈরী বলিয়া জানিবে, ইহারাই লোককে পাপে প্রবৃত্ত করায়। অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত হয়, দর্পণ যেমন মলের দ্বারা আবৃত হয়, গর্ভ যেমন উল্বের (অর্থাৎ উদরস্থ ভ্রূণের গাত্রাবরণ থলিয়া বিশেষ) দ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ কামের দ্বারা ইহা (জ্ঞান) আবৃত আছে। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর নিত্য বৈরিস্বরূপ এই অপর্য্যাপ্ত ও দুষ্পূরণীয় কামই জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ, মন এবং বুদ্ধিই রাগদ্বেষের অধিষ্ঠানভূমি, ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত রাগ এবং দ্বেষ জ্ঞানকে আবরণপূর্ব্বক দেহীকে মোহিত করিয়া ফেলে।

মায়া মোহিনী মূর্ত্তিতে পথ রুদ্ধ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান, জীবের সাধ্য নাই যে স্ব-শক্তিতে মায়াকে জয় করিয়া স্বরূপাবস্থা লাভ করে। কিন্তু জীব যদি ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে ভগবৎ প্রসাদে মায়াকে জয় করিয়া পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভগবদ্ভক্তের নিকট মায়া তাহার ঐন্দ্র-জালিক মায়াজাল বিস্তার করিতে পারে না; বরং লজ্জাবনতমুখী হইয়া অন্যত্র প্রস্থান করে। ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
গীঃ ৭অ, ১৪।

আমার এই সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্যা। যে সকল ব্যক্তি কেবল "আমারই" শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

হরিশ— তোমার এ যুক্তি স্বীকার করিয়া লইতে পারি না, ঐ গীতাতেই আছে—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥
৬ষ্ঠ অঃ। ৫-৬।

"বিবেক-শক্তিবিশিষ্ট হইয়া নিজের দ্বারাই নিজের উদ্ধার করিতে হয়। অবিবেকী হইয়া কখনও নিজকে অধঃপতিত করিবে না। কারণ একমাত্র আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই রিপু (সংসার দুঃখে ডুবাই-বার হেতু)। যিনি আপনার দ্বারা আপনাকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই নিজের বন্ধু, আর যিনি অনাত্মা অর্থাৎ যাঁহার আত্মা বিবেক বলের দ্বারা বশীভূত হয় নাই, সে নিজেই নিজের শত্রুরূপে পরিণত হয়। সুতরাং আত্মস্বরূপ লাভ করিতে হইলে ভগবদুপাসনার

কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখি না। নিজের পুরুষকার দ্বারা নিজকে মায়া মুক্ত করিতে না পারিলে, কে তোমাকে মায়ামুক্ত করিয়া দিবে? যাহারা কাপুরুষ এবং দুর্ব্বলচেতা, তাহারাই ভগবান বা দৈবের উপর নির্ভর করে। কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ, কর্ম্ম করিলে তাহার ফল অবশ্যই পাইব। জীব যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সেইরূপ ফল উপভোগ করিবে। আমি ইচ্ছা করিলে আমার "আমিকে" অজ্ঞান হইতে মুক্ত করিয়া পরম পদ লাভ করিতে পারি; আবার আমিই "আমাকে" অজ্ঞানান্ধকারের গভীরতম প্রদেশে নিক্ষিপ্ত করিতে পারি। যাহার ভাল মন্দ ফলাফল আমার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাদৃশ কর্ম্মের নিয়ামক ভগবানকে বলিয়া তাঁহার উপর আস্থাস্থাপন এবং নির্ভর করিয়া মাতৃস্তন্যপায়ী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত ক্রন্দন করিতে পারি না।

হেম—তোমার বীরত্বসূচক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি! যাহাদিগকে স্বীয় সম্পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া মায়া পিশাচিনী কুলুর বলদের মত ইচ্ছানুরূপ ঘুড়াইতেছে, তাহাদের আবার পুরুষত্বের অভিমান! যাহারা মায়া কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া মরীচিকায় জলভ্রান্ত মৃগের ন্যায় সংসার-মরুভূমে ভ্রমন করিতেছে, তাহাদের আবার স্বাধীনতা! তাহাদের আবার আত্মশক্তির গৌরব! তোমার বলিতে যে লজ্জা বোধ হইল না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়! তোমার কতটুকু শক্তি আছে যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তির বলে অহঙ্কৃত হইয়াছ? তাহা সেই অনন্ত শক্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ, অতি হেয়; তাহাও আবার সেই অনন্ত শক্তিশালী ভগবানের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। সে শক্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা জীবের নাই। জীব সম্পূর্ণ তাঁহার অধীন. ঐ শুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলদ্‌গম্ভীর স্বরে অর্জ্জুনকে কি বলিয়াছিলেন:—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
গীতা ১৮ অঃ ৬১।

"হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদয়দেশে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি মায়া দ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায়, এই সংসার-রাজ্যে পরিভ্রমন করাইতেছেন।"

যে পর্য্যন্ত জীব প্রকৃতি জয় করিয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, যে পর্য্যন্ত জীব গুণের বা স্বভাবের অধীন, সে পর্য্যন্ত জীবের স্বাধীনতা নাই। তার ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া জীবকে তদনুবর্ত্তী কার্য্য করিতেই হইবে, তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান মিথ্যা হইবে। যথা—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষঃ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥
গীতা ১৮ অঃ, ৫৯ ৬০

"তুমি যদি অহঙ্কারবশে কর্ম্ম (যুদ্ধ) না করিতে ইচ্ছা কর, তবে সে অধ্যবসায় তোমার মিথ্যা হইবে; কারণ প্রকৃতি দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তোমাকে কর্ম্ম (যুদ্ধ) করিতেই হইবে। হে কৌন্তেয়! স্বীয় স্বভাবজ ক্রিয়া দ্বারা যে কর্ম্ম-অভিসম্বন্ধ আছে, তাহা করিতে তুমি স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত না হইলেও স্বভাবপরবশ হইয়া করিতে হইবে।"

তুমি গীতা হইতে যে দুইটী শ্লোক শুনাইলে, তাহার অর্থ অহঙ্কারাত্মক আমিত্বের প্রতিষ্ঠা নয়। "আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু; নিজের দ্বারাই নিজকে উদ্ধার করিবে", এ, কথা সত্য। কিন্তু সে নিজকে নিজে উদ্ধার করা আত্ম-শক্তির বলে নয়; ভগবচ্ছক্তির বলে। আমি যদি মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ভগবানের শরণাপন্ন হই এবং ভগবদনুগ্রহ লাভ করনান্তর মায়ার মোহান্ধকার হইতে আপনাকে বিমুক্তকরতঃ আত্মস্বরূপ লাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমিই "আমার বন্ধু"; পক্ষান্তরে যদি ভগবৎ কৃপা বঞ্চিত হইয়া প্রকৃতি স্রোতে ভাসিয়া অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হই, তবে নিজেই নিজের শত্রু। ঈশ্বরের কৃপা-লাভই স্বরূপ বিকাশের উপায়। মায়াই জীবের স্বরূপ স্ফূর্ত্তির অন্তরায়। ঈশ্বর বিমুখ হইলেই মায়া স্বরূপ আবৃত করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে আপনাকে ঈশ্বরাধনায় নিয়োজিত করাই শ্রেয়ঃ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে জনক প্রতি কবি-বাক্য।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহ স্মৃতিঃ।
তন্মায়য়া তো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈ-কয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

তাঁহার (ঈশ্বরের) মায়া হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তির পক্ষে তদীয় মায়া বলেই স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না; তাহা হইতে "দেহই আত্মা" এইরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সেই দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, সুতরাং পণ্ডিত, গুরুকে ঈশ্বর ও আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিয়া ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে সেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ভজনা করিবেন।"

অতএব একমাত্র ভগবদুপাসনা ভিন্ন জীবের স্বরূপ প্রাপ্তির পক্ষে অন্য সুগম পন্থা দৃষ্টি-গোচর হয় না। যাহারা ঈশ্বর নির্দ্দেশ পন্থা পরিত্যাগকরতঃ অহঙ্কারবশে পুরুষকারের দ্বারা আত্ম-স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইয়া থাকে, তাহারা আপনাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে; অধিকন্তু আত্মাভিমানে অন্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ নরকযন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়। শ্রীভগবান জীবের প্রতি করুণা বিকাশে আত্মস্বরূপরূপ অক্ষয় পরমপদ লাভের সহজ ও সরল পথ, "ঈশ্বর শরণা-গতি" রূপ ভক্তিকেই মুখ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

গীতা ১৮ অঃ ৫৫—৫৮।

"ভক্তি দ্বারাই আমি কত প্রকারে অব-স্থিতি করিতেছি এবং কিরূপ পদার্থ তাহা তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া তদনন্তর আমাতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া নিষ্কাম ভাবে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা আমার প্রসা-দাৎ লব্ধজ্ঞান হইয়া শাশ্বত ও অব্যয়পদ লাভ

করিতে পারেন। অতএব তুমিও, (অর্জ্জুন) বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে বিন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধি যোগের আশ্রয় লইয়া সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হইতে পারিলে, আমার প্রসাদাৎ সংসারবীজস্বরূপ দুর্গসকল অতিক্রম করিতে পারিবে। যদি অহঙ্কারবশগ হইয়া, আমার এই উপদেশ গ্রহণ না কর, তবে বিনষ্ট হইবে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥
গীতা ১৮ অঃ ৬২।

হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, তবেই তাঁহার প্রসাদাৎ শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

ফলতঃ তাঁর কৃপা না পাইলে জীবের সাধ্য নাই যে, স্ব-শক্তিতে মায়াকে পরাজিত করিয়া হৃত-সম্পদ লাভ করিতে সক্ষম হয়। অধিক আর কি বলিব, অর্জ্জুনের ন্যায় জ্ঞানী, কর্ম্মী প্রতিভাসম্পন্ন বীর বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের সখা, তিনিও যখন স্ব-শক্তিতে পরম পদলাভে অক্ষম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভিখারী হইয়াছিলেন, তখন অন্য পরের কথা কি? শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ম্ম (যোগ) জ্ঞান, ভক্তি দ্বারা শ্রেয় প্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন স্ব-শক্তিতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি দ্বারা তৎ প্রাপ্তির উপায় দুরূহ দেখিয়া বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন;—তুমি দুঃখ করিও না, তোমার সাধন ভজন কিছুই করিতে হইবে না, কেবল আমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, তাহাহইলে মৎপ্রসাদে সমস্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আত্মস্বরূপ রূপ অক্ষয় পদ লাভ করিতে পারিবে যথা—

মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
গীতা-১৮অঃ ৬৫-৬৬।

"তুমি মন্মনা হও, মদ্ভক্ত এবং মদ্যাজী (ঈশ্বরপূজক) হও, সর্ব্বদা আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তুমি আমার প্রিয়পাত্র। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি, ইহা মিথ্যা হইবে না। তুমি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও, তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, তুমি ভয় করিও না।"

ভাই হরিশ! এই কলিগ্রস্থ জীবের তাঁর কৃপা ব্যতীত আত্মশক্তিতে—আধ্যাত্মিক জগতে এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। কলির জীব এত দুর্ব্বল, এত ক্ষীণশক্তি যে, কঠোর সাধনভজন ত দূরের কথা, বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার উপর আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁর নাম গুণ-গান করার শক্তি পর্য্যন্তও অনেকের নাই। ভাই হরিশ! কত জন্ম, কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, কত জন্ম ধরিয়া এ জন্ম-মৃত্যু-রূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি, কতবার কত চেষ্টা করিয়াছি, তবুও এ সুদুস্তর মায়া-জলধি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছি না। কত জনকে ডাকিয়াছি, কত জনের সাহায্য

চাহিয়াছি, কই কেউ ত আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই, কেউ ত আমার নিকটে আসে নাই! আর ত মায়ার লাঞ্ছনা, মায়ার কশাঘাৎ সহ্য করিতে পারি না, প্রাণ যে যায়, যায় হইয়াছে! তাই অগতির গতি, অকুলের কাণ্ডারী, দীনের ঠাকুর, বিশ্ব-প্রেমিক, জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভয় পদে শরণ লইয়াছি। যাঁহার প্রেম ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডালে, রাজা হইতে ভিখারীতে, জ্ঞানী হইতে মূর্খেতে, বড় হইতে ছোটতে সমভাবে বিতরিত। সমাজের কঠোর শাসনে নিপীড়িত—লাঞ্ছিত—পদদলিত তাড়িত ব্যক্তি যাঁহার প্রেমালিঙ্গনে কৃত-কৃতার্থ, গলিত-পলিত কুষ্ঠরোগী যাঁহার প্রেমালিঙ্গনে পবিত্র ও চরিতার্থ, যিনি সর্ব্ব জীবের ঘরে ঘরে যাচিয়া যাচিয়া প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রেম প্লাবনের উচ্ছ্বাসে ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়াছিল, সেই অহৈতুক কৃপাসিন্ধু, দীনবন্ধুর বিন্দু প্রেমের ভিখারী হইয়া তাঁহারই চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছি। চিদ্রূপাত্মক জীব নির্ম্মুক্ত হইয়াও কি কারণে ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত আত্মস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছ।

দীন—প্রেমানন্দ।

———:0:———

যাথার্থিক ভরসা।

"কৃষ্ণ: সমহ দীনতা—প্রতীপং
জগন্মা শুচে, মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।"

প্রভো!

সকল প্রকারে, অতি দীন আমি, সকলি গিয়েছে মোর।
প্রতিকূল বায়ু ঠেলিয়াছে দূরে, কুয়াশা করেছে জোর।
অতি পুরাতন, জীর্ণ তরী লয়ে, পড়েছি বিষয়-দায়,—
শত ছিদ্রপথে, প্রবেশিছে বারি,—ডুবু-ডুবু হ'ল তায়।
ধু ধু জলরাশ, চারিদিকে মোর, কোন পার নাহি কাছে।
হে দীনবৎসল! তুমি বিনা নাথ, কি মোর ভরসা আছে?
"যার কেহ নাহি, তুমি আছ তার" হয়ে আছে বিশ্বে ঘোষণা,
শত বজ্রাঘাত, শিরে পড়ে যার, তারি প্রতি তব করুণা।
চারি দিকে যার, অমানিশা ঘোর, বহে আঁখি-বারি ঝরণা।
তারি তরে তুমি, ছুটে যাও সদা মুছাতে-হৃদয় বেদনা।
সে ধ্রুব-বারতা, চিরধ্রুব সদা, ব্যর্থ তাহা ত কভু না।
তীরে লও তরী, দাও পদছায়া, ঘুচে যাক্ সব যাতনা।

দীন—নিত্যানন্দ।

আত্মার সন্ধান।

আমি জীব। আমার সরলতায়, বুদ্ধির বিকাশে, মনের স্ফূর্ত্তিতে ও ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যেতে, জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বোধ-শক্তির প্রভাবে আমি বিশ্বের উপলব্ধি করিতেছি। আমি জ্ঞানের নেশায় বিভোর হইয়া, বিশ্বের ধূলির কণায় কণায় মিশিয়া জাগতিক শক্তির ও সত্ত্বার উপর আমার কর্ম্মকুশলতার চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহিতেছি।

আমি জাগ্রত, বিশ্বের কার্য্যে আমি সাক্ষী। বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ চলিয়াছে, সে গতিতে, আমিও আমার আমিত্ব লইয়া চলিয়াছি। যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, সংসার জড়াইয়া ধরিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রেম, ভালবাসা, মায়া-মমতা, স্বাভাবিক গুণগুলি, পুষ্পের সৌন্দর্য্যে, নারীর মুখের টিপি টিপি হাসি-টুকুতে, আকাশের নীলিমায়, পক্ষীর গানে উধাও হইয়া ছুটিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। এই ত আমার সুখের ও কর্ম্মের পরিণতি। কর্ম্মই আমার জীবত্বের ও জীবনের নিদর্শন।

আমি যখন ঘুমাই, চোকের পাতা যখন আস্তে আস্তে বুঁজি, কর্ম্ম আমার সূক্ষ্ম হইয়া আইসে; ইন্দ্রিয়শক্তি নিস্তেজ হইয়া যায়, জ্ঞান ক্রমে লুপ্ত হয়; অবশেষে ঘোর তমসা আসিয়া সকলের নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। এইরূপে সর্ব্ব শক্তি অন্তর্মুখী হইয়া কেন্দ্রে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে, আমি সুখময়, শান্তিপূর্ণ নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ি। কিন্তু এ আবার কি? গভীর তমসার ভিতর আলোকের স্ফুরণ! আবার ভাবনা রাজ্য, কর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত, আমি নিদ্রিত, তবুও কর্ম্মের খেলা, কল্পনা-জগতের মূর্ত্তিমান অভিনয়! আমি কি নিদ্রিত হইয়াও জাগ্রত? না—ইহা আমার স্বপ্ন।

আমি ত স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি নাই, কর্ম্ম ত অনেকক্ষণ হয় ত্যাগ করিয়া শয্যা-গ্রহণ করিয়াছি, তবে এ অভিনয় কাহার? কে আমার অন্তর্ম্মুখী ইচ্ছাকে জাগ্রত রাখিতেছে? চক্ষু মুদ্রিত, অথচ ঘোর অন্ধকারের মাঝে আলোক জ্বালিয়া, কল্পনা রাজ্যের জীবন্ত ছবির অভিনয় দেখাইতেছে। দেখিতেছেই বা কে?

আমি মণিময় হার গলায় পড়িয়াছি, বহুমূল্য রত্নাভরণে ভূষিত হইয়াছি, সকলে আমার দিকে অনিমিষ নয়নে তাকাইয়া থাকে, আমিও গর্ব্বভরে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি এবং সকলই যেন আজ্ঞাবহ। আমি নিদ্রিত হইলাম, আমার গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্য সকল ভুলিয়া গেলাম। ঘরে চোর ঢুকিল, ধীরে ধীরে সকল আভরণ খুলিয়া লইল, আমি কিছুই জানিলাম না, কোন প্রকার বাধাই প্রদান করিতে পারিলাম না। তথাপি আমি জীবিত। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, আমি জাগ্রত হইলাম, ক্রমে বুঝিলাম চোর সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল, চিন্তাস্রোত কল্পনা-রাজ্যের গভীরতম প্রদেশের দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

চোর যখন আমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যায়, আমি কিন্তু তখন, কোন এক অজানাদেশে অজানা ক্ষেত্রে সুখের ফসল ফলাইয়া, আপন

মনে আনন্দে তাহা ভোগ করিতেছিলাম। আমার একই দেহ, একই জীবন; অথচ এক সময়ে দুইটী অভিনেতার অপূর্ব্ব খেলা। একটী চোর, অপরটী সেই অজানা ক্ষেত্রের সুখের ফসলভোক্তা কৃষক!

তবে আমি কে? কাহারই বা ইঙ্গিতে চোরঘটিত ব্যাপারে, আমার স্পর্শশক্তি আমিত্বকে জাগাইয়া দিতে সমর্থ হইল না? অথচ জাগ্রতাবস্থায় যাহার একটী বোতাম পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িলে, কত লোক, তাহা তুলিয়া পড়াইয়া দিতে পারিলে জীবনকে কৃতার্থ মনে করে,—আর নিদ্রিতাবস্থায় চোরে আমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যায়, আমি নির্ব্বাক, কিছুই জানি না।

গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টি গেল। দেখিলাম একটী প্রদীপ; কিন্তু ঘর ভরা আলো, অন্ধকার তাড়াইয়া যেন রাজ্য জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার দেহে হস্তার্পণ করিলাম, তাপ অনুভব হইল। আমি বুঝিলাম, অগ্নিতেও যে তাপ, আমাতেও সেই তাপ বর্ত্তমান। অগ্নি থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ ও তাপ থাকে; আমার দেহে যখন তাপ বর্ত্তমান, তখন নিশ্চয়ই তাপ ও জ্যোতিঃর একটী কেন্দ্র দেহ মধ্যেই বর্ত্তমান আছে।

আমি পরিষ্কার বুঝিলাম, এই দেহই গৃহ, এবং দেহস্থ প্রদীপ হইতে যে রশ্মি নির্গত হইতেছে, তাহাতেই দেহ উত্তপ্ত।* ইন্দ্রিয়গুলি, অনন্ত ক্ষেত্রে আলোক নির্গম হেতু, সে [illegible], তাহা প্রকাশের পথ; কর্ম্ম আমার রশ্মি-বিস্তার গতির কম্পন। মন অনন্ত ক্ষেত্রে, তাহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক বলিবর্দ্দ দুইটী দ্বারা, আমিত্বের জোয়াল কাঁধে লইয়া, জ্ঞানের লাঙ্গল টানিতেছে। বিশ্বের অসীম ক্ষেত্র, এইরূপে কর্ষিত হইলে, কৃষক আমার গুণ (স্বভাব) অনুযায়ী বীজ তাহাতে বপন করিয়া, সময়ে সেই ফল আহরণ করিতেছে।

কি জাগ্রত, কি নিদ্রিত সর্ব্বদাই আমি এই কৃষকের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত। কর্ম্ম সকল তাহার শক্তিরূপী রশ্মির পরিচালনে উৎপন্ন হইয়া, ছায়ারূপে তাহাতেই প্রতিফলিত হইতেছে। জাগ্রতাবস্থায়, এই ছায়ার (সংস্কার) অনুসরণে প্রধাবিত হইয়া, কখনও বা গর্ব্বিত, আবার কখনও লজ্জিত হই। ইন্দ্রিয়ের কপাট রুদ্ধ করিয়া যখন নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ি, তখন আভ্যন্তরিক উদ্ভাসিত রশ্মিগালে প্রতিফলিত ছায়ার পুনরাভিনয় হয়, আমার নিকট আবার নূতন জগত খুলিয়া যায়। যদিও সে দৃশ্য চর্ম্মচক্ষে দেখি না, তথাপি যে পথে রশ্মি নির্গত হইয়া দর্শন-জ্ঞান জন্মায়, সেই পথের রুদ্ধ কপাটে ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে, ছায়া অত্যধিক উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া বোধ জন্মায়। ইহাই স্বপ্নের দৃশ্য বস্তু।

বিশ্বে একমাত্র এই প্রদীপ, অথবা কৃষকের অপূর্ব্ব অভিনয়, যতই মনোযোগের সহিত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম, জ্ঞান ততই পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। আমিও রশ্মিপথ অবলম্বন করিয়া, প্রদীপের নিকট পৌছিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কেমন এক নেশায় হৃদয় আপ্লুত করিয়া, চতুর্দ্দিকের সমস্ত বিষয়

* দৈহিক তাপ সম্বন্ধে আজকাল যে মত প্রচারিত আছে, তাহা স্থূল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

ভেঙ্গে চুরে এই রশ্মির সহিত মিশিতে লাগিল। ক্রমে আমি শব্দাদি পঞ্চ-তন্মাত্রের ক্রিয়া-শক্তির অতীত হইতে লাগিলাম। আমার ইন্দ্রিয়শক্তি নিজ নিজ স্বভাব মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া, তাহাদের অন্তর্ম্মুখী শক্তিতে, জ্যোতির সহিত মিশিয়া গেল।

একি! একটী চিরপ্রবাহিনী স্রোতস্বতী কুলকুল রবে কোন এক দেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া অনন্ত কাল-সাগরে মিশিয়াছে। আমি এই নদীস্রোতের মধ্যে একটী ক্ষণস্থায়ী জলাবর্ত্তন; অবিরাম স্রোতের সঙ্গে অনন্তের দিকে ছুটিয়াছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু সকলই এই স্রোতের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে। যেই একটী জলাবর্ত্তন, আবর্ত্তন শেষ করিয়া, স্বাভাবিক স্রোতের গতিরূপে, সরলভাবে সাগরের দিকে চলিয়াছে, তখনই তাহার স্থূল বৈষয়িক মূর্ত্তির অবসান ঘটিতেছে।

এইরূপ নানা প্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপূর্ব্ব ভাবরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রমে সেই স্রোতস্বতী, গতিসম্পন্ন রশ্মিতে পরিণত হইল, আমি পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে উপস্থিত হইয়া জ্যোতির কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলাম। যতই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার অনুলোম, বিলোম, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা, অন্তঃকরণের ঘাতপ্রতিঘাত, সকলই এক শক্তিতে পরিণত হইয়া, হৃদ্দেশে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার আমিত্ব, জ্ঞান ও স্বভাব এই পথে ধাবিত হইয়া তিনের সমষ্টিতে একটী অবস্থায় উপস্থিত হইলে, বেগবতী চিন্তার স্বভাবাপন্ন রশ্মিজাল, কেন্দ্রীভূত হইয়া একটী মহাসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তখন দেখিতে পাইলাম,—এই কেন্দ্র হইতে দুই দিকে দুইটী সূত্র বহির্গত হইয়া, একটী নাভিমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছে, অপরটী ব্রহ্ম-রন্ধ্র ভেদ করিয়া মহাব্যোমের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই সূত্রটী প্রদীপের সলিতা, মস্তকোপরি মহা তৈলভাণ্ড হইতে যেন ধীরে ধীরে তৈল টানিয়া হৃদয়মধ্যে অন্তঃকরণের ঘাত প্রতিঘাত গতির কেন্দ্রে, প্রদীপের শিখা রূপে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।

এই অগ্নি হইতে যে তাপ সর্ব্বদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা হইতেই দৈহিক তাপের উৎপত্তি; ফলে রক্তের সচলতা, অন্তঃকরণের ঘাতপ্রতিঘাত গতি ও শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। ফুস্‌ফুস্ আমিত্বের বাসস্থান, সে আপন শক্তি প্রভাবে বাসনায়, ষড়রিপু ও অন্যান্য দৈহিক স্বাভাবিক বৃত্তি সকলের শক্তি প্রদান করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে। অন্তঃকরণ স্বভাবের প্রকাশস্থল। তাহার শক্তিতে দেহের সকল শক্তি নিয়মিত থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য পরিচালন করিতেছে। স্বভাব ও আমিত্ব, জ্ঞান ব্যতীত প্রকাশ থাকিতে পারে না এবং এই তিনটীই নিত্যসম্বন্ধে জড়িত; সুতরাং জ্ঞানের বিকাশ ক্ষেত্র মস্তিষ্ক দুই ভাগে (Upper and Lower Brain) দুই অংশকে গ্রহণ করিতেছে।

মস্তিষ্কের বিভাগদ্বয় মধ্যে সেতুর বর্ত্তমান, তাহার সম্মুখ ও পশ্চাৎ কেন্দ্র হইতে, অর্থাৎ গোলাকার পৃথিবীর বিষুবরেখার দুই প্রান্ত-বর্ত্তী উত্তর ও দক্ষিন মেরুর ন্যায়, সম্মুখে মন ও পশ্চাতে ব্রহ্মদ্বার। সম্মুখে মন মস্তিষ্ক-দ্বয় হইতে গতি প্রাপ্ত হইয়া, সংকল্প ও

বিকল্প নামক ক্রিয়ার প্রকাশ দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ ও অন্তঃকরণের ন্যায়, অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী ক্রিয়াদ্বয়ের বিকাশ করে। মনের ক্রিয়াশক্তি, ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় কর্ম্মের দিকে ছুটিয়া চলে।

মনের সংকল্প ও বিকল্প, মস্তিকের ঊর্দ্ধ ও অধঃ, ফুস্‌ফুসে শ্বাস প্রশ্বাস গতিদ্বয়, ও অন্তঃকরণের ঘাতপ্রতিঘাত গতি প্রভৃতিতে দুই প্রকার গতি বর্ত্তমান থাকিয়া, একে অন্যের সহায়তাকরতঃ একটী সমষ্টি গতি একক হইয়া, এক উদ্দেশ্যেই চলিয়াছে। দেহও দুই ভাগে বিভক্ত থাকিয়া, বাম দক্ষিণের, দক্ষিণ বামের কার্য্যের সহায়তা করিতেছে; এবং উভয়ে উভয়েরই গতির সমতা রক্ষা করিতেছে।

পৃথিবীর উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত যে রেখা কল্পনা করা হয়, তাহা বস্তুতঃ যদিও নিরাকার, তথাপি পৃথিবী ইহার শক্তির উপর অবস্থিত থাকিয়া নিয়মিত হইতেছে। সেইরূপ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বৃত্তাকার ছিদ্র-পথ, যাহা ফস্‌ফরাস্‌ মজ্জা, শুক্র ও অন্যান্য নানারূপ উৎকৃষ্ট উপাদান সমূহ দ্বারা পূর্ণ, তাহার কেন্দ্র মধ্যদিয়া একটী নাড়ী মস্তিষ্ক হইতে গুহ্যদেশপর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া, তাহাকে সুষুম্না নামে পরিচিত করা হইয়াছে। বক্ষ-পঞ্জরের হাড়, ও দৈহিক অন্যান্য অংশ মেরু-দণ্ডের দুই দিক হইতে বহির্গত হইয়া, দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। মেরুদণ্ডটী দেহের সর্ব্বাংশের শক্তির খুটীরূপে মস্তিষ্ক হইতে গুহ্যপর্য্যন্ত লম্বমান রহিয়াছে; এবং জীবন ধারণের প্রধান উপাদান ও বিশিষ্ট নাড়ীসকল, মস্তিষ্ক হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে শক্তি সঞ্চার করিতেছে।* বিষুব রেখার উপর, যেমন পৃথিবীর আবর্ত্তন-গতি নির্ভর করে, সেইরূপ সুষুম্না নাড়ীটীর উপরও নির্ভর করিয়া, দৈহিক শক্তি নিয়-মিত হইতেছে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতির কার্য্যগতি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, শক্তির গতিপথ যে বৃত্তাকার, তাহা ধরিতে পারা যায়। কর্ম্মেতে ইন্দ্রিয়পথে শক্তি, কেন্দ্রপ্রতিভিকর্ষিণী শক্তির বেগে, বিষয়েতে গতি বিস্তার করে। কর্ম্মশেষে, সেই বহির্ম্মুখী গতি কেন্দ্রে ফলসহ ফিরিয়া আসিলে, কর্ম্মের নিষ্পত্তি এবং সেই কামনার শান্তি। ইহা হইতেই শক্তির গতিপথ যে বৃত্তাকার, তাহা দেখিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়তঃ জীবের চেতন হইতেই গুণের প্রকাশ, সেই গুণ হইতে তদনুযায়ী ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া তাহা শক্তিতে পরিণত হয়। শক্তির স্বভাবিক গুণ প্রকাশ; কারণ প্রকাশ-স্বভাবাপন্ন গুণই শক্তি। প্রকাশ পাইতে হইলেই, শক্তিকে গতিতে পরিণত হইতে হয়, সেই গতি ইন্দ্রিয় পথে বহির্গত হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে; সুতরাং যতক্ষণ কর্ম্ম, তত-ক্ষণই চেতন হইতে একটী শক্তিপ্রবাহ,

---

*স্ত্রী পুরুষ উভয়ের দেহ মূলতঃ এক; পুরুষের যে অঙ্গ বহির্ম্মুখী, স্ত্রী জাতির সেই অঙ্গের ক্রিয়া অন্ত-র্ম্মুখী। পুরুষ ত্যাগকরে, স্ত্রী তাহা গ্রহণ করে। আবার পুরুষের স্তন প্রভৃতি যাহা অন্তর্ম্মুখী ও অব্যক্ত, স্ত্রীর তাহা বহির্ম্মুখী ও ব্যক্ত। উভয়ে এইরূপ নিত্য-সম্বন্ধে জড়িত বলিয়া উভয়ের সংযোগে আনন্দ এবং তাড়িতের সমতা রক্ষিত হয়।

কর্ম্মের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রত্যেক শক্তিরই দুইপ্রকার স্বভাব বর্ত্তমান আছে, একটী যোগ, অপরটী তাহারই বিয়োগ। যেখানে যোগ ও বিয়োগ নাই, সেখানে শক্তির বিকাশও নাই অর্থাৎ শূন্য কেন্দ্র। যোগ অগ্রগতি, বিয়োগ পশ্চাৎ গতি, উভয়ে নিত্য-সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, গতিপথ বৃত্তাকার; সুতরাং যে শূন্য কেন্দ্র হইতে, যে ভাব লইয়া কর্ম্ম প্রবৃত্তি, বহির্জ্জগতে লীলা খেলা করিয়া, পুনরায় ভাবের ঘনত্ব হইতে উৎপন্ন কর্ম্মফল সহ, সেই শূন্য কেন্দ্রে আসিয়া স্থির হয়; সে ভাবের গতিপথও বৃত্তাকার।

পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—গাছের গোড়ার পরিধি, কাণ্ডের পরিধি, লতার ব্যাস, পশুপক্ষী জীবজন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই যেন বৃত্তের কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করিয়া মূলে বৃত্তের স্বরূপেই বর্ত্তমান আছে।

আকাশের দিকে দেখিলাম গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি, সকলই বৃত্তাকার, এবং তাহাদের গতিপথও বৃত্তাকার। বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করিলে, কোন বিষয়েরই আদি, অন্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রের দিকে চাহিলেই, ইহার প্রকৃত স্বরূপ ও প্রকৃতি ধরা পড়িয়া যায়।

বৃত্তের পরিধিস্থ শক্তি, সম্পূর্ণরূপে তাহার মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রের আশ্রিত বুঝিতে পারিয়া, আমার দেহে, পদ হইতে গতি, হস্ত হইতে বিস্তার স্বভাব; মুখ হইতে তেজের বিকাশ, বাক্য, লিঙ্গ হইতে রসাত্মক সংযোগশক্তি এবং গুহ্য হইতে ভূমিত্যাগশক্তি আকর্ষণ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ গুণগ্রাহী কর্ণশক্তি, রূপগ্রাহী চক্ষু, রসগ্রাহী জিহ্বা, গন্ধগ্রাহী নাসিকা ও স্পর্শগুণগ্রাহী ত্বক হইতে শক্তি সমূহ আকর্ষিত হইয়া, আপন আপন বিষয় ত্যাগকরতঃ কেন্দ্রের দিকে ছুটিল। ফলে মন সংকল্প ও বিকল্পহীন হইয়া আমার সহিত বুদ্ধিতে প্রবেশ করিল। বুদ্ধি, মন অভাবে নিঃক্রিয় হইয়া স্বভাবে আসিয়া পৌছিল। স্বভাবের প্রকাশক জ্ঞান অদৃশ্য হওয়ায়, তিনি ক্রিয়াহীন হইয়া তাহার ব্যক্ততার কারণ অব্যক্ত চেতনে আসিয়া স্থির হইলেন। আমিও রশ্মিপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে, এতক্ষণে বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রের ন্যায় দেহস্থ প্রদীপের নিকট পৌছিয়া আমার কেন্দ্রে অর্থাৎ "আত্মার সন্ধান" পাইলাম।

কস্যচিৎ অনুসন্ধিৎসু।

———:0:———

আত্মোপদেশ।

(৮)

সত্বরতা

তুমি কল্পনা বন্ধ করিতে পারিলেই, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র অপরের বুদ্ধির অগোচর, ব্রহ্মবলপ্রভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে।

প্রকৃত দোষ বিলম্ব-জড়ত্ব।

চৈতন্য যতক্ষণ প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, ততক্ষণই বলক্ষয়। যেমন একটি বালককে উচ্চভূমি হইতে নিম্নে

প্রেরণ করিতে হইলে, একটি মাত্র লাথি মারার সম্বন্ধ ব্যতীত আর-কোন সম্বন্ধ নাই। চৈতন্য ও ক্রিয়াশক্তির সহিত তদ্রূপ সম্বন্ধ। ব্রহ্ম চৈতন্যে, যদি বিচার রূপ অধর্ম্ম উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা রূপ, জড়ত্ব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর ব্রহ্মের সিদ্ধ ও স্বাধীন অবস্থা কোথায় রহিল!

কর্ম্ম নিষ্পত্তির কাল।

ইচ্ছা উদিত হইবামাত্র, বিনা চিন্তায় যন্ত্রের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া যেন কল্পনা করিবার অবসর উদিত না হয়। ইহা করিলে ক্রমশঃ ক্রিয়াশক্তি আদ্যবীজভাব ধারণ-করিবার চেষ্টা করিবে। কারণ প্রকৃতিকে পুরুষেরই অনুগমন করিতে হয়।

জগৎ।

এই যে জগৎরূপিনী, ত্রিগুণময়ী মহাদেবী, যাহার সর্ব্বাঙ্গে সদাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তালে নৃত্য চলিতেছে, এই সৌভাগ্যশালিনী ভগবতীটি, সেই পরম পুরুষের স্ত্রী।

কর্ম্ম বা ত্রিগুণ ক্রিয়া।

অব্যক্ত কারণে লীন, সাত্ত্বিক, রাজসিক, অথবা তামসিক কর্ম্ম বা গুণ ক্রিয়া, শব্দ বা রূপকে আশ্রয় করিয়া, যখন মনে দেখা যায়, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, এখনও কর্ম্ম শেষ হয় নাই; প্রকৃতি ও পুরুষের বিয়োগ হয় নাই।

সংসারে তোমার কি কর্ত্তব্য?

নির্জীবকে জীবন দান, ভীতকে অভয়-দান, দুর্ব্বলে ব্রহ্মবল প্রয়োগ, আর্ত্তের আর্ত্তিহরণ, বিমুখকে সম্মুখে স্থাপন।

কারণ-সূত্র।

ব্রহ্ম-যন্ত্র, কারণসূত্রের সংযোগ হইলে কার্য্যমূর্ত্তি দেখা যায়।

আয়তনটা কি?

আয়তনটা কিছুই নহে, উহা পশ্চাতে প্রকাশিত দেহ। আয়তনের ধ্যান ক্ষরিত অবস্থা। যাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতাবশতঃ, চিন্মাত্রতা ও শক্তিমাত্রতার সংযোগ তাহার বল ও আঘাত শক্তি, অচিন্ত্য। মনুষ্যেরা চিন্তা করিয়া যে শক্তিকে আনয়ন করে, সে শক্তি চিন্তার দ্বারা নিয়মিত বা সসীমীকৃত।

তাড়িতাগ্নির কণামাত্র যাহা করিতে পারে, স্তূপাকার সাধারণ বহ্নির সে ক্ষমতা নাই। শক্তির তীব্রতা পরিমাণে বেগ ও রূপ অদৃশ্য হইয়া যায়।

পূর্ণত্ব।

পূর্ণত্ব (অর্থাৎ যখন মন হইতে আপনার অস্তিত্ব ভিন্ন সর্ব্ববিধ অপর বস্তুর বা চিন্তার লয় হয়, সেই লগ্ন বা যোগটিকে, পূর্ণত্ব যোগ কহে;) এই যে নিঃসঙ্গ, পূর্ণাত্মতা, ইহা ব্রহ্মের সিদ্ধাবস্থা। আমাদের সদাই চিন্তা-সঙ্গ। এই চিন্তাসঙ্গরূপ অধর্ম্মবশতঃ আমাদের ক্রিয়াশক্তির অভ্যন্তর ফোঁপরা এবং অসার চিন্তারূপ বায়ু পূর্ণ।

উপস্থিতি বা বাস।

যে যার আপনার বাড়ীতে থাকাই ভাল। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য যদি জড়ের ঘরে বাসা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জড়তা ধর্ম্ম আক্রমন করে। সুতরাং তুমি যখন অগ্র-পশ্চাৎশূন্য অনাদি-নিধন, তখন কর্ম্ম করিয়াই

অগ্রপশ্চাৎ ত্যাগ করিবে, এবং অসঙ্গ, অনির্দ্দেশ্য কৈবল্যে পলায়ন করিবে। যদি ইহা না কর, তাহা হইলে নিজ ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিবে না এবং আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ আত্ম ও অনাত্ম উভয় বিজ্ঞানই হাতড়াইতে হইবে।

ব্রহ্মবল প্রয়োগের বিঘ্নাদি।

ব্রহ্মবল যে অব্যর্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবল কখন নিষ্ফল হইবার নহে। তবে আমরা যে সর্ব্বকার্য্যে ব্রহ্মবল প্রয়োগ করিতে পারি না, তাহার একটা কারণ আছে; সংসারই তাহার কারণ। সংসারই আমাদের হাত-পা বাঁধিয়া আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র ধরিতে দেয় না। যে চিন্ময়, বিশ্বব্যাপী, অনাদি-নিধন, অনাবদ্ধ, তাহাকে দেশ, কাল, পাত্র রূপ জড় সম্বন্ধে সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া, সধর্ম্ম নিরোধ করিয়া বিধর্ম্ম বহন করিতে হয়, তাহার কারণ সংসারে আসক্তি। যাহাই হউক সময় সময় খুব ঝকমারি বলিয়া বোধ হয়।

কর্ম্মের মূর্ত্তি ধারণা।

কর্ম্মের মূর্ত্তি মনে বা বুদ্ধিতে ধারণ করিতে যাইও না, তাহ'লে ধা করে জড় হয়ে পড়বে।

জল ও অগ্নির সঙ্গ।

জল ও অগ্নির সন্নিকর্ষরূপ সঙ্গ হইলে যেমন জলের শীতলতাগুণ অন্তর্হিত হইয়া উষ্ণতা গুণ উহাতে আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ জড়ের সহিত চৈতন্যের সঙ্গ (আসক্তিবন্ধন) হইলে, জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া চৈতন্যের আত্মবিজ্ঞানপ্রভাব তিরোহিত হয়।

নিঃসঙ্গ।

নিঃসঙ্গের অর্থ— যে দেখে যে আমার কিছুই নাই। আমি মহাশূন্যে একাকী বিরাজিত। আমার হুঙ্কারে এই মহাশূন্যে একটা চেতনার প্রতিধ্বনি ক্ষণকালের জন্য উত্থিত ও পরিদৃশ্যমান হয়। আবার আমার তেজ আমাতেই ফিরিয়া আসে। শূন্যে শূন্যই থাকে।

হায় আমার কপাল।

আপনি শব্দ করিয়া, সেই শব্দ অনুসরণ করতঃ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করিয়া পথে পথে ঘুরিতেছি।

"আমার এ খেলার মালা, শব্দে গাঁথা ভাবের হার।
যে মালা পর্‌তে জানে, তারেই দিলাম উপহার।
যে হবে খেলার খেলী, সাড়ায়, নড়বে টনক তার।
ও সে আসবে ধেয়ে, উধাও হয়ে, বাড়িয়ে গলা পরবে হার।"

প্রকৃতির দেহ।

এই যে তিনটি অবস্থা, যথা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, ইহাদের মধ্যে সুষুপ্তিটি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কারণ দেহ, স্বপ্নটি সেই প্রকৃতির সূক্ষ্ম দেহ এবং জাগ্রতটি সেই প্রকৃতির স্থূল দেহ। অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ যখন বৈষম্য ত্যাগ করিয়া "এক অভেদ, অস্তিত্ববৎ ভাব গ্রহণ করে" সেই অবস্থাটাকে গুণদের কারণ-শরীর বলে। কারণ-শরীরে গুণদের ক্রিয়া হয় না অর্থাৎ সে শরীরে অঙ্গবৈচিত্র, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ প্রসব নাই।

এই যে গুণদের নিরীহ অবস্থা, ইহা বেশীক্ষণ থাকে না; এই অবস্থাটাকে কেহ কেহ গুণদের বিশ্রাম-ঘটিও বলেন—এ অবস্থাটা আত্মার যে এক রকম চিন্ময় অবস্থা, তাহা নহে, বা তাহার সমতুল্যও নহে—তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণের বর্ণটি স্বচ্ছ; এই বর্ণে অস্তিত্বের অনুভবস্বরূপ যে আত্মার একটা আভাস, তাহা উদয় হয়; ক্রমেই কিন্তু ইহাতে একটি রক্তিমাভাস স্ফুট হয়, ইহা রজোগুণ বা কর্ম্মেচ্ছা এবং পরে আবার কৃষ্ণবর্ণও দেখা দেয়, প্রকৃতি খুব গরম হইবার পর এই বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

তুরীয়ই কিন্তু গুণদের উদয়াস্তের সাক্ষী।

তিনি ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে চেয়ে বসে আছেন, নিষ্কর্ম্মা তিনি দেখছেন যে,—রোহিত, কাতলা, মারা গেল, শাল, শোল, চুনোপুটি একের পর এক এসে রকমারি টিপ মারছে, আর তার ছায়া দেখে লম্বা দিচ্ছে।

ইচ্ছা।

ইচ্ছা অনাদি, অনন্ত প্রসবধর্ম্মিনী,—যে ইচ্ছাটা আগে ঠেলে আসে, বা প্রসব হয়, আমরা সেইটাকে দেখতে পাই। বাকীগুলা অনন্ত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কারণগর্ভে লীন হয়।

নিটোল-নিরেট।

আত্মার ক্ষয় মোটেই হয় না। যদি বল সে যখন আত্মার ভিতর থেকে, তাহার ত্রিগুণাত্মক ইচ্ছাশক্তি বা তেজ ক্ষরিত বা আবির্ভূত হয়, তখন কি করে বলি যে, আত্মার কিছুই ক্ষয়ে যায় না। আত্মার ভিতর থেকে তাঁহার ত্রিগুণাত্মক তেজ, ছড়করে বেরিয়ে, ধাঁধা করে, কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল, কত অনন্ত দেহ ধারণ করিয়া ফেলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য,—কিন্তু আত্মার কি ব্যয় হইল, ইহা দেখিতে গেলে, আত্মার কি ছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখা উচিত। পূর্ব্বে আত্মার নিরাকার, নির্ব্বিকার অস্তিত্ববৎ একটি অনুভব স্পষ্ট ছিল। এখন যেন সে অনুভবটির উপর আর কতকগুলা কি অনুভব চেপে ধরে, একটু পূর্ব্ব ভাবের বিস্মৃতি হইয়াছে। এই বিস্মৃতি বা আত্মস্মৃতি ক্ষয়টি ক্ষণিক। যেমন মনে চিন্তা উদয় হইলে মন ক্ষয়ে যায় না, তদ্রূপ আত্মার ইচ্ছা শক্তি উদয় হইলে আত্মা ক্ষয়ে যান না। সুচিন্তা বা দুশ্চিন্তা উদয়ে মনে ক্ষণকালের জন্য আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি হইলেও, চিন্তার অবসানে মন দেখে, যে আমি আগেও যা ছিলাম, এখনও তাই আছি। চিন্তার দরুণ ত আমার স্বরূপ হারাই নাই। জাগ্রৎ অবস্থা যেমন ক্ষণিক, স্বপ্নাবস্থা যেমন ক্ষণিক, সুষুপ্তি অবস্থা যেমনি ক্ষণিক, আত্মায় জগদ্ভাবের উৎপত্তি, স্থিতি, ও প্রলয় তদ্রূপ ক্ষণিক। তুমি চিন্তিত হইও না, আত্মা অক্ষয়—চির যৌবন বা হরদম্ তাজা।

মর্ম্মে মর্ম্মে সাক্ষাৎ—অব্যর্থ যোগ।

যেখানে যে মর্ম্ম (অভাব যোগ) সেখানে তাহার ঔষধ মর্ম্ম স্বরূপ (পূরক যোগ) ঝেড়ে দিবে—মর্ম্মে মর্ম্মাঘাতের ফল অমোঘ। মর্ম্ম দেহকে লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে হয়।

বাঁচাতে পারে কে?

বাঁচাতে এক পারে ধন্বন্তরী; রোগ মর্ম্মে ও ঔষধ মর্ম্মে ছেড়ে। আর পারেন ব্রহ্মা, যাহার

ইচ্ছায় প্রাণসঞ্চার হয়। বাচবার মূলে তাঁর ইচ্ছা, আপনি অল্প কারণ-সূত্র স্পর্শ করিলেই ফল পাওয়া যায়। অথবা তাঁর ইচ্ছা হইলেই বাঁচে, কারণ তিনিই ভবিতব্যের মূল সাক্ষী।

তুমি সর্ব্বদা জড়ধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত থাক বলিয়া ব্রহ্মযোগের ফলাফল লক্ষ্য করিতে পার না।

ব্রহ্মা থাকেন স্বধর্ম্মে, ধন্বন্তরী থাকেন পরধর্ম্মে বা কার্য্যে, তিনি মৃত্যুযোগে হুস করে, সঞ্জীবনীযোগ—এনে ফেলতে পারেন। ব্রহ্মা ও ধন্বন্তরী পরস্পরের বিরোধী নহেন। যেখানে রোগী মরবে, সেখানে ধন্বন্তরী আসেন না, মর্ম্ম সাক্ষাৎ হয় না। সাধনে দোষ থাকিলে দুজনের মধ্যে কারও দেখা পাওয়া যায় না। রোগীর শয্যার কাছে, হয় বিষ্ণুদূতেরা রক্ষা করিবার জন্য, না হয় যমদূতেরা নষ্ট করিবার জন্য ঘেরিয়া থাকে। তাহারা ভবিতব্য প্রেরিত; যে পক্ষের বল বেশী, সে পক্ষকে দেখিয়া বিপক্ষ দল বিমনা হইয়া ফিরিয়া যায়।

ভৃগুর চরিত্র।

একদা মহাপ্রলয়ে রাত পোহাবার সময়, পুরুষোত্তমের যোগনিদ্রা ভেঙ্গেছে এবং তখনই জগদম্বাকে মনে পড়েছে, পড়তেই তিনি চোক চেয়ে তাঁকে ঈক্ষণ করতে লাগলেন; আর জগদম্বা পুরুষকে সেবা দিতে লাগিলেন বা পুরুষার্থ সাধন করিতে লাগিলেন,—এমন সময়ে এত ভোরে একজন লাল টক্ টক্ কর্‌ছে মূর্ত্তি, নক্ষত্রবেগে কোথা থেকে যে এসে পড়ল, বলা যায় না। এসেই পুরুষোত্তমের বুকে একটি বিরাশী শিক্কের লাথি ঝাড়লে, তা এমন ধারা কেউ দেখেও নি, দেখিবেও না। সে লাথির দাগ নিত্য হয়ে গেল। ভারি জোরে মেরেছিল। যাহা হোক, ঠাকুর একটু মাথাটা নীচু করে, দাগটা দেখিলেন। জগদম্বা থতমত খেয়ে গেলেন। ভৃগু সেই রকম বেগে আবার কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, বুঝা গেল না। যাহা হউক, তিনি চিত্রগুপ্তের খাতায় নিজের হাতে, এই নোটটি করিয়া যান।

তিনি দেখলেন যে, জগৎ জন্মালেই তাঁহাকে জগতের একখানা ঠিকুজি তৈয়ার কত্তে হয়। কারণ জগতের বরাতে এত ঘটনা থাকে যে, বলে ফুরায় না। কিন্তু তিনি জগতের জন্মলগ্ন খুঁজে পান না। তাই ঠিকুজির ফলাফলে প্রায় ভুল হয় না; আর তার বদনাম হয়। তিনি কিন্তু মহাপ্রলয়ের সময়ে ঠাকুরের যোগনিদ্রাটি যেই এসেছে, আর অমনি তাঁর পীঠে পীঠে ঠেকিয়ে জমিয়ে গেলেন। বাহিরে চতুর্দ্দিকে সব লয় হয়ে গেল। জগদম্বার দাঁতে দাঁত লেগে গেল ও তিনি জড় হয়ে গেলেন। তারপর যেই ভোর হয়ে এলো, ভৃগু বুঝলেন, এইবার ঠাকুরের যোগনিদ্রা ভাঙ্গবার সময় হল। ঠাকুরের দস্তর, নিদ্রাভঙ্গের পরই প্রকৃতির অঙ্গ স্পর্শ করা। ভৃগু খুব আস্তে একটু দূরে গিয়া দাড়াইলেন; তারপর ঠাকুর চোক খুলে যেমন জগদম্বার গায়ে হাত দেওয়া, অমনি তিনি গিয়ে ঠাকুরের বুকে লগ্ন ঠুকে দিলেন। ভৃগু জানিতেন যে, পুরুষোত্তমের শরীর নিত্য। ঐ শরীরে যাহা ঠুকা, তাহা মহাপ্রলয়েও নষ্ট হয় না। এইরকম দুঃসাহসিক কাজ করে লগ্নটা বরাবরের জন্য ঠিক হয়ে গেল। জ্যোতিষের পেসা ভারি ঝকমারির কারণ।

একমাত্র পুরাণ পুরুষ ব্রহ্মই সত্য। তিনি [illegible] না, [illegible] না; সুতরাং তাহার [illegible] নাই। জগন্মাতা, মহামায়া [illegible] এবং অনাদিও নহেন। [illegible] অনির্ব্বচনীয়; সুতরাং ঠিকুজীর দরকার নাই। এখন মহামায়া সত্য সত্যই আছেন, কি না আছেন, এটা যখন ব্রহ্ম দেখিতে যান, তখনই উল্টো উৎপত্তি বা বিপরীত জ্ঞান উদয় হয়। সেই উল্টা উৎপত্তির নামই জগৎ। এখন এই জগৎ আর জগদ্ব্যাপার যে কতদূর সত্য, তাহা বুঝে দেখ, বাপ আছে, মা আছে কি তার ঠিক নাই। তাদের ছেলেপিলে হল। কাল-গ্রহ, নক্ষত্রাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পাহাড়, পর্ব্বত, দিক, অষ্টবসু, ভূত, প্রেত, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি। এই এত নব মিথ্যাজ্ঞানকে সত্য করে ফেলিয়ে মনুষ্যের বিশ্বাস করিয়ে দিতে হবে; তাহা না হলে জ্যোতিষ মহাশয়ের পসার থাকবে না। কাজেই গায়ের জ্বালাই বল, আর মিথ্যা উৎপত্তির লগ্ন ঠুকবার জন্যই বল, ভৃগুকে এই কাজটি করতে হয়েছিল, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যাহা কর, তাহাতে পাপ হয় না। বহির্ম্মুখ হওয়া ভারি ঝক্‌মারি। একটু যোগনিদ্রা ভেঙ্গেছে কি অমনি নিত্য ধর্ম্মে অনিত্য ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া বিস্মৃতি ও বিকার-বৃদ্ধি চলিল। বিস্মৃতিটী অমনি সঙ্গের সাথী হয়ে, অষ্ট প্রহরের জন্য যেন পেয়ে বসল।

শব্দের ধারা।

শব্দের সব শ্রেণী আছে। আর মাঝে মাঝে ঐ শব্দেরই পুরু আল দেওয়া আছে। শব্দ যত মিহি হয়ে আসে, ধারণাকেও তত সূক্ষ্ম হতে হয়, নহিলে কি করে ধারণা হইবে? এই কত্তে কত্তে মিথ্যাজ্ঞানটা সূক্ষ্ম হইতে অবশেষে সচ্চিদানন্দে গিয়া আর মোটেই থাকে না; তখন কোথায় বা শব্দ, আর কোথায় বা স্পর্শ, আর কোথায় বা রূপ রস; আর কোথায় বা গন্ধ!

চৈতন্য লীলা।

যেখানে অন্ধকার, সেইখানে চৈতন্য চোকে এসে, অন্ধকার দেখে ভয় কল্পনা করেন। মাথার দিব্যি দিলেও তখন চোক বুজিবেন না।

এইরূপ একটা শব্দ উঠলেই কাণে গিয়ে বসেন ও নানাবিধ অর্থ কল্পনা করিতে থাকেন ও নিজের কল্পনায় নিজেই বিচলিত হন।

হাজার বল যে, তোমার এবার ভূতের সঙ্গে মিশে মনোকষ্ট পাবার কি দরকার? তা কিছুতেই শুনবেন না। ১২টা ভূত—যথা পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি।

স্থূলভূত ও সূক্ষ্মভূত।

প্রকৃতি ও পুরুষকে আশ্রয় করিয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাদি নির্ম্মাণ করিয়া ফেলেন। এই গুলির স্তর একটিকে বেষ্টন করিয়া অপরটি, এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডটী নির্ম্মিত হয়, কেন্দ্রস্থলে থাকেন ব্রহ্ম বা পুরুষ। তত্ত্বগুলি [illegible] শ্রেণীর অণু বা তেজসমষ্টি। ইহারা মহাপ্রলয়ের অবসানে সৃষ্ট হয় এবং অন্তে লয় হয়। জীবাত্মা বা অজ্ঞান যথাক্রমে আসক্তিবশতঃ এই স্তর-গুলিকে গ্রহণ বা ত্যাগ করেন।

পুরুষ ও প্রকৃতির অর্থাৎ জড় ও চেতনের সংযোগে-সূত্রের স্বরূপ।

চৈতন্যের বা পুরুষের যে বোধরূপ বা অস্তিত্বভাব তাহার পরিবর্ত্তন নাই। উহা

নিত্য শরীর ; এবং এই শরীরের অধর্ম্ম আপনাকে, নিরাকার, নির্ব্বিকার, অজর, অক্ষর, অমর, নির্লিপ্ত বা কেবল বোধ করা।

প্রকৃতির রূপ ত্রিবিধ—যথা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ বা বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ।

প্রকৃতি বা জড়ের যাহা কারণ-শরীর বা সংস্কার মাত্রতা (যাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম অবস্থা) সেই শরীরের সহিত চেতনের সম্বন্ধ হয়। সেই সম্বন্ধটির নাম ধারণা-সূত্র। দুইটি বিপরীত ধর্ম্মের বস্তুর সন্নিকর্ষবশতঃ "ধারণা সূত্র" নামক এই যে একটি নূতন ভাব বা অস্তিত্ব উৎপন্ন হয়, এইটি অতি সূক্ষ্ম হইলেও অত্যন্ত বলবান রজ্জু। জড় ধর্ম্মে চেতনাভাস এবং চিদ্ধর্ম্মে জড়াভাস, এই ধারণা-সূত্রই বান্ধিয়া রাখে। এই ধারণা-সূত্রটি বহুকাল নষ্ট হয় না। পরন্তু ইহার শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের ন্যায় দুইটি পক্ষ আছে। সেই পক্ষ দুইটির নাম স্মৃতি ও বিস্মৃতি। ধারণায় যখন চিদ্ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, তখন তাহাকে বলে স্মৃতি; আর যখন জড় ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, তাহাকে বলে বিস্মৃতি।

"ধারণা সূত্র" এত সূক্ষ্ম যে, ইচ্ছাকে উহার উপরের খোল মনে করিতে পার। চিৎ-ধর্ম্ম ও জড়ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করাতেই স্মৃতি ও বিস্মৃতির সঞ্চার হয়। স্মৃতি ও বিস্মৃতি সত্ত্ব ও তমোগুণের কার্য্য।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—:0:—

অশ্রুজল।

(১)

প্রাণের দেবতা তুমি হৃদয়ের ধন।
কি আর বলিব আমি, তুমি ত হৃদয়স্বামী,
সঁপেছি তোমায় দেব! জীবন, যৌবন।
সরে থাক দূরে দূরে, হেরিব নয়ন ভরে,
আর না চাহিব দেব! জীবনে মিলন,
অনিত্য দেহের সুখে কিবা প্রয়োজন॥

(২)

প্রাণের দেবতা তুমি হৃদয়ের ধন।
তুমি ত আছ গো সুখে, শুনিলে লোকের মুখে,
আমার হইবে তাহে সুখ কোটি গুণ।
অঙ্গসঙ্গে কিবা লাভ, তাহে শুধু বাড়ে তাপ,
নিত্য নব অশান্তির করে গো সৃজন।
তাই নাহি যাচি দেব! দেহের মিলন॥

(৩)

প্রাণের দেবতা তুমি হৃদয়ের ধন।
কাছে কিম্বা থাক দূর, তাহে ক্ষতি নাহি মোর,
অঙ্গের পরশে মোর নাহি প্রয়োজন।
পরাণে পরাণ ঢালি, চরণে দিব গো ডালি,
আছে মাত্র অভাগীর এই আকিঞ্চন।
ক্ষণিক সুখেতে মুগ্ধ হ'ব না কখন॥

(৪)

প্রাণের দেবতা তুমি হৃদয়ের ধন।
প্রাণে প্রাণ না মিশালে, নাহি সুখ কোন কালে,
জ্বলে তাহে অশান্তির অনল ভীষণ।
নলিনী-দীনেশে হের, যদি ও গো আছে দূর,
তবুও তাদের প্রেম ভবে অতুলন।
কদাপি না চায় তারা অঙ্গের মিলন॥

(৫)

প্রাণের দেবতা তুমি হৃদয়ের ধন।
আমার সুখের আশে, না যাব তোমার পাশে,
দূরে থেকে তব কাজ করিব সাধন।
তোমার প্রতিমা গড়ে, স্থাপিয়ে মানসপুরে,
নিশিদিন তব নাম করিব স্মরণ।
"অশ্রুজলে" নিত্য তব ধুয়াব চরণ॥

দীনা—ভিখারিণী।

—:0:—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

অমিয়া।—শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ বসু প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। পুস্তকখানি উপন্যাস হইলেও, ইহাতে ধর্ম্মকথারই বাহুল্য। এই পুস্তকে কর্ম্ম, তপঃ, জ্ঞান, যোগ জপ, ভক্তিতত্ত্ব, কি উপায়ে মনঃস্থির করিয়া ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়, জন্মান্তরবাদ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পরজন্মে পূর্ব্ব দেহজাত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষবিষয়ে কিরূপ যত্নশীল হইয়া থাকেন, গ্রন্থকার এই সকল তত্ত্ব সরলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একমাত্র পতি-সেবা দ্বারাই স্ত্রীজাতি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অমিয়ার উদাহরণ দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। উপ-ন্যাসের ভাষায় ধর্ম্মের জটীল ও গূঢ় তত্ত্বের সরল মিমাংসা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য; সুতরাং তাঁহার চেষ্টা অভিনব বটে। শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি এ গ্রন্থ পড়িলে ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিয়া শাস্ত্র-বিশ্বাসী হইয়া পড়িবেন। তবে অবিশ্বাসীর কথা স্বতন্ত্র; তাহাদের পুস্তক-খানি আগাগোড়া ধোঁয়া ধোঁয়া লাগিবেক।

মুকুল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ||০ আনা, কাপড়ে বাঁধা ||৵০ আনা মাত্র। মুকুল কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। ইহার কয়েকটী কবিতা ইতিপূর্ব্বে "নব্যভারত," "বিজয়া" ও "সুরমা" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাগুলিতে বিশেষ কবিত্বের পরিচয় না থাকিলেও স্বভাবসৌন্দর্য্য ও ভাবুকতার সুন্দর সমাবেশ রহিয়াছে। নবীন কবির নিকট আমরা মুকুলের পর ক্রমশঃ ফুল-ফলের সৌন্দর্য্য, সৌরভ ও মাধুর্য্যের প্রত্যাশা করি।

মোহ-মুদ্গর। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। মূল্য /০ আনা মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত মোহ-মুদ্গরের মূল ও অনুবাদ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সরল ও প্রাঞ্জল-পদ্যানুবাদ। কাগজ ও ছাপাও সুন্দর।

প্রেম ও ভক্তিসাধনা। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী প্রণীত। জেলা হুগলী-এলাটী শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধান ১||০ দেড় টাকা মাত্র। এই গ্রন্থ খানি প্রেম-ভক্তিপিপাসু সাধকজনের সহায়তাকল্পে লিখিত হইয়াছে; সাধনভক্তিই রাগানুগা ভক্তির সোপান, সেইজন্য গ্রন্থকার ইহাতে রাগানুগা ভক্তির আভাস মাত্র দিয়া, বৈধীভক্তি-সাধক-গণের যে সকল বিষয় শিক্ষা ও অনুশীলন করা আবশ্যক, কেবল সেইসকল বিষয়েরই বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে সাধনার আবশ্যকতা, প্রেমতত্ত্ব, সম্বন্ধবিচার, প্রেমের বিষয়, জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, সাধন-ভক্তিবিচার, সাধনাঙ্গবিচার, অনর্থ-নিবৃত্তি, ভজনক্রিয়া প্রভৃতি পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক হিসাবে গ্রন্থখানির উপাদেয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য।

হরিদ্বারে কুম্ভযোগ ও সাধুমহাসম্মিলনী. আসাম—সারস্বত মঠ হইতে শ্রীমৎ স্বামী যোগা-নন্দ প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ||০ আনা মাত্র; মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

বিগত ১৩২১ সালের চৈত্রমাসে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাঁহারই বিশদ বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে স্নানমাহাত্ম্য, অমৃত কুম্ভযোগ অর্থাৎ ভারতের চারিটী কুম্ভযোগের কাল ও স্থান নিরূপণ এবং সাধু-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও ইতিহাস, জমায়েত, মেলাস্থানের পরিচয়, ব্রহ্মকুণ্ডঘাট, মঠ, আশ্রম, আখড়া প্রভৃতির বিবরণ, শ্রীমন্মুনিমণ্ডলমহাবিদ্যালয়, বৈরাগী লস্কর, বিশিষ্ট-মহাত্মাগণ, শোভাযাত্রা, অস্থায়ী ফটক, কুম্ভযোগে প্রথম স্নান ও জনতা, কয়েকটী অদ্ভুত সাধু, সেবা-সমিতি, নৃপতিবর্গ, ধর্ম্মশালা, মিউনিসিপ্যালিটীর বন্দোবস্ত, সরকারী ইস্তাহার, কুম্ভযোগে শেষ স্নান, সংক্রামক ব্যাধি, যাত্রীবিদায় ও উপসংহার। এই বিষয়গুলির বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—এতদ্ব্যতীত সত্যযুগী মণ্ডলী, গুরুকুল-বিশ্ববিদ্যালয়, ঋষিকুল মহাবিদ্যালয়, সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসভা, প্রারম্ভিক সাধু-ধর্ম্ম মহাসভা প্রভৃতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী। আশাকরি, উদীয়মান বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পুস্তকখানি প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। আমরা নিম্নে পুস্তকখানির ভূমিকাটী উদ্ধৃত করিয়া ইহার গুরুত্ব, মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিলাম। বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব।

ওঁ নমঃ শ্রীনাথায়।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের স্নেহাশীর্ব্বাদে আমরা "হরিদ্বারে কুম্ভযোগ ও সাধুমহাসম্মিলনী" এতদিনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছি। কুম্ভমেলা বিষয়টা কি, ইহা শাস্ত্রীয় কিম্বা অশাস্ত্রীয়, কতদিন পূর্ব্বে কাহার দ্বারা সর্ব্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ তত্ত্ব অস্মদ্দেশের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি অবগত নহেন। কুম্ভমেলা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণের মহাসম্মিলনী, সকলেই স্বয়ং আহুত। ইহার কোন উদ্যোগকর্ত্তা নাই, আবাহনকর্ত্তা নাই, সংবাদদাতা নাই, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নাই এবং সভাপতি বা সম্পাদক নাই। কত শত বৎসর হইতে এই সাধু সম্মিলনী চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোন ইতিহাস নাই। তাই আমরা আসাম—সারস্বত-মঠাধীশ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গুরুমহারাজের আদেশে, গত হরিদ্বারকুম্ভে ইহার তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত হই। তাঁহার কৃপায় যে পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, তাহাই ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মুখপত্র "আর্য্য-দর্পণ" নামধেয় প্রসিদ্ধ মাসিকে প্রবন্ধাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কুম্ভমেলার এরূপভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিসহ বিস্তৃত বিবরণ আর যে প্রকাশিত হয় নাই, মুক্তকণ্ঠে তাহা সুধিগণ স্বীকার করিয়াছেন।

বিগত ১৩২১ সালের শ্রীশ্রীশিবরাত্রি হইতে মহাবিষুব সংক্রান্তি পর্য্যন্ত হরিদ্বারে যে বিরাট সাধু-মহাসম্মিলনীর অধিবেশন হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা তাহারই একখানি যথাযথ প্রতিলিপি। হিন্দুর ধর্ম্ম-প্রাণতার নিদর্শনস্বরূপ হিমাচলের পাদদেশে যে মহাযজ্ঞের উদ্বোধন হইয়াছিল, হিমাচল সদৃশ হৃদয়বান মহাজনগণই তাহার যথার্থ দ্রষ্টা এবং বোদ্ধা; সুতরাং সামান্য লেখনীমুখে সেই অপার্থিব ভাবব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তোলা, কেবল তাহাদেরই কৃপাসাপেক্ষ। তাঁহাদের কৃপায়, এই দুঃসাহসিক কার্য্যে কতদূর সাফল্য

লাভ করিয়াছি, তাহা সুধিগণের বিবেচ্য। ভরসা এই যে, সাধু চরিত্র-মহিমা আমার অযোগ্যতাকে অতিক্রম করিয়াও জীবের মঙ্গল বিধান করিতে পারে।

ধর্ম্মজগতে কুম্ভমেলা হিন্দুর অবিনশ্বর কীর্ত্তি। এরূপ বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল হিন্দুর দ্বারাই সম্ভবপর। কি প্রাচীন, কি আধুনিক কালে, সমগ্র জগতে এমন কোন অনুষ্ঠান দেখাইতে পারিবে না, যাহা গাম্ভীর্য্যে এবং গুরুত্বে এই কুম্ভমেলার সহিত তুলিত হইতে পারে। স্মরণাতীত কাল হইতে এই সম্মিলনী ভারতের অগণিত ধর্ম্মপিপাসু ও ধর্ম্মবিৎ মহাত্মাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া আর্য্য-মনীষার লীলাভূমি ভারতজননীর উন্মুক্ত কণ্ঠাভরণস্বরূপ জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া আর্য্যনামের গৌরব প্রস্ফুট রাখিয়া আসিতেছে। ভারতের একমাত্র গর্ব্বের সামগ্রী ধর্ম্ম; ভারতের একমাত্র অদৃষ্টনিয়ন্তা তাহার মহাপুরুষগণ। এই ভারতের ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের যত বৈচিত্র। যেখানে বৈচিত্র্য, সেইখানেই বিরোধ। কিন্তু কুম্ভমেলা সেই বিরোধের ফল, কোলাহল থামাইয়া তাহার স্থানে সাম্যের বোধন-গীতি জাগাইয়া তুলিয়াছে। এইখানেই কুম্ভমেলার বিশেষত্ব। শুধু এক দেশ, একজাতি বা এক সম্প্রদায় নহে; একটা বিশাল মহাদেশের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কোন যাদুবলে এই মহাসম্মিলনীতে আপন আপন ব্যক্তিগত বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়া এক মহান আনন্দসমুদ্রে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছে, তাহা ভাবিতেগেলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন মনে হয়, কুম্ভমেলা হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতার ঘনবিগ্রহ। এখানে সকল সার সত্যের সমাবেশ, সকল বৈচিত্র্যের সমন্বয়। তাই কুম্ভমেলা নির্ব্বিশেষ,—বিশ্বধর্ম্মের একমাত্র আসন।

কুম্ভমেলা ত্যাগের মহাতীর্থ ক্ষেত্র। "ত্যাগে নৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" এই মহাবাক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থলও কুম্ভমেলা। এখানে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে ত্যাগী। বরং এখানে দাতা ও গ্রহীতা সম্বন্ধের বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে দেখা যায়। কারণ এখানে দাতা কৃপাকাঙ্ক্ষী, আর গ্রহীতা কৃপাকারী। কুম্ভে আসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এখানে আমাদের নিত্যদৃষ্ট এক জাগতিক বিধানের ব্যত্যয় উপস্থিত হইয়াছে—"এখানে ঐশ্বর্য্য নিঃস্বের নিকট ভিখারী।" এই ভাবটী ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। কুম্ভে উহা দেদীপ্যমান। ইহাই কুম্ভমেলার আর এক বিশেষত্ব।

আমরা বাঙ্গালী, সুতরাং নিখিল ভারতের এই মহানুষ্ঠানে বাঙ্গালীর স্থান কোথায় তাহা জানিতে আমাদের স্বতঃই ইচ্ছা হয়। "বাঙ্গালী চিরদিন মা পিসীর অঞ্চলের নিধি—বাঙ্গালীর প্রতিভার গতি বহির্ম্মুখী নহে।"—বাঙ্গালী নামের সহিত বাঙ্গালী, এই চিরাপবাদে জড়িত রহিয়াছে; কিন্তু আজি কালের স্রোত ফিরিয়াছে। এই জাতীয় জীবনের উদ্বোধনের দিনে, বাঙ্গালী তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা শুধু নিজের গৃহেই আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর চোখ ফুটিয়াছে; তাহার মধ্যে ধীরে ধীরে যে জীবনী শক্তির উন্মেষ হইতেছে, তাহা সে বাহিরের দিকে প্রসারিত করিতে শিখিয়াছে।

তাই আজ কুম্ভে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব দেখিয়া, সমস্ত ভারতব্যাপী ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার দিন আসিতেছে ভাবিয়া, আমরাও আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি। স্বীকার করি, এই মহানুষ্ঠানে এখনও বাঙ্গালীর স্থান বহু নিম্নে। কিন্তু তাহাতে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। পুষ্প-কোরকে যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পের পরিণতির অভাব, তাহা তাহার বিকাশের পরিপন্থী নহে। উহা কোরকেরই ভাবী সম্পদের সূচনা মাত্র।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-যজ্ঞানলের একটী আহুতিস্বরূপ, আমরা এই কুম্ভমেলার বিবরণ প্রকাশিত করিলাম। কুম্ভ যে বাঙ্গালী জীবনকে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দিবে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালীরও যে সেই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমন প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এই পুস্তক লিখিত প্রবন্ধটী "আর্য্যদর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া কালীন গ্রাহকবর্গ আগ্রহসহকারে ইহা পাঠ করিয়াছিলেন এবং কোন কোন সাময়িকপত্র সম্পাদকের অনুমত্যানুসারে স্ব স্ব পত্রিকায় ইহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আগ্রহাতিশয্যে উহা পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। কুম্ভমেলাকে জাতীয় জীবনের সহায়করূপে বাঙ্গালী বরণ করিয়া লউক, ইহাই শ্রীভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা। বলা বাহুল্য, এই পুস্তকখানির আয় "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রমের" আশ্রিত নারায়ণগণের সেবা ও শিক্ষায় ব্যয়িত হইবে, ইহাতে আমার কোন স্বার্থ বা সম্বন্ধ নাই।

এই পুস্তকখানি ৪৮নং পিলখানা, শিবালা, বেনারস সিটি,—৪৮নং নবাবপুর, ঢাকা—২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,—ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে এবং পোঃ কোকিলামুখ, যোরহাট, আসাম—সারস্বত মঠে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

———:0:———

সংবাদ ও মন্তব্য।

আশ্রম-সংবাদ।—বিগত ভক্ত সম্মিলনীর অধিবেশনে আশ্রম-পরিচালকসংঘের সিদ্ধান্তানুসারে আমাদের গুরুভাই শ্রীমৎ যোগানন্দস্বামী-মহারাজ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধানমত শ্রীশ্রীধামচতুষ্টয় দর্শন মানসে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুমোদনে গত ৬ই ফাল্গুণ অত্র মঠ হইতে যাত্রা করিয়াছেন। অনন্তর গৌহাটী, বশিষ্ঠাশ্রম, বৈদ্যনাথ, গয়া, বিন্ধ্যাচল, চিত্রকূট, প্রয়াগ, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার হইয়া অক্ষয়া-তৃতীয়াযোগে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ ও যোশীমঠ (জ্যোতির্ম্মঠ) দর্শন করিয়া বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে ভ্রমন করিতেছেন; জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আমরা এইরূপ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের প্রার্থনা শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার তীর্থ-ভ্রমনের সার্থকতা সম্পাদিত হউক।

আমাদিগের অন্যতম সহকর্ম্মী, গুরুভাই শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দস্বামী মহারাজ বিহারাঞ্চলে এবং ব্রহ্মচারী শ্রীমান অতুলচন্দ্র কেদার-খণ্ডে প্রচারার্থ পরিভ্রমন করিতেছেন।

অত্র মঠাধীশ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদের অনুপস্থিত কালে আশ্রমের অন্যতম সেবক শ্রীমৎ বোধানন্দ মহারাজের অনধিকার কর্ত্তৃত্বে অধিকাংশ সেবক ও সেবাশ্রমাশ্রিত জনগণ উত্যক্ত উঠে; তিনি স্বীয় অপরাধে লজ্জিত হইয়া আশ্রম-পরিচালকসংঘের পূজ্যপাদ সভাপতিকে ঢাকায় একখানি পত্র দ্বারা জানাইয়া গত জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বেচ্ছায় আশ্রম-ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই দাক্ষিনাত্যে ভ্রমনে যাইবেন, আমরা এরূপ সংবাদ পাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী শ্রীমান বরদাচরণ (নরেন্দ্রচন্দ্র) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি, এ পরীক্ষায় ঢাকা কলেজ হইতে সংস্কৃত ভাষায় (অনার কোর্সে) সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতঃ (প্রথম হইয়া) উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কলেজে এম, এ (সংস্কৃত—দর্শন বিভাগে) অধ্যয়ন করিতেছে। শ্রীমান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৩২৲ টাকা মাসিক বৃত্তি ও "অভয়চরণ দাসের স্মৃতি পুরস্কার" (৮০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক) লাভ করিয়াছে। আবার শ্রীমান এই বৎসরেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া "কাব্যতীর্থ" উপাধি লাভ করিয়াছে।

মহানুভবতা। মিস এথেন, এভারেষ্ট নামক কোন ইংরেজ রমণী ভারতবাসীর শিক্ষার্থে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ব্যবস্থাপক সকলেই ভারতবাসী হইতে নির্ব্বাচিত হইবে। ইহার নামই মহানুভবতা! ইহার নামই উদারতা!!

সাত্ত্বিক দান। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ ধনী পার্শী সওদাগর এন, জে, গামদিয়া মৃত্যুকালে দরিদ্রদিগের জন্য দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা ইহাতে "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়" মহাভারতের এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখিতে পাইতেছি। ইহাই খাঁটী দান—ভগবান দাতার পারলৌকিক মঙ্গল বিধান করুন।

জন্মোৎসব। আমরা সংবাদ পাইয়াছি, বগুরাস্থ ভক্তমণ্ডলী অত্র মঠাধীশ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২৮শে শ্রাবণ পূর্ব্বাহ্নে ভিক্ষুক বিদায়, মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, ভোগ, ৺চণ্ডীপাঠ, ৺গীতাপাঠ, এবং তদনন্তর প্রসাদবিতরণ এবং সায়াহ্নে আরতি, বৈকালী, শ্রীশ্রীনাম-কীর্ত্তন ও প্রসাদবিতরণ ইত্যাদি কার্য্য মহানন্দে সম্পাদন করিয়াছেন।

মহাকালী পাঠশালা। হিন্দু বালিকাগণের আর্য্য-ধর্ম্মানুমোদিত গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে বগুড়াস্থিত হিন্দুধর্ম্ম সভাগৃহে একটী মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া আমরা বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। ভগবান এই পাঠশালাটীর স্থায়িত্ববিধান ও উদ্যোগকর্ত্তাগণের হৃদয়ে উৎসাহ প্রদান করুন—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

—:o:—

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, } অগ্রহায়ণ। { ৮ম সংখ্যা।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বাঙ্গালী হইলেও বাঙ্গালায় কোনদিন কাহারও নিকট তাঁহার নাম শুনি নাই বা তাঁহার স্বার্থশূন্য পবিত্র কর্ম্মজীবনের পরিচয় জানিতে পারি নাই। উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে আসিয়া এই বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর পবিত্র চরিত্র, মহতী কীর্ত্তি ও নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতপালনের পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত, গৌরবে আনন্দিত এবং ভক্তিগদগদ হৃদয়ে তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করিয়াছিলাম। ধন্য ব্রহ্মচারী! শত ধন্যবাদ তোমাকে, তোমার কীর্ত্তি সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। তোমার নির্ম্মল চরিত্র, জ্বলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস এবং অসাধারণ শক্তি ও পরহিতেচ্ছাই পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমবাসী জনগণকে সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত বাঙ্গালীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। যাহা বিদেশীয় বাঙ্গালীগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল, বাঙ্গালীর সেই জাতীয় অনুষ্ঠান—সহরে সহরে প্রকাণ্ড কালীবাড়ীগুলি মহাত্মা ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তি, কলিকাতা-কালীঘাটে যে পঞ্জাবী ভক্তগণের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলেও তন্ত্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী কৃষ্ণানন্দের প্রভাব, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই ব্রহ্মচারী মহাত্মার জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই; তবে স্থানে স্থানে তাঁহার স্থাপিত মঠ, দেবমন্দির, আশ্রম প্রভৃতি হইতে এবং তাঁহার সমসাময়িক গুণমুগ্ধ বিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট হইতে তাঁহার মহজ্জীবনের বিবরণ যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ "আর্য্য-দর্পণের" স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিতেছি।

বর্ত্তমান হাবড়া জেলার কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশে ১১৯৭ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। কৃষ্ণানন্দের আট মাস বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পিতাই মাতার স্নেহে ও যত্নে পুত্রকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পঞ্চম বৎসর উত্তীর্ণ হইলে

কৃষ্ণানন্দের হাতে-খড়ি হয় ও বিদ্যাভ্যাসের জন্য তাঁহাকে গ্রাম্য টোলে ভর্ত্তিকরিয়া দেওয়া হয়। পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পুত্রের সৎ শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতি অল্পসময়েই কৃষ্ণানন্দ সংস্কৃত, পারস্য ও বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শুনা যায় যে, তিনি ১৬ বৎসর বয়সের সময়েই অসাধারণ কবিত্ব শক্তি দেখাইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই ইনি পিতার উপদেশে কুল-গুরুর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহার পিতাও প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। তাই পুত্রের সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশাধিকার লাভহইলে, নিজেই তাঁহাকে তন্ত্রশাস্ত্রে অধ্যয়ন করাইতে এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণানন্দের বাল্যকাল হইতে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হইয়া মায়ের অভাব প্রতিনিয়ত ভোগ করিতেন বটে; কিন্তু কোন নারীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতে পারিতেন না। কাহাকেও 'মা' বলিতে তাঁহার বিষম লজ্জা উপস্থিত হইত। পিতার সংসারে অন্য কোন রমণী না থাকায়, বাল্যকালে কোন নারীর আদর-যত্ন পান নাই। তাই নারীজাতিকে তিনি দূরে রাখিয়া সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। কোনদিনই কাহাকেও "মা" বলিয়া ডাকিবার সুবিধা পান নাই; কিন্তু মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পর হই-তেই তাঁহার রুদ্ধ হৃদয়-কপাটের কঠিন অর্গল খুলিয়া গেল, মাতৃভক্তির উৎস উৎসারিত হইল; জগন্মাতাকে মা ডাকিয়া আজ কৃষ্ণানন্দ জীবনের সাধ মিটাইতে লাগিলেন। জগ-জ্জননীকে নিজের জননী বলিয়া ধারণা জন্মিয়া গেল। তিনি মহা উৎসাহে ও অধ্যবসায়ের সহিত পিতার নিকট তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ ও সাধন-রহস্য শিক্ষা করিয়া জগন্মাতাকে জানিবার ও পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণানন্দ যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে জীবমাত্রেরই কামক্রোধাদি রিপুসকল প্রবল হইয়া থাকে। কৃষ্ণানন্দের হৃদয় রাজ্যে যে সময়ে রিপুগণ রাজত্ব করিতে আসিত, সেই সময়ে কৃপাণহস্তা, লোলজিহ্বা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, করালবদনা কালীর শরণ লইতেন; শ্যামাবিষয়ক গান গাহিয়া রিপুগণকে দমন করিতেন। মা—মা—রবে দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিলেন। পুত্রকে বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহার পিতা বিবাহের উদ্যোগ আয়ো-জন করিতেছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে একদিন অকস্মাৎ তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন,—পুত্রকে একটী কথা বলিয়া যাইবারও অবসর পাইলেন না। কাল বলবান্!

পিতার মৃত্যুতে কৃষ্ণানন্দ একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পিতৃশোকে চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু বহুদিন তিনি পিতৃ-শোকে অভিভূত ছিলেন না। মা কৃপা করিয়া এই ঘটনায় তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন। তিনি জগতের নশ্বরতা, কুজ্ঝটিকাবৎ অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। আরও বুঝিলেন,—এই পাঞ্চভৌতিক দেহের ইহাই পরিণাম। বৃক্ষে ফল জন্মিলে যেমন একদিন তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিলে জীবের মৃত্যু অনি-বার্য্য। তরঙ্গিনী যেমন সাগরাভিমুখে সতত ধাবিতা, জীবগণও সেইরূপ কাল-সাগরাভিমুখে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে। ধনীর অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত—তাপসের আশ্রম

হইতে ঘোর বিষয়াসক্ত বিষয়ীর নিবাস-ভূমি পর্য্যন্ত, এই সংসারের যে দিকেই দৃষ্টি-পাত করি, কেবল হাহাকার ক্রন্দনেরই রোল শুনিয়া থাকি। কান্না ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই। বোধহয় কাঁদিবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি হইয়াছে। উঃ! আমরা কি মূঢ়! যৌবনমদে মত্ত হইয়া এ শরীরের পরিণাম একবারও ভাবিয়া দেখি না, তাই সংসারের অধিকাংশ মনুষ্যই ইন্দ্রিয়-উপভোগের নিমিত্ত স্ত্রী-পুত্রের সেবা করিয়া শোকতাপে দগ্ধীভূত হয়। যখন সংসারে সকল পদার্থই অনিত্য, অস্থায়ী, কেহই চিরসঙ্গী নহে, তখন শরীরের স্ফূর্ত্তি, পরিচ্ছদের গর্ব্ব, সৌন্দর্য্যের মমতা এবং বিদ্যার অহঙ্কার করি কেন? পৃথিবীর সমুদয় ধার্ম্মিক ও মহাপুরুষেরাই সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিয়া-ছিলেন। আমিও ধর্ম্মপথের পথিক হইব।

কৃষ্ণানন্দের আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতি-বাসিগণ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হই-বার জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল, কিছুতেই আপনার সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। আর সংসারে লিপ্ত হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। উপরন্তু আপনার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি জ্ঞাতি-গণকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আমি আর পাপ-সংসারে প্রবেশ করিব না। এতদিন পিতা জীবিত ছিলেন বলিয়াই পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করিতে ছিলাম। এক্ষণে এ অমূল্য সুযোগ আর পরিত্যাগ করিব না।"

কৃষ্ণানন্দ সংসারের সকল জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। ইনি অতি তরুণ বয়সে গৃহত্যাগ-করতঃ ব্রহ্মচারী বেশে উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মচারী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এজন্য শক্তি-উপাসনার প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে ইনি জীবনের অধিকাংশ সময় ক্ষেপন করিয়াছিলেন। ইনি কামরূপ, নেপাল, জ্বালামুখী, হিংলাজ, গীর্ণার, প্রভৃতি স্থানে গিরিগুহায়, নদীতটে, কুঞ্জমধ্যে কঠোর তপস্যা করেন এবং আরাবল্লী পর্ব্বত শিখরে ও বারানসী ধামে গঙ্গাতীরে তপঃ-সাধনার জন্য কুটীর নির্ম্মান করিয়া কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর কাল এই-রূপভাবে অতিবাহিত করিবার পর ইঁহার যোগ-শিক্ষা করিবার ইচ্ছা জন্মে। নির্জ্জন স্থান ব্যতীত যোগাভ্যাসের সুবিধা হয় না বলিয়া, ইনি হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী ঋষিকেশ নামক স্থানে গমন করেন। কিন্তু সেস্থানও তাঁহার মনোমত না হওয়ায় দেহরাদুন চলিয়া যান। দেহরাদুনপ্রবাসী অনেক পঞ্জাবী, ব্রহ্মচারীর গুণে আকৃষ্ট হন, তিনি তাঁহার প্রসাদতুল্য বাটী-সংলগ্ন সুবৃহৎ উদ্যানের একটা নিভৃত প্রান্তে একটী কুটীর নির্ম্মান করাইয়া ব্রহ্মচারীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কৃষ্ণানন্দ আপন কুটীরে আসন প্রস্তুত করিয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

কিছুদিন পরে তথায় একজন মহারাষ্ট্রদেশ-নিবাসী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধুর সমাগম হয়। কৃষ্ণানন্দের তেজঃপূর্ণ সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া কৌলসাধু স্নেহবশে কয়েকদিন তাঁহার কুটীরে বাস করিয়াছিলেন। তিনিই ইঁহাকে বুঝাই-লেন যে, একালে তপস্যা বা যোগাদির

স্তায় কৃচ্ছ্রসাধনার কোনই প্রয়োজন নাই। একমাত্র "জপাৎ সিদ্ধি"—অর্থাৎ জপদ্বারাই ব্রহ্মময়ীর সাক্ষাৎ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু তন্মূলে গুরুকৃপা; শ্রীগুরুই উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল ভবার্ণব পারের একমাত্র কর্ত্তা, গুরু ব্যতীত ভবসাগরে এই দেহতরীকে অন্ত কেহ সঞ্চালন করিতে পারিবেন না, গুরু-গ্রহণ ব্যতীত চিত্ত-তিমির দূর হইবে না; তুমি গুরু গ্রহণ কর।"

মহাপুরুষের বাক্যে তাঁহার চৈতন্ত হইল, অত্যাশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যও অনন্তসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন সেই কৌল সাধুকে কৃষ্ণানন্দ গুরুরূপে বরণ করিয়া লইলেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নানা তীর্থে ভ্রমন করিতে করিতে আরাবল্লী পর্ব্বতে উপস্থিত হন। উক্ত পর্ব্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা একটী ক্ষুদ্র নদীর নির্জ্জন তটে মহাপুরুষের সাধনাশ্রম। কৃষ্ণানন্দকে তথায় তন্ত্রোক্ত সাধনায় নিযুক্ত করাইয়া মহাপুরুষ তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি শিক্ষা দিলেন। জপের কৌশল বলিয়া দিলেন। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি ও গুরুসেবার ফলে ব্রহ্মচারী অতি অল্প দিনেই উচ্চ সাধনাধিকার লাভ করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্য ও মহাসাম্রাজ্য অভিষেক করিয়া মহাপুরুষ কৃষ্ণানন্দকে পূর্ণদীক্ষা প্রদান করিলেন। তিনিও পূর্ণ সিদ্ধিলাভের জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। শ্রীগুরুর নিকট সাধন-রহস্ত অবগত হইয়া এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া তিনি সাধনোদ্দেশ্যে হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া গেলেন। তথায় উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া নানাবিধ সাধনার অনুষ্ঠানে দিনাতিবাহিত করিতেন। নির্জ্জন পর্ব্বত-কন্দরে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্বিষয়ে লীন, এবং স্থাণুর স্থায় নিশ্চল হইয়া একস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সাধনা করিতেন। তিনি ধ্যান ধারণায় এরূপ নিমগ্ন থাকিতেন যে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা তাহার ব্যাঘাত সম্পাদনে অসমর্থ হইত। কোন দিক দিয়া সময় অতিবাহিত হইত, তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর হইত না। এইরূপ দিবারাত্র কঠোর সাধনা করিয়া তিনি ব্রহ্মময়ীর সাক্ষাৎকার এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি গিরি-কন্দর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমন করেন। তিনি জীবনের অবশিষ্ট সময় লোক-কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, আজীবন অটুট ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কামিনীকাঞ্চনে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। বাল্যকাল হইতে তিনি যেরূপ সত্যানুসন্ধিৎসু, জ্ঞানপিপাসু ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, সেইরূপ অকৃত্রিম বৈরাগ্যভাবও তাঁহার হৃদয়ে নিহিত ছিল। এইক্ষণে চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম ও তপোনুষ্ঠান এবং জপ, যোগ দ্বারা মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞান ও মাতৃভক্তি প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, বিশালবক্ষ, দৃঢ়কায় ছিলেন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সবল ও কার্য্যপটু ছিল। তাঁহার আয়ত চক্ষুর্দ্বয় জবা পুষ্পের স্থায় রক্তবর্ণ দেখাইত। তাঁহার গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে গৈরিক বসন, দেখিলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভৈরব মূর্ত্তি মনে হইত। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ সৌম্য মূর্ত্তির

সম্মুখে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তিষ্ঠিতে পারিত না। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট শুনা যায়,—"ব্রহ্মচারী ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ ছিলেন। "তাঁহার কি এক অলৌকিক শক্তি ছিল, কেমন একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব ছিল, বক্তৃতা ও যুক্তি দ্বারা লোকের চিত্ত বশীভূত করিবার কেমন এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি যে সভায় কিম্বা যে ব্যক্তির নিকট গমন করিয়াছেন, তথায় জয়ী হইয়াছেন, যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর চরিত্র-বলে বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালীর প্রতি উত্তরপশ্চিম ও পঞ্জাববাসীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। ইনি জীবনের অধিকাংশ কাল উত্তরপশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে কাটাইয়াছিলেন।

পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হইবার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী এই প্রদেশে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাবের নানা স্থান ভ্রমন করিয়াছেন এবং অনেক হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। সকলের বিবরণ প্রদান করিবার স্থান নাই, তবে তিনি এতদঞ্চলে বাঙ্গালীর জাতীয় কীর্ত্তিরূপে যে কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এলাহাবাদ, কাণপুর, আগরা, মিরাট, দিল্লী, আম্বালা, কালকা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন কালীবাড়ীগুলি দৃষ্ট হয়, যাহা দেখিয়া থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক কর্ণেল অলকট্ সাহেব তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক পত্রিকায় অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, যাহা বিদেশীয় বাঙ্গালিগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল, বাঙ্গালীর সেই জাতীয় অনুষ্ঠান, এই মহাত্মারই কীর্ত্তি। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় পঞ্জাব-প্রবাসী শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে রাজ্যকার্য্যে পঞ্জাবের অনররি ম্যাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস্ অব দি পীস্, ডেপুটী একাউণ্টাণ্ট জেনারল, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, পরীক্ষক ও ডেপুটী রেজিষ্ট্রার, কালীবাড়ীর পৃষ্ঠপোষক, ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, পঞ্জাবের দেশীয় সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা ও পাণ্ডিত্যে অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় দিন-লিপিতে (ডায়েরীতে) লিখিয়াছিলেন,—"চাকরীর জন্য আমাকে অনেক স্থানে অনাথের ন্যায় ভ্রমন করিতে হইয়াছে, আমি জীবনের অধিকাংশ কাল অতি দীনহীনের ন্যায় কাটাইয়াছি, একটী পয়সার অভাবে সমস্ত দিন অনাহারে গিয়াছে, এমন দিনও দেখিয়াছি। ভ্রমনের সময় যেখানে সেখানে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দস্বামীর কালীবাড়ী পাইয়াছিলাম, সেইখানেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছি ও মনের সুখে নিদ্রা গিয়াছি।

* * * আমার ন্যায় কতশত হতভাগ্য, কৃষ্ণানন্দের কালীবাড়ীর কৃপায় শ্রীমন্ত পুরুষ-হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হয়, সেই মহাত্মাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া পূজা করি *"। পাঠক! কেন—কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারী এই সকল প্রদেশের বড় বড় নগরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়াছেন'। এই সকল প্রদেশে তখন নবাগত বাঙ্গালীর স্থানা-

---

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। লেখক—

স্থার জুটিত না। কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠার দ্বারা সে অভাব পূরণ হইয়াছিল এবং প্রবাসী বাঙ্গালিগণের মধ্যে ঐক্য, সৌহার্দ্দ্য ও ধর্ম্মবন্ধন দৃঢ় করিয়াছিল। ব্রহ্মচারী রাজপুতনা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্যভারত, বেলুচিস্থান এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশে সর্ব্বশুদ্ধ বত্রিশটী কালীবাড়ী নির্ম্মান করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ কীর্ত্তি এলাহাবাদের কালীবাড়ী। নিঃস্ব অবস্থায়—কৌপীনমাত্রৈকসম্বল ব্রহ্মচারী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এবং ঘোরতর আন্দোলনে প্রবাসী বাঙ্গালিগণকে উত্তেজিত করিয়া স্বজাতিবৎসলতা ও নিঃস্বার্থতার এই আদর্শ মহাপুরুষ কিরূপে নিরাশ্রয় বিদেশী বাঙ্গালীদের স্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্ম্মান করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও শরীর পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠে। আমৃত্যু তিনি ভারতের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১২৮৯ অব্দে ৯২ বৎসর বয়সে প্রয়াগধামে কৃষ্ণানন্দ স্বজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীগুলি এক্ষণে প্রবাসী বিশিষ্ট বাঙ্গালিগণদ্বারাই রক্ষিত ও পরিচালিত হইতেছে। লাহোর কালীবাড়ীর বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। অন্যান্য স্থানের কালীবাড়ীও এইরূপ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত প্রবাসী বাঙ্গালীরদ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। সকল কালীবাড়ীগুলিতেই নবাগত বাঙ্গালিগণ দুই, তিন দিন অবস্থিতি করিতে পারেন এবং আহার্য্য পাইয়া থাকেন। পশ্চিমভারতবাসী ধনকুবেরগণের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা, ছত্র, মঠ, মন্দির, অলঙ্কৃতদেশে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত এই কালীবাড়ীগুলি বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই মহাপুরুষ হইতেই বাঙ্গালীর জাতীয়-কীর্ত্তি এই প্রদেশে চিরস্থায়ী হইয়াছে, সমগ্র বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরব একজন কৌপীনমাত্রৈক-সম্বল ব্রহ্মচারীর দ্বারা এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মনে হইলেই আনন্দে শরীর পুলকিত এবং শ্রদ্ধায় শিরঃ অবনত হইয়া আসে। ধন্য ব্রহ্মচারি!—ধন্য তোমার সাধনা!!—আশীর্ব্বাদ কর, তোমার পূতজীবন, যেন আমাদিগকে সর্ব্বদা সৎপথ দেখাইয়া জগদ্ধিতায় নিযুক্ত করিয়া রাখে। ওঁ হরি ওম্—

দীন—চিদানন্দ।

:0:

কর্ম্মযোগ

যেইদিন ত্যজিয়াছি গৃহ পরিজন,
যেইদিন ত্যজিয়াছি আত্ম-বন্ধুগণ,
তোমার চরণ যবে করিয়াছি সার,
জানিয়াছি সেইদিন "কর্ম্ম" সারাৎসার।

কর্ম্মরূপে তব দেব! সর্ব্ব ঘটে স্থিতি,
কর্ম্মজ্ঞা ভকতি আর কর্ম্মেই মুকুতি,
কর্ম্ম মোর তপ, জপ, কর্ম্ম মোর ধ্যান,
কর্ম্ম মোর মন, প্রাণ, কর্ম্ম মোর জ্ঞান,
জীবনের বাকী দিন কর্ম্ম করি যাব,
কর্ম্মময় দেহ মোর কর্ম্মেতে নাশিব,
কর্ম্মে আমি আর কভু না করিব হেলা,
ভবসিন্ধু তরিবারে কর্ম্ম মোর ভেলা,

হইব না ভীত কভু কর্ম্মের তাড়নে,
সাধিব তোমার কর্ম্ম জীবনে মরণে,
শয়নে, স্বপনে কিম্বা নিদ্রা, জাগরণে,
আহারে, বিহারে কিম্বা ভ্রমনে, চিন্তনে,
কর্ম্মই হইবে মোর জীবনের সার,
"নিষ্কাম করম" হো'ক সাধনা আমার।

দীন—উমেশচন্দ্র।

—:০:—

স্মৃতি

আমি পরম যতনে, যাহার লাগিয়া, রাখিনু সাজায়ে, মরম ডালি,
সে নির্ম্মম, নিঠুর, হয়ে নিরদয়, গেল গো চলিয়া, চরণে ঠেলি।
আমি কাতর নয়নে, বিনম্র বচনে, যতই তাঁহার করুণা মাগি,
সে বিদ্রূপ কটাক্ষ, সঘনে বরষি, যায় গো সরিয়া, ততই রাগি।
আমি কতই সাধিনু, চরণে ধরিয়া, বেদনা-করুণ বিষাদ-আস্যে,
সে হয় গো অদৃশ্য, সমীর-হিল্লোলে, আনন্দ-উজ্জ্বল, প্রশান্ত হাস্যে।
আমি দিবস রজনী, থাকি গো বসিয়া, নির্ম্মল, উদার গগনতলে,
সে অলখিতে আসি, হৃদয়-নিকুঞ্জে, যায় গো তখনি, অমনি চলে।
আমি হৃদয়-সাগর, করিয়া মন্থন, রাখি গো যতনে, পীযূষ রাশি,
সে নির্দ্দয়, কপট, দেয় সব ফেলে. না জানি কখন, গোপনে আসি।
আমি কুসুম পরাগে, রচিয়া শয়ন, থাকি গো চাহিয়া, তাঁহার পানে,
সে চরণে দলিয়া, যায় গো চলিয়া, বাজায়ে বাঁশরী, বেসুরো তানে।
আমি কতই প্রয়াস, করিনু জীবনে, বাঁধিতে তাঁহায়, হৃদয় ফাঁদে,
দেখিলে সম্মুখে, যাই সব ভুলে, আকুল পরাণ, কেবলি কাঁদে।
আমি নয়নের বারি, নয়নে নিবারি, যেমনি তাঁহারে, ধরিতে যাই,
দেখি অনন্তে অনন্ত, গিয়াছে মিশিয়া, আছে শুধু "স্মৃতি," আর কিছু নাই॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—:০:—

আত্মোপদেশ

(৯)

শব্দ।

মহাকাশে বিচরণ করিবার পথ, একমাত্র শব্দধারা। এই শব্দ ব্রহ্ম-সম্ভূত বলিয়া শব্দ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে (যাহা হইতে সর্ব্বারম্ভ এবং যথায় সর্ব্বশেষ হয়) যাওয়া যায়।

সৃষ্টিতে এমন লোক নাই, যেখানে শব্দের প্রবেশ নাই। ঊর্দ্ধলোক, অধঃলোক, তীর্য্যকাদি, সর্ব্বদিকেই শব্দ অতিবেগে বিধাবিত। অর্থশূন্য শব্দ হয় না এবং বিনা কারণেও শব্দ হয় না। শব্দ ব্রহ্মেরই তেজ এবং বিনা কারণে ব্রহ্ম হইতে বিনির্গত হয় না। শব্দ কখন নরকাভিমুখে এবং কখন স্বর্গাভিমুখে ধাবিত হয়—ব্রহ্ম চিন্তায় শব্দের উৎপত্তি, গতি, লক্ষ্য সব ব্যক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হয়।

প্রকৃতির ক্রমাগত বিকৃতি বর্দ্ধন।

তুমি প্রকৃতিকে যতই বিকৃত করিবে, ততই তোমার দুঃখ ও কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। প্রকৃতির ধর্ম্ম সর্ব্বদা পুরুষের ধ্যান করা এবং দেখা যে, সকল কর্ম্ম সেই পরম পুরুষের চরণে নিবেদিত হইতেছে। ইহা করিলে, সদানন্দভাব ভোগ হয় এবং কখনই কোন চিত্তবিকার উদয় হয় না। পরন্তু ইহা না করিলে, বহু বিকার উৎপন্ন হইয়া, নিজের প্রকৃতিই তখন নিজ কণ্টকস্বরূপ, অসহনীয় হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যত ব্যবধায়ক বা বিচ্ছেদক স্পন্দনের উৎপত্তি হয়, ততই দুঃখানুভব বৃদ্ধি হয়। প্রকৃতি পুরুষের আরাধনা করিতে করিতে অবশেষে পুরুষের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। তখন পুরুষ হইতে প্রকৃতি ভিন্ন, কি অভিন্ন তাহা আর বোধ হয় না। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

বড় মজার কথা—যা হবার তাই হয়, কিন্তু কেহই বুঝিতে পারে না।

দেবাগমন।

দেবতাদের এবং ঋষিদের সূক্ষ্ম শরীর; এই শরীরগুলি বা জ্ঞানপ্রধান স্পন্দনের ছন্দগুলি যে কোথায় বা কোন স্তরে কি ভাবে, অবস্থিতি করে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা মনুষ্যের সহিত কিরূপে মিলিত হন, স্বপ্রেরণায়, অথবা মনুষ্যের সাধন ফলে তাহাও বলা যায় না।

ফলকথা সর্ব্ব দেহই শক্তির। সুতরাং শক্তির সাধকেরা, যে শক্তির উৎকৃষ্ট ছন্দাদির সহিত মিলিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যেমন এক মনুষ্য, কখন স্থূল দেহে, কখন বা সূক্ষ্মে এবং কখন বা কারণ-দেহে অবস্থিতি করিলেও, মূলতঃ তাহাতে কোন হানি হয় না। যদ্রূপ বায়ু, সূক্ষ্মভাবে আমাদের নাসিকারন্ধ্রে যাতায়াত করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিলেও, আমরা তজ্জন্য দুঃখিত নহি, তদ্রূপ দেবতা বা মহর্ষিরা বা শক্তির শুভ ছন্দেরা যদি অজ্ঞাতভাবে আমাদের বুদ্ধিতে উদিত হন, তাহাতে ক্ষতি কি?

যখন অবিশেষ পর্ব্ব হইতে বিশেষ পর্ব্বের বিকাশ হয়, যখন সংস্কার হইতে সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম শরীর হইতে স্থূল শরীর এবং পুনরায় স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে সংস্কারে প্রত্যাবর্ত্তন হয়, যখন ব্রহ্ম হইতে সকলের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই সকলের লয় হয়—তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর অপরকে চিন্তা করিবার দরকার কি? বেদব্যাসই বল, লর্ড মৈত্রেই বল, বুদ্ধই বল, কল্কি-অবতারই বল, খ্রীষ্টই বল, আর মেহদিই বল, ইহারা সকলেই সেই ব্রহ্মাগ্নির কভু প্রদীপ্ত এবং কভু লুপ্ত শিখা ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

যখন কোন অবতার বা মহাপুরুষ স্থূল দেহে আবির্ভূত হয়েন, তখন তাঁহার জীবদ্দশা অবধি

তাহাকে ঘৃণা চক্ষে দেখা মনুষ্যের স্বভাব। তাহার দেহত্যাগের পর, একজন দেহধারী মহাপুরুষ বা অবতারের জন্য, আবার মনুষ্যের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হয়। যদি স্বপ্নে বা ধ্যানে মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে উহা মস্তিষ্কবিকার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়।

বহিঃ ও অন্তর্জ্জগতে বিচরণ।

যেমন বহির্জ্জগতে বিচরণ করিতে হইলে দুইখানি পদের বা চরণের ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম বা অন্তর্জ্জগতে ভ্রমন করিতে হইলে, শব্দরূপী চরণই ব্যবহার করিতে হয়। অন্তর্জ্জগৎ ভাবরাজ্য, স্থূল জগৎ যেমন সম্মুখে, অগ্রে এবং পশ্চাতে বস্তু প্রত্যক্ষ হয়। (সম্মুখের বস্তু তৎক্ষণাৎ অগ্রের বস্তু পাদচরণ করিয়া কিছুদুর অগ্রসর হইলে এবং পশ্চাতের বস্তু, পশ্চাতে ফিরিয়া দাড়াইলে তবে প্রত্যক্ষ হয়। তদ্রূপ সূক্ষ্ম বা অন্তর্জ্জগতে ও যাহা বর্ত্তমান ভাব উহার মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। পরন্তু যাহা অতীত (পেছনের দিকে) বা যাহা অনাগত (যাহা অগ্রের দিকের) ভাব তাহা শব্দাদি স্মরণ দ্বারাই প্রাপ্ত বা প্রত্যক্ষ হয়। বহির্জ্জগতে যেমন পথ চলিতে আয়াস বা পরিশ্রম বোধ হয়, অন্তর্জ্জগতেও তদ্রূপ হয়, তবে তত নহে।

শব্দসঞ্চয় সংসারীর পক্ষে।

যে সকল শব্দ ভয়নিবারক, সাহসপ্রদ, বলসঞ্চারক, স্বাস্থ্য ও শুভবর্দ্ধক অর্থাৎ যে সকল শব্দ স্মরণ করিলে শান্তির শুভমূর্ত্তি বা ভাব হৃদয়ে উদয় হয়, সেই শব্দগুলিকে আবৃত্তি দ্বারা স্মৃতিক্ষেত্রে সঞ্চিত রাখা উচিত।

আরম্ভ, মধ্য ও অন্ত।

কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, শক্তি শুভ প্রয়োগে এবং অশুভ বা কল্পনা নিরোধ করিয়া আরম্ভ করিবে; এবং কর্ম্মের মধ্যে বা অন্তেও কল্পনাকে প্রবেশ করিতে দিও না। কল্পনাশূন্য শক্তিই শুভ এবং কল্পনাসংযুক্ত শক্তিই অশুভ। কোন পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারকে, তোমার সহায়ক বা মধ্যস্থ করিও না। তাহাহইলে স্বতঃসিদ্ধ চিৎ ও ক্রিয়া শক্তির দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সেই অনাদি পুরুষ ও প্রকৃতিকেই কর্ম্ম করিতে দিও।

বস্তু ও ছায়া।

যেমন বস্তুর সহিত তাহার ছায়ার নিত্য-সঙ্গ, তদ্রূপ পুরুষের সহিত প্রকৃতির সঙ্গও নিত্য—প্রকৃতির কার্য্য পুরুষার্থসাধন—সুতরাং যে কোন অনুভব মাত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়াশক্তি উপস্থিত থাকে; এবং পূর্ব্ব সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে, অনুভবের প্রয়োজন, অভাব বা উদ্দেশ্য প্রকৃতিই পূর্ণ করে। প্রকৃতি নিজ কৌশলেই করে, প্রকৃতিকে শিখাইতে যাইতে নাই।

তুমি মূর্খ, কি আমি মূর্খ, এই বিষয় লইয়া জগতে বিতণ্ডা।

জগতে যদি কোন ব্যক্তি, নিজ অনুভব শক্তিবলে, অপরকে অজ্ঞ কহে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, সেই অজ্ঞরূপে অবধারিত ব্যক্তি অভিমানভরে অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া

তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে নিজ ধনহর্ত্তাকে অজ্ঞ বলিয়া অপবাদ করে ।

কলকথা একবার বিচার করিয়া দেখে না যে, সে স্বয়ং বস্তুতঃ অজ্ঞ কি না । ভাবিয়া দেখ, যদি কেহ সূক্ষ্ম দৃষ্টিবলে দেখে যে, কাহারও ধনভাণ্ডার হইতে ধন অপহৃত হইয়াছে এবং সে ব্যক্তিকে বলে, তাহাহইলে কি তাহার নিজ ভাণ্ডার তদন্ত করিবার পুর্ব্বেই সেই ব্যক্তিকে ক্রোধভরে প্রত্যুত্তরে তুই নির্ধন, তুই দরিদ্র বলিয়া তাড়না করা কর্ত্তব্য ।

চৈতন্য ও ক্রিয়াশক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতি ।

আমার চৈতন্য আছে ও শক্তি আছে, এ জ্ঞান সর্ব্ব প্রাণিরই আছে, পরন্তু আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান এ জ্ঞানটি কাহারও নাই । আমার যে জ্ঞানটুকু ও শক্তিটুকু আছে, তাহা অতি অল্প; এবম্বিধ জ্ঞানের দ্বারা সকলেই অভিভূত বা আচ্ছন্ন ; এবং এই কারণবশতঃ সকলে বাহির হইতে জ্ঞান ও শক্তি আহরণ করিয়া, নিজ শক্তি ও জ্ঞানের পুঁজি বাড়াইবার চেষ্টায় ফেরে । পরন্তু "আমার ভিতরে সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তি আছে" এইরূপ যে জ্ঞান কৌশল তাহা কাহারও উদয় হয় না ।

একাগ্রতা ।

খুব এক নিঃশ্বাসে টানলে, খুব খানিকটা বেশী জ্ঞান ও শক্তি, জোয়ারের জলের মতন এসে পড়ে । মানুষেরা (বিশ্বাসের সহিত) চোক, কান বুজে এক নিশ্বাসে টান্‌তে পারে না, হুস করে নিশ্বাস ছেড়ে দেয় ; বা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তারপর হেসে বলে হয় না, হয় না ।

আরম্ভ ও সমাধার মধ্যে পরিচ্ছেদ ।

আরম্ভ হইতে সমাধা পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, এই টুকুর ভিতর নিশ্বাস অবিচ্ছিন্ন থাকা চাই ; অর্থাৎ চিত্ত যেন রূপান্তর গ্রহণ করিতে না পায় অর্থাৎ উদ্যম করিয়া ফলোদয় হইবার পূর্ব্বেই আধা-খেঁচড়া অবস্থায় সাধন ছাড়িয়া দিয়া, সব দোষ শক্তির ঘাড়ে চাপান উচিত নহে । শক্তি স্থিতিস্থাপক. যত বাড়াও বাড়িয়া যাইবে । নিজে দম্ না রাখতে পে'রে, ছেড়ে দিলেই হুস্ করে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে যাবে ।

দম ।

এ দম্ গাঁজার দম্ নয়, বিশ্বাসের দম্ ।

স্বরূপ

যার রূপ নাই, তাঁর স্বরূপ দেখ্‌বি কি রে ? আ্যবাগের ব্যাটা টেনে যা, টেনে যা—কি টাম্‌চিস্ তা দেখবার দরকার নাই—সব টেনে যা । চোক বুজিয়া মা, মা বলে টান, আরও টান্, আরও টান্ ।

রূপসঞ্চয়, সাজান আর মেলানা ।

কেউ খালি রূপ ফলাচ্চে, সাজাচ্চে, আর মেলাচ্চে, আর কেউ রূপটুপ, সব পুছে ফেলে, আসল মাল টানছে। বাবা, কটা রূপ দেখেছ ? দুটো চারটা যা জ্যোতিষ শাস্ত্রে টের পেয়েছ, তাতে কি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের, অনন্ত জ্যোতিষ্কের জানা হয়ে গেল ? কাকে বোঝাও বাবা ! যে জ্যোতিষ্ক আজ অবধি তোমরা আবিষ্কার করতে পার নাই এবং যাহার নাম জান না, যদি তোমাদের "অবতার" সেই জ্যোতিষ্ক থেকে এসে থাকে, তা'হলে ত তোমাদের

বঙ্গবাধুনি সব ফক্কা গেরো হয়ে গেল; ও সব হাঙ্গামা রেখে, হাটের লোক জড় না করে, চুপচাপ একান্তে বসে পরমপদের ধ্যান কর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

———:0:———

বৈদিক-প্রসঙ্গ

(২৬)

[উত্তর পক্ষের কথা] এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" শব্দ দ্বারাই যদ্যপি ঈশ্বর বস্তু সাব্যস্ত করা হয়, তাহা দ্বারা ঈশ্বর বস্তুর কোন রূপ অঙ্গহানি হয় না। কারণ, যিনি ঈশ্বর তিনি এরূপ স্থিতিস্থাপক বস্তু নহেন যে, তোমার আমার কতকগুলি প্রাণহীন অক্ষর সমষ্টি দ্বারা,—বা "আক্ষরিক" শব্দ বিভিন্নতায় তিনি হীনাঙ্গ বা উত্তমাঙ্গ হইয়া পড়িবেন। শ্রুতি বলেন, শিক্ষাশাস্ত্র, কল্পশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ ইত্যাদি শাস্ত্র সকল বাক্য মনের অতীত, অক্ষয় ও অবিনাশী স্থানে যায় না,—বা ঐ সকল শাস্ত্রবাক্য দ্বারা অবিনাশী স্বভাব, সনাতন বস্তু—"যাঁহার নামের সংজ্ঞা ঈশ্বর," দুই, দুই ভিন্ন ভেদ হন না। তবে, ঐ সকল শাস্ত্র, ঐ অবিনাশী-স্বভাব পরম বস্তুর (ঈশ্বরের) স্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক মাত্র। অতএব, ঈশ্বর বস্তুর "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" শব্দ দ্বারা অর্থবোধ করিলে, তাঁহার অঙ্গহানির সম্ভাবনা নাই, বা মনোবাণীর অতীত, নিরাকার, নির্গুণ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিলে, তাহাতেও তাঁহার নুতন অঙ্গবর্দ্ধনের আশঙ্কা নাই। তিনি (ঈশ্বর) যাহা আছেন, চিরদিন তাহাই আছেন ও থাকিবেন। তবে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" শব্দ দ্বারা ঈশ্বর বস্তুর অর্থবোধ করিলে, জ্ঞানের আপ্যায়ন বা সংশয়-নিরাকরণ অবশ্যম্ভাবী কি না!

ঐশ্বর্য্য পদার্থটা গুণ বাচক পদার্থ,—বা উহা গুণেরই লক্ষণ। লৌকিক জগতে সচরাচর দেখা যায় যে, গুণ থাকিলেই তাহার মূলে কোন কিছু দ্রব্য বা বস্তু আছে। সে দ্রব্য সাকার, নিরাকার বা নিরবয়ব নহে। যেমন তিক্তগুণ;—তিক্তগুণ যে ভাবে যেখানে থাকুক না কেন, তাহার মূলে আকারবিশিষ্ট কোন দ্রব্য বস্তু নিশ্চয়ই আছে স্বীকার করিতে হয়। অন্যথায়, মূলে কোন দ্রব্য বা বস্তুর অস্তিত্ব নাই, অথচ তিক্তগুণ আছে, এরূপ কথা বলা যায় না। তবেই হইল যে,—কোন দ্রব্য না থাকিলে কেবল গুণের জ্ঞান কখনই প্রকাশ পায় না; দ্রব্য থাকিলে অবশ্যই তাহার গুণ প্রকাশিত হয়। অতএব গুণ দ্রব্যাশ্রয়ী পদার্থ, বা দ্রব্যকে অপেক্ষা করিয়াই গুণের গুণত্ব। এইরূপে লৌকিক জগতে আমরা দ্রব্য ও গুণ নামক দুইটী

পদার্থ দেখিতে পাই।—অর্থাৎ দ্রব্য থাকিলেই অবশ্য তাহার গুণ আছে, এবং গুণ আছে, এবং গুণ থাকিলেই তাহার মূলে কোন দ্রব্য আছে, এইরূপে ব্যবহারিক জগতে দুইটী পদার্থ আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আবার, দ্রব্য ও গুণ ক্রিয়াশূন্য পদার্থ নহে;—অর্থাৎ দ্রব্য ও গুণের ক্রিয়া বা কর্ম্ম আছে, ইহাও লোক মধ্যে দেখা যায়। মনে কর, অগ্নি একটী দ্রব্য; ঐ দ্রব্যের রূপ এবং উষ্ণস্পর্শ বা দাহিকা শক্তি নামক দুইটী গুণ আছে। ঐ অগ্নি দ্রব্য ও তাহার গুণ দ্বারা, ব্যবহারিক জগতে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে, সমস্ত পার্থিবই পদার্থই অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়। অতএব দ্রব্য ও গুণের ক্রিয়া আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপে দ্রব্য ও গুণ হইতে, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া এই তিনটী পদার্থ ব্যবহারিক জগতে সচরাচর আমরা দেখিতে পাই।

অতঃপর একটু অগ্রসর হইয়া দেখ যে, দ্রব্য থাকিলেই যখন তাহার গুণ আছে,—বা দ্রব্য মাত্রেই যখন গুণ আছে,—তখন দ্রব্যই গুণবান, এবং গুণ পদার্থটী দ্রব্যেরই ধর্ম্ম। গুণ কখন গুণবান হয় না, বা গুণ হইতে গুণ প্রকাশ পায় না। সুতরাং গুণের ধর্ম্ম গুণ নহে, উহা দ্রব্যেরই ধর্ম্ম। এরূপ কথায় আর বিরোধের সম্ভাবনা নাই। কারণ, ইহা লৌকিক জগতের প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ; কিন্তু ঐ দ্রব্য ও তাহার গুণ হইতে আমরা যে ক্রিয়া দেখিতে পাই,—অর্থাৎ অগ্নি দ্রব্য ও তাহার গুণ হইতে আমরা যে প্রত্যেক জিনিষকে পুড়িয়া ছাই, ভস্ম হইতে দেখি, ঐ "ছাই ভস্ম রূপ" ক্রিয়া কেন হয়? এখানে আর বলিতে পার না যে, উহা দ্রব্য ও গুণের ধর্ম্ম। কারণ, দ্রব্যের ধর্ম্মই গুণ; গুণের ধর্ম্ম গুণ নহে,—বা গুণ স্বয়ংসিদ্ধ নহে, উহা দ্রব্যাশ্রয়ী; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব, দ্রব্য ও গুণ হইতে যে ক্রিয়া বা কর্ম্ম হয়, তাহা দ্রব্য ও গুণের ধর্ম্ম নহে। তবে ঐ ক্রিয়া কেন হয়? লৌকিক জগতে বা বাহ্যজগতে ইহার হেতু অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে,—অগ্নি দ্রব্যের সহিত কোন পদার্থের সম্বন্ধ বা মিলন না হইলে, তাহা আর পুড়িয়া ছাই ভস্ম হয় না। অভিপ্রায় এই যে, অগ্নি আর কাষ্ঠ যদ্যপি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক ভাবে থাকে, তাহা হইলে সে কাষ্ঠ আর পুড়িয়া ছাই ভস্ম হয় না। কিন্তু, অগ্নি দ্রব্যের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ বা মিলন হইলে,—অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নি আর কাষ্ঠ উভয়ে একত্রিত হইলে, অগ্নি দ্রব্য হইতে অবশ্যই কাষ্ঠ পোড়ান রূপ ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়। তবেই দেখা গেল যে, দ্রব্য, সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইলে কোন "ক্রিয়া" হয় না। এইজন্য দ্রব্য ও গুণ নামক পদার্থ দুইটীর পর "ক্রিয়া" পদার্থ মানিতে হইলে, "সম্বন্ধ" নামক আর একটী পদার্থ মানিতে হয়। পক্ষান্তরে, দ্রব্য না থাকিলে যখন ক্রিয়াই হইতে পারে না, তখন দ্রব্যের সহিত ক্রিয়ার অবশ্যই সম্বন্ধ আছে।

ঐ যে সম্বন্ধ, উহার নামই "সমবায়"। অর্থাৎ,—দ্রব্যের সহিত ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ,—বা গুণ ও ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের নাম "সমবায় সম্বন্ধ"। বর্ত্তমান জগতে আমরা যখন দ্রব্য, গুণ হইতে সচরাচর ক্রিয়া দেখিতে পাই, তখন সম্বন্ধ—(নামান্তর সমবায়) নামক আর একটী পদার্থ

অবশ্যই মানিতে হইবে। এইরূপে দেখা গেল যে, গুণ থাকিলেই,—দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ (নামান্তর দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমবায়) এই চারিটী পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, লৌকিক জগতে ঐ পদার্থ চতুষ্টয় সাধারণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তোমরা (পূর্ব্বপক্ষ বাদী) যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও তদনুকূল যুক্তি ভিন্ন অন্য কোন কথাই শুনিবে না; মৌখিক বচন বা শাস্ত্রীয় বচনের অসাধ্য কিছুই নাই,"—"বচন-বাহুল্যে সবই সাধ্য হইয়া যায়"—এইরূপ কথা প্রয়োগ করিতে যখন তোমাদের কুণ্ঠা-কার্পণ্য দোষ দেখা যায় না,—তখন উল্লিখিত বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি অবশ্যই তোমাদের স্বীকার্য্য হইবে, ইহা আর অস্বীকার করিতে পার না। আর এক কথা, তোমার যখন গত বারের উল্লাস প্রসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে,—জগতের এমন নিয়ম কিছুই থাকিতে পারে না যে,—তাহার বাহিরে একরূপ, আর ভিতরে অন্যরূপ;— অর্থাৎ জগতের ভিতর বাহির সর্ব্বত্রই এক নিয়ম ব্যতীত দুই দুই নিয়ম কখন হইতে পারে না। তোমাদের এই "মূল্যবান" প্রতিজ্ঞাটী বজায় রাখিতে হইলে, অতঃপর দেখিতে হইবে যে—

যিনি "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" শব্দ দ্বারা ঈশ্বর হইতেছেন,—অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, তিনি নিশ্চয়ই গুণবান। গুণবান, হইলেই উল্লিখিত নিয়মে তাঁহাকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমবায়" এই চারটী পদার্থের অন্তর্ভূত হইতে হইবে। তিনি—অর্থাৎ ঈশ্বর, এই চারিটী পদার্থের অন্তর্ভূত পদার্থ হইলে, অবশ্যই তিনি গুণবান, সক্রিয়, ঐশ্বর্য্যশালী, সাকার ইত্যাদি শব্দের অধিকারী হইতে পারেন। অন্যথায় তাঁহার গুণ আছে, কিন্তু আকার নাই; আবার, আকার আছে, কিন্তু গুণ নাই, এইরূপ তাহার ক্রিয়া আছে, কিন্তু তিনি দ্রব্য ও গুণ পদার্থের অন্তর্ভূত নহেন,—বা তাঁহার ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু তিনি গুণবান নহেন; এরূপ কথা,—"আকাশের গোলাপ ফুল, চতুষ্কোণ গোলক" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায়— স্ববিরোধিজ্ঞানে, বালকেও তাহাতে কর্ণপাত করে না। অতএব ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া গুণবান হইলে, অবশ্য তাহাকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমবায় এই চতুর্ব্বিধ পদার্থের অন্তর্ভূত হইতেই হইবে। জগতের ভিতর ও বাহির এক নিয়মে গাঁথা—এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে হইলে, ইহা আর অস্বীকার করিতে পার না।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতের সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, গুণবান, রূপবান ইত্যাদিতে সমস্ত আকারধারী পদার্থের নিধন এক দিন না একদিন অবশ্যম্ভাবী। ব্যবহারিক জগতে চির দিন সমান ভাবে অর্থাৎ অচল অটল ভাবে, কোন গুণবান বা রূপবান বস্তুর চির বিরাজমান কেহ কখন দেখে না। এইজন্যই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম এই তিন জাতীয় পদার্থকে নশ্বর ও বিনাশশীল পদার্থ বলা হয়। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, নশ্বর বা বিনাশী হইলে সারা জগৎও তথৈবচঃ হইবে। পরিদৃশ্যমান জগৎ যদ্যপি এইরূপে নশ্বর বা বিনাশী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই নশ্বর জগতের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা,—অর্থাৎ উল্লাস মতে যিনি ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর—শব্দ দ্বারা ঈশ্বর সেই সৃষ্টিকর্ত্তা "ঈশ্বর" পদার্থটী কিরূপ হইবেন ?

এক্ষণে তাহাই—ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

কর্ত্তার ক্রিয়া,—"অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি" যদ্যপি মিথ্যা বা নশ্বর হয়, তাহাহইলে কর্ত্তাটীও সেইরূপ মিথ্যা বা নশ্বর না হইয়া পারেন না। কারণ কর্ত্তা যদ্যপি সত্য হইত, তাহাহইলে সেই সত্য পদার্থ হইতে মিথ্যাত্ব বা নশ্বরত্ব কখন আসিত না। যেমন আলো হইতে অন্ধকার কখন আসে না; জ্ঞান হইতে অজ্ঞান সৃষ্টি কদাচ সম্ভবপর নহে ইত্যাদি। অন্য-পক্ষে আবার দেখ, ছেলে মিথ্যা হইলে বাপ কখন সত্য হয় না; কম্বল কাল বর্ণের হইলে, তাহার লোম কখন সদা হয় না। অভি-প্রায় এই যে, জন্য পদার্থ মিথ্যা হইলে, জনক কখন সত্য হয় না; অবয়বীর রূপ একরূপ, আর অবয়বের রূপ অন্যরূপ, এরূপও প্রায় দেখা যায় না। এখানে কর্ত্তার ক্রিয়া,—অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ হইতেছে "জন্য পদার্থ;" আর "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ + বর" শব্দ দ্বারা যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর,—সেই ঈশ্বর হইতেছেন তাহার "জনক"। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিক্রিয়া হইতেছে জগতের "অবয়ব;" আর দৃশ্যমান জগৎ হইতেছে, তাহার "অবয়বী"। এবম্ভূত জন্য পদার্থ জগৎ, বা অবয়বী দ্রব্য জগৎ, যদ্যপি মিথ্যা বা নশ্বর হয়, তাহাহইলে জনক ঈশ্বর বা জগতের অবয়ব "সৃষ্টিক্রিয়া" অবশ্যই তথৈবচঃ হইবে। ইহা আর অস্বীকার করিতে পার না। এইরূপে "সৃষ্টিক্রিয়া" যদ্যপি মিথ্যা বা নশ্বরই সাব্যস্ত হয়, তাহাহইলে ঐ ক্রিয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, বা যাহার আশ্রয়ী হইতেছে,—অর্থাৎ যাহা হইতে ঐ ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতেছে, সেই কর্ত্তা "দ্রব্য" ঈশ্বরও মিথ্যা বা নশ্বর বস্তু সাব্যস্ত হইবেন।

অভিপ্রায় এই যে, ক্রিয়া স্বয়ংসিদ্ধ পদার্থ নহে। দ্রব্য ও গুণ নামক দুইটী পদার্থ না থাকিলে, ক্রিয়া নামক পদার্থ কখন একা আসিতে পারে না; অর্থাৎ অগ্নি, দ্রব্য ও তাহার গুণ দাহিকা শক্তি না থাকিলে, কাষ্ঠাদি পদার্থ কখন পুড়িয়া ভস্মীভূত হয় না। অতএব, কাষ্ঠাদি পুড়ানরূপ ক্রিয়া বা কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে, অগ্রে অগ্নি দ্রব্যকে মানিতে হইবে; নতুবা পুড়ান রূপ ক্রিয়া কস্মিনকালেও হইবে না। তবেই দেখা গেল যে, ক্রিয়া মানিতে হইলে দ্রব্য মানিতে হয়;—সুতরাং ক্রিয়া পদার্থটী দ্রব্যাশ্রয়ী। ঐ ক্রিয়া পদার্থটী যদ্যপি নশ্বর হয়, তাহা-হইলে তাহাতে নশ্বরত্ব আছে, এবং তজ্জাতীয় বস্তুতেও অবশ্য নশ্বরত্ব আছে। আবার ঐ ক্রিয়া, দ্রব্য না থাকিলে কখন হইতেই পারে না। আবার দ্রব্য থাকিলেই তাহার গুণ আছে; এইরূপে দ্রব্য ও গুণ থাকিলেই তাহার ক্রিয়া আছে। অতএব দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম এক জাতীয় সমান শ্রেণীর পদার্থ;—একটীর অভাবে অপর-টীর বিদ্যমানতা অসম্ভব। অতএব, ক্রিয়া পদার্থটী নশ্বর হইলে, তজ্জাতীয় সমান শ্রেণীর পদার্থ—দ্রব্য ও গুণ অবশ্যই নশ্বর হইবে; পরন্তু তাহাতে নশ্বরত্ব থাকিবে। তবেই দেখা গেল যে, ক্রিয়া পদার্থটী নশ্বর হইলে, সেই ক্রিয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়,—বা ক্রিয়া পদার্থটী যাহার আশ্রয়ী, সেই দ্রব্যও নশ্বর হইয়া যায়। অতএব কর্ত্তার ক্রিয়া অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিক্রিয়া যদ্যপি নশ্বর হয়, তাহহাইলে সেই ক্রিয়া যে কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইবে,—সেই সৃষ্টিকর্ত্তাও

নশ্বর হইবেন। এইরূপ ঐ সৃষ্টিকর্ত্তা যদ্যপি (ঐশ্বর্য্যশালী ও ঈশ্বর হইয়া) গুণবান্ হন, তাহাহইলে গুণ নশ্বর পদার্থ বিধায়ে ঈশ্বরও নশ্বর হইবেন। আবার, তিনি যদ্যপি দ্রব্য বা বস্তু হন, তাহাহইলেও তথৈবচঃ অবস্থা আসিবে। কারণ, দ্রব্য বা বস্তু নশ্বর পদার্থ। এইরূপে দেখা গেল যে,—ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ + বর" শব্দ দ্বারা ঈশ্বর পদার্থটী গুণবান হইলেও নশ্বর; ক্রিয়াবান্ বা সক্রিয় হইলেও নশ্বর; আর সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও তথৈবচঃ। অতএব এইরূপ নশ্বর "কাচের পুতুলের মত" ঈশ্বর লইয়া, জ্ঞানের আপ্যায়ন বা সংশয়-নিরাকরণ কস্মিনকালেও সম্ভবপর নহে।

পক্ষান্তরে, জগৎকে যদ্যপি সত্য বা সৎ বস্তুই সাব্যস্ত করা হয়, তাহাহইলে এই দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, বা বিশ্ব-সৃষ্টির আর আবশ্যক হয় না। কারণ, সৎ বস্তুর কখন বিনাশ নাই; বিনাশশীল বস্তুই নশ্বর। সুতরাং, বিনাশ না থাকায়, সৎ বস্তুর অস্তিত্ব লোপের আর আশঙ্কা নাই। তাহার বিদ্যমানতা কোথাও না কোথা, অবশ্যই থাকিবে। অতএব, জগৎ যদ্যপি সৎ বস্তুই সাব্যস্ত হয়, তবে আর জগৎসৃষ্টির প্রয়োজন কি? তাহার অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা যখন কোথাও না কোথা, অবশ্যই থাকিবে, তখন আর নূতন ভাবে সেই জগতের সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন। সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন হইলে, ঈশ্বরকে আর সৃষ্টিকর্ত্তা, ঐশ্বর্য্যশালী, গুণবান, ও সক্রিয় ইত্যাদি হইতে হয় না। কারণ, জগৎ সৃষ্টির জন্যই ত তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা, গুণবান, ক্রিয়াবান ইত্যাদি উপাধি। সেই জগৎ যদ্যপি সৃষ্টি করিতে না হয়, তবে আর তাহার ঐ সকল আলঙ্কারিক উপধির প্রয়োজন কি? অতএব এমতেও দেখা গেল যে, জগৎকে যদ্যপি সৎ বস্তুই সাব্যস্ত করা হয়, তাহাহইলে ঈশ্বরকে আর "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ + বর" শব্দ দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী, গুণবান, ক্রিয়াবান। ইত্যাদিতে—"সৃষ্টিকর্ত্তা" হইতে হয় না,—বা ঐরূপ ঈশ্বর দাঁড়ায় না।

কিন্তু, জগৎ সদ্বস্তু কিম্বা অসদ্বস্তু? এই চিন্তার অবসর এখনও আমাদের আসে না। তোমাদের পক্ষে (পূর্ব্বপক্ষ বাদীর) ঐ চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তোমরা যখন ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকার কর না, অপিচ জগতের অতীত প্রদেশে "নিত্যসিদ্ধ" সনাতন-স্বভাব" কোন বস্তুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার কর না—তখন তোমাদের পক্ষে জগৎ কদাচ সৎ হইতে পারে না। কারণ, সৎ বস্তুর বিনাশ নাই; তাহা অবিনাশী। অবিনাশী বস্তু, অন্তবান নহে; অক্ষয়, অনন্ত। অনন্ত বস্তুর আদি নাই—অর্থাৎ উৎপত্তি নাই; তাহা অনাদি। যে বস্তু অনাদি ও অনন্ত তাহাই অবিনাশী, সনাতন ও শাশ্বত। অতএব দেখা গেল যে, বস্তু সৎ হইলেই তাহা অনাদি, অনন্ত ইত্যাদিতে সনাতন, নিত্যসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু তোমরা যখন নিত্যসিদ্ধ বস্তু স্বীকার কর না, তখন তোমাদের পক্ষে জগৎ কখন সৎ হইতে পারে না। আর এক কথা, এই যে দৃশ্যমান জগৎ ইহার পরিণাম বা পরিবর্ত্তন প্রতি পদক্ষেপেই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। উন্নতি—অবনতি, হ্রাস-বৃদ্ধি স্থিতি-অস্থিতি সমস্তই আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যমান। সুতরাং এবম্ভুত পরিণামশীল জগতকে "নিত্যসিদ্ধ" সদ্বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিতে, সর্ব্বতঃ কোন বিদ্বান ব্যক্তি সহজে প্রস্তুত হন না।

তথাপি, তোমাদের উল্লাসোক্ত "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" শব্দ দ্বারা ঈশ্বর বস্তু প্রতিপন্ন করিবার জন্য জগৎকে সত্বস্তু সাব্যস্ত করিয়া দেখা গেল যে, তাহা দ্বারাও ঐরূপ ঐশ্বর্য্যশালী, গুণবান, সক্রিয় ইত্যাদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা "ঈশ্বর" দাঁড়ায় না। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমবায় চারিটী পদার্থ লৌকিক জগতে ভিন্ন ভিন্ন বটে; কিন্তু জ্ঞান পক্ষে উহাদের ভিন্ন ভেদ নাই। কারণ শব্দ ও তদ্বোধক জ্ঞান একই বস্তু বুঝাইয়া দেয়। অন্যপক্ষে, গুণ থাকিলেই যখন "দ্রব্য" চাই, আবার দ্রব্য থাকিলেই যখন তাহার "গুণ" আছে, তখন দ্রব্য ও গুণ একরূপ অখণ্ডাকার বস্তু। এইরূপে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সমবায় প্রকারান্তরে এক হইয়া যায়। তথাপি লৌকিক জগতে ঐ সকল পদার্থের—অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মের ভিন্ন ভেদ উপলব্ধি যেরূপ প্রচলিত আছে, তোমাদের উল্লাসের—কথা দ্রুত "প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য"—ঠিক সেইরূপ আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে,—

জগৎ নামক বস্তুটী সৎ না হইয়া,—নশ্বর হইয়া যায়। অতএব, জগৎকে যদ্যপি নশ্বরই সাব্যস্ত করা হয়, তাহাহইলে "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" শব্দ দ্বারা যে ঈশ্বর পদার্থ স্থিরতর হইতেছে, সেই ঈশ্বর পদার্থটীরও নশ্বরত্ব স্বীকার করিতে হয়। অন্যপক্ষে, জগৎকে সত্বস্তু সাব্যস্ত করিলেও, ঐরূপ "ঈশ্বর" দাঁড়ায় না। সুতরাং,—এই উভয় সমস্যার সমীকরণে দাঁড়াইল কি? অন্য কিছুই নহে; কেবল "ঈশ্বরত্ব লোপ"। ভূমা ও পূর্ণপরব্রহ্মের 'এক' একত্ব বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে গিয়া, তোমারা যে "ভূমা ভেদনে নবোল্লাস" মন্ত্র বাহির করিয়াছ,—প্রথমাবধি সেই মন্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, উহা "ভূমা ভেদনে নবোল্লাস' নহে; প্রকারান্তরে কৌশল-বিশেষ দ্বারা "ঈশ্বরত্ব লোপ," বা হিন্দু ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ। কারণ, তোমরা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করিবে না; অপিচ "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" শব্দ দ্বারা যে ঈশ্বরের উপদেশ সাধারণ্যে প্রকাশ করিবে, তাহাও বিচার দ্বারা নশ্বর এবং বিনাশী হইয়া কাচের বাসনের মত" মূলহীন হইবে। ইহা দ্বারা জ্ঞানের আপ্যায়ন, বা তোমাদের সংশয় নিরাকরণ হয়, ভালই; কিন্তু আমরা বলি, এইরূপ সন্দিহ্যমান বাক্য দ্বারা সংশয়-দূরীকরণ দূরের কথা, ঈশ্বরলোপী বাক্যবিন্যাসে, হিন্দু এই সকল হইতে দূরে থাকিবে সন্দেহ নাই।

অতএব, জ্ঞানের আপ্যায়ন বা সংশয় নিরাকরণ জন্য হিন্দুকে অতঃপর নিশ্চয়ই চিন্তা করিতে হইবে যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সমবায় এই চারিটী পদার্থ ব্যতীত দৃশ্যমান জগতে আর কোন পদার্থের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী কি না! যাহা দ্বারা ঈশ্বরের নিত্যত্ব সমর্থন অনায়াসসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।
সন্তোষপুর, হুগলী।

—:0:—

উপহার

১

নম নম প্রভো! নম নারায়ণ,
নমামি দেবতা করুণা আধার।
ভকতবৎসল, অতুল, মহান,
ও রাঙ্গা চরণে নমি শতবার॥

২

তরুণ অরুণ চরণ কিরণ—
পরশে ভাতিল তমোময় হৃদি।
পতিতপাবন, অধমতারণ,
মঙ্গল কারণ পাঠাইলা বিধি॥

৩

শরত সুখদ নবীন প্রভাত—
নবীন উদ্যমে পূরিত ভবন।
কোন পুণ্যফলে এ দীন কুটিরে,
বাসনা পূরাতে শুভ আগমন॥

৪

পবিত্র হইল অধম কুটির
পুণ্যের প্রতিভা গৃহেতে উদয়।
ধ্যানে চিন্তি যাঁরে না পাই সন্ধান,
সেই সত্য প্রভু আপনি সদয়॥

৫

চিন্তিত এ শ্রান্ত হৃদয় নিলয়,
স্নেহের অনলে দহিছে সতত।
প্রভুর করুণা অমিয় আশীষে,
হইল মোদের পূর্ণ মনোরথ॥

৬

জীবের মঙ্গল সাধিতে যতনে,
বিশ্বব্যাপী প্রভু ভূত ভাবি জ্ঞান,
তাড়িতের সম আনিয়ে বারতা,
করিলেন মোরে অভয় প্রদান॥

৭

আজি পাইলাম মঙ্গল বারতা,
হৃদয়ে উথলে আনন্দ অপার।
কল্পনার সূত্রে ভকতি কুসুমে,
চরণে অর্পিনু প্রীতি-ফুলহার॥

৮

পুলকে ভ্রমিয়া হৃদয় কাননে
ভকতি কুসুম করিনু চয়ন।
সজ্জিত করিনু এ নব কুসুম
পূজিতে প্রভুর যুগলচরণ॥

প্রণতা
শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দেবী।

:0:

ধীর

অভ্যন্তরে মহারোগ যে বেশ্যার রয়,
জেনে শুনে কেবা তার সমাগত হয়?
ইহলোকে, পরলোকে ভোগ্য বস্তু যত,
রোগগ্রস্থ রূপবতী তারা বেশ্যামত,
যৌবনের মদে মত্ত কামাতুর জনে,
স্বীয় দোষ ঢাকি লুব্ধ করে প্রলোভনে।

ভোগ্য বস্তু পরিণামে দোষের আকর,
যেবা জানে সেই ধীর তার কিসে ডর?
স্বর্গ রাজ্যে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু রয়,
সে সকল ভোগে যার আকাঙ্ক্ষা না হয়,
কি অনিত্য, কিবা নিত্য, যে করেছে স্থির,
তরী বিনা ভবার্ণব তরে সেই "ধীর"।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

—:0:—

সুখ-তত্ত্ব

(৩)

যাহা যাহা সমস্ত জগতে কর্ম্মময় জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, আব্রহ্ম-স্তম্ভব্যাপী সেই আনন্দসত্তা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি প্রকৃতিতে রজস্তমো মল অপসৃত হইয়া সত্ত্ব-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের অভিব্যক্তি এবং ঐ সত্ত্বেরই পূর্ণতা ও লীনতায় আনন্দরূপ ভগবদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানের উপর প্রণিধান করিয়া পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা জগতের জড়ভাগ ও চেতন ভাগের কতক অংশের বিচার করিতে পারিয়াছি। চেতন রাজ্যের অবশিষ্ট ভাগ লইয়া আজিকার আলোচনায় মনোনিবেশ করিব।

তৃণ, তরু, পশু, পক্ষী ও মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ব্যতীত জগতের সমস্তকে লইয়া যে একটা মহাশক্তি, তাহাকে দার্শনিক ভাষায় বিরাট প্রকৃতি (১) বলা হইয়াছে। ঐ বিরাট বা সমষ্টি প্রকৃতির উচ্চাবচ স্তরভেদ অনুসারে ঊর্দ্ধ এবং অধোলোকেও আনন্দসত্তা বিকাশের তারতম্য রহিয়াছে; অর্থাৎ বিশ্বপুরুষের (১) নাভিদেশের উপরি ভাগ ও প্রকৃতির বিরাট নিম্ন ভাগ হিসাব অঙ্গেও আনন্দের করিয়া অনন্ত কোটী ক্রমবিকাশ ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ত ঊর্দ্ধলোক * এবং সপ্ত অধোলোক* কল্পনা করা হইয়াছে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি রাজ্যের অন্তর্গত হওয়ায় সেই সমস্ত লোকের ঊর্দ্ধ বা অধঃস্থিতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ অনুসারেই নির্দ্দিষ্ট; সুতরাং যে সকল জীবের [illegible] লোক সমূহের মধ্যে আপন কর্ম্ম-সংস্কার অনুসারে [illegible] লোকে গমন করিবে, তাহাদের [illegible]। ও প্রাক্তন সংস্কার সেইরূপ সাত্ত্বিক [illegible] ভাবাপন্ন হইবে। অতএব ঐ সমস্ত ভূর্লোক [illegible]

(১) পুরুষ প্রকৃতির শব্দের [illegible] হইলেও এস্থলে বিরাট রূপে একই ভাবে গৃহীত হইয়াছে।

* ভূ, ভুব, স্ব, জন, তপ, মহ, ও সত্য,—সপ্ত ঊর্দ্ধলোক। অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল— সপ্ত অধোলোক। এই লোক সমূহের আধিভৌতিক বা স্থূলসত্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সত্তা বিজ্ঞানসম্মত।

জীবগণের সুখদুঃখভোগও সেই পরিমাণেই হইবে। প্রকৃতির যে অংশ অতি ঘৃণ্য নরক বলিয়া খ্যাত, তাহা একেবারে নিম্ন ভাগে হওয়ায় ভয়ানক তমোময়; কাজেই আনন্দ সেখানে অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছে। এইজন্যই নারকীয়-জীবন দুঃখময় হয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সে ভীষণ যন্ত্রণা, সে মর্ম্মন্তুদ যমদূত তাড়না ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাহারও ধারণায়ও আসিবার নহে। পুরাণ আদি শাস্ত্রে ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ যেরূপ ভাবে নারকীয় চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যমদূতগণ কখনও পাপীকে প্রজ্বল্যমান বহ্নির লেলিহান জিহ্বায় সবেগে আহুতি প্রদান করে, কখন প্রদীপ্ত অঙ্গাররাশি দ্বারা উত্তপ্ত তাম্রপাত্রে দাঁড় করাইয়া রাখে, নারকী তথায় তীব্র বহ্নি দ্বারা দহ্যমান হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে, ঐ অবস্থায় পরিধাবমান পাপী পথে কোথায়ও ক্ষেপা কুকুর সমূহের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে দষ্ট হয়, কোথায়ও বা বিষধর সর্পদংশনে আপাদ-মস্তক হলাহলে জর্জ্জরিত হয়, আবার কোথায়ও করপত্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া সমস্ত অঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। স্থানান্তরে ঘটীযন্ত্রের* ন্যায় এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। উপরি-বর্ণিত নানাবিধ যাতনা ভোগের পর কঙ্কালরূপে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকেও ঊর্দ্ধপাদ-অধোমুখে ঐ যন্ত্রে আবদ্ধ করিয়া ঘুরাইতে থাকে, যাহাতে ঐ ভাবে ঘূর্ণ্যমান পাপীর চোক-মুখ দিয়া রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়* ইত্যাদি।

নরক-যন্ত্রণা

এই ত গেল সমষ্টি প্রকৃতির নিম্নস্তর বা নরকের দুঃখ। আবার যাহা প্রকৃতির উচ্চ স্তরে স্থিত, তাহাতে সূক্ষ্মতত্ত্বের আধিক্য থাকায়, সত্ত্ব-বিলাসের বাহুল্য বিধায় উহার বাহ্য ও অন্তর্দৃশ্য সমস্তই আনন্দ-বিলাসবহুল হইয়া থাকে। এইজন্য স্বর্গাদি উচ্চলোক সকল আপেক্ষিক সুখদ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক জীব সাধনাবলে প্রকৃতির উচ্চস্তরের দিকে যত অগ্রসর হইবে, ততই তাহার আনন্দ-সত্ত্বা ক্রমো-বিকাশ লাভ করিবে। এইরূপে ভূ ও ভুবর্লোকের অধিবাসিগণ যখন নিজ স্তরের কর্ত্তব্য পূর্ণভাবে সম্পাদন করিয়া পূর্ণ সত্ত্বের প্রতি উপোষিত হৃদয়ে তাকাইয়া থাকিবে, তখন তাঁহাকে স্বর্গাদি লোকপ্রবাসী দেবপুরুষগণ সসম্ভ্রমে নানারূপ অমৃত মধুর স্বাগতবচনে অর্চ্চনা করিয়া তথায় যাইবার জন্য অভ্যর্থনা করিবেন। এই কথাই শ্রুতি গাহিতেছেন,—

স্বর্গাদি প্রকৃতির উচ্চ লোকে আপেক্ষিক সুখ বাহুল্য।

---

*হিন্দুস্থানের বিহার প্রদেশে শ্রমজীবিগণ ক্ষেত্রে জল দিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

*তত্রাগ্নিনা সুতীব্রেণ তাপিতাঙ্গারভূমিনা।
তন্মধ্যে পাপকর্ম্মাণঃ বিমুঞ্চন্তি যমানুগাঃ॥
স দহ্যমান স্তীব্রেণ বহ্নিনা পরিধাবতি।
পদে পদে চ পাদোঽস্য জীর্য্যতে শীর্য্যতে পুনঃ॥
ঘটীযন্ত্রেষু বদ্ধাণ্যে বদ্ধা ভোর-বটী যথা।
ভ্রাম্যন্তে মানবা রক্তমুদ্গীরন্তঃ পুনঃ পুনঃ॥
অস্ত্রৈ মুখ বিনিষ্ক্রান্তৈ নেত্রৈরন্তবলম্বিভিঃ।
দুঃখানি প্রাপ্নুবন্তীহ যান্যসহ্যানি জন্তুভিঃ॥
হা মাত ভ্রাত স্তাতেতি ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
দহ্যমানাঙ্ঘ্রি যুগলা ধরণীস্থেন বহ্নিনা॥ ইত্যাদি

"এহি এহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভি র্বহমানং প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোর্চ্চয়ন্ত্য এষঃ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ।"

এইরূপ সুমধুর আপ্যায়নায় আহুত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক সাত্ত্বিক মহাপুরুষ যেভাবে অবস্থান করেন, শ্রীগীতোপনিষদে তাহার উল্লেখ আছে যথা,—

"তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।"

অর্থাৎ তাঁহারা পুণ্যফলরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগ্য সম্ভোগ করেন। তাঁহাদের সুখ সম্পদ বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে, যে—

সমুখঃ পবনঃ স্বর্গে গন্ধশ্চ সুরভি স্তথা।
ক্ষুৎপিপাসা শ্রমো নাস্তি ন জরা নচ পাতকম্॥

নন্দন কাননের বকুল, চম্পক, বেল, মালতী যুথী প্রভৃতি সুরভি কুসুমের সৌরভবাহী মারুত স্বর্গবাসীর শ্রান্তি অপনোদন করিয়া আপাদমস্তক শীতল ও স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। তথায় ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য হেতু ক্ষুধা, পিপাসায় কাতরতা নাই, অচিরাৎ জরামরণেরও ভয় নাই। এইরূপে মিমাংসাদর্শন বলিয়াছেন—

যন্ন দুঃখেন সংভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতং যৎ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

"অপাম সোম অমৃতা অভূম" ইত্যাদি। স্বর্গীয় সুখে দুঃখের লেশমাত্রও নাই। প্রাণে ইচ্ছার উদয় হইবামাত্রই ভোগ্য-বস্তু সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

স্বর্গাদি উন্নত লোক সমূহের বিভিন্ন সুখ-সম্পদের ভোগ-বিলাসের কথা লইয়া বৃহদারণ্যকোপনিষদ বলিতেছেন, মনুষ্যলোকে যে নরপতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সমস্ত ভোগ্য বস্তু যুক্ত, তিনি ঐহিক ভোগজনিত সম্যক আনন্দ প্রাপ্ত হন, এবং পিতৃলোকবাসী জীবগণ উঁহার শতগুণ অধিক আনন্দ লাভ করেন। এই সিদ্ধান্তে ক্রমশঃ পিতৃলোক অপেক্ষা গন্ধর্ব্বলোকে, গন্ধর্ব্ব লোক অপেক্ষা কর্ম্ম দেবলোকে, কর্ম্মদেবলোক অপেক্ষাও আজান দেবলোকে শত গুণে বর্দ্ধিত আনন্দসত্তার অনুভূতি হইয়া থাকে। এবং যে শ্রোত্রিয় নিষ্পাপ অকামহত পুরুষ সাধনা বলে প্রজাপতিলোকে গমন করিতে সক্ষম, তিনি আজান দেবলোক অপেক্ষায় শতগুণ অধিক আনন্দের অধিকারী হইবেন। আর পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লোকের আনন্দ, ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মলোকবাসীর নিকট—অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয় *। গুণত্রয়ের বিকাশ তারতম্যই যে উপরোক্ত ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধতর, ঊর্দ্ধতম লোক সমূহে আনন্দ অনুভূতির পার্থক্যের কারণ, এখন তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। আজ এই স্থানেই সাধুহৃদয় পাঠকপাঠিকাদের নিকট বিদায় লইতেছি। অগামীবারে পূর্ব্বোক্ত

* "স যো মনুষ্যানাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি অন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈ মানুষ্যকৈ র্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ মনুষ্যানাং পরমানন্দোহথ যে শতং মনুষ্যানাং আনন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিত-লোকানাং আনন্দোহথ। যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানাং আনন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দোহথ। যে শতং গন্ধর্ব্বলোকানন্দাঃ এষঃ কর্ম্মদেবানা মানন্দো যে চ কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পাদ্যন্তে অথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজান দেবানামানন্দাঃ স এক প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োহ বৃজিনোহ কামহতোহথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দ।

সমুন্নত স্বর্গাদি লোক সমূহের অবস্থানও নিরবচ্ছিন্ন শান্তিদায়ক নহে, প্রত্যুত ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য্য হেতু সমধিক ঈর্ষা, দ্বেষ ও দম্ভপূর্ণ সে বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিবার মানস রহিল। হায় মা জগদম্বিকে! আর কত দিনে আমাদের চিত্তের বিক্ষোভ দূর করিয়া দিবে, "প্রসন্না", "বরদা" রূপে নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে বলিয়া মা তোমায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

শ্রীচন্দ্রকান্ত কাব্য-সাঙ্খ্যতীর্থ,
বেদান্তশাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

—:0:—

যোগানন্দ লহরী

বিভাস (২২) যৎ

আদ্যাশক্তি মহাকালী কালভয়বারিণী।
মহাকাল বিমোহিনী কালী কৈবল্যদায়িনী॥
দিগম্বরী মুক্তকেশী, করে শোভে ভীম অসি,
মুখে অট্ট, অট্ট, হাসি, ত্রাসিছে ত্রিলোকবাসী;
ঘোরা করালবদনী, কালরাত্রি, কপালিনী,
উগ্রচণ্ডা, মহাদেবী, দৈত্যকুলবিনাশিনী॥
লক্ লক্ লোলরসনা, কড়্মড়্ ঘোরদশনা,
ধ্বক্ ধ্বক্ ভীমনয়না বিশ্বত্রাসকারিণী;—
রণরঙ্গে উন্মাদিনী, নৃমুণ্ডমালাশোভিনী॥
আসবেতে উল্লাসিনী, তাণ্ডব নৃত্যকারিণী,
ধিয়া ধিয়া নাচে বামা, কত রঙ্গে নাহি সীমা,
সচকিতে বিশ্ববাসী, হেরে প্রেমতরঙ্গিনী॥
শম্ভু-বক্ষবিহারিণী, অয়ি বিশ্ব-প্রসবিনী
দীনে কৃপা কর মাগো, বরাভয়প্রদায়িনী;—
জ্যোতির্ম্ময়ী মাতা তুমি, চিদানন্দ স্বরূপিনী
ব্রহ্মময়ী তারা তুমি, জ্ঞান-ভক্তিবিকাশিনী,
বিহর যোগেন্দ্র হৃদে মোহ-তমবিনাশিনী
ব্রহ্মানন্দে মাতাও মাগো প্রেমানন্দদায়িনী॥

—:0:—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব সংবাদ

ধর্ম্মরহস্তবিৎ যদু নির্ভয়ে বিচরণশীল কোন এক পণ্ডিত যুবা অবধূতকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে ব্রাহ্মণ! হে অবধূত! যাহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি বিদ্বান হইয়াও বালকের ন্যায় ভ্রমন করিতেছ, অকর্ত্তা তোমার নির্ম্মল বুদ্ধি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? প্রায়শঃ মনুষ্যের আয়ু, যশ ও মঙ্গল-কামনা-হেতুতেই ধর্ম্মে, অর্থ-কামে ও আত্মবিচারে চেষ্টিত হইয়া থাকে; কিন্তু তুমি সমর্থ, পণ্ডিত নিপুণ, সৌভাগ্যশালী ও মিতভাষী হইয়াও জড়, উন্মত্ত এবং পিশাচের ন্যায় নিকর্ম্ম, নিস্পৃহ। লোকসকল কামলোভরূপ দাবানল দ্বারা দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু তুমি অগ্নিমুক্ত হইয়াও গঙ্গাজলস্থিত হস্তীর মত তাপিত হইতেছ না। হে ব্রহ্মণ! তুমি কলত্ররহিত ও বিষয়ভোগে স্পৃহাশূন্য, তোমার আত্মানন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে বল। ভগবান কহিলেন, সেই মহাভাগ ব্রহ্মণ, ব্রাহ্মণের হিতাকাঙ্ক্ষী সুমেধা যদু কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত ও পুজিত হইয়া বিনয় নম্রাদি সদ্‌গুণে ভূষিত রাজাকে কহিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনি বুঝিয়া অনেককে গুরু করিয়াছি; "উপদেশ করিব" বলিয়া তাঁহারা আমাকে উপদেশ করেন না, যাঁহাদিগ হইতে বুদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছি, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর,—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর গজ, মধুহা, হরিণ, মীন, পিঙ্গলা, কুরু, বালক, কুমারী, শরকার, সর্প, উর্ণনাভ ও প্রজাপতি পতঙ্গ। রাজন্! আমি এই চতুর্ব্বিংশতি গুরু অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের আচরণ দ্বারা আমার নিজের গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য শিক্ষা করিয়াছি। হে নহুষনন্দন! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহা হইতে যেরূপে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। পীড়াকর ভূতগণ দৈবের বশবর্ত্তী—ইহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতব্যক্তি পদবী হইতে বিচলিত হইবেন না,—পৃথিবী হইতে এই নিয়ম শিক্ষা করিবেন। সাধু ব্যক্তি পর্ব্বতের নিকটেই নিরন্তর পরোপকার ব্রত শিক্ষা করিবেন। এইরূপ বৃক্ষের নিকট আত্মার পরাধীনতা শিক্ষা করিবেন। মুনি-জ্ঞান বিনষ্ট না হয়, এইজন্য কেবল প্রাণবৃত্তি দ্বারাই তুষ্ট থাকিবেন। বাক্য ও মনকে বিক্ষিপ্ত করিবেন না। যোগী সর্ব্বত্র নানা ধর্ম্মশীল বিষয় সকল সেবা করিয়াও গুণ এবং দোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখিয়া বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিবেন। আত্মদর্শী যোগী সংসারে পার্থিব দেহসকলে প্রবিষ্ট এবং সেই সকলের গুণাশ্রয় হইয়াও গন্ধসমূহের সহিত বায়ুর গুণগানে বস্তুতঃ অসংসৃষ্ট থাকিবেন। মুনি, দেহের অন্তর্গত হইয়াও ব্রহ্ম-স্বরূপতা বোধ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি সমুদায় দেহে সম্বন্ধ থাকায় ব্যাপক, বিস্তৃত আত্মার, আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা ভাবনা করিবেন। আকাশ যেমন বায়ুচালিত-মেঘাদিতে সম্বন্ধ হয় না, তেমনি পুরুষ তেজ, জল ও পৃথিবীময় কামসৃষ্ট গুণ সকলের সহিত স্পৃষ্ট হন না। রাজন্! যোগী জলের ন্যায় নির্ম্মল, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ,

মধুর ও তীর্থভূত হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা দ্রষ্টা প্রভৃতিকে পবিত্রীকৃত করেন। তেজস্বী, দীপ্ত, দুর্দ্ধর্ষ, পরিগ্রহশূন্য, সংযতাত্মা, মুনি অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভোজী হইয়াও মল গ্রহণ করেন না। অগ্নির ন্যায় কখন প্রচ্ছন্ন কখন বা ব্যক্ত হইয়া, ভূত, ভবিষ্যৎ অশুভ দহনপূর্ব্বক দাতাদিগের নিকট হইতে সর্ব্বত্র ভোজন করিয়া থাকেন। অগ্নি যেমন দারুসংশ্লিষ্ট হন, আত্মা তেমনি মায়া-সৃষ্ট সদসংস্বরূপ এই বিশ্বে প্রবেশ করিয়াও তন্ময়ভাবে প্রবর্ত্তিত হন। জন্ম অবধি শ্মশান পর্য্যন্ত যে সকল অবস্থা, তাহা আত্মার নহে; যেমন অব্যক্তগতি কাল, চন্দ্রের কলা সকলেরই বৃদ্ধিহ্রাস করিয়া থাকে, কিন্তু চন্দ্রমার তাহাতে কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। যেমন শিখা-সমূহেরই উৎপত্তি এবং বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে,—অগ্নির নহে; তদ্রূপ প্রবাহের ন্যায় বেগসম্পন্ন কাল প্রাণীদিগেরই নিত্য উৎপত্তি ও বিনাশ দৃষ্টিগোচর করাইতেছে, আত্মার নহে। যেমন সূর্য্য কর-নিকর দ্বারা জলরাশি আকর্ষণ করিয়া যথাকালে পরিত্যাগ করেন, তেমনি যোগী ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া যথাকালে অর্থীদিগকে তাহা প্রদান করিবেন, অথচ স্বয়ং তাহার লাভা-লাভে আসক্ত হইবেন না। যেমন একমাত্র সূর্য্য জলপাত্ররূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন, সেইরূপ স্বরূপে অবস্থিত আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ভিন্নভাবে লক্ষিত হন। কাহার প্রতি অতি স্নেহ বা অত্যাসক্তি করিবেন না, করিলে দীনবুদ্ধি কপোতের ন্যায় দুঃখভোগ করিতে হইবে। কোন এক কপোত অরণ্যমধ্যে বৃক্ষে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া ভার্য্যা কপোতীর সহিত কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিল। গৃহস্থ কপোত, কপোতীস্নেহে বদ্ধচিত্ত হইয়া দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টি, অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ ও বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধি বন্ধন করিয়া থাকিত এবং সেই বনস্থলীতে একত্রিত হইয়া নিঃশঙ্কভাবে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, কথোপ-কথন, ক্রীড়া ও ভোজনাদি করিত। রাজন্! তৃপ্তিদায়িনী, অনুকম্পিতা সেই কপোতী যাহা বাসনা করিত, অজিতেন্দ্রিয় কপোত কষ্ট করিয়াও সেই সেই অভিলষিত বিষয় সম্পাদন করিত। সময় উপস্থিত হইলে কপোতী প্রথম গর্ভ ধারণ করিয়া নিজ স্বামীর সমক্ষে নীড়মধ্যে কয়েকটী অণ্ড প্রসব করিল। নারায়ণের দুর্ব্বিভাব্য শক্তি-সমূহ দ্বারা বিরচিতাবয়ব কোমল-অঙ্গ ও লোম-বিশিষ্ট কয়েকটী পক্ষী সেই সকল অণ্ড হইতে উদ্ভূত হইল। সন্তান-গণের কূজন শ্রবণপূর্ব্বক মধুরভাষণ দ্বারা প্রীত হইয়া পুত্রবৎসল স্ত্রী পুরুষ তাহাদিগের পালন করিতে লাগিল। পিতা-মাতা মহা আনন্দিত, তাহাদিগের সুখস্পর্শ পক্ষ, কূজন, মুখভঙ্গী এবং প্রত্যুদগম হইতে আমোদ পাইতে লাগিল। তাহারা হরির মায়ায় পরস্পর স্নেহে বদ্ধহৃদয়, দীনবুদ্ধি এবং বিমোহিত হইয়া শিশুসন্তানদিগকে পালন করিতে লাগিল। একদা পিতা-মাতা তাহাদিগকে আহারের নিমিত্ত বহির্গমন করিয়া অনেকক্ষণ সেই কাননে বিচরণ করিল। ইত্যবসরে কোন এক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই কপোত শাবকদিগকে তাহাদিগের কুলায়-সমীপে বিচরণ করিতে দেখিয়া জাল বিস্তারপূর্ব্বক ধারণ করিল। সন্তান পোষণ-সমুৎসুক কপোত কপোতী আহার লইয়া নিজ নীড়ে ফিরিয়া আসিল। কপোতী নিজ বালক সন্তানদিগকে জালবদ্ধ দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে চীৎকার করিতে করিতে রোরুদ্যমান শাবককুলের অনুসরণ করিতে লাগিল। বিষ্ণুর মায়ায় বার বার স্নেহপাশে

বদ্ধ কাতরহৃদয়ে সেই কপোতী শিশুদিগকে বদ্ধ দেখিয়া স্মৃতিভ্রংশবশতঃ নিজে সেই জালে বদ্ধ হইল। আপনা হইতেও প্রিয়তর আত্মজদিগকে এবং আত্মসদৃশী ভার্য্যাকে জালে বদ্ধ দেখিয়া কপোত অতি দুঃখিতভাবে বিলাপ করিতে লাগিল,—অহো আমি অতি অল্পপুণ্য ও দুর্ম্মতি, আমার দুর্গতি দেখ! গৃহস্থাশ্রমে তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইতে না হইতেই আমার ত্রিবর্গসাধন গৃহ নষ্ট হইল। আমার অনুরূপা, অনুকুলা, অতি প্রিয়তমা ভার্য্যা যখন আমাকে শূন্য গৃহে পরিত্যাগ করিয়া সাধু-পুত্রগণের সহিত স্বর্গে গমন করিতেছে, তখন আমি দীন, হতদার, হতপুত্রকাতর ও দুঃখজীবী হইয়া কি জন্য শূন্যগৃহে জীবন ধারণপূর্ব্বক বাস করিব? মূর্খ ও দুঃখিত কপোত সেই দারা-পুত্রদিগকে জাল আবৃত ও মৃত্যুগ্রস্থ হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিয়াও সেই জালে পতিত হইল। ক্রূর ব্যাধ গৃহমেধী কপোত, কপোতী ও কপোত শাবকদিগকে লাভ করিয়া চরিতার্থ ভাবে গৃহে প্রতিগমন করিল। যে ব্যক্তি এইরূপ কুটুম্বী, অশান্ত হৃদয় ও গৃহসেবী হইয়া অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ কটু স্বপোষণ করে, সে ঐ কপোতপক্ষীর ন্যায় এইরূপ দুঃখিত হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন হয়। মোক্ষের উদ্‌ঘাটিত দ্বার মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি পক্ষীর ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়, শাস্ত্রে সেই মূঢ় "আরূঢ়চ্যুত" বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

দীন—কৃষ্ণদাস।

——:0:——

সংবাদ ও মন্তব্য।

আশ্রম সংবাদ। সারস্বত মঠের অন্যতম ব্রহ্মচারী শ্রীমান বরদাচরণ (নরেন্দ্রচন্দ্র) গত বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্স কোর্সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় "রাধাকান্ত" সুবর্ণ-পদকও পুরস্কার পাইয়াছে।

সারস্বতমঠের অন্যতম সেবক শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজদ্বয় প্রচার উদ্দেশ্যে গত কার্ত্তিক মাসে ব্রহ্মদেশ যাত্রা করিয়াছেন, এবং শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ পরিভ্রমনকরতঃ প্রত্যাগত হইয়া মঠের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ সংবাদ। হবিগঞ্জের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের সাহায্যকল্পে যোরহাট হইতে মঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা "সুরমা-ভ্যালি রিলিফ-কমিটী"র সেক্রেটারী মহোদয়ের নামে প্রেরিত হইয়াছে। স্থানান্তরে দাতাগণের নাম প্রকাশিত হইল।

বার্ষিক উৎসব। আগামী ২৭শে অগ্রহায়ণ ১২ই ডিসেম্বর "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের" ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে, আমরা সর্ব্বসাধারণকে উক্ত উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার—আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে" নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের পোষ্টমাষ্টর জেনেরেল বাহাদুরের পার্সন্যাল এসিষ্ট্যান্ট শ্রীযুত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র দত্ত ২৷৷০ শ্রীযুত হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়, লামডিং ১৲ শ্রীযুত কান্তলাল সরকার, শিলিগুড়ী ৫৲, শ্রীযুত চারুবালা দেবী, জয়ন্তী ১৷৷০, জনৈক হিতৈষী ৷৵১০ শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখার্জ্জি, মজঃফরপুর ১৲, শ্রীযুত সারদাপ্রসাদ বানার্জ্জি দ্বারভাঙ্গা ১৲ শ্রীযুত রাখালচন্দ্র সিংহ, দ্বারভাঙ্গা ৵, শ্রীযুত হরিলাল মুখার্জ্জি ৷৷০ জনৈক হিতৈষী ১০৲ একুনে ৩২৵১০ পণ্ডা মাত্র।

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

১ম বর্ষ, } পৌষ। { ৯ম সংখ্যা।

ব্রহ্মনির্ব্বাণমোক্ষ

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্ম ভূতোঽধিগচ্ছতি ॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
কাম ক্রোধ বিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্ম নির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥

"ব্রহ্মনির্ব্বাণমোক্ষ" লাভের অর্থ এই যে—জীব সর্ব্বদাই ব্রহ্ম পদার্থ হইলেও অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায় তাহা বুঝিতে পারে না; এই জন্য "ব্রহ্ম হইতে আপনাকে পৃথক বলিয়া মনে করে; কিন্তু যিনি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে ইহামুত্রফললাভাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনপূর্ব্বক অহৈতুকী ভক্তিযোগে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন অথবা ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধন স্বরূপ শম, দম, বৈরাগ্যাদি গুণ জন্মিবার পর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহকারে নির্গুণ পরব্রহ্মের অন্বেষণ করেন, তিনি নিজ আত্মাতেই পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। "ব্রহ্মই আমি" ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য কোনই পন্থা নাই।

ব্রহ্মজ্ঞ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধা নন্দী ভবতি নান্যথা ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। আত্মবিৎ শোক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ব্রহ্ম রসস্বরূপ, সাধক রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন, অন্যরূপে প্রাপ্ত হন্ না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যে স্বয়ংই ব্রহ্ম পদার্থ ইহা বুঝিতে পারেন। ইহাকেই জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা সনাতন আমিত্বলাভ বলে। এতদ্ব্যতীত মুক্ত অবস্থায় কেহ কোন অপ্রাপ্ত নূতন বস্তু পায় না। রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পভ্রমরূপ অন্ধকার নিবৃত্তি করিতে হইলে, প্রদীপ প্রকাশতুল্য যে জ্ঞান আবশ্যক, তাহার অন্য কোন ফল দেখা যায় না অর্থাৎ ঐ জ্ঞান সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি করিয়া রজ্জুর কৈবল্যরূপ ফল ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ফলের জনক হয় না। সেই কৈবল্যাত্মস্বরূপ প্রকাশই জ্ঞানের ফল।

ভুজ্যগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াবৎ স্যাৎ ইতি চেৎ।
ন কৈবল্য ফলে জ্ঞানে ক্রিয়াফলার্থিত্বানুপপত্তেঃ॥

ভোজন ও অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার যেমন অন্যফল দৃষ্ট হয়, আত্মজ্ঞানেরও সেইরূপ ফলান্তর কেন হইবে না? এইরূপ শঙ্কাও হইতে পারে না। কারণ অপার, অসীম জলাশয়কে প্রাপ্ত হইলে লোক আর ক্ষুদ্র কূপাদির জন্য অভিলাষ করে না। কিম্বা যে ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিতে উদ্যত হয়, তাহার যেমন পৃথক ভাবে একখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষেত্র লাভের জন্য প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ কৈবল্যফলপ্রদ জ্ঞানকে যিনি প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকা সম্ভবপর নয়, তাহার যত কিছু প্রয়োজন, তাহা সকলই সেই জ্ঞানের ফল নিত্যানন্দ রূপ মোক্ষের মধ্যেই নিবিষ্ট থাকে। আত্মজ্ঞানের ফল কৈবল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

৮

ঈশ্বরত্বেন কিং তস্য ব্রহ্মেন্দ্রত্বেন বা পুনঃ।
তৃষ্ণা চেৎ সর্ব্বতশ্ছিন্না সর্ব্বদৈন্যোদ্ভবাঽশুভা॥

যদি সমস্ত দীনতার কারণ অশুভ তৃষ্ণা সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া থাকে, তবে আর তাঁহার ঈশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব কিংবা ইন্দ্রত্বে কি প্রয়োজন? তৃষ্ণা থাকিলেই বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে; তাহা হইতেই সমস্ত দৈন্য আবির্ভূত হয়। ঐশ্বর্য্য অজ্ঞান কার্য্য। যাঁহার তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার নিকট ঐশ্বর্য্য-বান্ত অর্থাৎ উদ্গীর্ণ বস্তু তুল্য। বিবেকজ্ঞান-জনিত ঐশ্বর্য্যেও যিনি বীতস্পৃহ হন, তাঁহারই সর্ব্ব প্রকারে বিবেক-জ্ঞান লাভ হয় এবং তখনই তাঁহার নিকট "ধর্ম্মমেঘ" নামক সমাধি উপস্থিত হয়।

শাপানুগ্রহ সামর্থ্যং যস্যাসৌ তত্ত্ববিদ্ যদি।
তন্ন শাপাদি সামর্থ্যং ফলং স্যাৎ তপসোযতঃ॥

অভিসম্পাত বা অনুগ্রহ করিতে যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, তাহাকেও তত্ত্ব-জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করা বিধেয় নহে। যেহেতু অভি-সম্পাতাদি সামর্থ্য তপস্যার ফল মাত্র; তাহা জ্ঞানের ফল নহে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

হিরণ্যগর্ভাদি পদও যাহা হইতে অপকৃষ্ট, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম পুরুষ সাক্ষাৎকৃত হইলে সাক্ষাৎকর্ত্তার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত আত্মার তদাত্ম্যাধ্যাস ভেদ প্রাপ্ত হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধা-তিরিক্ত সদসৎ কর্ম্মসকল ক্ষয় পায়। পরমাত্মাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রমের উপায়ান্তর নাই। যে কালে সাধক সেই স্ব-স্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। আর যে ব্যক্তি তাঁহাতে অবস্থিত না হইয়া তাঁহাকে ভিন্ন বলিয়া জানেন, তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র এবং যম ইহারা ইষ্টপূর্ত্তাদি ধর্ম্মাচরণ করিয়াও জন্মান্তরে তাঁহাকে ভিন্ন ভাবিয়া তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। যিনি ইহলোকে জীবিত থাকিয়া—আমার হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মাই ব্রহ্ম, আমি ইহলোকে মৃত্যুর পর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব" এইরূপ জানেন, তাহার সত্য সত্যই ব্রহ্মলাভ হয়। মানুষ যত দিন না আপনাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, ততদিন তাহার মুক্তি-লাভ হইতে পারে না। যিনি ইহলোকে জীবন্মুক্ত

পরলোকে তিনিই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন।

বিচারেণ পরিজ্ঞাত স্বভাব স্যোদিতাত্মনঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মাবিষ্ণিন্দ্র শঙ্করাঃ॥

ব্রহ্মবিচার দ্বারা নিজ স্বভাব পরিজ্ঞাত হইলে পরমাত্মার প্রকাশ যাহার সম্বন্ধে হয়, তদ্রূপ আত্মবিৎ জীবন্মুক্তের দয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি দেবতারা আকাঙ্ক্ষা করেন।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"

হে সৌম্য! প্রথমে সেই এক অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন।

"তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি।"

ঐ সৎ শব্দ দ্বারা অভিহিত ব্রহ্ম ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন—"আমি বহু হইব," আমি প্রজাসৃষ্টি করিব। কাজেই ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, ব্রহ্মতেই অবস্থিতি ও পরিণামে ব্রহ্মতেই লয় হয়; সুতরাং দেবতা বল, অসুর বল, মানুষ বল, পশু বল, বৃক্ষ বল, পর্ব্বত বল, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম যাহ কিছু বল, সমস্তই ব্রহ্ম। সকলই একই পরমাত্মার দেশকালানুযায়ী বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। অজ্ঞান অবস্থায় ব্যবহারিক জীব; জ্ঞানাবস্থায় পারমার্থিক ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়।

শুক্তিতে যেমন রৌপ্য, রজ্জুতে যেমন সর্প এবং সূর্য্যকিরণে যেমন সলিল-ভ্রান্তি জন্মে, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃই লোকের আত্মাতে জগৎভ্রান্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যা প্রভাবে মানুষ ব্যবহারিক দশায় স্বপ্ন সন্দর্শনের ন্যায় অসৎকে সৎ এবং এককে বহু বলিয়া মনে করিয়া থাকে। প্রাকৃত জীব যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হয়, ততক্ষণ সে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মিথ্যাত্ব জানে না, সে সকলকেই সত্য বলিয়া মনে করে। আত্ম-প্রবোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সকলও তদ্রূপ জানিবে।

অনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মসু নিত্য শুচি সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।

অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান, অশুচিকে শুচি জ্ঞান, দুঃখকে সুখজ্ঞান এবং অনাত্ম পদার্থকে আত্মা জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। ঘুম ভাঙ্গিলে যেমন মানুষের স্বপ্নদৃষ্ট সুখের রাজ্যাদি অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ জীবের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিলেই সকল ভেদাভেদ দূর হইয়া যায় এবং,

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপ বিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্তং তদিতীর্য্যতে॥

এই পরিদৃশ্যমান নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র নামরূপ-বিবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই ব্রহ্ম এইক্ষণও তদ্রূপই অবস্থিত আছেন, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ।

যিনি স্বয়ংই বিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে আর কোন্ করণ দ্বারা জানা যাইবে? আমরা আত্মা দ্বারা সব জিনিষ জানিতে পারি। আত্মা কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। যে নিজে জ্ঞাতা সে কি করিয়া জ্ঞেয় হইবে? যিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আপনাকে আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি সমাধি ভঙ্গে বুঝিতে পারেন, তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বরূপ; আবার ইহার স্রষ্টাও বটে। ঈশ্বরে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় কোনরূপ ভেদ নাই।

ব্যবহারিক দশায় তোমার ইষ্ট, আমার ইষ্ট; কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তুমি যাঁহার

উপাসনা, কর আমিও তাঁহারই উপাসনা করি।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।

সূত্রে মণিগণের ন্যায় সমস্ত জগৎ পরমাত্মায় গাঁথা রহিয়াছে।

যো রাম দশরথকি বেটা, ওহি রাম ঘট ঘটমে-লেটা।

ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সব সে নেয়ারা॥

শ্রীরামচন্দ্র কেবল মাত্র দশরথের পুত্র নহেন, তিনি প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জীব-ভাবেও প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার ঐরূপে অন্তরে প্রকাশ পূর্ব্বক জগদ্রূপে নিত্য প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক, মায়ারহিত নির্গুণ স্বরূপেও নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। এই পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই স্থিত হয়। অতএব শান্ত চিত্তে এই বিশ্বকেও ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিতে হইবে।

সচ্চিদানন্দ এবত্বং বিস্মৃত্যাত্মতয়া পরং।
জীব ভাবমনুপ্রাপ্ত স এবাত্মাসি বোধতঃ॥
অদ্বয়ানন্দ চিন্মাত্র শুদ্ধঃ সাম্রাজ্যমাগতঃ॥

তুমিই সচ্চিদানন্দ! তুমি যে পরমাত্মা তাহা বিস্মৃত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছ, জ্ঞান হইলে সেই অদ্বয়ানন্দ চিন্মাত্র, শুদ্ধ আত্মাই যে তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে এবং সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইবে।

চিত্ত প্রসাদেন বিনাবগন্তুং বন্ধংন শক্নোতি পরমাত্ম-তত্বম্
তত্বাবগত্যা তু বিনা বিমুক্তির্ন সিধ্যতি ব্রহ্ম সহস্রকোটিষু॥

চিত্তপ্রসন্নতা ব্যতীত কেহ বন্ধন এবং পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। তত্বজ্ঞান ব্যতীত সহস্র কোটীবার ব্রহ্মা হইলেও কেহ মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি আপনাকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করেন এবং লোক ও শাস্ত্রের অবিরোধী যথাসম্ভব জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকিয়া ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করেন, যিনি যথালাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া বেদ-বিরোধী কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ ও সচ্ছাস্ত্রানুশীলন করেন, তিনিই মুক্ত হয়েন। তিনিই উপলব্ধি করেন

"চিদাত্মাহং পরাত্মাহং নির্গুণোহং পরাৎপর।"

"আমি চৈতন্যস্বরূপ, আমি পরমাত্মা, আমি নির্গুণ এবং ব্রহ্মা হইতেও উৎকৃষ্ট। এইরূপে আত্মস্বরূপে অবস্থিত হওয়ার নামই

"ব্রহ্মনির্ব্বাণমোক্ষ।"

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

—:0:—

ব্যর্থ

আমি মরম বেদনা মরমে চাপিয়া
যতই তোমাকে ডাকি,
তুমি মরম দুয়ারে লাগাও আগল
আমাকে বাহিরে রাখি।

আমি স্পন্দিত হৃদয়ে, স্খলিত চরণে
তোমাকে দেখিতে আসি,
তুমি চঞ্চল চরণে যাও সরে দূরে
হাসিয়া ঘৃণার হাসি।

আমি দগ্ধ হৃদয়ের দুটী মর্ম্ম ব্যথা
তোমাকে কহিতে চাই,
তুমি আঁখি পালটীতে যাও মিশাইয়ে
কোথা, খুঁজে নাহি পাই।
আমি শুনিয়া তোমার নুপূর-শিঞ্জন
আকুল হরষে ধাই,
তুমি দূর নীলিমায় হও গো বিলীন
আর না শুনিতে পাই।
আমি করি গো বাসনা সতত তোমায়
পাইতে হৃদয় মাঝে,
তুমি অনন্ত অসীম হইবে সসীম
রাজিবে মোহন সাজে।
আমি চাহি গো সতত আমিত্ব আমার
তোমাতে করিতে লয়।
কিন্তু অন্বেষিয়া দেখি হৃদি অন্ধকার
ব্যর্থ মোর সমুদয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

:0:

যোগিবর চম্পানাথজী

আজিকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নেপাল রাজ্যের নাম অবিদিত নহে। নেপাল রাজ্যের উত্তর সীমা অভ্রভেদী হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বসীমা সিকিম প্রদেশ, দক্ষিণসীমা বঙ্গ, বেহার ও অযোধ্যাদেশ এবং পশ্চিম সীমা কুমায়ুন দেশ। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন নেপাল রাজ্যর মধ্যে দাঙ্গদৌখরী নামক একটী প্রদেশ আছে। তথায় চৌঘরা নামক যোগীদিগের একটী আশ্রম আছে। এই আশ্রমের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নেপালের মহারাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। দাঙ্গদৌখরীতে বহু গৃহস্থ-যোগী বাস করিয়া থাকেন। এইস্থানে সন ১৯১১ সংবতে মহেশ নাথ নামে এক গৃহস্থ যোগীর ঔরসে মাতা পার্ব্বতীর গর্ভে চম্পানাথের জন্ম হইয়াছিল। চম্পানাথ বাল্যকালে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ম ছিল। অষ্টম বৎসর বয়সে তাহার উপনয়ন হয়। ঐ সময়ের প্রচলিত রীত্যানুসারে চম্পানাথ পাঠাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে গমন করেন। আলমোড়া জিলার অধিবাসী শিবনাথ ইহাঁর গুরু ছিলেন। যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে চম্পানাথ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন।

এই সময়ে কালের কুটিল কটাক্ষে পতিত হইয়া চম্পানাথের পিতা ও মাতা উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পিতামাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি পিতামাতার বিয়োগজনিত শোকপ্রাপ্ত হইয়া যখন বুঝিলেন, ইহসংসারে সকল জীবকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তখন মৃত্যু যন্ত্রনা হইতে নিস্কৃতি পাইবার উপায় অবলম্বন করা উচিত। এইরূপ চিন্তা দ্বারা চম্পানাথের হৃদয়ে বৈরাগ্যবহ্নি ধিকি ধিকি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতে করিতে পিঠান নামক স্থানে আসিয়া

উপস্থিত হন এবং তত্রত্য ভদ্রকালীর মন্দিরে বাস করেন। তথাকার সেনানিবাসে তাঁহার এক ভগিনিপতি কর্ম্ম করিতেন। তিনি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া যত্নপূর্ব্বক গৃহে লইয়া যান। এই সময়ে চম্পানাথের আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চম্পানাথ একদিন ঘোর নিশাকালে ভাই-ভগিনী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান।

চম্পানাথ এবার লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজনের ভয়ে গভীর অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তিনি কোন সাধুর নিকট শুনিতে পাইলেন,—"নিকটবর্ত্তী কোন বিজন জঙ্গলে বনচণ্ডী বাবা নামে এক অঘোরপন্থী সাধু বাস করিতেছেন। তিনি তন্ত্রমতে সাধন করিয়া থাকেন। তিনি নরমাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ভয়ে তাঁহার ত্রিসীমানায় যাইত না। চম্পানাথ অসমসাহসে ভর করিয়া সেই সাধুর উদ্দেশে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। বহুপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া সাধুর সাক্ষাৎলাভ করেন। পরে তিনি প্রকৃত সাধু কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কিছু দিবস তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। বনচণ্ডীবাবা বস্তুতঃ পরম বৈষ্ণব, ঘোর তপস্বী ও শ্মশানবাসী যোগী ছিলেন। চম্পানাথ নানামতে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন যে, এই সাধু মহারাজ প্রকৃতই যোগী পুরুষ, তখন তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হঠযোগ শিক্ষা করেন। নেতি, ধৌতি প্রভৃতি শোধন-ক্রিয়া, নানাবিধ আসন ও মুদ্রা অভ্যাস করিয়া অষ্ট প্রকার প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে গুরুদেবের আদেশক্রমে সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিধানানুসারে তীর্থ যাত্রা করিতে বহির্গত হন। বার বৎসর কাল নেপাল রাজ্যে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া যোগাভ্যাস করিয়া চম্পানাথ পাটনে অবতরণ করেন। এই সময়ে পাটনে প্রতিবৎসর একটী করিয়া মেলা হইত। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ঐ মেলা উপলক্ষে তথায় আগমন করিতেন। পাটনের মেলায় তিনি মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলে মাংসাশী তান্ত্রিক সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করেন।

পাটন হইতে বাহির হইয়া তিনি ভারতের নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া নর্ম্মদাতীরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় আচার্য্য আনন্দগিরির সাক্ষাৎলাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। বেদান্তবিদ্যায় স্বামী আনন্দগিরির অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সাধুগণের আচার্য্যপদে বরিত হইয়াছিলেন। চম্পানাথ তাঁহার নিকট সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র ও যোগমার্গ-নিদর্শক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরন্তু মহাত্মা আনন্দগিরির পরামর্শে হঠ-যোগাভ্যাস ত্যাগ করিয়া রাজযোগের পন্থা অবলম্বন করেন। সাধুশ্রেষ্ঠ আনন্দগিরি যোগিরাজ চম্পানাথের সমাগমে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন এবং দুইজনে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরস্পর আনন্দিত হইতেন। কয়েক বৎসর নর্ম্মদা তীরে বসবাস করিয়া চম্পানাথ উজ্জয়িনী নগরে গমন করেন।

তথা হইতে মালব, গুজরাট, করাচী ও পঞ্জাব হইয়া ১৯২৫ সংবতে কাশ্মীরে গমন করিয়াছিলেন। জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাশ্মীরেই অতিবাহিত হয়। যোগিরাজ কেবল মাত্র কৌপীন পরিধান করতঃ ভারতের সকল তীর্থ পরিভ্রমন করিয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীরে আসিয়া কৌপীন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরে পৌছিয়া তিনি অমরনাথ মহাদেব দর্শন করিতে সর্ব্বাগ্রে গমন করেন। অমরনাথ দর্শনার্থিগণকে উলঙ্গ হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। চম্পানাথ মন্দির প্রবেশকালে সেই যে কৌপীন ত্যাগ করিলেন, জীবনে আর তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি অমরনাথ দর্শনান্তে মহাদেবের মন্দির-পথে চন্দনবাড়ীতে ছয়মাস পর্য্যন্ত নগ্নদেহে বাস করিয়াছিলেন। এই সময় সাধু চম্পানাথ সম্বন্ধে নানা অলৌকিক যোগবলের কথা লোকমুখে প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ যোগ ও তপোপ্রভাবে তাঁহার অনেক অমানুষী ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। ইনি কাশ্মীরে আপন শিষ্যদিগকে যোগবল দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হন এবং লোকপরম্পরায় তিনি কাশ্মীর অঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ যোগী বলিয়া বিখ্যাত হন।

চম্পানাথজী কখনও কখনও জম্বুর নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতেও বাস করিতেন। এই সময়ে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় জনসমাজে প্রচারিত হওয়ায় তৎকালের জম্বুর মহারাজ শ্রীরণধীর সিংহ বাহাদুর যোগিরাজকে স্বচক্ষে দর্শন করিতে বাসনা প্রকাশ করেন। ১৯৩২ সম্বতে মহারাজ শ্রীগঙ্গাধর মন্দিরে চম্পানাথের দর্শন লাভ করেন। সাধু মহারাজের যোগীজনোচিত পবিত্র-মূর্ত্তি এবং জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া জম্বুমহারাজ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে যোগীরাজকে বলিলেন, স্বামিন্! এই দুরন্ত শীতকালে সকলেই বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদান করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনি কঠোর শীত-ঋতুতে অনাবৃত গাত্রে দিবারাত্র যাপন করেন। আমি অনুরোধ করি যে, আপনি গাত্রবস্ত্র গ্রহণ করিয়া শীত হইতে দেহ রক্ষা করুন।" স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ এই বলিয়া একখানি উৎকৃষ্ট শাল তাঁহার নিকটে রাখিয়াদিলেন। যোগীরাজ তাহা গ্রহণ না করিয়া মহারাজকে বলিলেন, "সমীচীন ব্যক্তি যে বস্তু একবার ত্যাগ করেন, তাহা আর পুনরায় গ্রহণ করেন না। কাশ্মীরের মহারাজ অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাধু সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, মন্ত্রিগণের সহিত তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত হইল যে, ইন্দ্রেশ্বরে একটী সুবৃহৎ মঠ ও তৎ সংলগ্ন একটী সুন্দর পুষ্পবাটিকা প্রস্তুত করাইয়া যোগীরাজের বাসের জন্য দান করা হইবে। তদনুসারে সুবৃহৎ বাটী ও উদ্যান নির্ম্মিত হইলে সাধু চম্পানাথের নামে দান-পত্র লিখিয়া একদা স্বয়ং চন্দনবাড়ীতে যাইয়া জম্বুর ধার্ম্মিক মহারাজ যোগীরাজের চরণতলে অর্পণ করিলেন। এবার চম্পানাথজী তাহা গ্রহণ করিয়া ১৯৩৪ সম্বতে সশিষ্যে ইন্দ্রেশ্বরের মঠে প্রবেশ করিলেন। যদিও তিনি কাশ্মীরে বহু যোগাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, তবুও এই ইন্দ্রেশ্বরের যোগাশ্রমই সর্ব্ব প্রধান। এই স্থানে তিনি শ্রীশ্রীগুরুর আসন ও পাদুকা

স্থাপন করিয়াছিলেন। যোগভ্যাসের জন্য যোগ-পীঠ ও গুহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি অবশিষ্ট জীবনের অধিকাংশ সময় ইন্দ্রেশ্বর যোগাশ্রমেই অতিবাহিত করিতেন। ইনি কাশ্মীর প্রদেশে একটী যোগীসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। গৃহস্থদিগের মধ্যেও তাঁহার শিষ্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সাধুজী পাত্রগুদ্ধির বিলক্ষণ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সাম্প্রাদায়িক আচার ও নিয়ম যিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে প্রস্তুত না হইতেন, তাঁহাকে তিনি যোগশিক্ষা দিতেন না। কিন্তু তিনি উদারচরিতও ছিলেন এবং যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে বা যোগশিক্ষার্থীকে বিমুখ করিতেন না।

কাশ্মীরের হিন্দুসাধারণ মৎস্য-মাংসাশী; যোগিরাজ চম্পানাথজী মৎস্য-মাংসের ব্যবহার রহিত করিবার জন্য শ্রীনগরে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। মৎস্য-মাংস ভক্ষণের দোষ এবং মৎস্য-মাংসাশীর পক্ষে শাস্ত্রযুক্তির অসাংগত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীনগরস্থ পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত বিচারার্থী হন। বিচারে কিন্তু চম্পানাথই পরাজিত হইয়াছিলেন; কারণ পণ্ডিতমণ্ডলী শাস্ত্রাদি সাহায্যে বিচারসভায় প্রমাণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালের প্রায় সকল হিন্দুই মাংসাদি ব্যবহার করিতেন। যাহাহউক গৃহস্থ কর্ম্মিগণের পক্ষে মৎস্য-মাংসাহার দোষাবহ না হইলেও ব্রহ্মচারী ও যোগি-গণের পক্ষে উহা একান্ত নিষিদ্ধ। চম্পানাথ-মহারাজের যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে মৎস্য-মাংস ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যগণও নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিচারে পরাজিত হইলেও যোগীরাজ আজীবন হিন্দুদিগের মধ্যে মৎস্য-মাংসের ব্যবহার রহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন।

যোগীবর ধীর ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আপন যোগাশ্রমস্থ গুহায় অধিকাংশ সময় যোগমগ্ন থাকিতেন। বিশেষতঃ তিনি একাকী নির্জ্জনস্থানে বাস করিতেই ভালবাসিতেন। কিন্তু তিনি নির্জ্জন ভাল-বাসিলে কি হয়, তাঁহার যোগবল ও অমানুষী শক্তির খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, তীর্থযাত্রীর ন্যায় অজস্র জনমণ্ডলী তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রেশ্বরের যোগাশ্রমে আগমন করিত। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রাসাদবাসী মহারাজ হইতে পর্ণ-কুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কেবল কাশ্মীরস্থ ভক্তজনেরাই যে সাধু চম্পানাথের মহিমা বুঝিয়াছিলেন এমন নহে, সিন্ধু, পঞ্জাব গাড়োয়াল, কুমায়ুন প্রভৃতি প্রদেশের বহুলোক এবং কাশ্মীরপ্রবাসী নব্য সভ্যতম ও সুশিক্ষিত হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। তিনি কয়েকবার উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ও দেশীয় সর্দ্দারগণের সমক্ষে স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি জলের উপর দিয়া হাটিয়া বেড়াইতে পারিতেন এবং অবলম্বন ব্যতীত শূন্যে অবস্থিতি করিতে পারিতেন। বহুদিন অনাহারে, অনিদ্রায় কাটাইয়া দিতেন। নগ্নদেহে শীত-বর্ষায় অবস্থিতি করিতেন এবং তিনি সকলের মনের কথাই বলিয়া দিতে পারিতেন। বিনা ঔষধে দুঃসাধ্য কঠিন রোগও আরোগ্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এইসকল অসাধারণ

যোগবল দেখিয়া ঈশ্বরের অংশ ভাবিয়া কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিতেন। চম্পানাথজী সাধন-ভজন ব্যতীত অবশিষ্ট সময় লোককল্যাণ-কর কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল দৃঢ়, সবল ও কার্য্যক্ষম ছিল।

১৯৭২ সম্বতের আষাঢ় শুক্ল চতুর্দ্দশী, রবিবার প্রাতঃকালে ছয়টার সময় যোগীবর চম্পানাথ যোগগুহায় সমাধিস্থ অবস্থায় দেহ-ত্যাগ করেন। মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, অমুক দিনে তাঁহার কাল-পূর্ণ হইবে। ঐ দিন সমাগম হইলে তিনি প্রাতে সূর্য্য উদয়ের প্রাক্কালে যোগগুহায় উপযুক্ত স্থানে আসিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হন এবং স্থিরভাবে দেহত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন। সে সময় বহুলোক উপস্থিত ছিল। কাশ্মীর অঞ্চলে অদ্যাপি যোগিবরের নাম-কীর্ত্তি ও শিষ্যমণ্ডলী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কুমার চিদানন্দ।

—:0:—

লক্ষ্য

কোথা যাও, ফিরে চাও ওরে মূঢ় মন।
চেয়ে দেখ কতদূর হয়েছে পতন॥
কোথা ছিলে, কোথা এলে, কোথা যাও চলে।
মোহের আবর্ত্তে পড়ে গেছ পথ ভুলে॥
চেয়ে দেখ ঊর্দ্ধপানে কি ঐ সুন্দর।
শোভিতেছে শতদলে প্রাণমুগ্ধকর॥
বিমল আভায় তার ধরা আলোকিত।
রূপের ছটায় তার ভুবন মোহিত॥
তদুপরি ছত্রাকারে সহস্র কমল।
ঢাকিয়া রেখেছে তারে জুড়ি নভোস্থল॥
কাছে কিম্বা দূরে থাক্ কি ক্ষতি তাহায়।
সূত্রযোগে এ জগৎ গাথা আছে তায়॥
আজি কিম্বা কালি কিম্বা শতবর্ষ পরে।
জগৎ হইবে লীন তাতে চিরন্তরে॥
আর কিছু নয় উহা জেনে রেখো মন।
জীবনের লক্ষ্য তব "শ্রীগুরুচরণ"॥

দীন—উমেশচন্দ্র।

—:0:—

উপদেশ পঞ্চক

(১)

কুসুম-বিকীর্ণ নহে উন্নতির পথ,
উদ্যম বিহীনে কার পূরে মনোরথ?
শোক দুঃখ বিপত্তির মহা পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইলে নর চির শান্তি পায়।

(২)

ক্ষুধার্ত্ত কুকুর তুষ্ট মুষ্টি অন্ন পেয়ে,
জ্ঞানান্ধ মানব ব্যস্ত অন্ন-বস্ত্র নিয়ে।
ভোগ্যবস্তু কাকবিষ্টা তুল্য যার পাশে,
সে জন সক্ষম সুধু অবিদ্যার নাশে।

(৩)

পদস্থের অত্যাচারে অপদস্থ ...
বিধির বিধানে স্বর্গে শাস্তি ... ।
অভ্রান্ত বিচারকর্ত্তা ভগ...
অনাথের মর্ম্ম-ব্যথা অলক্ষি...
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হয়,
বিশ্বজনীন শাসনদণ্ড তার উপরে রয়।

(৪)

প্রকৃতির মহাগ্রন্থে ঈশ্বরের বিধি,
সুস্পষ্ট অঙ্কিত, সাধু হেরে নিরবধি।

(৫)

কামিনী কাঞ্চন ছেড়ে কালী বল ভাই,
কলিকালে কালী নাম সম কিছু নাই
কতকাল বল জীব যমে দিবে ফাঁকি ?
কালী কৃষ্ণ নাম জপ, যে কদিন বাকী।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু।

—:0:—

বৈদিক প্রসঙ্গ

(২৭)

[উত্তর পক্ষের কথা] এক্ষণে কথা হইতেছে যে,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সমবায় (সম্বন্ধ বিশেষ, বা মিলন) এই চারিটী পদার্থ ভিন্ন দৃশ্যমান জগতে আর কোন কিছু পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষপ্রমাণ মধ্যে গ্রহণ করা যায় কি না, আমাদের পক্ষ হইতে ঐ কথাটীর কোন কিছু স্থির নিশ্চয় হইলে, বিশ্বাতীত পরম বস্তুর (পূর্ণ পরব্রহ্মের) নিত্যত্ব সমর্থন "একরূপ" দৃঢ় হয়। অপিচ, (পূর্ব্বপক্ষবাদীর) "ভূমাভেদনে ...বোল্লাস ঘটিত" আপত্তি পণ্ড হইয়া যায়।

একটু প্রণিধান করিয়া দেখ,—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ পদার্থে অস্তিত্ব, ব্যবহারিক জগতে—সাধারণের "একরূপ" প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যখন ঐ পদার্থগুলি আমরা প্রত্যক্ষরূপে গ্রহণ করি, তখন তাহা সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মনে কর, জল একটী দ্রব্য; যখন আমরা জল নামক দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন বাস্তবিকই আমরা জলকে জলরূপেই গ্রহণ করি। জল বলিলে, বৃক্ষাদি পদার্থ গ্রহণ করি না, বা বৃক্ষাদির উপলব্ধি হয় না। রূপ, একটী গুণবাচক পদার্থ; যখন আমরা "রূপ নামক" গুণের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন শ্বেত, পীত, লোহিত ইত্যাদি রূপের অস্তিত্ব বাস্তবিকই আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয়। রূপ বলিলে,—প্রস্তর, লৌহ ইত্যাকার পদার্থ মনে হয় না। "গমনাগমন" একটী কর্ম্ম; যখন আমরা গমনাগমন নামক কর্ম্মের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি, তখন সাধারণের গমনাগমনই আমাদের সত্য বলিয়া বোধগম্য হয়। গমনাগমন বলিলে,—শয়ন, উপবেশন ইত্যাদির বোধ হয় না। অতএব দেখা গেল যে,—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ পদার্থ ব্যবহারিক জগতে সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব সদ্রূপে প্রতীয়মানত্ব,—অর্থাৎ সত্য বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতীত হওয়া,—দ্রব্য, গুণ ও

কর্ম্ম নামক পদার্থের একটী সাধারণ ধর্ম্ম।

অতঃপর, একটু অগ্রসর হইয়া দেখ,—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম নামক পদার্থ যখন ব্যবহারিক জগতে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তখন সত্য নামক কোন পদার্থ অবশ্যই ঐ দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম পদার্থত্রয়ে আছে। অন্যথায়, যদি সত্য নামক কোন পদার্থ আদৌ না থাকিত, তাহা হইলে ঐ পদার্থগুলি লৌকিক জগতে ক্ষণকালের জন্যও সত্য বলিয়া প্রতীত এবং ব্যবহৃত হইত না। অতএব, ঐ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পদার্থই সাক্ষ্য দিতেছে যে, আমাদের সহিত সত্য নামক কোন একটী পদার্থ নিশ্চয়ই আছে; সুতরাং, সত্য নামক আর একটী পদার্থের অস্তিত্ব, "একরূপ" দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পদার্থ দ্বারাই সিদ্ধ হইল। অতএব, ঐ সত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার, অনন্যকর্ত্তব্য। তবেই দাঁড়াইল যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমবায় ও সত্য নামক আর একটী পদার্থ,—অর্থাৎ পাঁচটী পদার্থের অস্তিত্ব, দৃশ্যমান জগতে সাধারণের "একরূপ" প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ।

এক্ষণে দেখ, আমরা ঐ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পদার্থ, যেরূপ সত্য বলিয়া গ্রহণ করতঃ লৌকিক কার্য্যে ব্যবহার করি,—অর্থাৎ, জলের প্রয়োজনে জলকে, রূপের প্রয়োজনে রূপকে, এবং গমনাগমনের প্রয়োজনে গমনাগমনকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় করতঃ ব্যবহার করি, ঠিক এইরূপ সত্য প্রত্যয় এবং ব্যবহার পৃথিবীর সকল দেশের, সকল স্থানের, সকল লোকেরই আছে;—অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আছে। অতএব, ঐ সত্য প্রত্যয়, সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বলৌকিক, এবং সর্ব্ব-ব্যাপক। "সর্ব্বব্যাপক" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—যতগুলি দ্রব্য পদার্থই থাকুক, যত রকম গুণ পদার্থই থাকুক, আর যত রকম কর্ম্ম পদার্থই হউক, ঐ সত্য, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পদার্থ মাত্রেই ভাসিতেছে; সুতরাং তাহাদের উপর তাহাদিগকে ব্যপিয়া আছে;—অর্থাৎ সর্ব্বত্রই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম পদার্থ মাত্রেই ব্যাপিয়া আছে। এইজন্য ঐ সত্য পদার্থের নাম "সর্ব্ব-ব্যাপক পদার্থ"। সর্ব্বব্যাপক হইলেই, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে; সুতরাং, তাহা সার্ব্বভৌমিক, তাহা সার্ব্বলৌকিক, তাহা সর্ব্বগতং।

দার্শনিক ভাষায়, ঐ সর্ব্বব্যাপক পদার্থের নাম "সামান্য পদার্থ"। অর্থাৎ, যাহা সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে, সেই পদার্থের নামই "সামান্য পদার্থ"; তাহাই ব্যাপক,—বা সর্ব্বব্যাপক। তবেই হইল, সর্ব্বব্যাপক "সত্য পদার্থ," আর সর্ব্বব্যাপক "সামান্য পদার্থ", একই কথা; অক্ষরের ভিন্ন-ভেদ মাত্র। সহজ কথার অনুরোধে, আমরা সামান্য শব্দের পরিবর্ত্তে সত্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। অর্থাৎ, "দার্শনিক ভাষায়" যাহা "সামান্য পদার্থ"—সাধারণবোধ্য করিবার নিমিত্ত তাহাই "সত্য পদার্থ" নামে উল্লেখ করিয়াছি; সুতরাং, এ বিষয়ে মহাশয়দের কোনরূপ আশঙ্কা নাই। পক্ষান্তরে,—ঐ সামান্য পদার্থেরই নামান্তর "সত্ত্বা"। সত্ত্বা, স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ। অনেকে ঐ সত্ত্বা নাম্নী "সামান্য" পদার্থ স্বীকার করেন না। তদুত্তরে আমরা বলি, ইহাতে দোষ কি? কারণ 'সৎ' হইতেই 'সত্ত্বা' হয়; সুতরাং "সৎ" বস্তু ব্যবহারে আসিলে,—অর্থাৎ প্রকাশে

আসিলে,—তাহার "সত্তা" উপাধি অসম্ভব নহে। নহে অভিপ্রায় এই যে, "সৎ" ক্লীবলিঙ্গ বাচক শব্দ;—"নিত্য ব্রহ্ম"। তাহা পুংলিঙ্গও নহে, আর স্ত্রীলিঙ্গও নহে। আবার, ভাবিবার মত ভাবিলে, তাহা ক্লীবলিঙ্গও নহে, শব্দাতীত; সুতরাং, এবম্ভূত শব্দাতীত "সৎ" বস্তু, ব্যবহারে আসিলে—অর্থাৎ প্রকাশ্যে আসিলে, তাহার নাম সংজ্ঞার (উপাধির) বিকার সম্ভাবনা অসম্ভব নহে। সুতরাং, প্রবৃত্তিরূপ অর্থ ভাবনা দ্বারা, সে "সৎ" বস্তু,—সত্য পদার্থ, সামান্য পদার্থ—বা সত্তা নাম্নীপদার্থ, কিম্বা 'পর' জাতি হইলে, দোষ নাই। এক্ষণে আমাদের কথা দাঁড়াইয়াছে —সত্য পদার্থ—(দার্শনিক ভাষায়—"সামান্য পদার্থ") সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগতং

কিন্তু, যে "সত্য" প্রত্যয়টী লইয়া গমনাগমন,—(নামান্তর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পদার্থের "সত্য" প্রত্যয় ত চিরদিন থাকে না, ভাঙ্গিয়া যায়;—"অর্থাৎ ধ্বংস হয়"। দেখ, জল শুকাইয়া যায়; রূপ, নিরূপ হয়; গমনাগমন, "লৌকিক প্রত্যয়ে"—মৃত্যুর কোলে লোপ পায়। অপিচ, এক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে দৃশ্যমান বস্তু সব ধ্বংস হয়। তবে আবার, এ কি ভাব আসিল? অন্য কিছুই নহে; লৌকিক জগতে পার্থিব বস্তুর প্রত্যক্ষীভূত যে "সত্য" প্রত্যয়, তাহা ধ্বংসী এবং বিনাশী; ইহাই প্রতিপন্ন হইল। অর্থাৎ, দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম পদার্থ, আবার সাক্ষ্যপ্রদান করিল যে,—লৌকিক জগতে "ব্যবহারিক কার্য্যে" তাহাদের যে "সত্য" প্রত্যয়, তাহা ধ্বংসী। এরূপ হইলে, সারা জগৎ ব্যাপিয়া,—দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মের যে সার্ব্বলৌকিক ও সার্ব্ব ভৌমিক "সত্য" প্রত্যয়,—অর্থাৎ পার্থিব বস্তুর সর্ব্বব্যাপক যে "সত্য" প্রত্যয়, তাহাও ধ্বংসী এবং বিনাশী হইয়া যায়। কিন্তু, 'অবিনাশী হউক আর নাই হউক', লৌকিক জগতে যখন দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মের "সত্য" প্রত্যয় প্রতীত হইতেছে, তখন অবশ্যই সত্য বলিয়া কোন কিছু আছেই আছে। অতএব, দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম এক পক্ষে একটী সত্য পদার্থের বিজ্ঞাপক। আবার ঐ "সত্য"-প্রত্যয় যখন লৌকিক জগতে চিরস্থায়ী না হইয়া অন্তবান, অর্থাৎ বিনাশশীল;—তখন ঐ দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম অন্যপক্ষে একটী অস্থায়ী "সত্য" প্রত্যয়ের বিজ্ঞাপক। ঐ অস্থায়ী "সত্য" পদার্থটী,—অবশ্যই চিরস্থায়ী সত্য হইতে ইতর বা অপর। অর্থাৎ—সদেতর, বা 'সত্য'-বিশেষ পদার্থ। অতএব, দ্রব, গুণ ও কর্ম্ম পদার্থের আলোচনায়, আবার এমতেও আমরা, একটী অস্থায়ী 'সত্য' বিশেষ (সদেতর)—পদার্থ দেখিতে পাইলাম; সুতরাং, ঐ "বিশেষ" পদার্থটীর অস্তিত্ব স্বীকার, অকর্ত্তব্য নহে।

অন্য পক্ষে আবার দেখ,—জল, রূপ, গমনাগমন (দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম) এই গুলি ব্যবহারিক জগতে আমরা একভাবে দেখি নাই; ভিন্নভেদ দেখি। বেল, জুই, গোলাপ ইহারা একই ফুল; কিন্তু আমরা ভিন্নভাবে দেখি; কাক, বক, চিল ইহারা একই পক্ষী; কিন্তু আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখি; ইহার কারণ কি? একটী বৃক্ষ রোপণ করিলাম; একই বীজ, একই বৃক্ষ; কিন্তু ছোট, বড় নানা রূপ ফল ফলিল;—কেন এরূপ হয়? মৃত্তিকা শিলায় পেষণ করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুবৎ হইয়া যায়।

অনুগুলি সমান; তবে একই সমান অণু সমষ্টিপূর্ণ যে ভূমি, সেই ভূমিতে আলু, বেগুণ কপি, যব, গম, তিসি ইত্যাদি নানারূপ পার্থিব বস্তু উৎপন্ন হয় কেন? ইহার কারণ নানামতে নানারূপ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু, দেখিবার মত দেখিলে, সমস্ত মত এক হইয়া যায়; কেবল আক্ষরিক শব্দের ভিন্ন ভেদ হয় মাত্র। যাই হক, "প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য" আমরা যখন পার্থিব জগতের প্রত্যেক "আপ্ত" পদার্থই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এমন কোন পদার্থ আছে, যে পদার্থ প্রত্যেক বস্তু হইতে প্রত্যেক বস্তুর পার্থক্য রাখে; সেই পদার্থের নামই "বিশেষ পদার্থ"। অতএব, এমতেও আমরা একটী "বিশেষ" পদার্থ দেখিতে পাইলাম।

এইরূপে উভয় মতেই যখন দেখা গেল যে, "বিশেষ" নামক পদার্থটী সর্ব্বত্রই বিদ্যমান,—তখন তাহার অস্তিত্ব স্বীকার ন্যায়বহির্ভূত নহে অতএব, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পদার্থত্রয়ের আলোচনায়, আমরা দেখিতে পাইলাম যে:—

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম সমবায়, সত্য (সামান্য) ও বিশেষ, এই ছয়টী পদার্থই দৃশ্যমান জগতে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান; অপিচ "একরূপ" প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। ইহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার,—কর আর নাই কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তবে এইটুক জানিয়া রাখা ভাল যে,—'পদার্থ'—সাতই হউক, আটই হউক, আর নয়ই হউক;—অথবা পাঁচই বল, চারই বল, আর তিনই বল; ঐ ছয় পদার্থের বহির্ভূত কেহই নহে। এইরূপ দুই-ই বল, একই বল আর প্রবৃত্তিরূপ অর্থ ভাবনা দ্বারা শূন্যই বল;—অথবা নাই-নাই করিয়া উড়াইয়াই দাও,—কোনটাই ছয় হইতে ভিন্ন নহে; ছয়ের অন্তর্ভূত সকলই। বাহ্য জগতের যে দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ কর না কেন, সেই দিকের দৃশ্যমান ও অনুভূয়মান পদার্থ মাত্রেই প্রমাণ করিয়া দিবে যে—

জগৎ, ঐ ছয় পদার্থের ক্রীড়াভূমি মাত্র। জ্ঞানের সাধন, ভক্তির সাধন, আর কর্ম্মের সাধনই বল,—অথবা যোগ-যজ্ঞের উপাসনা, ব্রত নিয়ম ধ্যান ধারণা, "যাহাই তোমার অভিপ্রেত হউক" ঐ ছয় পদার্থ হইতে কেহই ভিন্ন 'নহে', ঐ ছয় পদার্থের সাধনভজনে রমমান থাকিয়া ক্রীড়া করিলে, ক্রীড়ার অন্তে যখন ঐ ছয় পদার্থ ভেদ করিতে সক্ষম হইবে,—অর্থাৎ ষটচক্র ভেদ দ্বারা ছয়ের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইবে,"—তখন তাহার বিশ্ব বিষয়ক সঙ্কল্প অপসৃত হইয়া, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র আপনাতে পূর্ণানন্দ ধারণ অবশ্যম্ভাবী হইবে। যে আনন্দ, বসন্তকালীন সৌরভশালী কুসুমকাননে নাই, দৃশ্যমান জগতে নাই; তাহাই বিশ্বাতীত। অপিচ, তখন নিজের অনুভূত বিষয়ে ইহা এই রূপ,—কি এইরূপ নয়," ইত্যাকার সন্দেহ-জাল ছিন্ন হইয়া, অবশ্যই প্রতিফলিত হইবে যে,—পরিদৃশ্যমান জগৎ, ঐ ছয় অবয়বে অনাদি কাল "একই বিরাট বিশ্ব" রূপে প্রতিবোধিত হইয়া, প্রত্যেক কার্য্যেই অনন্ত নিত্য" "বিশ্বাতীত পূর্ণ পরব্রহ্মের" সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ঐ কথা, কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? ইহাই হইতেছে "পূর্ব্বপক্ষ বাদীর" মূল আশঙ্কাটী নিবারিত হইলে, বিশ্বাতীত নিত্যবস্তুর নিত্যত্ব

সমর্থন নিশ্চয়ই অব্যাহত হয়। অতঃপর আশঙ্কা নিবারণ সম্বন্ধে কি বলি,—শুন।

পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, কাল দিক, আমি (ঔপাধিক আত্মা) ও মন এই নয়টী "দ্রব্য পদার্থ" —অর্থাৎ, দ্রব্য বলিলে, এই নয়টী বুঝিতে হয়;—ইহার কম বেশ বুঝা ঠিক নহে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সংখ্যা, পরিমাণ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা. দ্বেষ প্রভৃতি চবিশটী (মতান্তরে পঁচিশটী) "গুণ পদার্থ, অর্থাৎ গুণ বলিলে এই চব্বিশ বা পঁচিশটী বুঝিতে হয়।—অথবা "আধুনিক পক্ষে" যদ্যপি আরও কিছু অধিক বা অতিরিক্ত থাকে, তাহাও বুঝিতে হয়। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন বা গমনাগমন এই পাঁচটী "কর্ম্ম পদার্থ"। অর্থাৎ কর্ম্ম বলিলে এই পাঁচটীই মুখ্য;—অপিচ, ইহার অন্তর্গত যে সকল "কর্ম্ম" তাহাও বুঝিতে হয়। পক্ষান্তরে, যদ্যপি "আধুনিক মতে ইহার অধিক বা অতিরিক্ত কোন কিছু কর্ম্ম থাকে, "এক কথায়" সমস্ত কর্ম্মই বুঝিতে হয়। তবেই দেখা গেল, এতক্ষণ ধরিয়া যে 'দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম' করা গেল, তাহা আর অন্য কিছুই নহে, কেবল "একরূপ" সারা জগতেরই নামান্তর মাত্র। এই দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম নামন্তর সারা জগতের আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে—

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সমবায় সত্তা (দার্শনিক ভাষায় "সামান্য") এবং বিশেষ (সদেতর) এই ছয়টী পদার্থ, দৃশ্যমান জগতে সাধারণের একরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; সুতরাং, ঐ ছয়টী পদার্থ লইয়াই একই "বিরাট বিশ্ব।"

অতঃপর তোমাদের (পূর্ব্বপক্ষ বাদীর) ঐশ্বর্য্যার্থক ঈশ+বর" শব্দ দ্বারা যিনি "ঈশ্বর," অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী, গুণবান, ক্রিয়াবান,—(নামান্তর সগুণ ও সক্রিয়) "সৃষ্টিকর্ত্তা," সেই "ঈশ্বর" পদার্থটী ক্ষেত্রে আনয়ন কর। ঐ "ঈশ্বর" পদার্থটীর ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ গুণ আছে; গুণ, উল্লিখিত বিশ্বের অন্তর্গত। ক্রিয়া আছে; ক্রিয়াও (কর্ম্ম) ঐ বিশ্বের অন্তর্গত। সুতরাং গুণ ও কর্ম্ম থাকায়, "ঈশ্বর" পদার্থটী দ্রব্য-বং হইল। কারণ দ্রব্য না হইলে গুণ ও কর্ম্ম হইতেও পারেনা। তবেই দেখা গেল, তোমাদের "ঈশ্বর পদার্থটী, দ্রব্য, গুণ ও ধর্ম্মের অন্তর্গত হইল, বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত হইল। বিশ্ব, সাকার বস্তু। সাকরবস্তু মাত্রেই ধ্বংসী;—অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতে সাকার বস্তু চিরদিন থাকিতে কেহ দেখে না; সকলেই সাকার বস্তুর নিধন প্রত্যক্ষ করে। কাজেই, ঐ নিধন বা ধ্বংস সাধারণের প্রত্যক্ষীভূত এবং প্রতায়িত! অতএব, বিশ্ব ধ্বংসী বস্তু হওয়ায়, (মনেকরিয়া লও)—বিশ্বের অন্তর্ভূত ঐ "ঈশ্বর" পদার্থটীর সহিত,—"অর্থাৎ বিশ্ব এবং ঈশ্বর উভয়ই" ধ্বংস হইয়া গেল। "বিশ্ব এবং ঈশ্বর" উভয়ই যখন ধ্বংস হইল, তখন আর বলিতে পার না যে তথায় কোন কিছু আছে। অর্থাৎ, বিশ্ব এবং "ঈশ্বরের" রূপ গেল, গুণ গেল, কর্ম্ম গেল, আপিচ মন গেল, বাক্য গেল অনুমান গেল;—এক কথায় ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই ধ্বংস হইল; বিরাট বিশ্বের সহিত—"ঈশ্বর" ধ্বংস হইয়া গেল; (আপদ চুকিয়া গেল)।

অতঃপর, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ ধ্বংসের ভাবটী কিরূপ? তাহা তোমাদিগকে

নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। তোমরা আর উত্তর করিতে পার না। কারণ, যে কোন বাক্য, শব্দ বা অনুমান দ্বারা উত্তর করিবে, তাহা সৃষ্টির পর না হইলে আর হইতেই পারে না। "বিশ্ব" ধ্বংসের সহিত সমস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; "ঋষি," "মহর্ষি," "ঈশ্বর," কোন কেহই নাই;—মন, বাক্য, কর্ম্ম কোন কিছুই নাই। সুতরাং, ঐ ভাব প্রকাশ করিবার উপায় নাই। অর্থবোধের নিমিত্ত একে একে ধরিয়া যাও। এই ধর, উহাকে আর ধ্বংস বলিতে পার না। কারণ, এই যে "ধ্বংস" শব্দ, এবং ধ্বংস বলিলে যাহা বুঝিয়া থাক,—সেই উপলব্ধি বা জ্ঞান, তোমার দেহ সৃষ্টি না হইলে তো আর হইতে পারে না। অপিচ, বিশ্ব যখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তখন আর তথায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের শব্দ গুলি পর্য্যন্ত নাই; সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তবে আর তুমি কি করিয়া—কি বলিবে! তবেই দেখ, ধ্বংস হইয়া গেলে,—অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তু একবারে ধ্বংস হইয়া "আপদ চুকিয়া" গেলে, আর কোন উপায়েই বলা চলে না যে,—তাহা ধ্বংস কিম্বা নাশ অথবা অন্য কোন কিছু।

এই বার ধর,—ঐ রূপ নিয়মে তাহা আর "অব্যক্ত বীজ" বলিতে পার না; সাম্যাবস্থাও বলিতে পার না। কারণ, লক্ষণও নাই, লক্ষ্যও নাই, আর লক্ষ্যকর্ত্তাও নাই। কাজেই তাহা আর বলিবার উপায় নাই; নির্দ্দেশ করিতেও পার না; সুতরাং, ঐরূপ নিয়মে-তাহা আর প্রকৃতিও বলিতে পার না; পুরুষও বলিতে পার না। আবার ধর,—"ঐ রূপ নিয়মে" তাহা ব্রহ্মাও বলিতে পার না; বিষ্ণুও বলিতে পার না; মহাবিষ্ণু বলাও চলে না। পক্ষান্তরে,—"ঐ রূপ নিয়মে-" প্রলয়, বিলয়, মহা প্রলয়,—কালী, কৃষ্ণ, রাম,—এক কথায় কোন কিছুই বলা চলে না। কারণ, সমস্তই যখন ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে, তখন মন, বাক্য, কর্ম্ম কোন কিছুই নাই; বক্তা, বক্তব্য,—মন্তা, মন্তব্য সবই গিয়াছে। তবে আর কে তোমাকে বলিয়া দিবে যে, এইটীর নাম প্রকৃতি, এইটীর নাম অব্যক্ত, আর এইটীর নাম ব্রহ্মা ইত্যাদি? সৃষ্টির পর অবশ্য তোমাদের মনে যাহা ধরে, তাহা বলিতে পার। সৃষ্টির পূর্ব্বে,—"অর্থাৎ ধ্বংসো-বস্থায়," তোমাদের ধরিবার, ছুঁইবার কিছুই নাই। তবে আর কি করিয়া কাহাকে লইয়া বিশ্বসৃষ্টি করিবে? এখন আর বলিতে পার না যে,—সমস্তই কারণে "লয়" হইয়া যায়। অর্থাৎ, ধ্বংস অর্থে, একবারে বিনাশ নহে; সমস্তই স্ব-কারণে "লয়" হইয়া থাকে।—এরূপ কথা আর তোমাদের বলা চলে না;—কারণ, তোমরা বিশ্বাতীত অক্ষয়, অমর, নিত্য বস্তু স্বীকার কর না। আর এক কথা, কারণে 'লয়" হইয়া থাকে বলিলে, বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিলে, আবার সৃষ্টিকর্ত্তা কেন? যাহা সৃষ্টি করিবে, তাহা তো বিদ্যমানই আছে। অপিচ, ঐ অস্তিত্ব যে অক্ষয়, অমর, নিত্য বস্তু হইয়া যায়। তবেই দেখ, তোমাদের বাক্যবন্ধ; তোমরা নিরুত্তর। অপিচ, ঈশ্বরত্ব লোপ এবং বিশ্ব লোপ।

অতঃপর তোমাদিগকে বিশেষ বিচার পূর্ব্বক কথা কহিতে হইবে। অভিপ্রায় এই

যে, তোমাদের নানা মত। তোমাদের পক্ষের যাহার "প্রকৃতিকে" নিত্য বস্তু এবং জগৎ কারণ বলে,—আমারা পূর্ব্ব বিচারে বহু বার দেখাইয়াছি যে, সেই "প্রকৃতি" জগতের কারণ নহে। অর্থাৎ, পুরুষ এবং প্রকৃতি (চৈতন্য এবং জড়,—অচেতন বস্তু)—এই উভয়ের মিশ্রণে জগৎ সৃষ্টি সম্ভবপর নহে (তোমাদের মনে না থাকে, পূর্ব্ব বিচার গুলি দেখ)। ঐ কথা পাকা করিবার জন্য ভূমা ও পূর্ণ পরব্রহ্মের 'এক.—একত্ব মিলন দাঁড়াইয়াছে। তোমারা ঐ কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়া "অনন্ত নিত্য" পূর্ণ পরব্রহ্মের অস্তিত্ব লোপ করিতে প্রস্তুত।

অভিপ্রায় এই যে, তোমারা নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর না; পরম সত্য "পরমেশ্বরের" নিত্যত্ব পর্য্যন্ত মান না। এমন কি নিত্য বস্তুর নামটী পর্য্যন্ত মুখে আনার বিরোধী। এই কথার মূলে, তোমার ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ × বর এইরূপ একটী "সৃষ্টিকর্ত্তা" আনিয়াছ, যাহা জন্যবস্তু "ধ্বংসী"। ঐ "সৃষ্টিকর্ত্তা "ঈশ্বরের কথা" লইয়াই তোমরা "ঈশ্বরের" নিত্যত্ব স্বীকার কর না। তবেই দেখ, মূল "প্রকৃতি-পুরুষ" ছাড়িয়া আবার নূতন তত্ত্ব;—"ঈশ্বরত্ব লোপ" হিন্দুত্ব লোপ। সুতরাং তোমাদের নানা মত, নানা বাদি।

কিন্তু, বিচার দ্বারা দেখা গেল, তোমাদের ঐ "ঐশ্বর্য্যার্থ—ঈশ + বর="ঈশ্বর" সম্বন্ধে যে উপদেশ, তাহা (ছেলেভুলান কথা মাত্র)—কোন কাজেরই নহে। কারণ, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে দাঁড়াইয়াছে যে,—ঈশ্বরত্ব লোপ!" "হিন্দুত্ব লোপ!!" এবং "বিশ্বলোপ!!!"। এই জন্যই বলিতেছি, অতঃপর একটু বিচার পূর্ব্বক তোমাদের বাদ প্রতিবাদ করা, অবশ্য কর্ত্তব্য।

অভিপ্রায় এই যে, হয় তোমাদিগকে বিশ্বাতীত কোন বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকার,—বা ঈশ্বরের নিত্যত্ব সমর্থন,—নাহয় ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ + বর" ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্তৃত্ব বিস্মরণ, যাহা হয় একটী করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। অন্যথায়, তোমাদের পক্ষে "ঐরূপ "ঈশ্বর" পদার্থটী লইয়া,"—উল্লিখিত বিচার মতে,—বাক্যবদ্ধ করা,—বা চির-নিরুত্তর থাকা "অবস্থা পর্য্যালোচনায়" অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীরঙ্গলাল দেব শর্ম্মা।
সন্তোষপুর; হুগলী।

—:0:—

যোগানন্দ লহরী

(২৪)

সাহানা মিশ্র আড়াঠেকা

যতন জানিনে তব, ওহে হৃদয়ের স্বামী।
তুমি যে পরম্ ধন, তোমারি তুলনা তুমি॥

তুমিহে জগতপতি,
জগতেরি তুমি গতি,
তোমাতে সকল স্থিতি, ওহে প্রভু অন্তর্যামী।
প্রেমময় দীনবন্ধু,
তুমিহে করুণাসিন্ধু,
আমি তব বারি বিন্দু, মহিমা কি জানি আমি।
আঁধারে জীব ঘুরে ফিরে
মোহ কূপে ডুবে মরে,
তার' প্রভু কৃপা করে, পরা শান্তিদাতা তুমি।
অমিয়া করুণা ঢেলে,
তুমি চাহ নিতে কোলে,
আমি যাই দূরে চলে, সতত বিপথগামী।
তুমি যে প্রেমের খনি,
যোগেন্দ্রের চিন্তামনি,
দীনজনে কর নাথ, ও রাঙ্গা চরণকামী।

—:0:—

আত্মোপদেশ।

কুল-ঘটক

প্রত্যেক জীবের সঙ্গে তাহার কুল-ঘটক সদাই থাকে। তাহার কারণ যদি পথে ঘাটে, কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্বন্ধ ঘটিয়ে দিতে হয়। ভাল পুরুষ কি ভাল মেয়ে মানুষ পথে বেরুলেই ঘটকের নজর আগে পড়ে। প্রত্যেক জীবের মন ও চক্ষুই সেই ঘটক। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ সুন্দর পুরুষ ও স্ত্রীর, পথে চোকা চোকি হইলেই যে পরস্পরের মনে আরো দেখি, আরো দেখি হোচ্ছের যে একটা অনুরাগ ভাবের সঞ্চার হয়, এটা সুধু সেই কুল-ঘটকের কারশুজারি। তোমরা শালারা-শালিরা নূতন সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া মর আর বাঁচ, তাহাতে ঘটকের আর কি ক্ষতি। এই সব কুল-গুরুদের আর কুল-ঘটকদের ব্যাবহারে চটে গিয়ে আজকাল নব্যসম্প্রদায়েরা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন গুরু ও ঘটক কাড়বেন। তাহাদের মন ও চক্ষুর প্যাকিন-তার পোষক জীবকে ফাসিয়ে দিতে চায় না, মুক্ত রাখিতে চায়।

অনিশ্চয়কে নিশ্চয়ে উপনীত করিবার পথ

মনটা সদাই অনিশ্চয় বোধ-রূপ রোগ কষ্ট বা আঁকু-পাকু, তাহাই ভোগ করে। আর শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ লইয়া কারবার করে। মনের "অনিশ্চয়" রূপ-রোগ ছাড়াতে হইলে তাহাকে যে দেশে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নাই, সেই দেশে হাওয়া বদলাইবার জন্য নির্ব্বাসিত করিতেহয়। যারা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ দিয়া মনের রোগ ছাড়াতে চায়, তারা গোবদ্যি, বহির্ম্মুখে সত্যকে পাওয়া যায় না, অন্তর্ম্মুখ হইলে সত্যকে পাওয়া যায়।

কারণ-ধর্ম্ম ও কার্য্য-ধর্ম্ম, বা অন্ত … ধর্ম্ম ও মোহে। ধর্ম্ম

ইউরোপ, কার্য্যধর্ম্ম বা … ধর্ম্মটাকে, আবৃত্তি দ্বারা খু… ভারত কারণধর্ম্মে বা অ… উভয় প্রদেশের শাস্ত্রাদি ক… প্রণালী দেখিলেই তাহা…

বাহিরের কথা, এক… একজন হিন্দু তাহা জা… কথা একজন হিন্দু যা… সাহেব জানে না। … ডালকুত্তা, আয়না পাবে। … ঘরের … উপকারি কো… মালা, কুশাসন, আর বড় … একবার একটু সরিসার তৈল …।

সত্যঅন্বেষণ ও বাহ্যনিরোধ

সত্যকে অন্বেষণ করিতে গেলে বাহ্য নিরোধ করিতে হয়। আমার বাহ্যই হউক, আর জগতের বাহ্যই হউক, যদি ব্যষ্টি (আমার দেহ) অনিত্য হয়, তাহলে জগতে যত দেহ সবই অনিত্য, সুতরাং উহা আমার অভীষ্ট বা অন্বেষণের বিষয় নহে।

ইন্দ্রিয়, যাহার দ্বারা দেহাদি ব্যক্ত হয়, উহারাও অনিত্য এবং অধিকন্তু দেহ, কাল, পাত্ররূপ উপাধি দ্বারা খণ্ডিত; অর্থাৎ চোখের দ্বারা সর্ব্বদেশ, কানের দ্বারা সর্ব্বশব্দ, নাকের দ্বারা সর্ব্বগন্ধ, জিহ্বার দ্বারা স্বাদ ও ত্বকের দ্বারা সর্ব্ব স্পর্শানুভব একবারে করিতে পারি না। সুতরাং পরমার্থ-তত্ত্ব-নিরূপণ বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের কোন আবশ্যকতা নাই। মন, ইন্দ্রিয়-প্রদত্ত বিষয় লইয়াই কার্য্য করে; সুতরাং এই প্রবাহ যতদিন নিরোধ না হয়, ততদিন মনের দ্বারাও কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া অন্তরনুভব করিতে হইবে, তাহা হইলে নিত্য পদার্থ … পাওয়া যাইবে।

… অ দি

ধর্ম্ম … দ, এই কথাটা প্রকৃত অর্থ … ঈশ্বর বা আত্মার ত্রিগুণাত্মিকা … অনাদি ও অনন্ত। যেমন ঈশ্বর বা … অনাদি ও অনন্ত তদ্রূপ তাহার শক্তিও …

… শাস্ত্র, অর্থাৎ … এই … স্বর্গ নির্ম্মাণ করেন, এবং কতকগুলা প্রজাপতি সৃষ্টি করেন, এবং সেই প্রজাপতিদের দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার হইয়াছে।

চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, নক্ষত্র, পৃথিবী আর তুমিই বল, আমরা ও আমি এ সকলই সেই

পরমাত্মার বহুবিধ মূর্ত্তি। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন এক অদ্বিতীয় ভাবে থাকেন এবং নিজ শক্তিকে সংবৃত করেন, তখন আমরা কেহই থাকি না। আর যখন সৃষ্টি করেন, তখন, তিনিই নিজ শক্তিবলে বহু মূর্ত্তি ধরেন। যাঁহারা সেই পরাৎপর আত্মাকে দেখিতে পান, তাঁহাদের সেই দেখিবার মুহূর্ত্ত হইতে কর্ম্ম-প্রেরণা একেবারে স্থির হইয়া যায়। অর্থাৎ সর্ব্ব চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। তখন চক্ষু আর কিছুই দেখিতে চায় না, কাণ শুনিতে চায় না, জিহ্বা আস্বাদন করিতে চায়না, ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়েরাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ইন্দ্রিয়-প্রেরিত হইয়া মনুষ্যেরা, সেই এক পরমাত্মার বহুবিধ দেহাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবিধ ভাবে উপনীত হয়। এবং কাহাকেও দেখিয়া ভক্তি করে ভাল বাসে, কাহারও বা ভয়ে দ্রুত পলায়ন করে। কাহাকে অতি সুন্দর কাহাকে অতি বিশ্রী, কাহাকে অতি বলবান কাহাকে অতি দুর্ব্বল ইত্যাদি বোধ করে

একটি মজা দেখ

মনুষ্য মাত্রেরই সত্যকে জানিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এই ইচ্ছা কাহাতেও প্রবল এবং কাহাতেও কম। এই সত্যকে জানিবার ইচ্ছা বুদ্ধির কার্য্য, অথবা এই সত্য জানিবার ইচ্ছাই বুদ্ধি স্বয়ং। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই যে ঐশিক শক্তির প্রবল প্রকাশ বা প্রাদুর্ভাব, ইহার দ্বারা বুদ্ধি-শক্তি ভ্রান্ত হয়, এবং ইহাদের পশ্চাতেই বিধাবিত হয় এই ইন্দ্রিয়েরাই গ্রহ। ইহারাই জীবকে বিষয়ে পশ্চাতে ঘূর্ণিত করে।

"নিশ্চিত ও অনিশ্চিতের ভাণ্ডার"

প্রত্যেক জীবের কতকগুলি নিশ্চিত ও কতকগুলি অনিশ্চিত সঞ্চয় থাকে। অর্থাৎ কতকগুলি বিষয়ে মনুষ্য সিদ্ধ ও কতকবিষয়ে অসিদ্ধ। সিদ্ধ বিষয়ে মনুষ্য প্রাণ সাহস, নিশ্চয় আনন্দবোধ ইত্যাদি শক্তি লাভ করে; অসিদ্ধ বিষয়ে—ভয় সঙ্কোচ, দুঃখ, শক্তি হীনতা বোধ করে।

ভ্রান্তির বা ভ্রামিত হইবার বা চঞ্চল্যের কারণ কি?

যাহা নিত্য, যাহা সিদ্ধ, যাহা পূর্ণ, যাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে, যাহা সচ্চিদানন্দ আত্মবস্তু, তাহার অভ্যন্তর হইতে যখন তাহার অনন্ত বিভবশালিনী শক্তি বা মায়া আবির্ভূত হইয়া তাহাকে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, এই ত্রিবিধ দেহের দ্বারা আবৃত করে, তখন তাহার নিরূপদ্রুত স্বধর্ম্মে একটা আবরণাদি পড়ে যাহাতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। তখন তিনি স্থূল দেহ-ধর্ম্ম, সূক্ষ্মদেহ-ধর্ম্ম ও কারণ দেহ-ধর্ম্মদ্বারা আক্রান্ত হন। তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রত্যক্ষ করেন, তাহার পর মনের দ্বারা মনন করেন, তাহার পর চিত্তের দ্বারা সুখ, দুঃখ, ভয়, সাহস, ক্রোধ, লোভ আদি ভোগ করেন, বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করেন ইত্যাদি। এই যে বিষয়াদিকে দেখিবার, বুঝিবার, ভোগ করিবার ইচ্ছা ইহাই তাহার চাঞ্চল্যের বা ভ্রামিত হইবার কারণ।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

—০—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব সংবাদ।

পিঙ্গলার উপাখ্যান।

"ব্রাহ্মণ কহিলেন,—রাজন! স্বর্গ ও নরকে উভয় স্থানেই প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়-জনিত সুখ দুঃখ সমান; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা অভিলাষ করিবে না। খাদ্যদ্রব্য সুরস হউক, বা বিরস হউক, অধিক হউক বা অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইলেই উদাসীন হইয়া অজগরের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিবে। যদি গ্রাস উপস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে "দৈবই উপস্থাপক" এইরূপ ভাবিয়া ধৈর্য্য আশ্রয় পূর্ব্বক অজগরের ন্যায় নিরাহার ও নিরুদ্যম হইয়া বহুদিন শয়ন করিয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়বলে মনোবল ও দেহবল প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মকারী শরীর ধারণ পূর্ব্বক নিদ্রাশূন্য হইয়া ও স্বার্থে দৃষ্টি রাখিয়া অজগরের ন্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে; ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলেও কোন চেষ্টা করিবে না। মুনি স্তিমিতপ্রবাহ সাগরের ন্যায়, প্রশান্ত, গম্ভীর, দুরবগাহ, অনতিক্রমনীয়, অনন্তপার ও অক্ষোভ্য হইবেন। সিন্ধু যেমন বর্ষাকালীন নদীসকলের জল প্রাপ্ত হইয়া বেলা অতিক্রম করেন না এবং গ্রীষ্মকালে নদীসকল শুষ্ক হইলেও নিজে শুষ্ক হন না, তদ্রূপ নারায়ণপরায়ণ যোগী কাম সকল যথেষ্টরূপে লাভ করিয়া বা ঐ সকলে বর্জ্জিত হইয়া, আনন্দে মত্ত বা দুঃখে ম্লান হইবেন না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীকে দর্শন করিয়া, তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া, অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় অন্ধ নরকে পতিত হইয়া থাকেন। মায়াক্রান্ত রমণী স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্রাদি দ্রব্য সমূহে উপভোগ-বুদ্ধিতে প্রলোভিত-চিত্ত হইয়া, মূর্খ নষ্টজ্ঞান পতঙ্গের ন্যায় বিনিষ্ট হয়। যাহাতে দেহ থাকিতে পারে, গৃহসকল পীড়ন না করিয়া তাবন্মাত্র গ্রাস অন্ন ঐ করিয়া ভোজন করিবেন, মুনি এইরূপে ভ্রমরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ষট্‌পদ যেমন সকল পুষ্প হইতেই সার গ্রহণ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তেমনি স্বল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতেই সার সংগ্রহ করিবেন। ভক্ষিত দ্রব্য সায়ংকাল বা পরদিনের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না। হস্তমাত্র বা উদর মাত্র পাত্র করিবেন, মক্ষিকার ন্যায় সংগ্রাহক হইবেন না। ভিক্ষুক, সন্ধ্যা বা পরদিনের নিমিত্ত সংগ্রহ করিলে মক্ষিকার ন্যায় ঐ সংগৃহীত দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন। ভিক্ষুক দারুময়ী যুবতীকেও পাদদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না; স্পর্শ করিলে, করিণীর অঙ্গসঙ্গ বশতঃ করীর ন্যায় গর্ত্তে পতিত হইতে হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনও নিজের মৃত্যুরূপিণী রমণীকে গ্রহণ করিবেন না; করিলে যেমন অন্য হস্তিগণ দ্বারা হস্তী সকল নিহত হয়, সেইরূপ তাঁহাকে অধিক বলশালিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতে হয়। যেমন মধুহা মক্ষিকাসঞ্চিত মধু জানিতে পারে এবং হরণ করে, সেইরূপ অন্য অর্থবেত্তা কৃপণগণের দুঃখে সঞ্চিত দানভোগবর্জ্জিত ধন অপহরণ করে। মধুহা যেমন সঞ্চয়কারী মক্ষিকাদিগের অগ্রেই মধু আস্বাদন করে, সেইরূপ যতি, নিতান্ত দুঃখে উপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা গৃহের মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থদিগের অগ্রেই ভোগ করিয়া থাকেন। বনচর যতি কখনও গ্রাম্য গীত শ্রবণ করিবেন না।

ব্যাধ-গীত মোহিত বন্যমৃগের নিকটেই ইহা শিক্ষা করিয়েন। হরিণীতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীদিগের গ্রাম্য গীত, বাদিত্র ও নৃত্য উপভোগ করিয়া তাহাদিগের বশতাপন্ন ও ক্রীড়া পুতুল হইয়াছিলেন। অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি প্রমাথিনী জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদনে বিমোহিত হইয়া বড়শি দ্বারা মীনের ন্যায় মৃত্যুগ্রস্থ হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা রসনা ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়কেই শীঘ্র জয় করিতে পারেন।

নিরাহার ব্যক্তির উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিলেও যে পর্য্যন্ত রসনা জয় না করে, সে পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না, রসনা জয় করিলে, সকল ইন্দ্রিয়ই জয় করা হইল। হে নৃপনন্দন! পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত। তাহা হইতে আমি কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি, শ্রবণ করুন। সেই বারাঙ্গনা একদা সঙ্কেত স্থানে নাগরকে লইয়া আসিবার অভিলাষে উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিয়া যথাকালে বহির্দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই অর্থাভিলাষিণী পথে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ধনসম্পন্ন, শুল্কপ্রদ নাগর বোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা নিকটে আসিয়া চলিয়া যাইলে পর, সঙ্কেতোপজীবিনী সেই বেশ্যা মনে করিতে লাগিল,- অন্য কোনও ধনী ব্যক্তি আমার সমীপে আসিয়া অনেক দিতে পারে!" এইরূপ দুরাশায় নিদ্রাশূন্য হইয়া সে দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল, কিয়ৎক্ষণ পরে ভিতরে প্রবেশ করিল, কিন্তু আবার বহির্গত হইল, এইরূপ করিতে করিতে নিশীথ কাল উপস্থিত। ধনাশায় তাহার বদন শুষ্ক এবং অন্তঃকরণ দুঃখিত হইল। এই অবস্থায় তাহার ধনচিন্তা জন্য সুখাবহ পরম নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল! অন্তঃকরণ নির্ব্বিন্ন হইলে, সে যাহা বলিল, তাহা আমি যথাবৎ বলিতেছি শ্রবণ কর;—বৈরাগ্য পুরুষের আশাপাশের খড়্গ। হে রাজন্! যাহার বৈরাগ্য নাই, দেহবন্ধন ছেদনে তাহার আর উপায়ান্তর নাই। পিঙ্গলা কহিল, "আহা! আমি কি বিবেকশূন্যা ও অজিত-চিত্তা, আমার মোহের পরিসর দর্শন কর। আমি অতি মন্দবুদ্ধি; কেননা, আমি অতি তুচ্ছ কান্তের নিকট হইতে কামাবস্তু বাসনা করিতেছি। আমি অন্তরে রমমান নিত্যরাগ ও ধনপ্রদ এই নিত্য সৎপদার্থের উপাসনা ত্যাগ করিয়া মূর্খের ন্যায়, অকামদ, দুঃখপ্রদ, ভয়, শোক ও পীড়াদায়ক অতি তুচ্ছ পুরুষকে ভজনা করিয়াছিলাম। সঙ্কেতবৃত্তি অতি নিন্দনীয় বৃত্তি, আহা! তাহা দ্বারা আমি অনর্থক আত্মাকে পরিতাপিত করিয়াছি! আমি—লম্পট, অর্থলুব্ধ, অনুশোচনীয় পুরুষের নিকট হইতে তৎকর্তৃক ক্রীত-দেহ দ্বারা ধন ও রতি ইচ্ছা করিয়াছি। অস্থি দ্বারা যাহার বংশ, বংশু ও স্থূণা নির্ম্মিত হইয়া, যাহা ত্বক্, রোম ও নখ দ্বারা আবৃত এবং যাহা নব দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, এই বিষ্ঠামূত্র পরিপূর্ণ গৃহ আমা ভিন্ন আর কোন্ কামিনী সেবা করে? এই বিদেহ নগরে নিশ্চয় একা আমিই মূঢ়বুদ্ধি; কেননা, আমি এই আত্মপ্রদ অচ্যুত ভিন্ন অন্যের নিকট কাম ইচ্ছা করিতেছি। ইনি শরীরীদিগের সুহৃদ, প্রিয়তম, নাথ ও আত্মা, আমি আপনা দ্বারা ইহাঁকে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় ইহাঁর সহিত বিহার করিব। উৎপত্তি বিনাশশালী বিষয়

সকল, বিষয়প্রদ নর বা কালকবলিত দেবতা, তাঁহারা পত্নীর কতটুকু প্রিয়সাধন করিয়াছেন? আমি দুরাশাসম্পন্ন; আমার যে সুখাবহ নির্বেদ উদিত হইল, ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই কোন কর্ম্মবশতঃ ভগবান বিষ্ণু আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি যদি মন্দভাগ্যা হইতাম, তাহা হইলে আমার বৈরাগ্য হেতুভূত এত ক্লেশ হইত না; যে বৈরাগ্য দ্বারা গৃহাদি অনুবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ সুখলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার কৃত উপকার মস্তকে লইয়া গ্রাম্যসংসৃষ্ট দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই অধীশ্বরের শরণ লই। সন্তোষসহকারে শ্রদ্ধা করিয়া যাহা পাইব, তাহাতেই জীবন ধারণ করিয়া আমি এই রমণ আত্মার সহিত বিহার করিব। আমার আত্মা সংসারকূপে নিপতিত, বিষয় সকল ইহার দৃষ্টি হরণ করিয়াছে এবং কালসর্প ইহাকে গ্রাস করিয়াছে, অন্য কে ইহার উদ্ধার করিতে পারে? যখন জগৎকে কালসর্প কবলিত নিরীক্ষণ করিবে এবং সেই হেতু অপ্রমত্ত, ঐহিক ও পারলৌকিক সমুদায় হইতে বিরক্তভোগ হইবে, তখন নিজেই নিজের রক্ষা করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—পিঙ্গলা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, নাগর লাভের জন্য দুরাশা পরিত্যাগ করিল এবং শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। আশাই পরম দুঃখ, নিরাশাই পরম সুখ; কেননা, কান্তের আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে নিদ্রিত হইয়াছিল।

অবধূত বাক্য।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মনুষ্যের যে যে বস্তু প্রিয়তম, সেই সেই বস্তুর সহিত আসক্তিই দুঃখের নিমিত্ত; অতএব যে অকিঞ্চন ব্যক্তি তাহা জানিয়াছেন, তিনিই অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারিয়াছেন। আমিষসম্পন্ন কুররপক্ষীকে আমিষহীন অন্যান্য কুররেরা বধ করে। সেই আমিষ ত্যাগ করিয়া সে সুখী হইয়া থাকে। আমার মানাপমান নাই, পুত্রবান ও গৃহীদিগের ন্যায় কোন চিন্তাও নাই। আমি আপনা—আপনিই ক্রীড়া করিয়া এবং আপনাতেই আসক্ত হইয়া, বালকের ন্যায় এই সংসার ভ্রমন করি। অজ্ঞ উদ্যম রহিত বালক এবং যিনি প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয় ব্যক্তিই চিন্তাশূন্য ও পরমানন্দময়। কোন সময় কতকগুলি ব্যক্তি কোনও এক কুমারীকে বরণ করিবার নিমিত্ত তাহার গৃহে উপস্থিত হয়; তৎকালে তাহার বন্ধুজন স্থানবিশেষে গমন করিয়াছিল, সেই জন্য কুমারী নিজেই তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। হে মহীপতে! কুমারী তাহাদিগের নিমিত্ত নির্জ্জনে শালিধান্য কুটিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কুমারীর প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সকলের অতি শব্দ হইতে লাগিল। সে তাহাতে লজ্জাজনক বোধ করতঃ এক এক করিয়া শঙ্খ সকল ভগ্ন করিল; দুইগাছি করিয়া এক এক হস্তে অবশিষ্ট রাখিল। তথাপি আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শঙ্খদ্বয়ের শব্দ হইতে লাগিল। তাহা হইতেও একগাছি ভগ্ন করিল; এক গাছি হইতে আর শব্দ হইল না। হে অরিন্দম! লোকতত্ত্ব জানিবার অভিলাষে এই সকল লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সেই কুমারী হইতে এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছি।—বহুজনের

একত্র বাস, বা দুইজনে একত্র বাসও কলহের কারণ হইয়া থাকে; অতএব কুমারী কঙ্কণের ন্যায় একাকীই বাস করিবে। জিতাসনও জিতশ্বাস হইয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য ও অভ্যসযোগ দ্বারা মনকে এক বিষয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। এই মন যাহাতে স্থান লাভ করিয়া অল্পে অল্পে কর্ম্ম বাসনা পরিত্যাগ করে এবং উপশমাত্মক সত্ত্বগুণ দ্বারা রজস্তমঃ নাশ করিয়া গুণ ও গুণকার্য্য রহিত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইহাকে তাহাতে সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। যেমন বাণে নিবিষ্টচিত্ত বাণনির্ম্মাতা ব্যক্তি পার্শ্বে গমনকারী রাজাকে জানিতে পারে না, সেইরূপ চিত্তকে অবরুদ্ধ করিলে, তখন বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবেন না। সর্পের ন্যায় মুনি একাচারী গৃহহীন, সাবধান, গুহাশায়ী, আচার দ্বারা অলক্ষ্য, অসহায় ও অল্পভাষী হইবেন। নশ্বরদেহ মনুষ্যের গৃহারম্ভই দুঃখের কারণ ও নিস্ফল; সর্প পরকৃতগৃহে বাস করিয়া সুখী হইয়া থাকে। দেব নারায়ণ পূর্ব্বসৃষ্ট এই জগৎ কল্পান্ত সময়ে কালশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া, আত্মাধার ও আখিলাশ্রয়রূপে এক ও অদ্বিতীয় হইয়া থাকেন। আত্মশক্তি কাল প্রভাবে শক্তি সকল এবং সত্ত্বাদিক্রমে স্ব স্ব কারণে লীন হইলে পর, কৃষ্ণ পুরুষের ঈশ্বর আদিপুরুষ ব্রহ্মাদি ও অন্যান্য মুক্ত জীবগণের প্রাপ্য হইয়া অবস্থিতি করেণ, কারণ তিনি নিরুপাধিক নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ ও আনন্দ সন্দোহ! অতএব মোক্ষশব্দের প্রতিপাদ্য। হে শক্রদমন! নিরবচ্ছিন্ন আত্মানুভবরূপ কাল দ্বারা, ত্রিগুণাত্মিকা নিজ মায়াকে ক্ষোভিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রথমে মোহতত্ত্ব সৃষ্টি করেন। অহঙ্কার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টিকারিনী, অতএব বিশ্বতোমুখী ও ত্রিগুণাত্মিকা সেই মায়াকেই সূত্রাত্মা বলা যায়। ইহাতেই এই বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে এবং ইহা দ্বারা পুরুষ সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেমন ঊর্ণনাভ মুখ দ্বারা হৃদয় হইতে উর্ণা বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে, তদ্রূপ মহেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। দেহী, স্নেহ, দ্বেষ বা ভয় হেতু যাহাতে সমগ্র মন ধারণ করে, মরণান্তে তাহারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। রাজন! কীট পেশস্কারকে ধ্যান করিতে করিতে তৎ-কর্ত্তৃক ভিত্তির মধ্যে প্রবেশিত হইয়া, পূর্ব্ব রূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। এই সকল গুরু হইতে আমি এইরূপ বুদ্ধি শিক্ষা করিয়াছি। হে রাজন! স্বীয় শরীর হইতে যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি বলিতেছি, শ্রবণ কর। শরীর আমার গুরু, কারণ নিরন্তর মনঃপীড়া যাহার শেষ ফল, সেই উৎপত্তি-বিনাশ ইহার ধর্ম্ম, আর আমি ইহা দ্বারা যথাযথ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকি, অতএব ইহা আমার বিবেকের কারণ, তথাপি ইহাকে পরকীয় স্থির করায় সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি। পুরুষ যে দেহের হিত সাধন করিবার নিমিত্ত স্ত্রীপুত্র, অর্থ, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গ বিস্তার করিয়া কষ্টে ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক পোষণ করে। বৃক্ষধর্ম্মী সেই দেহ পুরুষের কর্ম্মরূপ দেহান্তরবীজ উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন অনেক সপত্নী গৃহস্বামীকে শীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ রসনা ইহাকে একদিকে আকর্ষণ করে। তৃষ্ণা অন্যদিকে, শিশ্ন অন্যদিকে, ত্বক, উদর, কর্ণ আর নাসিকা, চপল

চক্ষু এবং কর্ম্মশক্তি অন্যান্য দিকে আকর্ষণ করে। দেব-নারায়ণ আত্মশক্তি মায়া দ্বারা বৃক্ষ সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ও দন্দশূক প্রভৃতি বিবিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া, ঐ ঐ সকলে সন্তুষ্টচিত্ত না হওয়াতে ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত পুরুষ শরীর সৃষ্ট করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। এই সংসারে বহু জন্মের পর অনিত্য হইলেও পুরুষার্থের সাধন মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, ইহা পতিত না হইতে হইতেই ধীর ব্যক্তি শীঘ্র মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবেন। বিষয় ভোগ সকল জন্মেই হইয়া থাকে, এই রূপে বৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞানদীপ প্রভাবে অহঙ্কার ও সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ আত্মনিষ্ট হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই এক গুরুর নিকট হইতে সুস্থির সুপুষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; কেননা, ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্ণয় করিতেছেন। ভগবান কহিলেন,—"অগাধ বুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইলেন এবং রাজা কর্ত্তৃক বন্দিত, সুপূজিত এবং তজ্জন্য আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যথাগত গমন করিলেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্বজাত সেই যদু, অবধূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্ত ও সমদর্শী হইয়াছিলেন।"

দীন—কৃষ্ণদাস।

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ। অত্র মঠাধীশ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংস দেব উত্তর বঙ্গের ভোমার, বগুড়া, পুঁঠিয়া, রংপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমন করতঃ গত অগ্রহায়ণ মাসে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

—0—

বার্ষিক উৎসব। বিগত ২৭ শে অগ্রহায়ণ ১২ই ডিসেম্বর "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের" ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন পূজা, আরতি, হোম, স্তোত্রাদি পাঠ ও নাম সংকীর্ত্তন অন্তে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। ঐ দিন যাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ দিতেছি।

—0—

দান প্রাপ্তি-স্বীকার। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে" নিম্ন লিখিত দান প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বামরা ১৲, শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দেবী ৷৶০, শ্রীমতি চারুবালা দেবী ৷০, একুনে ২৶০ আনা মাত্র।

—:0:—

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, | মাঘ। | ১০ম সংখ্যা।

কর্ম্ম-রহস্য

জগতে যাহা প্রকাশিত হইয়া বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টি কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যাঁহার মহীয়সী শক্তি প্রভাবে কেহ মানব, কেহ দেবতা, কেহ বা সিংহ-ব্যাঘ্রাদি জন্তুরূপে প্রকট হইয়াছে, যাহার অপ্রতিহত শাসনাধীন হইয়া কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ রোগী, কেহ সুস্থ, কেহ কৈশোরে নবীন দেহ ত্যাগ করিতেছে, কেহ বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ দেহখানি লইয়া কষ্টে জীবন-ভার বহন করিতেছে, যাহার প্রবল প্রতাপে বালক দুশ্চিকিৎস্য রোগে মরণ-যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে, আর ঘোর অত্যাচারী যুবক বা প্রৌঢ় সুস্থ ও সবল দেহে মহানন্দে কালাতিপাত করিতেছে, তাহা কি? যাহার প্রভাবে দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, সূর্য্য ও চন্দ্র আলোক দান করিতেছে, ষড় ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে উপস্থিত হইতেছে, সে মহা শক্তি-শালী বস্তু কি? জ্ঞানী বলিবেন, "ব্রহ্ম," কর্ম্মী বলিবেন, কর্ম্ম এবং ভক্ত বলিবেন, এ সকল ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানের ইচ্ছা। এ দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্ম বা মহাশক্তির লীলাবিলাস বা শ্রীভগবানের ইচ্ছার বিকাশ হইতে পারে; কিন্তু এই লীলা বা ঐশী ইচ্ছার একটী সাধারণ সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থা আছে, যাহার মিমাংসা অনাদি কর্ম্ম-শৃঙ্খলা ভিন্ন সম্পন্ন হয় না। জীব আশা-পাশে বদ্ধ থাকিয়া ভগবানের ইচ্ছায় বা তাঁহার লীলার অংশীভূত হইয়া যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে বা তাহার এ বেদনাময় অবস্থা ভগবানের লীলা, এরূপ সান্ত্বনা বাক্য হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। সে তাই তাহার সুখ-দুঃখ-ময় জীবনকে কর্ম্মফল বলিয়া ধৈর্য্যা-বলম্বন করে। অতএব এই সর্ব্ব-সাধারণ ভাবের অনুসরণ করিলে জগতের এক অপ্রতিহত গতি কর্ম্মই দৃষ্ট হয়। কর্ম্ম বশেই জীব জন্মান্তর গ্রহণ করিতেছে, কর্ম্মক্ষয়ের জন্যই কর্ম্ম-যোগাবলম্বনে সাধনা করিতেছে।

কোন কোন দার্শনিকগণের মতে কর্ম্মই ব্রহ্ম বা ভগবান, অথবা কর্ম্ম ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী; কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কোন বিশেষ ভাবে নিয়মিত রূপে কর্ম্ম অভ্যাস করিলে অর্থাৎ যোগাদি

কর্ম্ম আশ্রয় করিলে, তাহাতে যে শক্তি আয়ত্ত হয়, তাহাদ্বারা ঈশ্বর লাভ হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর কর্ম্মের অধীন হওয়ায় কর্ম্মই শ্রেষ্ঠতর; কিন্তু ইঁহাও দেখা যায়, অনেক সময় যোগাদি দ্বারা ইষ্ট লাভ হয় না,—শত সাধন-ভজন বৃথা হইয়া যায়, শত চেষ্টাও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। ইহাদ্বারা এরূপ অনুমিত হয় যে, ঈশ্বর লাভ কর্ম্ম-সাপেক্ষ বটে; কিন্তু সেই কর্ম্মফল দাতা স্বয়ং ঈশ্বরই। ঈশ্বর হইতে কর্ম্মের উদ্ভব হইয়া জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। কর্ম্ম নিজে তাই মহাশক্তিশালী; কিন্তু এই কর্ম্মের ফল দাতা কর্ম্মের জনয়িতা স্বয়ং ঈশ্বর।

মূল কর্ম্ম একটী বৃহৎ ঘূর্ণায়মান চক্র—ইহা ঈশ্বরের শক্তি স্বরূপ—তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে ঘুরিতেছে। ইহার সহিত শৃঙ্খল দ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য অগণ্য চক্র সংযোজিত আছে। এই মূল চক্রের ঘূর্ণ-বেগে অন্য সকল চক্রগুলিই ঘুরিতেছে। যাহদ্বারা এই চক্র গুলি পরস্পর সংযোজিত আছে তাহাই বাসনা, কারণ ঈশ্বরের বাসনাই এ জগৎ রূপে বিকাশ। এই চক্রগুলি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দেব, দানব, মানব ও অন্যান্য জীব গণ রূপে জগতে প্রকাশমান। ইহারা প্রত্যেকেই বাসনা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া অবিরাম গতিতে আপন আপন পথে আবর্ত্তন করিতেছে, সাধন দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইলে জীবের এই ঘূর্ণায়মান চক্রের গতি প্রতিহত হয় এবং ক্রমে মূল চক্র তাহার শক্তি সংহত হইয়া শৃঙ্খল ছিন্ন হয় ও তাহার নির্ব্বাণ লাভ হয়। ইহাই মোটামুটী কর্ম্ম-রহস্য।

প্রেমময় শ্রীভগবান হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি, অতএব কর্ম্মেও প্রেম বর্ত্তমান। "প্রেমহীন শুষ্ক কর্ম্ম" "তিক্ত মধুর" ন্যায় অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি মাত্র। কর্ম্ম প্রেমের ক্রোড়ে উৎপত্তি লাভ করিয়া জগত নিয়ন্ত্রিত করতঃ জগত-জীবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই স্বভাব-প্রেমিক জীব কর্ম্মের সাধনা করিতেছে। যোগীতে যোগ, তপস্বীতে তপস্যা, ভোগীতে বিলাসিতা এবং তস্করে পরস্বাপহরণ রূপে প্রকাশিত। ব্যাঘ্রে হিংসা, সর্পে ক্রুড়তাও ইহারই বিকাশ। কর্ম্মের এই বিকাশই জগত জীবের ধর্ম্ম নামে খ্যাত। স্বভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অন্য কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। কেহ হয়ত হস্ত ও পদের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া বাহ্যতঃ নিস্ক্রিয় হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিশ্রাম নাই, মন সর্ব্বদা শত সহস্র কর্ম্ম তাঁহাকে নিযুক্ত রাখিতেছে। অতএব মানব লয় সাধন করিতে না পারিলে এই কর্ম্ম বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ অসম্ভব। মনের লয় সাধন জন্য যে যোগ-পন্থা অবলম্বিত হয় তাহা ক্রিয়াযোগ। আবার কামনা-বাসনা শূন্য হইয়া জগতে কর্ম্ম করাও যোগ এই যোগের নামই কর্ম্ম-যোগ বা নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা। যেমন কর্ণে জল প্রবেশ করিলে তাহা জল দ্বারাই বহিষ্কৃত করিতে হয়, তস্কর ধরিতে হইলে তস্করের সাহায্য লইতে হয় তেমনি যে কর্ম্ম শৃঙ্খল মুক্ত হইতে হইলে কর্ম্মেরই সাধনা করিতে হয়। কর্ম্ম-যোগ সাধন অতীব কঠিন, কিন্তু মূল কর্ম্মের সহিত একত্ব থাকায় আশু ফলপ্রদ। ক্রিয়া-যোগাবলম্বনে সাধনা ও কর্ম্ম যোগের ফল বিভিন্ন। ক্রিয়া-যোগাপেক্ষা কর্ম্মযোগস্থ

অল্প সময় মধ্যে ফল দান করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্ম যোগের মূল-তত্ত্ব নিষ্কাম ভাব সাধন; অন্য ক্রিয়া যোগের সম্পূর্ণ অবশ্যকতা আছে। সদ্গুরু কৃপায় স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে কর্ম্ম-রহস্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, অচিরেই কর্ম্ম-যোগে সিদ্ধিলাভ হয়।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আশ্রয়ে কর্ম্ম আপন শক্তিতে ফলদান করিতেছে। প্রবৃত্তিমুখী কর্ম্ম আচরণে সুখ ও দুঃখের সংঘাত উপস্থিত হইয়া মানব চিত্ত সদা বিচলিত রাখিতেছে, আর, নিবৃত্তি মার্গে কর্ম্ম প্রেম-ফল প্রদান করিতেছে। নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় জীব শিবত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। কর্ম্মকে কর্ম্মজ্ঞানে আচরণই নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা। কর্ম্মের দ্বারা কোন ফল লাভের আশায় কার্য্যে ব্রতী হওয়াই সকাম কর্ম্ম। জগতে এই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি অনন্ত কাল হইতে চলিতেছে। মানবের স্বভাবিক "আমিত্ব" বা কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান না থাকিলে কর্ম্ম-জ্ঞান জন্মিতে পারে না, অর্থাৎ কর্ত্তা ভিন্ন কর্ম্ম সম্ভবে না। যথা—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা
ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্মকর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ
কর্ম্মসংগ্রহঃ॥
গীতা ১৮।১৮।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটীই কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটী কর্ম্মের আশ্রয়।

গুণ ভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার; যথা— সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

সাত্ত্বিক কর্ম্ম; যথা;—

নিয়তং সঙ্গরহিতং অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
গীতা ১৮।২৩।

কামনাশূন্য মানব কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অনাসক্ত, প্রীতি ও দ্বেষ বর্জ্জিত চিত্তে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

রাজস কর্ম্ম; যথা—

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম
সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং
তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥
গীতা ১৮।২৪

ফলাকাঙ্খায় অহংকারের সহিত বহু আয়াসে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই রাজস কর্ম্ম।

তামস কর্ম্ম; যথা—

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসা
মনাপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম
যত্তত্তামসমুচ্যতে॥
গীতা ১৮।২৫

যে কর্ম্ম ভাবী বন্ধন, ক্ষয়, হিংসা এবং পৌরুষ (আত্মশক্তি) পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহ বশতঃ আরম্ভ করা যায়, তাহাই তামস কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।

অতএব এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ম্মই শ্রেষ্ঠতম। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ইহা অবলম্বনে জীব কর্ম্ম পাশ মুক্ত হয়। রাজস ও তামস কর্ম্ম আরও তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—

সঞ্চিত কর্ম্ম, প্রারব্ধ কর্ম্ম ও ক্রিয়মান কর্ম্ম।

যে কর্ম্মের ফলভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই, তাহার নাম সঞ্চিত কর্ম্ম।

যে কর্ম্মের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম।

বর্ত্তমানে যে কর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে তাহাই ক্রিয়মান কর্ম্ম নামে অভিহিত।

সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মফল গুরু কৃপায় নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হয়। মানব জীবন সাধারণতঃ এই প্রারব্ধ কর্ম্মের বিকাশ বিশেষ। ইহার বশেই মানবের মনীষা বা নির্ব্বুদ্ধিতা জগতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রভাবেই কেহ হয়ত শত বৎসর সাধন করিয়াও কৃতকার্য্য হয় না, কেহবা মুহূর্ত্তে ইষ্ট লাভ করিয়া ধন্য হয়। এ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব একটী গল্প বলিতেন। গল্পটী এইরূপ; যথা—কোনও বন মধ্যে একটী তান্ত্রিক সাধক বহু আয়াসে একটী শব ও তৎসাধনোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতঃ শবসাধনায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথা হইতে একটী ব্যাঘ্র আসিয়া সাধকটীকে ধরিয়া লইয়া গেল। একটী পথিক অন্তরাল হইতে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে সাধনার উপযোগী সমস্ত বস্তুর আয়োজন দেখিয়া সেই শবেই সাধনায় নিযুক্ত হইল। সাধন প্রভাবে যথা সময়ে শবাসনার আবির্ভাব হইল। পথিক মহামায়ার সন্দর্শন লাভে সফল মনোরথ হইয়া কোনরূপ বর প্রার্থনার পূর্ব্বেই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকের ব্যাঘ্র-কবলিত হওয়া ও তাহার সিদ্ধি লাভ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রীতমনা জগন্মাতা বলিলেন, "বৎস, প্রারব্ধই ইহার মূল। সে যে ভাবেই অগ্রসর হউক না কেন প্রারব্ধ কর্ম্ম-প্রভাবই তাহার জীবন সম্যক নিয়ন্ত্রিত করিবে—অন্য কিছুতে নহে।" এই গল্পটীতে প্রবন্ধের প্রভাব সম্যকরূপে প্রকটিত আছে।

আদর্শে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া স্থির চিত্তে প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনরত থাকিতে হয়। অন্যথায় পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্ম-ফলে নিস্পৃহ হইতে না পারিলে কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইতে পারা যায় না। বাসনাই বন্ধনের মূল। বাসনা কর্ম্মে যুক্ত হইয়া সকাম কর্ম্মের উৎপত্তি করে এবং এই বাসনার নাশ হইলেই নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। আবার, নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় ক্রমে কামনা-বাসনাও ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব মানবের কেবল কর্ম্মের জন্যই প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য, ফলের জন্য নহে। যথাঃ—

> কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে
> মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা
> তে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মনি॥
>
> ২।৪৭ গীতা

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কর্ম্ম-ফলে কখনও নহে, অতএব তুমি কখনও কর্ম্ম-ফলপ্রার্থী হইও না এবং সকাম কর্ম্মে যেন তোমার আশক্তি না হয়।

কর্ম্মের সাধনা করিয়াই এই নিষ্কাম অবস্থা লাভ হয়।

যথা—

> ন কর্ম্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং
> পুরুষো হশ্নুতে।

কর্ম্মের সাধনা না করিয়া মানব নিষ্কাম অবস্থা লাভ করিতে পারে না। অতএব শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে আরোহণ করিতে হয়।

কর্ম্ম জীবের এক মাত্র আশ্রয়। অতএব কর্ম্মের আশ্রয়ে সাধনা করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করত জীব পরমানন্দময় তৃপ্ত অবস্থায় উপনীত হইয়া জীবন জনম-সফল করিবে। তখন তাহার আর কর্ম্ম থাকিবে না। যথা—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

গীতা ৩।১৭

যিনি আত্মাতেই রত, তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। অর্থাৎ যিনি আত্ম-জ্ঞান লাভ করেন, তিনি কর্ম্ম-বন্ধন মুক্ত হন। এই অবস্থাই মানবের লক্ষ্য। কর্ম্মের আদর্শ এই অবস্থা লাভই মানব জীবনের সার্থকতা।

ওঁ তৎ সৎ ওম্।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

———:0:———

অন্তিম আবেদন

আমি সারা জীবনের বেদনা বহিয়া
এসেছি তোমারি দ্বারে,
তুমি তাপিত হৃদয় করগো শীতল
করুণা-পীযূষ ধারে।
আমি বাসনা বিজয়ে শ্রান্ত অতিশয়
করি গো ভীষণ যুদ্ধ,
তুমি ক্ষীণ প্রহরণে কর গো তাহার
অসংযত গতি রুদ্ধ।
আমি নেহারি তাহার বিভীষিকাময়ী
কঠোর প্রকৃতি রুদ্র।
আতঙ্কে শিহরি, যেন ব্যাধ-বিতাড়িত
ভয়ার্ত্ত শশক ক্ষুদ্র।

আমি স্বপনেও প্রভু, ভাবি নাই কভু
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য,
এবে জীবন-সন্ধ্যায় এসে দেখি হায়
সব অন্ধকার শূন্য।
শুধু ভৈরব হুঙ্কারে আশু ব্যাপিয়া
গর্জ্জিছে ভীষণ সিন্ধু।
উত্তপ্ত প্রবাহ তার, ছুটে উল্কা প্রায়
উগারি অনল বিন্দু।
পতিত পাবন ওহে অনাথতারণ,
তুমি দয়া ক্ষমা শান্তি।
ঘুচাও আতঙ্ক ঘোর, স্নেহ-বক্ষে তুলি
নবীন নীরদ-কান্তি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

———:0:———

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(২৮)

(ভূমা ভেদনে তৃতীয়োল্লাস।)

["পূর্ব্বপক্ষ"]। আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় অনেক গুলি আছে, (পরের পর হইবে) তন্মধ্যে আপনার কথার প্রসঙ্গে "আপাততঃ" আমরা বলিতেছি যে,—ধ্বংসের ভাবটীকে আমরা 'শূন্য' বলিতে পারি। কারণ, গণিত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে দেখা যায়, 'এক' শূন্য হইতে যায়; শূন্য হইতেই সংখ্যা সৃষ্টি, ক্রমে যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ প্রভৃতি সংখ্যা সমন্বয়ে বহু বিস্তৃত হয়।

অন্য পক্ষে, যাহা ভাগ করা যায় না অর্থাৎ যেখানে অবিভাগ, সে খানে 'দশমিক' দিয়া ভাগ করা যায়। দশমিকের অর্থ,—যাহা দশ গুণ বৃদ্ধি করে। তাহার অবয়ব এইরূপ যথা—(·১) (·২) ইত্যাদিবৎ।—অর্থাৎ শূন্য (•) অপেক্ষা সূক্ষ্ম,—"মহাশূন্য" তবেই দেখা গেল, যহা দশ গুণ বাড়াইয়া দেয়, এবম্ভূত বস্তুর (দশমিকের) অবয়ব যখন—শূন্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম "মহাশূন্যবৎ",—তখন এত বড় যে বিশ্ব, ইহার গুণ গুলি ধ্বংস হইলে,—অবশ্যই ঐ সমস্ত গুণ মহা শূন্যকারেই থাকিবে।— অর্থাৎ, 'দশ' 'দশ' গুণের যে শূন্যাপেক্ষা সূক্ষ্ম "মহাশূন্যের মত" অবয়ব, ঠিক সেই আয়বে থাকিবে। অতএব, এমতেও ধ্বংসের ভাবটী শূন্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম,—মহাশূন্য হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে,—এক হইতে এক বিয়োগ করিলে (বাদদিলে)—বিয়োগ ফল "শূন্য" হয়। যথা—(১—১=০) এইরূপ। আপনি ছয়টী পদার্থ লইয়া "এক" বিরাট বিশ্ব বলিতেছেন। অতএব ধরুন, আপনার বিশ্ব হইল (১) এক। এই (১) এক বিশ্ব হইতে এক (১) বিশ্ব বাদ দিলে, (ধ্বংস হইলে) শেষে শূন্যই থাকে। সুতরাং, ধ্বংসের ভাবটীকে আমরা "শূন্য" বলিতে পারি। আর এক কথা, দুইটী রাশির মধ্যস্থলে কোন চিহ্ন না থাকিলে, তাহা গুণ চিহ্ন বুঝায়। যেমন (৩) (২) ইহার মধ্যস্থলে—অর্থাৎ ফাঁকে, কোন চিহ্ন নাই;—তথাপি গুণ চিহ্ন ধরিতে হয়; যথা (৩) × (২) এই রূপ। ইহাই গণিত শাস্ত্রের নিয়ম। তবেই দেখা গেল, "গুণ" ফাঁকেই থাকে,—অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রই শূন্যের অবস্থান কেন্দ্র; ঐ কেন্দ্রেই গুণের অবস্থিতি। অতএব, এমতেও বলা যায় যে, গুণ ধ্বংস হইলে, তাহার আস্থান কেন্দ্র "শূন্যই" হয়। আরও দেখুন,—শূন্যকে যত দিয়াই গুন করুন, তাহার ফল শূন্যই হয়; যথা,—$(+0 \frac{-1}{+1})$ এই রূপের ফল শূন্য;—অর্থাৎ (০ × —১=০) এইরূপ। একটী মাত্র সংখ্যার পূর্ব্বে কোন চিহ্ন না থাকিলে, তাহা যুক্ত চিহ্নই বুঝায়; তথাপি আমারা শূন্য ও একের পূর্ব্বে যুক্ত চিহ্ন দিলাম। তবেই দেখুন, যে দিকেই দেখিতে যাই,—সমস্তই "শূন্য"। এরূপাবস্থায়, আপনার পূর্ণ পরব্রহ্মও যে "শূন্য" হইয়া পড়েন। তবে আপনি কাহার সহিত ভূমা মেলন করিতে চান?

["উত্তর পক্ষ"] (রাম ! রাম ! রাম এরূপ বাক্য, হিন্দুর শ্রবণ যোগ্য নহে ।) অহোহো ! ব্রহ্মণ্য দেব ! ইহারা এখনও কথার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না । কুসুম বৃন্তচ্যুত হইলে, আর সে কুসুম পুনরায় বৃন্তে নিবদ্ধ করা, কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে । স্তন্য দুগ্ধ একবার স্খলিত হইলে আর সে দুগ্ধ পূর্ব্ববৎ যথা স্থানে স্থাপন করা, কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে । তদ্রূপ ইহাদের মন এবং সহজাত প্রবৃত্তি, তোমা হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে আসিয়াছে । কাজেই, ইহারা তোমার অস্তিত্ব লোপ কল্পনায় আকুল চিত্ত । পুনরায় ইহাদের মন তোমাতে লাগান, মানবিক চেষ্টার অতীত । ভারতের এই পূত পবিত্র পুণ্য ভূমিতে আর কত দিন ইহারা এইরূপ আপন হারা হইয়া, যথা তথা তোমার অস্তিত্ব লোপ কল্পনায় ফিরিবে, হে অনন্তদেব ! তাহা তুমিই জান ।

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, এরূপ অসাময়িক, অসম্বন্ধ কথায়, বৃথা সময় ক্ষেপণের ফল কি ? পার্থিব পদার্থ বা দ্রব্যের "উপাদান-উপাদেয়" ভাব এক কথা, আর পাটীগণিত শুভঙ্করীর যোগ, বিয়োগ,—সে একটী অপর কথা । তোমাদের আজ পর্য্যন্ত যখন—কোনটা কাহার উপাদান আর কোনটা উপাদেয়,—এরূপ জ্ঞান উপস্থিত হয় না, তখন অতঃপর মুদীর দোকানের বেচাকেনা, এবং কর্জ্জ-দাদনের কিস্তীখেলাপী সুদ,—ইত্যাকার হিসাব গুলি পারমার্থিক বিচারের পোষক হওয়া অসম্ভব-পর নহে । এরূপাবস্থায়, আমাদের পক্ষের কর্ত্তব্যই হইতেছে যে,—অতঃপর তাঁরা "পিসীর "মন্ত্রে" এক কথায় উত্তর প্রদান । যথা :—

আমাদের দেশে "তারী পিসী নাম্নী" এক পিসী ছিল । তুমি যাইয়া যদ্যপি পিসীর নিকট বল, পিসী ! আমার এম, এ, পাশ করা ছেলেটী হঠাৎ কলেরায় মারা গিয়াছে । পিসী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবে,—"আহা ! হোগ্ ! হোগ্ !" আমি যাইয়া যদ্যপি বলি, পিসী ! গৃহ-দাহ হইয়া, কল্য আমার যথা সর্ব্বস্ব পুড়িয়া গিয়াছে । পিসী তাহাতেও উত্তর করিবে,—"আহা ! হোগ্ ! হোগ্ ! এইরূপ বগলা যাইয়া যদ্যপি বলে, পিসী ! আমার ভাইপোটী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে পিসী অবিলম্বেই বলিবে;—"আহা ! হোগ্ ! হোগ্ !" পিসীর ঐ এক কথা, এক উত্তর (আহা ! হোগ্ হোগ্ !) সকল কথায় যথা তথা প্রযুক্ত হয় । আমরাও দেখিতেছি অতঃপর তোমাদের ঐরূপ প্রসঙ্গের, ঐরূপ উত্তরই—"অর্থাৎ তারা পিসীর মন্ত্রই" যথেষ্ট । অন্যথায়, যাহা বলি শুন ।

একটী তাল গাছে কতক গুলি তাল আছে । একটী কাক ঐ তালের উপর আপন মনে বসিয়া নিজের স্বভাবসুলভ 'কা' 'কা' রব করিতেছে । গাছের যে তাল ফেলিতে হইবে কাকের এরূপ কোন চেষ্টাই নাই । এরূপ সময়ে কোন কারণে কাকটী উড়িয়া গেল; সেই সঙ্গে "তৎক্ষণাৎ"—একটী তাল পড়িয়া গেল । তালতলায় দুই চার জন "বাবু গোছ" লোক ছিল । বাবুরা মনে করিল যে, ঐ কাকই নিশ্চয় এই তালটী ফেলিয়া দিল । অর্থাৎ, বাবুরা-জ্যামিতি পরিমিতি)—নানারূপ শাস্ত্র খাটাইয়া দেখি-

লেন যে,—তাল কিম্বা কর্ম্মটী কাকের নিশ্চয়ই। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু, ঐ তাল পড়া,—এবং কাকের উড়িয়া, যাওয়া এই দুটীর মধ্যে কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই; অ শুস্থাবীও নহে। তথাপি, বাবুরা ইহা কাকের কার্য্য মনে করিয়া যেরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন ঐ রূপ চমৎকার জনিত চিত্তবিস্তারকে,—অর্থাৎ ঐ রূপ বিস্ময়কর ঘটনাকে কাকতালীয় ন্যায় বলা হয়। তদ্রূপ, তোমাদের (ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ × বর) ভবে ঈশ্বরত্ব লোপ ঠিক বজায় রাখিয়া আবার পাটীগণিত-শুভঙ্করীর দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ করায় "পূর্ণ পরব্রহ্ম" নিশ্চয়ই গণিত শাস্ত্রের মতে "শূন্য"—এইরূপ যে চিত্তবিস্তার, ঐ চিত্তবিস্তার জনিত চমৎকৃটী নিশ্চয়ই—"কাকের তাল ফেলার ন্যায়"—বা কাকতালীয় ন্যায়। কোথায় বিশ্ব! আর কোথায় যোগ বিয়োগ! তাপর আবার শূন্য!! চমৎকার কৌশল!!!

বিশ্ব কোথায়? ধ্বংসের সহিত তোমাদের "ঈশ্বর" "বিশ্ব" সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; ধরিবার ছুঁইবার কিছুই নাই। তালব্য শয়ে দীর্ঘ-উ দিলে 'শূ' হয়,—আর দন্ত্যনয়ে য ফলা দিলে 'ন্য' হয়। এইরূপ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের খেলা—কিম্বা "শূন্য" শব্দযুক্ত মন্ত্র কি ধ্বংসের পর বিদ্যমান আছে? উহার অনুভাবক কেহ আছে কি? তোমরা যদ্যপি তাহাই স্বীকার কর, তাহা হইলে ঐ "শূন্যই" নিত্য পদার্থ হইয়া যায়। সেরূপ হইলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তোমরা বিশ্বের অতীত কিছু পদার্থ স্বীকার কর না; ঈশ্বরের নিত্যত্ব পর্য্যন্ত মান না;—"নিরীশ্বরবাদী"। এরূপাবস্থায়, বিশ্ব ধ্বংশ হইবার পর, তোমাদের যোগ, বিয়োগ, পাটীগণিত, বীজগণিত—এবং তদনুগত সাধন শূন্য, কোথা হইতে আসিল? পক্ষান্তরে,—দেখ "বিশ্ব এবং ঈশ্বর" সমস্তই যখন (পূর্ব্ববিচারে) ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে, পরন্তু অদ্যাপি যখন বিশ্ব বা জগৎ সৃষ্ট হয় না, তখন তোমরা কি করিয়া, কোথা হইতে আসিয়া, এরূপ বাদ-প্রতিবাদের অবসর পাইলে? অপিচ পূর্ণ পরব্রহ্ম যে এইরূপ শূন্য,—এরূপ অনুভবই বা কোথা হইতে আসিল? তা তোমরাই বলিতে পার। অশূন্য, সৃষ্টির পর প্রবৃত্তি রূপ অর্থ ভাবনা দ্বারা,—তোমরা একই "পূর্ণজ্ঞান" পরম বস্তুকে নানা মতে,—নানা পথে লইয়া গিয়া, নিজ নিজ অন্যায্য সুসিদ্ধ করিতে পার, তাহাতে দোষ নাই। তাই বলিয়া, সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকার না করিয়া, ঐরূপ "শূন্য"—অভিজ্ঞান পাইবার আশা করা,—বিড়ম্বনা মাত্র।

পক্ষান্তরে, তোমরা বড় জোর মহর্ষি কপিল, না হয় মহানুভব বুদ্ধদেবের নিকট যাইবে। কিন্তু, সৃষ্টির পূর্ব্বে মহর্ষিদের তো উৎপত্তিই হয় না! অতএব, মহর্ষি বা আচার্য্য,—মহানুভবদের নিকট কোন কিছু উপদেশ পাইয়াছ, বলিতে পার না। আর,—ক্ষণে ধ্বংস হইয়া যায়, আবার ক্ষণে তৎসদৃশ উৎপত্তি,—"অর্থাৎ অহেতুক উৎপত্তি, আর অহেতুক বিনাশ,"—এরূপ কথাও তোমরা বলিতে পার না। কারণ, তোমরা সৃষ্টিকর্ত্তা মানিয়া আসিতেছ। জগৎ একবারে ধ্বংস হয় না; ঐ ধ্বংসের অর্থ লয়,—অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব, কোথাও না কোথা—"অব্যক্তাবস্থায়"

থাকে,—এরূপ কথাও তোমাদের বলা চলে না। কারণ, জগতের অস্তিত্ব চির বিদ্যমান থাকিলে, আর নূতন স্থষ্টিকর্ত্তার প্রয়োজন হয় না। তোমাদের মতে যখন জগতের ধ্বংস আছে, তখন তাহার স্থষ্টি অবশ্যই আছে। কিন্তু, ঐ স্থষ্টিকর্ত্তাটী কে? এখানে আর "ছেলে ভুলান কথার মত"—বলিতে পার না যে, "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" শব্দের যিনি "ঈশ্বর," তিনিই স্থষ্টিকর্ত্তা। যেহেতু, তিনি তোমাদের মতে ইতিপূর্ব্বে "ধ্বংস" হইয়া স্থষ্টির জঞ্জাল এড়াইয়াছেন। এরূপাবস্থায়, তোমরা যদি "শূন্য" নামক কোন কিছু স্বীকার কর, তাহা হইলে ঐ "শূন্যই" নিত্য বস্তু হইয়া, জগতের অতীত হইয়া যায়। এরূপ হইলে, তোমাদের ঐশ্বর্য্যার্থক "ঈশ্বর" পদার্থটী ভুলিতে হয়। অপিচ, জগতের স্থষ্টিকর্ত্তা কোন কেহ আছে, তাহাও ভুলিতে হয়। যদি বল, শূন্য হইতেই সকলের উৎপত্তি; স্থতরাং শূন্যই স্থষ্টিকর্ত্তা বা জগৎ কারণ। —তদুত্তরে বলা যায়, ঐ ঐশ্বর্য্যার্থক "ঈশ্বর" পদার্থটী, স্থষ্টিকর্ত্তা এই সম্পদটুকু লইয়া,—যেরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন,—বর্ত্তমান শূন্য মহাশয়ও সেইরূপ স্থষ্টিকর্ত্তা হইয়া, ঠিক সেইরূপ অবস্থায় আসিবে,—অর্থাৎ ধ্বংসের কোলে যাইবে; এ বিষয়ে আর কথা কি আছে? তবেই দেখ, অতঃপর তোমাদের কর্ত্তব্য কি? 'কর্ত্তব্য'—জগতের বা বিশ্বের অতীত কোন কিছু পদার্থের নিত্যত্ব স্বীকার করা; অপিচ, ঐ নিত্য বস্তুর স্থষ্টিকর্ত্তৃত্ব বিস্মৃত হওয়া।

"পূর্ব্বপক্ষ।" আচ্ছা, আমরা যদ্যপি বিশ্বাতীত কোন বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকার করি, এবং তাহার স্থষ্টি-কর্ত্তৃত্ব ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কোথা হইতে আসিতেছে?

"উত্তরপক্ষ।" হাঁ; এ কথা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। আমরা ঐ চিন্তার হাত এড়াইবার জন্যই তো এতদূরে দাঁড়াইয়াছি। অর্থাৎ বিচার দ্বারা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, নিত্যবস্তু "পূর্ণপরব্রহ্ম" জগতের কারণ নহেন। প্রযত্ন, অভিঘাত ইত্যাদিও জগতের কারণ নহে। ক্ষণভঙ্গবাদ অপসিদ্ধান্ত-পাত দোষ-দুষ্ট। যিনি প্রকৃতি, তিনিও জগৎ কারণ নহেন। তবে "দাঁড়াইয়াছে এই" ঐ যে প্রকৃতি, উনি পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত অভেদ হইতেছেন। যিনি "পূর্ণপরব্রহ্ম" পূর্ণ-চৈতন্য-বস্তু-বিশেষ, তাহারই অন্য একটী নাম "ভূমা" প্রকৃতি; এইরূপ অভেদ দাঁড়াইয়াছে। ঐ অভেদ তত্ত্বের নামই, "ভূমা ও পূর্ণপরব্রহ্মের" 'এক' একত্ব। বর্ত্তমানে দেখা গেল, "ঐশ্বর্য্যর্থক—ঈশ+বর"=ঈশ্বর পদার্থটী স্থষ্টিকর্ত্তা, বা জগৎ কারণ নহে। আমারা এই এতদূরে দাঁড়াইয়াছি; স্থতরাং অতঃপর বাধ্য হইয়া আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে যে,—তবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কোথা হইতে আসিতেছে? ইহা অবশ্যই আমাদেরই চিন্তার বিষয়ীভূত প্রসঙ্গ। তবে, তোমাদের পক্ষ হইতে এরূপ প্রশ্ন হইয়াছে,—ভালই হইয়াছে। এক্ষণে কথা এই যে, তোমরা অগ্রে বিশ্বাতীত কোন বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকার কর; তার পর অবশ্যই বিচার করিয়া দেখা যাইবে যে, পরিদৃশ্যমান্ জগৎ কোথা হইতে আসিতেছে!

"পূর্ব্বপক্ষ"। আচ্ছা; বিশ্বাতীত দুইটী বস্তুর যদ্যপি নিত্যত্ব স্বীকার করা যায়, অপিচ, ঐ শূন্যকে যদ্যপি তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র বলা হয়,—অর্থাৎ দুইটী বস্তুর যে সংযোগ, সেই সংযোগের মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র বলা হয়,—তাহাতে দোষ কি? আর এক কথা, আমরা ঐ যে 'শূন্য' 'শূন্য' করিলাম, ঐ শূন্য, শূন্যবাদীর শূন্য নহে। দুইটী বস্তুর মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রই প্রকৃত শূন্য পদ বাচ্য। ঐ শূন্য, যে সে লোক ধরিতে পারে না,—বা সাধারণের প্রত্যক্ষীভূত নহে। এক মাত্র যোগিগণই তাহা ধরিতে পারেন;—অর্থাৎ ঐ যে শূন্য, উহা যোগিগণেরই প্রত্যক্ষ-গম্য। এরূপাবস্থায়, শূন্যকে একবারে উড়াইয়া দেওয়া ঠিক নহে। তবে কথা এই যে,—আমরা বিশ্বাতীত বা জগতের অতীত কোন কিছু পদার্থের "অস্তিত্ব" অস্বীকার করিতে ছিলাম। এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে বিশ্বাতীত দুইটী বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকার করিতেছি। আর উহাদের সংযোগে মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রকে শূন্য বলিতেছি। এরূপ হইলে দোষ কি?

"উত্তরপক্ষ"। দেখ, দোষ আর গুণ এতদুভয়ের বস্তুগত ভাব একটী স্বতন্ত্র কথা। আর জটিল ভাষায়, একই কথার পুনঃ পুনঃ উক্তি, সে একটা অপর কথা।

অভিপ্রায় এই যে, কথা অনেক দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন যদ্যপি তোমার ঐশ্বর্য্যর্থক "ঈশ+বর"=ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া, আবার "প্রকৃতি-পুরুষের" আশ্রয় গ্রহণ কর; তদুত্তরে বলা যায় তোমাদের ভাষা জটিল করিয়া, অর্থাৎ দুইটী বস্তুর নিত্যত্ব স্বীকার উহাদের সংযোগের মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্র শূন্য"—এইরূপ ভাষায়, আবার নূতন ভাবে প্রকৃতি এবং পুরুষের নিত্যত্ব ও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে কেন? ঐ স্বীকার তো পূর্ব্বাপর আছেই। তবেই দেখ, কেবল ভাষার পারিপাট্য দেখাইয়া,—পাটীগণিত, বীজগণিত ইত্যাকার শাস্ত্র লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তোমারা যাহা বলিতেছ, তাহা সেই একই প্রকৃতি তত্ত্বের "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" মাত্র। নূতনত্ব কিছুই নহে। আর ঐ "ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ+বর" তত্ত্বটী, ঐ প্রকৃতি তত্ত্বেরই প্রকার ভেদ "মাধ্যমিক সাধন" মাত্র।

কিন্তু, ঐ "প্রকৃতি তত্ত্বের" কথা লইয়া ইতি পূর্ব্বে বহু বহু বিচার হইয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে, প্রকৃতির নিত্যত্ব ও জগৎ কারণত্ব সমর্থিত হয় না।

বর্ত্তমানে আর ঐ সকল কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন (তোমাদের মনে না থাকে, পূর্ব্ব বিচার গুলি দেখিতে পার)। তবেই দেখ, যখন প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর সংযোগ সম্ভাবনা নাই, তখন যোগ, বিয়োগ, পাটীগণিত, শুভঙ্করীর উদাহরণ গুলি প্রবৃত্তি রূপ অর্থ ভাবনারই ফল-স্বরূপ। আর যোগীর শূন্য নিরীক্ষণ,—বা প্রকৃতি পুরুষ মিশ্রণে জগৎ উৎপাদন,—এ গুলি সৃষ্টির পর নিজ নিজ সাধন লব্ধ "অভিজ্ঞান মাত্র"। ঐ অভিজ্ঞান এক কথা; আর অভিজ্ঞানের অতীত,—অর্থাৎ জগতের অতীত ভাব আর একটী স্বতন্ত্র কথা। আমাদিগকে যখন দেখা দেখি, শুনা শুনি ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তখন বর্ত্তমানে ঐ রূপ "যোগীর শূন্য নিরী-

ক্ষণ"—(চিত্রানী নাড়ীর মধ্যভাগ) দেখিয়া মুগ্ধ হইলে চলিবে না। আর, প্রকৃত পরমার্থিক ভাব হারাইয়া, কেবল ভাষার মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইলেও চলিবে না। অতএব, তোমাদের ঐরূপ প্রসঙ্গ অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল নহে। যাহা প্রকৃত কাজের কথা, প্রবন্ধের ফলিতার্থ দ্বারা যাহা ব্যক্তীভূত হইতেছে,—সেই কথা (অর্থাৎ বিশ্বাতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব এবং নিত্যত্ব স্বীকার) সমর্থন কর, তাহা দ্বারা তোমাদের সহজাত ভ্রম নিবারিত হইয়া, চিত্তমল বিদূরিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

—:0:—

ধ্রুব তারা

অকূল সাগরে দিক্ হারা হয়ে,
বিপন্ন নাবিক দিক্-যন্ত্র লয়ে
করয়ে দিকের সাড়া;
এ ঘোর সংসারে পথ ভ্রান্ত হয়ে,
আমিও তেমতি করেছি তোমারে
জীবনের ধ্রুবতারা।

গম্ভীর নিশীথে গহন কান্তারে,
পথহারা পান্থ চাহি ঊর্দ্ধপানে
নেহারে আকাশ-তারা।
অজ্ঞান তিমিরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে,
আমিও তেমতি জেনেছি তোমারে
জীবনের ধ্রুব তারা;

দূর পর্য্যটনে ক্লান্ত তীর্থগামী,
আশা পায় প্রাণে দেখে দূর হতে
মন্দিরের উচ্চচূড়া;
বহুদূর হতে আমিও তেমনি,
তোমারে দেখিয়ে পেয়েছি সাহস,
তোমা জেনে ধ্রুবতারা।
তুমিত উপরে আমি আছি নীচে,
জানিনা কেমনে পাইব চরণ,
মাঝে মাঝে দিও সাড়া;
তব কৃপা হবে, তোমারে পাইব,
বুঝেছি নিশ্চয় জেনেছি যে দিন,
তুমি মোর ধ্রুব তারা।

দীন—স্বরূপানন্দ।

—:0:—

সুখ-তত্ত্ব

(৪)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত ক্রমোন্নত স্বর্গাদি লোক সমূহের শান্তি-সুখও যে অচির স্থায়ী এবং পরিণাম দুঃখ-প্রদ, সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা না হইলে সন্ত-স্বর্গাদি লোকেও বস্তুতঃ প্রবন্ধ অঙ্গহীন হইবে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, শ্রীভগবান গীতায় বলিয়া প্রত্যুত অধিক দুঃখ। গিয়াছেন যে কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী জীবগণ ইষ্টাপূর্ত্তাদি যজ্ঞের

অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গবাস কামনা করিয়া থাকেন। ঐ কামনা অবশ্য আপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখভোগের নিমিত্ত, সন্দেহ নাই। সাধারণ বিচার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ভোগই দুঃখ বা অশান্তির প্রধান কারণ। ভোগরহিত ব্যক্তির অভাব থাকে না। অভাবের অনুভূতি না থাকিলে মন ক্ষুব্ধ হইতে পারে না, মন তখন শান্ত, ধীর, স্থির। অভাবের অনুসন্ধান-জনিত বিক্ষোভ দ্বারা চাঞ্চল্য উপস্থিত না হইলে মনে কোন প্রকার অশান্তির উদয় হয় না। অস্থিরতার দ্বারাই মনের গভীর প্রশান্তভাব দূরীভূত হইয়া নানা প্রকার উদ্বেগের সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক দর্শনবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, চিত্তবৃত্তি সমূহের অধিপতি
চিত্তের মন একই বিষয়ের শ্রবণ, মনন ও
চাঞ্চল্যই নিদিধ্যাসনের দ্বারা শান্তভাব ধারণ
দুঃখের করে এবং আনন্দে আপ্লুত হয়। এই
কারণ। জন্যই প্রশান্তমনা যোগীরা ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত দশার অতীত হইয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রত্যক্ষরূপেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, সাধারণ ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাণায়ামকারীর মন অনেকটা শান্ত ও গম্ভীর হইয়া দুঃখের হাত এড়াইয়া থাকে। বুঝিবা দুঃখ রাশির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় বলিয়াই শাস্ত্রে যোগের এত মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এইজন্য শ্রীভগবান সকল অবস্থাতেই সুখাভিলাষী মানবকে যোগী হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী, জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী, তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।
গীতা ৬ষ্ঠ, ৪৬ শ্লোঃ।

স্বর্গাদি উন্নত লোক সমূহ ভোগবহুল। যজ্ঞাদি সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানব সেই ভোগাধিক্যেরই কামনা করিয়া থাকে। এখন দেখিতে হইবে যে, ভোগের দ্বারা ভোগ-বাসনার অবসান হয় কিনা; এবং ভোগাকাঙ্ক্ষার বারংবার চরিতার্থতা সম্পাদনেও প্রাণে বাস্তবিক শান্তি আসিতে পারে কিনা। কত অচিন্ত্যনীয় বিলাস ঐশ্বর্য্যের অবিশ্রান্ত উপভোগ দ্বারা কতকত বিলাসীর সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল; তাহার বদন-চন্দ্রমা বার্দ্ধক্যের পীড়ায়, জীবনের হতাশায়ে কালীমা-যুক্ত হয় কেন? বিলাস সামগ্রীর কোনটীরই অভাব যাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে নাই; তাহার স্ফূর্ত্তি-যুক্ত শরীরও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিথিল
ও উৎসাহ-উদ্যম শূন্য
ভোগের দ্বারা আশা হইয়া পড়ে কেন? লক্ষ্য-
মিটেনা। পতির প্রাণ অভাবের তাড়-
নায় ছট্ ফট্ করিতে
থাকে!

পূর্ণযৌবনা, পূর্ণাভরণা রমণীয়া কামিনীর কমনীয় কান্তিই যার অহোরাত্রের উপাস্য, তার প্রাণও সময়ে সময়ে উড়্ উড়্ করিতে দেখা যায় কেন? ভোগের এই দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া যখন জগতের প্রধান প্রধান কর্ম্মবীরদের সাধন জীবনের সংযমের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখনও প্রাণে এইরূপ ক্ষণিক আনন্দের চিহ্নই দেখিতে পাই। কর্ম্মের বিশ্রাম কালে
আবার তুমি যেই তিমিরে
সাংসারিক সৎকর্ম্মের সেই তিমিরে। বৈজ্ঞানিক
গবেষণার দ্বারাও শান্তি প্রবর নিউটন যখন মধ্যো-
হয় না। কর্ষণ শক্তির আবিষ্কারের

প্রণালী উদ্ভাবনের চিন্তায় সমাধিস্থ হইতেন, তখন তাঁহার মন একনিষ্ঠ হওয়ায় নানাপ্রকার কল্পনা রূপে দার্শনিক জল্পনায় সকল্প বিকল্পের দুঃখ জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইতেন বটে; কিন্তু পরক্ষণেই ত তিনি আবার সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতির নিকট আত্মবিক্রয় করিতেন। এইরূপে মহামতি হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যখন জাগতিক পদার্থের analyse অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিতে করিতে বিশ্বব্যাপিনী শক্তির (Universal force এর) বিদ্যমানতা এবং অদ্ভুত কার্য্যকারিতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভয়ে ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইতেন, তখন তাঁহার চিত্ত একাগ্র হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারিত বটে; কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই ত আবার সংসারের ঝঞ্ঝনাত তাঁহার হৃদয় কন্দরকে মুখরিত করিয়া তুলিত !! এই রূপে দার্শনিক প্রবর মোক্ষমুলার, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কর্ম্ম-জীবন আলোচনা করিলেও একই প্রকার তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। মহর্ষি ব্যাসদেব যখন বেদান্ত রচনায় উপরত থাকিতেন, তখন তিনি ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইতেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু যেই মুহূর্ত্তে তিনি ব্রহ্মধ্যানে সামান্য শৈথিল্যপরায়ণ হইতেন, তখনই ত তিনি সংসারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট সাজিতেন ! শুকদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় তিনি কি মোহান্ধতাই না প্রকাশ করিয়াছিলেন !! মহামুনি কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি ও জৈমিনি প্রভৃতি মুক্তিপথ-প্রদর্শক দিগের সংসার জীবনেও যে কখনই বৈষয়িক সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছিল না, এমন কথা কে বলিতে পারে ? বিশ্ব-বিখ্যাত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বর্ত্তমান মনীষিগণের সংসার চিত্রও ঠিক তদনুরূপ বলিতে পারা যায়। সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সুখ এবং দুঃখ হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। মানবের দেহের ভৌতিক উপাদান দুঃখ সঙ্কুল। সুতরাং ভৌতিক দেহধারী মানব যে প্রকারই হউন না, অল্প বিস্তর দুঃখ ভোগ তাহাকে করিতেই হইবে। শরীরের ধর্ম্ম নষ্ট হইবার নহে। তবে সাধু জীবনের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা সুখ-দুঃখকে শরীর-ধর্ম্ম ও ক্ষণস্থায়ী মনে করিয়া উহা দ্বারা ততটা অভিভূত হন না; অধিকন্তু অনেক সময় উপেক্ষা করিতে সমর্থ হন। প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক পাঠিকা তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

সৃষ্টির কারণ সুখ-দুঃখ-স্বরূপ; কাজেই শরীর ধারী মাত্রেই অল্প বিস্তর সুখ-দুঃখের ভাগী হইবে, আশ্চর্য্য বা সন্দেহের বিষয় নহে।

শরীরধারী মাত্রেই বাসনা-বিজৃম্ভিত। এবং ঐ বাসনা দুঃখাত্মিকা ইহাই আমরা বলিতে চাহিয়াছিলাম। আর বলিতেছিলাম, বাসনা থাকিতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-লাভ আকাশ-কুসুমবৎ অলীক ও অসম্ভব। ভোগের দ্বারা ভোগ বাসনা পরিতৃপ্ত বা চরিতার্থ হয় না, অভাব ঘুঁচিবেনা। কাজেই ভোগবাসনা যতই বাড়িবে সঙ্গে সঙ্গে অভাবও শত সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইবে; তজ্জনিত দুঃখের ভাগও সেই অনুপাতে দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত রূপে বৃদ্ধি

আমাদের উদ্দেশ্য ও বিধেয়

হইতে থাকিবে। বাসনা অনন্ত, ভোগের দ্বারা বাসনা নাশ করিব, এরূপ ধারণায় যাঁহারা অপরিমিত বিষয় সম্ভোগে উপরত হন, অনন্ত বাসনা তাঁহাদের জীবনের সঙ্গিনী হয়, এবং অভাব জনিত দুঃখানুভূতিও তাঁহাকে আর ছাড়িতে চায় না। কোন বিষয়ের লালসা মনে উদিত হইলে, তখন তাহার বুদ্ধি বিচলিত হয়, লোভ বা লালসা হইতে বিষয়-তৃষ্ণা জন্মে, আর তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ইহলোক পরলোক বা স্বর্লোক সর্ব্বলোকেই দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি, লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি; পরত্রেহচ মানবঃ॥

নীতিশাস্ত্র।

যদি বুঝিতাম আমার লোভের বিষয় হস্তগত হইলেই লোভের নিবৃত্তি হইবে, তাহা হইলেও না হয় কমনাপরায়ণ স্বর্গকামিগণ অবিরাম সম্ভোগের দ্বারা বাসনাকে চরিতার্থ করিতেছেন, দেখিয়াও তাঁহাদেরে সুখী বলিতে পারিতাম। কিন্তু দেখিতে পাই,—ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, বৃদ্ধ, যুবা, উচ্চ, ইতর, সকলের জীবনেই দেখিতে পাই, যতই ভোগ দ্বারা বাসনা ফুরাইয়া ফেলিতে চাওয়া যায়, ততই ভোগানলে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। যদি দৃষ্টান্তের দ্বারা আলোচনা করা দোষাবহ না হয়, তবে আমারা এস্থলে অন্য কিছু না বলিয়া মহাভারত হইতে কেবল রাজা যযাতির উপাখ্যানটি উদ্ধৃত করিব। মহারাজ যযাতি সমস্ত জীবন বিষয়-সম্ভোগ করিয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন ও মনে করিলেন, পুনরায় যৌবন আনিতে পারিলে বুঝি বা ভোগ-দ্বারা লোভের-কমনার নিবৃত্তি হইবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি তাঁহার পুত্র-দিগের নিকটে যৌবন প্রার্থনা করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার একটা গভীর সঙ্কল্প-সিদ্ধির অনুসন্ধানার্থ অকাতরে তাঁহার যৌবন অর্পণ করিলেন। রাজা যযাতি সেই যৌবন লইয়া একদিন-দুই দিন নয়, এক মাস-দুই মাস নয়, দুই এক বৎসরও নয়, সহস্র বৎসর ধরিয়া কাল অকাল, সময় অসময়, বিচার না করিয়া নানা বিষয়ে নানা প্রকারে বাসনা চরিতার্থ করিতে লাগি-লেন, অবশেষে দেখিলেন, বাসনায় অন্ত নাই, লোভের বিরতি নাই; দুঃখেরও অবসান নাই, ভোগের দ্বারা বাসনার সীমান্তে পৌঁছিতে পারা যায় না। তাই তিনি সহস্র বৎসরান্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে অরিন্দম পুত্র, মনে যখন যেরূপ অভিরুচি হইয়াছে কিম্বা যেরূপ উৎসাহ হইয়াছে, যে সময়ে যেইরূপ বিষয় ভোগ করা যাইতে পারে, তোমার যৌবন লইয়া সেইরূপ বিষয়ই ভোগ করিয়াছি। কাম ভোগদ্বারা কখনও কামের নিবৃত্তি হয় না; বরং অগ্নি যেমন ঘৃতাহুতি পাইলে আরও অধিক ভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়, কামও সেইরূপ ভোগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও নারী আছে, তাহা সমস্ত একত্র করিলেও একটী মাত্র ব্যক্তিরও তৃষ্ণা মিটে না; অতএব তৃষ্ণা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। দুর্ম্মতিগণ যাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; শরীর সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া গেলেও যাহা কখন জীর্ণ হইবার নহে, সেই যে প্রাণান্তিক মহারোগ তৃষ্ণা, তাহাকে যিনি

ভোগের দ্বারা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়না। রাজা যযাতির উপাখ্যান।

ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী । আজ পূর্ণ সহস্র বৎসর বিষয়াসক্ত-চিত্ত হইয়া রহিয়াছি, তথাপি দিন দিন এই লোভের বিষয় গুলিতে তৃষ্ণা জন্মিতেছে । সুতরাং এই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মেতে চিত্ত সমাহিত করিয়া সুখ দুঃখের অতীত ও মমতা রহিত হইয়া মৃগদিগের সহিত বিচরণ করিব ।

যথাকামং যথোৎসাহং যথাকালমারিন্দম ।
সেবিতা বিষয়াঃ পুত্র যৌবনেন ময়া তব ॥
ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাত্তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি যান জীর্য্যাতি জীর্য্যতঃ ।
যোহসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখং ॥
পূর্ণং বর্ষ-সহস্রং মে বিষয়াসক্ত চেতসঃ ॥
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা, মমৈতেস্বাভি জায়তে ॥
তস্মাদেনামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসং ।
নির্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥

এখন আমারা অনায়াসে বুঝিতে পারিলাম যে, বাসনার ন্যায় উৎকট ব্যাধি আর নাই। যাহাদের ক্রমাগত বাসনা বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাদের প্রাণে শান্তি আসিবে কি প্রকারে ? সুতরাং অহর্নিশ ভোগ-ব্যাকুল স্বর্গবাসী লোক-কুল যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী নহে, তাহা সাহসের সহিত বলিতে পারা যায় ইন্দ্রাদি দেবগণ সুবৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা মর্ত্ত্যবাসীর উপকার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ঐ উপকারের মূলে স্বার্থের অপেক্ষা আছে । শ্রীভগবান গীতার বলিয়া গিয়াছেন—

ইন্দ্রাদি দেবতাগণের দয়া অহৈতুকী নহে।

স্বার্থের অপেক্ষা থাকিলে সেই উপকারে প্রাণে বিমল শান্তি আসিবে কেন ?

দেবান্ ভাবয়তানেন, তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ, শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
৩য় অঃ ১১ শ্লোঃ
ইষ্টান ভোগান হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
৩য় অঃ ১২ শ্লোঃ

হে প্রজাপতি সৃষ্ট জীবগণ !

যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণের সংবর্দ্ধনা কর এবং দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন । এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে । যেহেতু দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়াই তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগসকল দান করিবেন । (নতুবা নহে) ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দ্বারা দেবতাদের উদর-তৃপ্তির ব্যবস্থা না করিলে তাঁহারা আমাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিবেন না । এই রূপ স্বার্থান্বেষীদের চিত্তে শান্তি আসিতে পারে কি ? শান্তি যে আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান-রহিত ব্যক্তিরই চিরায়ত্ত সম্পত্তি !!

স্বর্গবাসী দেবতাদের পরশ্রীকাতরতা ।

পরশ্রীকাতরতা রূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান দেবতাদের নিত্য কর্ত্তব্য । পৃথিবীতে কেহ কোন সৎকার্য্য করিলে দেবতাদের গাত্র-দাহ উপস্থিত হয় । কেননা পুণ্যেরদ্বারা স্বর্গে বাস করিবার অধিকার পাইয়া পাছে তাঁহাদের ভোগ্যে ভাগ বসায় ! মরুত রাজা, শত অশ্বমেধ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়া নিরানব্বইটী পর্য্যন্ত কোন প্রকারে সম্পন্ন করিলেন । শত সংখ্যক পূর্ণ করিতেই দেবরাজের হৃৎকম্প হইল, অমনি তিনি যজ্ঞের অশ্বটী অপহরণ করিলেন ! মরুত রাজার শতাশ্বমেধ

পূর্ণ হইল না। দেবতারাও কতকটা সোয়াস্তি বোধ করিলেন। আবার মহারাজ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, দেবতাদের প্রাণে তাহা সহিল না; অমনি স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে পাঠাইয়া তাঁহার তপস্যায় বাধা জন্মাইলেন। এইরূপে ছলে বলে কৌশলে—নানা প্রকারে দেবতারা মর্ত্ত্যবাসীর ধ্যান-ধারণায়, জপ-তপ ও সাধ্য-সাধনায়, বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। এতাদৃশ ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতায় যাঁহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত ও কলুষিত, তাঁহারা শান্তির বিমল ভাতির কণিকা মাত্রেরও অধিকারী নহেন।

এখন আবার প্রশ্ন হইতেছে, তবে বস্তুতঃ সুখ কোথায়? আনন্দরূপ ব্রহ্মের সত্তা কোথায় সম্যক রূপে অনুভূত হয়? কোথায় গেলে মানবের মন প্রাণ চির-স্থির, চির-শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে? আমরা আগামী-বার হইতে প্রকৃতির স্তর-ভেদ অনুসারে আলোচনা করতঃ পুনরায় আনন্দের স্বরূপ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচন্দ্রকান্ত বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ।

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী

মিশ্র ভূপালী (২৫) কাওয়ালী

ওহে শ্যামরায়, কেমনে চিনিব হে তোমায়।
তুমি কখন শ্যাম, কখন শ্যামা, লীলা বুঝা দায়॥
কভু হেরি নিধুবনে, কভু যমুনা-পুলিনে,
কভুবা শিবের বামে, কভু ভীষণ শ্মাশানে,
ধিয়া ধিয়া নৃত্য কর হায়॥
কভু মাথে মোহন চুড়া, গোপীগণ মন-চোরা,
কখন মুকুট পরা, এলোকেশী পাগল পারা,
সঙ্গে যোগিনী রঙ্গে ধায়।
কভুবা ললিত হাসি, বিতরে অমিয় রাশি,
কভু ঘোর অট্ট হাসি, চমকিছে দশ দিশি,
বিশ্ব কাঁপে প্রলয়ের প্রায়॥
করেতে মোহন বাঁশী, রাধার নামে উদাসী,
কভু হেরি ভীম অসি, উজলে দানব নাশি,
(আবার) বরাভয় হেরে প্রাণ জুড়ায়॥

নরমুণ্ড মালা গলে, কভু বনমালা দোলে,
কভু গজমতি হারে, কতই মাধুরী খেলে,
(তুমি) পশুবল দল' রাঙ্গা পায়।
নরকর কোটিবেড়া, কভু হেরি পীত ধড়া,
কভু রক্তাম্বর পরা, কভু তুমি দিগম্বরা,
এ মাহিমা বুঝা বড় দায়॥
বিরাজে পদে তুলসী, কভু বিল্বপত্রে খুসী,
কভু রাঙ্গা পায়ে হেরি, শোভে কত জবা রাশি,
যোগানন্দ লোটে ঐ পায়॥

——0——

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবসংবাদ

ভগবানের প্রতি উদ্ধবের প্রশ্ন

ভগবান কহিলেন—"আমি যে সমস্ত নিজ নিজ ধর্ম্ম কহিয়াছি, মদাশ্রিত ব্যক্তি তাহাতে সাবধান হইয়া, মন হইতে বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ণ, আশ্রম ও কুলানুরূপ আচার করিবে। বিষয়াসক্ত দেহী সকল বিষয়কে যথার্থ বোধ করিয়া যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তৎ সমুদায়েই বিপরীত ফল ফলে,—শুদ্ধচিত্ত হইয়া ইহা দর্শন করিবে। সুপ্তব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় বিষয়দর্শন বা চিন্তাকারীর মনোরথ যেমন নানাত্বক বলিয়া অর্থশূন্য, সেইরূপ বিষয় সকলে ইন্দ্রিয় জনিত আত্ম-বুদ্ধিও নানাত্ববশতঃ অর্থশূন্য। মৎপরায়ণ হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মই করিবে, কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। আত্মবিচারে সম্পূর্ণ রূপে প্রবৃত্ত হইয়া নিবৃত্তি কর্ম্মবিধানেও আস্থাবান্ হইবে না। কিন্তু মৎপরায়ণ হইয়া সংযম সকল নিত্য সেবা করিবে। নিয়ম সকল কখন কখন সেবা করিবে, আর যিনি আমাকে বিশেষরূপে জানেন, আমার স্বরূপ সেই শাস্ত্র-গুরুর আরাধনা করিবে। অভিমান, মাৎসর্য্য, আলস্য ও মমতা ত্যাগ করিবে। গুরুতে দৃঢ়রূপে সৌহার্দ্য বন্ধন করিয়া থাকিবে, ব্যগ্র হইবে না, তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিবে এবং অসূয়া ও অনর্থক আলাপ পরিহার করিবে। স্বীয় প্রয়োজনকে সর্ব্বদাই সমান দেখিয়া স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে উদাসীন হইয়া, কেবল গুরুর উপাসনা করিবে। যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য ও প্রকাশ্য কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন পদার্থ, সেইরূপে দর্শক ও স্বপ্রকাশ আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক। ধ্বংশ, জন্ম, সূক্ষ্মত্ব ও নানাত্ব অগ্নির গুণ নহে—অগ্নি কাষ্ঠের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তদীয় গুণ সকল অবলম্বন করিয়া থাকে; এইরূপ আত্মাও দেহের গুণ সমূহ

ধারণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের গুণগ্রাম দ্বারা স্থূল দেহ বিরচিত জীবের সংসার ইহাদিগের অধ্যাসবলে উৎপাদিত; আত্মজ্ঞান দ্বারা তাহা ছিন্ন হয়, অতএব কার্য্য কারণ সমূহে অবস্থিত নিষ্কল পরমাত্মাকে বিচার দ্বারা সম্যক্‌রূপে জানিয়া যথাক্রমে এই দেহাদিতে যথার্থ বুদ্ধি ত্যাগ করিবে। আচার্য্য নিম্নস্থ কাষ্ঠ, শিষ্য—উপরিস্থিত কাষ্ঠ, উপদেশ মধ্যস্থিত মথনকাষ্ঠ; আর, বিদ্যা—উহাদিগের সংঘটনোদ্ভূত সুখাবহ অনল। অতি নিপুণ শিষ্য কর্ত্তৃক লব্ধ সেই অতি—বিশুদ্ধা বুদ্ধি, গুণসম্ভূত মায়াকে নিবর্ত্তিত করিয়া দেয় এবং এই বিশ্বসম্ভব গুণ সকলকে দাহ করিয়া, নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়, আপনিও নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ-দুঃখ ভোক্তা এই সকল জীবাত্মার নানাত্ব স্বীকার কর; যদি স্বর্গাদিলোক, কাল—ধর্ম্মবোধক শাস্ত্র ও আত্মার নিত্যতা মনে কর, যদি সমুদয় ভোগ্য পদার্থের যথাবৎ স্থিতিকে প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া স্বীকার কর এবং যদি মনে কর যে, তত্তৎ আকৃতির ভেদ দ্বারা বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং অনিত্য বলিয়া নাশ পায়;—তাহা হইলেও দেহসংযোগে ও কালের অবয়ব হেতু সমস্ত শরীরীর বারংবার জন্মাদি অবস্থা সকল হইতে পারে। আর সে পক্ষেও কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তার পরাধীনতা লক্ষিত হইতেছে। অস্বাধীনকে কোন পুরুষার্থ সাধন-উদ্দেশে উপাসনা করিবে? পণ্ডিত দেহীগণেরও কিঞ্চিৎ সুখ নাই, এইরূপ মূঢ়দিগেরও কোনও দুঃখ নাই, অতএব অহঙ্কার কেবল নিরর্থক। যদি সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি ও নাশ জানে, তথাপি তাহারা মৃত্যু-প্রভাব-প্রতিবন্ধক যোগ অবগত হইতে পারে না। যখন বধ্যস্থানে নীয়মান বধ্যের ন্যায়, নিকটে মৃত্যু অবস্থিতি করিতেছে, তখন কোন্ পুরুষার্থ বা কাম ইহাকে সুখী করিতে পারে? দৃষ্ট সুখভোগের ন্যায় শ্রুত স্বর্গও স্পর্দ্ধা, অসূয়া, নাশ ও অপক্ষয় দ্বারা দূষিত এবং বিঘ্নবহুল সুখ থাকাতে ইহা কৃষির ন্যায় নিষ্ফল। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিঘ্নশূন্য হইলে, তদ্দ্বারা উপার্জ্জিত স্থান যে প্রকারে পাওয়া যায়, তাহা শ্রবণ কর। যাজ্ঞিক ইহলোকে যজ্ঞসকল দ্বারা দেবগণের যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন, তথায় দেবতার ন্যায় নিজ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত দিব্য ভোগ সকল ভোগ করিয়া থাকেন। মনোহর বেশ ধারণ পূর্ব্বক নিজ পুণ্য দ্বারা সর্ব্বভোগসম্পন্ন শুভ্র বিমানে আরোহণ করিয়া, রমণীদিগের মধ্যে বিহার করিতে করিতে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক প্রসংসিত হইয়া থাকেন। দেবতাদিগের ক্রীড়াস্থান সকলে কিঙ্কিণী-জাল-জড়িত কামগামী যানযোগে স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সুখ প্রাপ্ত হইয়া, আপনার অবশ্যম্ভাবী পতন জানিতেও পারেন না। যতকাল পুণ্য সমাপ্তি না হয়, ততকাল তিনি স্বর্গে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; পুণ্যক্ষয় হইলে পর, কাল-প্রেরিত হইয়া, অনিচ্ছা সত্বেও অধঃপতিত হইয়া থাকেন। আর যদি অসৎ ব্যক্তিদিগের সঙ্গ বশতঃ জীব অধর্ম্মনিরত অজিতেন্দ্রিয়, নীচাচার লুব্ধ, স্ত্রৈণ এবং ভূতগণের হিংসক হইয়া অবিধি পূর্ব্বক পশুবধ করতঃ প্রেত ও ভূতগণের যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ হইয়া বিবিধ নরকে গমন পূর্ব্বক ভয়ানক অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হন। কর্ম্ম সক-

ণের উত্তর কাল দুঃখপ্রদ,—দেহ দ্বারা সেই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারাই আবার শরীর লাভ করে; অতএব মর্ত্ত্যধর্ম্মিগণের সে কালে সুখ কি? লোক এবং কল্পজীবী লোকপালগণের আমা হইতে ভয় আছে; দ্বিপরার্দ্ধ সংবৎসর যাঁহার পরমায়ু, সেই ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয় আছে। গুণ সকল দ্বারাও ইন্দ্রিয় বর্গ সৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই জীব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল সমস্ত ভোগ করিয়া থাকে। যতদিন গুণগণের বৈষম্য থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব ও ততকাল পরাধীনতা; যতদিন ইহার পরাধীনতা, ততদিন ঈশ্বর হইতে ভীতি। যাঁহারা ভোগ এবং কর্ম্ম সেবন করেন, তাঁহারা শোকগ্রস্ত হইয়া বিমূঢ় হইয়া থাকেন। মায়াক্ষোভ হইলে, আমাকে কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব বা কর্ম্ম; এইরূপ বিবিধ রূপে বর্ণনা করিয়া থাকে। উদ্ধব কহিলেন,—বিভো! গুণগণের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে দেহজাত কর্ম্মও, সুখাদিতে কিরূপে বদ্ধ না হইয়া থাকিবে? আর সম্বন্ধ না থাকিলেই বা গুণগণ দ্বারা বদ্ধ হয় কেন? বদ্ধ আর মুক্ত ব্যক্তি কিরূপে ব্যবহার করেন? কি কি লক্ষণ দ্বারা উভয়কে জানা যায়? কিরূপে ভোজন করেন? কোথায় শয়ন করেন? কি পরিত্যাগ করেন? কোথায় উপবেশন করেন? কিরূপে গমন করেন? হে প্রশ্নবেত্তাশ্রেষ্ঠ! এই আমার প্রশ্ন। তবে কি একই আত্মা নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত?—এই আমার ভ্রম, উত্তর করিয়া তাহা দূর করুন।

দীন—কৃষ্ণদাস।

আত্মোপদেশ

নানো নদন না তেরা উধার

এই মহূর্ত্তেই বর গ্রহণ কর। কারণ যাচককে দাঁড় করাইয়া রাখা দাতার কর্ত্তব্য নহে। দাতার কার্য্য দান মাত্রেই শেষ হইয়া যায়। গ্রহীতারও কিছু কার্য্য আছে। তাহার গ্রহণশক্তি চাই, গ্রহণে অধিকার চাই। বস্তুর মুল্যানুভব বা বস্তুতে ভক্তি করা বা না করা তাহার হাত। তুমি তোমার কর্ম্মফল ভোগেরই অধিকারী, দাতা তোমাকে ত্রৈলক্য রাজ্য দিলেও তুমি যদি উহা ভোগ করিবার অধিকারী না হও—তাহা হইলে তুমি উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না; উহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে তোমার হৃদয়-ভাণ্ডারে স্থান পাইবে না। আধ্যাত্মিক আদান-প্রদান প্রণালী বড়ই অলৌকিক। ভক্তের ভক্তি দ্বারা সবই গ্রহণ হয়, অভক্তের সবই উড়ে যায়।

মহাত্মারা আর্ত্তকে কতকগুলি মঙ্গলোদ্দীপক বা শুভ শক্তির উদ্দীপক শব্দ প্রদান করেন। এই শব্দাদি ব্রহ্ম-সম্ভূত তীব্র বীর্য্যশালী। যাহারা নিজ কর্ম্ম দোষে অন্ধ, যাহারা বিষয়াবরণে সম্যকরূপে আবৃত-বুদ্ধি, যাহারা ঈশ্বরের ক্রিয়াপ্রণালী জানে না, যাহারা স্থূল-ভক্ত, যাহারা অহঙ্কার মদমত্ত, তাহারা নিজ দোষে মহাত্মাদের দয়া প্রাপ্ত হইয়াও

উহা গ্রহণ করিয়াও কৃতার্থ হইতে পারে না। বীজশক্তি ও ক্ষেত্রশক্তির মিলন না হইলে ফল উৎপন্ন হয় না। ভস্মে ঘৃত সিঞ্চনে যে ফল হয়, পাষাণে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে যে ফল হয়, তাহাদিগকে বরদান করিলেও সেই ফল হয়।

গ্রহ-নিগ্রহ

শুভ গ্রহই হউক আর দুষ্ট গ্রহই হউক, তাহারা কর্ম্মজীবকে শুভ অথবা অশুভাভিমুখে আকর্ষণ করেন বা ছোটান।

জীবকে স্থির পদে রাখা তাহাদের কার্য্য নহে। পরন্তু জীবকে স্থির পদে ধরিয়া রাখিবারও একজন আছেন। তিনি এই গ্রহদিগের কেন্দ্রস্থ পুরুষ। তিনি স্থির তিনিই ধ্রুব। সকল গ্রহকে নিগ্রহ করিতে পারেন, সকলের কর্ম্ম বন্ধ করিতে পারেন। তখন সেই গ্রহেরা শব তুল্য হইয়া যান। গ্রহদের কর্ম্মজীবের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে একটা কিছু গ্রহণ করিয়ে দেওয়া বা শুভ অশুভ একটা ধুয়ো ধরিয়ে দেওয়া। জীব যদি তখন পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত থাকে, অপর ধারণা দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলে গ্রহেরা হতবীর্য্য ও হতবল হইয়া পড়ে।

আধ্যাত্ম বল অপেক্ষা বল নাই। অধ্যাত্ম বলে ধৃত হইয়া, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি ও বিবিধ জীবগণ নিজ নিজ দেহপ্রভাব রক্ষণ করিতে সমর্থ হন। ক্ষুদ্রই হউন আর মহৎই হউন, সর্ব্ব শক্তির মূলই আত্মা। আত্মা যাহাকে রক্ষা করেন, কেহই তাহার কিছু করিতে পারে না এবং করেও না। শত্রুও মিত্র হইয়া দাঁড়ায়। যথা প্রহ্লাদ।

দেহের জোর

দেখ বাবা, তুমি সর্ব্বদা অত হা দেহ! হা দেহ! করে হেদিওনা। চব্বিশ ঘণ্টা প্যাট প্যাট করে চেয়ে ফুক্কোমুখী হয়ে এদিক ওদিক করো না। নিরাকার থেকেই সাকার হইয়াছে। সূক্ষ্ম থেকেই স্থূল হয়েছে। বেদব্যাসেরই বল, আর বুদ্ধদেবেরই বল, যিশুখৃষ্টেরই বল, আর মহাত্মাদেরই বল, আর মাষ্টারদের বল—সর্ব্বলোকেই স্থূল শরীর বা শক্তি তো খাক হয়ে গেছে। এখন আর জটা আর পাকা দাড়ির প্রত্যাশায় থাকা মিছে।

চোক বুজে, নিজের ভিতর দেখনা—যে কোন সূক্ষ্ম শক্তি তোমার মনে বা বুদ্ধিতে ঢুকেছে কিনা। তুমি নাম আর রূপ এই দুটোর জন্য গুলিয়ে মরো না। যিনি আর জন্মে বেদব্যাস ছিলেন, তিনি তাহার পূর্ব্ব জন্মে হয় ত গুপিদাস ছিলেন এবং এজন্মে হয় ত পরণ দেবের সেক্রেটারি হয়েছেন। সুতরাং তুমি ব্রহ্মমায়ার আরাধনা কর। সময়ের ফল সময়ে পাওয়া যায় না। আর যদি বেদব্যাস তোমার মতন স্থূল বুদ্ধির সম্মুখে জটাটটা লাগিয়ে উপস্থিতও হন তা হলেও তুমি তাঁকে চিনিবে কি করে। তুমি তোমার আপনার স্ত্রী পুত্রের মনে কি আছে তাহা কি জান?

কল্পনা নিরোধ করিয়া কার্য্য

ক্রিয়া-শক্তিকে, যদি চিৎশক্তির ভিতর বন্ধকরে বা আটকে কর্ম্ম কর (অর্থাৎ কল্পনার পথ বন্ধ কর,) তাহলে অসাধারণ বেগে কর্ম্ম হবে, মন ও বুদ্ধি কেহই জানিতে পারিবে না।

জ্ঞানী ও ভক্ত

যিনি জ্ঞানী তিনি রসবর্জ্জিত রসিক, তাঁর মাথাটা একেবারে খালি হয়ে গেছে। কাজেই ভয়ও নাই, ডরও নাই, রাগও নাই, ভালবাসাও নাই, সুখও নাই, দুঃখ ও নাই। মাথাটা শূন্যেতে টল্ মল্ কচ্চে। তিনি কতকটা উপসি মাতালের মতন। যিনি ভক্ত তিনি রসপূর্ণ রসিক। তাঁর নাড়ি-জ্ঞান টন্‌টনে। তিনি ভাবে পূর্ণ বাগ্‌দগদ বলিয়া, আর এক শ্রেণীর মাতাল।

আমার মতে জ্ঞানী ভক্তেরা বেশী চালাক। তাহারা প্রকৃতির সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ রূপ ভোগ করিয়া, তারপর ইস্তফা দেন। জ্ঞানীরা না খেয়ে দেয়েই ইস্তফা দাখিল করেন। তাদের শরীরে একটা অম্বলে বাই আছে, তাই কোন জিনিষই স্পর্শ করিতে রাজি নহেন। তাকে জানে নিবেদন করা জিনিষ, আর কে জানে অনিবেদিত। তাদের নিষেধ নিষ্ঠে অম্বল হয়। জ্ঞানীদের আমি একলাই যথেষ্ট, আমি কিছু চাই না।

উন্নত ও অবনত সাধক

যাহার যেমন অভ্যন্তরীণ আকর্ষণ বা চিন্তা বা সাধন, সে তদনুরূপ সিদ্ধি বা ফল প্রাপ্ত হয়। এবং ভোগসাধন দেহযন্ত্রেও তদ্রূপ পরিবর্ত্তণ সংঘটিত হয়। ত্রিবিধ দেহেরই ছন্ন পরিবর্ত্তন হয়। মানুষ মাত্রেই যে আপন চিন্তারূপ সাধনের দ্বারা, আপনার ভবিষ্য দেহ গ্রহণ করে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রভাব

যে বনে বাঘ থাকে, সেখানে যেমন সব অত্যন্ত নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাব, সেইরূপ যেখানে মহাপুরুষেরা মহৎসাধন অনুষ্ঠান করেন, সেখানে পঞ্চভূতও উন্নত ভাব প্রাপ্ত হয়। মহত্তের মহিমায় পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণও মহিমান্বিত হইয়া পড়ে। জড়েও যেন অনুভব শক্তি প্রবিষ্ট হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য

বারাণসী-বৈষ্ণব-সম্মিলন

অনেকেই বিদিত আছেন, কাঞ্চীর প্রতি-বাদী ভয়ঙ্কর মঠাধীশ, রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীশ্রীমৎ অনন্তাচার্য্য স্বামী দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া কাশীধামে গমন করেন। তথায় তিনি দুই বা তিন মাস অবস্থিতিকালে নিজ বিশিষ্টাদ্বৈত মত ব্যাখ্যা করেন এবং পরিশেষে কাশী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইয়া রাজঘাটে জীতমল গিরিধারি লালের ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার জিনিষ পত্র সমুদায় রেলগাড়ীতে উঠান হইয়াছিল। এমন সময় শ্রীযুত রুদ্রভট্ট নামক ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক এক যুবক পণ্ডিত এক বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া অনন্তাচার্য্যের নিকট পাঠাইয়া দেন। বিজ্ঞাপনে

লেখা ছিল যে, আপনি নাকি কাশী আসিয়া গঙ্গাস্নান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করেন নাই, আপনি নাকি শিবনাম শ্রবণ ও ভস্মরুদ্রাক্ষধারী পুরুষ দেখিলে অন্তরে জ্বলিয়া উঠেন। এই সব কথা যদি সত্য হয়, তবে কল্য বিদ্বৎ-পরিষদে আসিয়া আমার সহিত শাস্ত্রার্থ করুন, আমি প্রমাণ করিব যে আপনার বিশিষ্টাদ্বৈত মত অবৈদিক মত।

ইহা পাঠ করিয়া স্বামী অনন্তাচার্য্য রাজ-ঘাট হইতে কাশী ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং দ্বিতীয় দিন চৌখাম্বায় বিদ্বৎপরিষৎ সভাতে স্বয়ং না যইয়া নিজ দলভুক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেশিক বরদাচার্য্যকে প্রেরণ করিলেন। সেই দিন অনন্তাচার্য্যের সঙ্গী সকল বৈষ্ণব পণ্ডিত ও কাশীস্থ অপর পণ্ডিতগণও উপস্থিত ছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত শ্রীজয়দেব মিশ্র। ইনি স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত-কাশীর-দারভাঙ্গার পাঠশালায় অধ্যাপক ও একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। বিচারের মধ্যস্থ ছিলেন, পণ্ডিত শ্রীবামাচরণ ন্যায়াচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ। এই সভাতে বিচারে রুদ্রভট্ট, যাহা আপত্তি করিয়াছিলেন তাহার সমাধান উক্ত দেশিক বরদাচার্য্য নাকি করিতে পারেন নাই। অনন্তর পণ্ডিত জয়দেব মিশ্র, পরদিন বালাজী মন্দিরে অদ্যকার শেষ আপত্তি উত্তর বৈষ্ণবগণ দিবেন বলিয়া সভাভঙ্গ করেন। ইহার কারণ রুদ্রভট্ট জয়ী হইয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আপত্তির উত্তর স্বয়ং রামানুজ আসিলেও হইবে না। ইহারই জন্য বৈষ্ণবগণের ইচ্ছায় এইরূপ ঘোষণা করা হয়। পরদিন কিন্তু বালাজী মন্দিরে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ আসিলেন না। ইহার পর স্বামী অনন্তাচার্য্য এক বিজ্ঞাপন দেন যে,—গত সভাতে কিছু বিচার হয় নাই। আমি চারিদিন থাকিব, তন্মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন আমার সঙ্গে বিচার করিবেন। ইহাতে কিন্তু কেহ স্বামী অনন্তাচার্য্যের নিকট যান নাই। এদিকে স্বামী অনন্তাচার্য্য বৈষ্ণব সম্মিলন করিয়া বিচার করিতে ইচ্ছা করিলেন। ওদিকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর পুত্র পণ্ডিত শ্রীবিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী, রামানুজ ভাষ্যের চারিটি দোষ দেখাইয়া একটী পত্রিকা প্রকাশিত করিলেন। শ্রীমৎ অনন্তাচার্য্যের সঙ্গী পণ্ডিত শ্রীমৎ দেশিক বরদাচার্য্য উহার প্রতিবাদ ছাপাইলেন। তাহাতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রুদ্র-ভট্ট পুনরায় প্রতিবাদ করিয়া পরিহার খণ্ডন নামে এক পত্রিকা ছাপাইলেন। ইহাতে সমুদয় বিষয়ই মুদ্রিত হইল। অনন্তর শ্রীমৎ অনন্তাচার্য্য ভারতের নানা স্থান হইতে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া ২৪শে নবেম্বর শুক্রবার বিশ্বেশ্বর থিয়েটার হলে বৈষ্ণব সম্মি-লন সভা করিলেন। ওদিকে কাশীর অদ্বৈতমতা-বলম্বিগণ টাউনহলে তিন দিন যাবৎ এক সভা আরম্ভ করিলেন। বৈষ্ণব সম্মিলনে শ্রীমৎ অনন্তাচার্য্য যখন দণ্ডায়মান হইয়া সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতে করিতে উপ-সংহারে বলিলেন,—"এইবার রুদ্রভট্ট আসিয়া বিচার করুন" অমনি সহসা পণ্ডিত রুদ্রভট্ট কোথা হইতে সভামধ্যে আসিয়া বলিলেন,—"স এবাহং রুদ্রভট্ট শর্ম্মা উপস্থিতঃ।" এ সময় কাশীর পণ্ডিত তথায় কেহই ছিলেন না। রুদ্র-ভট্টই এইরূপে প্রথমেই উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা ৯৷৷০টা। বিচার আরম্ভ হইল। এক পক্ষে রুদ্রভট্ট একাকী, অপর পক্ষে শ্রীমৎ

অনন্তাচার্য্য প্রমুখ যাবৎ বৈষ্ণব পণ্ডিত। কিন্তু শ্রীমৎ অনন্তাচার্য্যের সম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণমাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অনন্তাচার্য্য প্রতিনিধি হইলেন। ইহঁার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর, নিবাস সম্প্রতি আমদাবাদের নিকট বড়তাল নামক স্থান। ইনি তথাকার স্বামী নারায়ণ মঠের অধ্যাপক।

বিচার চলিল। পণ্ডিত রুদ্রভট্ট আপত্তি তুলিলেন, উভয় পক্ষের লেখকগণ তাহা লিখিয়া লইলেন, রুদ্রভট্ট তাহা পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিলেন। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণমাচার্য্য তাহার উত্তর দিলেন, শ্রীমৎ স্বামী অনন্তাচার্য্য মধ্যে মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচার্য্যের বাক্যের পারিপাট্য সম্পাদন করিয়া দিতে লাগিলেন। অনন্তর উহা উভয় পক্ষের লেখকগণ লিখিয়া লইল এবং তাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচার্য্য স্বাক্ষর করিলেন। ইহার উত্তর পণ্ডিত শ্রীরুদ্রভট্ট দিলেন এবং তাহাও ঐরূপ লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইল। ইহার উত্তর আবার পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণমাচার্য্য দিলেন, এবং তাহাও পূর্ব্ববৎ লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইল। অনন্তর তাহার উত্তর পণ্ডিত শ্রীরুদ্রভট্ট দিলেন, তাহাও এইরূপে লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইল। এমন সময় বেলা ১টা বাজিল; লেখকগণ লিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। লেখক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রীর পুত্র শ্রীমৎ রাজেশ্বর শাস্ত্রী প্রভৃতি। পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণমাচার্য্য বলিলেন "আমি নিরুত্তর হই নাই, সুতরাং আমার উত্তর লিখিয়া সভাভঙ্গ করা হউক।" ইহাতে পণ্ডিত শ্রীরুদ্র ভট্ট বলিলেন "আমিও নিরুত্তর হইব না, সমস্ত রাত্র যদি বিচার করিতে হয় আমি করিব। এবং কাহাকেও যাইতে দিব না" ইত্যাদি। ইহাতে অগত্যা সভা ভঙ্গই হইল।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ধর্ম্মদত্ত এই স্থানে উপস্থিত হন। এবং কল্যকার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে পণ্ডিত শ্রীঅনন্তাচার্য্যপক্ষীয় পণ্ডিতগণ বলেন, রেভারেণ্ড বৃদ্ধ জনসন সাহেব মধ্যস্থ হইবেন। কিন্তু ইহাতে পণ্ডিত শ্রীরুদ্রভট্ট আপত্তি করিলেন। কারণ তিনি ম্লেচ্ছ এবং এ বিচার বুঝিতে অক্ষম। ইহাতে স্থির হইল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও মীমাংসক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ পণ্ডিত ও শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দ স্বামী অদ্বৈত পক্ষে মধ্যস্থ হইবেন এবং বৈষ্ণব দলের মধ্যস্থ তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে হইবে। কিন্তু সভার ব্যবস্থার জন্য উভয় পক্ষের দুই দুই জন ব্যক্তি শ্রীযুক্ত মতিচাঁদের নিকট গমন করেন। শ্রীমান মতিচাঁদ ইহাতে অস্বীকৃত হন। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীধর্ম্মদত্তের চেষ্টায় শ্রীমৎ রামচন্দ্র পুরীর যত্নে দ্বিতীয় দিনের সভায় কাশীর যাবৎ পণ্ডিত যাইতে সম্মত হন এবং তদনুসারে নির্ব্বাচিত পণ্ডিতগণকে প্রবেশ-পত্র বিতরণ করা হয়। এ দিন কলিকাতা হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী কাশীতে উপস্থিত হন। ইহাতে আরও স্থির হইয়াছিল, শ্রীশ্রীঅনন্তাচার্য্যের সেক্রেটারী এবং ধর্ম্মদত্ত উভয়ে সভাদ্বারে থাকিয়া পণ্ডিতগণকে ভিতরে লইয়া যাইবেন। পরদিন শনিবার প্রাতে সমাজে সভা আরম্ভ হইল। প্রায় ২৫ জন পণ্ডিত প্রবেশপত্র সহিত দ্বারে-উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদত্ত দ্বারে

উপস্থিত। কিন্তু স্বামী অনন্তাচার্য্যের সেক্রেটারি অনুপস্থিত। সহসা দ্বার রুদ্ধ হইল। পণ্ডিতগণ সিপাহীগণকে অতিক্রম করিয়া কেহ কেহ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সিপাহী তখন বিপুল বেগে বাধা দিতে লাগিল। প্রবেশ-পত্র গুলি পণ্ডিতের হস্ত হইতে লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু পশ্চাতের দর্শকবৃন্দের ধাক্কায় পণ্ডিতগণ সিপাহীর উপর পড়িয়া গেলেন। তখন সিপাহী ক্রোধে অসিমুক্ত করিয়া ভয়প্রদর্শন করিল। ইহাতে পণ্ডিতগণ সকলেই সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে বহু বৈষ্ণব দর্শক পণ্ডিত স্বামী অনন্তাচার্য্যের উপর এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিল যে, আপনি ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা আপনার পক্ষে লজ্জার কথা। ইহাতে শ্রীঅনন্তাচার্য্যের সেক্রেটারি পুনরায় কাশীস্থ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য স্বামী গোবিন্দানন্দের বাটীতে গমন করেন, তথায় বহু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত স্বামী অনন্তাচার্য্যের সেক্রেটারী পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন রবিবার পূর্ব্বোক্ত থিয়েটার হলে সভার প্রস্তাব করেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন টাউনহলের ময়দানে সভা হউক, থিয়েটারে স্থানের অভাব হইবে। ইহাতে কিন্তু সেক্রেটারিগণ সম্মত হইলেন না। সুতরাং সভা হইল না।

অনন্তর সন্ধ্যাকালে সেই দিনই শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দর্শকরূপে বৈষ্ণব সম্মিলনে যান। তিনি জনগণকে মধ্যস্থ রাখিয়া স্বামী অনন্তাচার্য্যের বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন করিয়া অপত্তি করেন। ইহাতে মধ্যস্থ রেভারেণ্ড জনসন শ্রীমান হারাণের জয় ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গালিগণ হারাণকে স্কন্ধে করিয়া টাউনহলাভিমুখী পণ্ডিতগণের শোভাযাত্রা মধ্যে লইয়া যায় ও তাহার বিজয়ের সংবাদ দেয়।

এই উপলক্ষে পণ্ডিত রুদ্রভট্টের আদর-অভ্যর্থনা বড় কম হয় নাই। অনেক বাটীতে পতাকাতে রুদ্রভট্টের নাম। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিপ্রবর শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়কে সম্মুখে রাখিয়া যে শোভাযাত্রা বহির্গত হয়, তাহাতে যে সকল ধ্বজা পাতাকা ছিল, তাহাতেও রুদ্র ভট্টের নাম। রুদ্র ভট্টের নাম আজ কাশীতে সকলের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। স্বামী অনন্তাচার্য্য আজকাল রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, তিনি ভারতের যাবৎ মতাবলম্বী পণ্ডিত লইয়া বিচারার্থী, একাকী রুদ্রভট্ট তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী। এ বড় কম সাহস, কম বিদ্যাবত্তার পরিচয় নহে। ভাবিয়াছিলাম বর্ত্তমান বৃদ্ধ পণ্ডিত সম্প্রদায় অন্তর্দ্ধান করিলে কাশী বুঝি পণ্ডিত শ্রীহীন হইবে কিন্তু বিশ্বনাথের কাশীধামে বিশ্বনাথই তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাই হইল, বৈষ্ণব সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত।)

———:0:———

দান প্রাপ্তি-স্বীকার। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে" নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। শ্রীযুক্তা নগবালা বড়বড়ানি ১৲, শ্রীযুক্তা চারুবালা দেবী ॥০, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দাসী ॥০, শ্রীযুক্ত হরিচরণ সমাদ্দার ৶০, মোট ২৶০ দুই টাকা, দুই আনা মাত্র।

ও তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, } ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা।

তত্ত্ব নির্ণয়।*

১। প্রশ্ন। আত্মার বন্ধন কি?
উত্তর। নিত্য মুক্ত আত্মার বন্ধন নাই। দেহে আত্মাভিমান অর্থাৎ দেহই আত্মা এই ভ্রম জ্ঞানই আত্মার বন্ধন।

২। প্রঃ। মুক্তি কি?
উঃ। দেহাত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি অর্থাৎ যে অবস্থায় আত্মা দেহাতিরিক্ত বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই মুক্তি।

৩। প্রঃ। অবিদ্যা কি?
উঃ। যাহা দেহে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ আমি এই দেহ, এই জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, তাহাই অবিদ্যা।

৪। প্রঃ। বিদ্যা কি?
উঃ। যাহা দ্বারা দেহাত্মাভিমান দূরীভূত হয়, তাহাই বিদ্যা।

৫। প্রঃ। আত্মার জাগ্রত অবস্থা কি?
উঃ। যে অবস্থায় চন্দ্র, অচ্যুত, শঙ্কর, চতুর্ম্মুখ, দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনী-কুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া, মনে সঙ্কল্প, বুদ্ধিতে অধ্যবসায়, চিত্তে চেতনা, অহঙ্কারে অভিমান, কর্ণে শব্দ, ত্বকে স্পর্শ, চক্ষুতে রূপ, রসনায় রস, ঘ্রাণে গন্ধ, বাক্যে মুখ ব্যাদান, পানিতে ধারণ, পাদে গমন, পায়ুতে মল ও উপস্থে মুত্রাদি রূপ কার্য্যাদি স্থূল বিষয়ের উপভোগ হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত এবং আত্মা নির্লেপ রূপে অনুভূত না হয়; তাহাই আত্মার জাগ্রতা-বস্থা।

৬প্রঃ। আত্মার স্বপ্নাবস্থা কি?
উঃ। যে অবস্থায় শব্দাদি বিষয় উপস্থিত না থাকিলেও বাসনাপরিচালিত হইয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার দ্বারা বাসনানুরূপ শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি করে, তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থায় কেবল বাসনা পরিচালিত অন্তঃকরণে প্রকৃত বিষয়ের অবর্ত্ত-মানেও বিষয়ের উপভোগ হয়,—তাহাই স্বপ্নাবস্থা।

৭প্রঃ। সুষুপ্ত অবস্থা কি?

*সর্ব্বোপনিষৎসার অবলম্বনে লিখিত। ইতি লেখক।

উঃ। যে অবস্থায় চতুর্দ্দশ করণ (মন বুদ্ধি ইত্যাদি) স্ব স্ব কারণে উপরত হওয়ায় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না তাহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে।

৮প্রঃ। আত্মার তুরীয় অবস্থা কি?

উঃ। যে অবস্থায় আত্মা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটী অবস্থা হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং সমস্ত বস্তু হইতে বিভিন্ন হইয়া উহাদের সাক্ষী-স্বরূপে বিরাজিত থাকেন এবং যখন আত্মার ব্যবধায়ক কোন বস্তু বর্ত্তমান থাকে না এবং ইনি প্রকাশ স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই অবস্থাই তুরীয় অবস্থা। অর্থাৎ যে অবস্থায় সর্ব্ববিধ দৃশ্যমান মায়িক বন্ধন মুক্ত হইয়া আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, তাহাই তাঁহার তুরীয় অবস্থা।

৯প্রঃ। মানব দেহে কয়টী কোষ (স্তর) আছে?

উঃ। পাঁচটী।

১০প্রঃ। এই পাঁচটী কোষ কি কি এবং কাহাকে বলে?

উঃ। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটী কোষ।

অন্নের বিকার অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক, মাংস এবং শোণিতযুক্ত দেহই অন্নময় কোষ।

চতুর্দ্দশ বায়ু (যথা প্রাণ, অপান, ব্যান উদান ও সমান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এবং বৈরম্ভন, স্থানমুখা প্রদ্যোত ও প্রাকৃত) এবং অন্নময় কোষ লইয়া প্রাণময় কোষ।

অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই অন্তকরণ চতুষ্টয় লইয়া মনোময় কোষ।

এই কোষত্রয় সংযুক্ত হইয়া যখন ইহাদের অন্তর্গত বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তাহাই বিজ্ঞানময় কোষ।

যে অবস্থায় বটবীজে গুপ্ত বটবৃক্ষের ন্যায় কোষ চতুষ্টয়ের কারণ স্বরূপ অজ্ঞানে আত্মা বর্ত্তমান থাকে, তাহাই আনন্দময় কোষ।

১১প্রঃ। কর্ত্তা কি?

আত্মা যখন সুখ ও দুঃখ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সুখ দুঃখ অনুভব করে, তখন তাহার নাম কর্ত্তা।

১২প্রঃ। সুখ ও দুঃখ বুদ্ধি কি?

উঃ। শুভ বিষয়ের যে বুদ্ধি তাহার নাম সুখ-বুদ্ধি ও অশুভ বিষয়ে যে বুদ্ধি তাহার নাম দুঃখবুদ্ধি।

১৩প্রঃ। সুখ দুঃখের হেতু কি?

উঃ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধই সুখ-দুঃখের হেতু।

১৪প্রঃ। জীব কাহাকে বলে?

উঃ। আত্মা যে অবস্থায় পুণ্য ও পাপ কর্ম্মানুসারে কখনও স্থূল দেহে, কখনও সূক্ষ্ম দেহে ইহলোকে ও পরলোকে গতায়াত করিয়া থাকে, সেই অবস্থায় জীব নামে অভিহিত হয়।

১৫প্রঃ। পঞ্চ বর্গ কি কি?

উঃ। ১। মনাদি যথা—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার।

২। গুণত্রয় যথা—সত্ব, রজ ও তম।

৩। ইচ্ছাদি যথা—বিচিকিৎসা অর্থাৎ শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা, ধৃতি, লজ্জা, ভয় ও বুদ্ধি।

৪। পুণ্যাদি যথা পাপ ও পুণ্য জ্ঞান।

৫। পঞ্চ বায়ু, যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান।

১৬ প্রঃ। পূর্ব্বোক্ত বর্গ সমূহের ধর্ম্ম কিরূপে বিনষ্ট হয়?

উঃ। আত্মজ্ঞান লাভে।

১৭ প্রঃ। লিঙ্গশরীর কি?

উঃ। নিত্য আত্মার সান্নিধ্য বশতঃ আত্মার উপাধি অনিত্য হইয়াও নিত্যরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই লিঙ্গশরীর বা হৃদয়-গ্রন্থি।

১৮ প্রঃ। ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে?

উঃ। এই লিঙ্গদেহে প্রতিফলিত হইয়া যে চৈতন্য প্রকাশিত হয়, তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে।

১৯ প্রঃ। সাক্ষী কাহাকে বলে?

উঃ। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর (জ্ঞাতৃ—যে জানিতেছে, জ্ঞান—যাহাদ্বারা জানিতেছে এবং জ্ঞেয়—যাহা জানিতেছে) আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলব্ধি করেন কিন্তু স্বয়ং অবির্ভাব ও তিরোভাব রহিত ও স্বয়ং জ্যোতি-স্বরূপ, তিনিই সাক্ষীনামে অভিহিত হন।

২০ প্রঃ। কুটস্থ চৈতন্য কাহাকে বলে?

উঃ। চৈতন্য, ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধিতে অবশিষ্ট রূপে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চেতনাকারে প্রতীয়-মান হইয়া সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বনে অবস্থান করিলে, তাহাকে কুটস্থ চৈতন্য বলে।

২১ প্রঃ। কুট কি?

উঃ। ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কুট বলে।

২২ প্রঃ। অন্তর্যামী কে?

উঃ। যে চৈতন্য কুটস্থাদি উপাধি-যুক্ত অবস্থার স্বরূপ লাভের কারণ এবং সূত্রে মনিগণের ন্যায় যিনি সর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, তিনিই অন্তর্য্যামী।

২৩ প্রঃ। প্রত্যগাত্মা কাহাকে বলে?

উঃ। সর্ব্ববিধ উপাধিবিনির্ম্মুক্ত সুবর্ণঘণবৎ বিজ্ঞানঘন চিন্মাত্রস্বরূপ রূপে প্রকাশিত এবং তত্ত্বমসি বাক্যের ত্বং পদ-বাচ্য বস্তুই প্রত্যগাত্মা।

২৪ প্রঃ। পরমাত্মার স্বরূপ কি?

উঃ। পরমাত্মা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দ স্বরূপ।

২৫ প্রঃ। সত্য কি?

উঃ। যাহা অবিনাশী তাহাই সত্য। নাম, দেশ ও কাল, বস্তু ও নিমিত্তের বিনাশ হইলেও যাহা বিনষ্ট হয় না তাহাই অবিনাশী।

২৬ প্রঃ। জ্ঞান কি?

উঃ। উৎপত্তি ও বিনাশরহিত চৈতন্যই জ্ঞান।

২৭ প্রঃ। অনন্ত কি?

উঃ। মৃত্তিকার বিকারভূত বস্তুতে (ঘটাদিতে) যেমন মৃত্তিকা, স্বর্ণের বিকারে (অর্থাৎ কুণ্ডলাদিতে) যেমন স্বর্ণ এবং তন্তুর বিকারভুত কার্য্য (বস্ত্রাদিতে) যেমন তন্তু বিদ্যমান থাকে, তেমনি সৃষ্টি প্রপঞ্চে

যে চৈতন্য ব্যাপক ভাবে বিরাজিত, তাঁহাকে অনন্ত বলা যায়।

২৮ প্রঃ। আনন্দ কাহাকে বলে?

উঃ। যে চৈতন্য সুখ-স্বরূপ অর্থাৎ অপরিমিত আনন্দ-সমুদ্র-স্বরূপ—তাহাই আনন্দ

২৯ প্রঃ। তৎ-পদ প্রতিপাদ্য পরমাত্মা বা পরংব্রহ্ম কি?

২৯ উঃ। পূর্ব্বোক্ত সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দ যাহার স্বরূপ এবং যাহা দেশ, কাল ও নিমিত্তের অপেক্ষা করে না অর্থাৎ কোন দেশ, কোন কাল বা কোন কারণ বশতঃ যাহার স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, এবংবিধ চৈতন্যই পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম।

৩০ প্রঃ। আত্মা বা শুদ্ধব্রহ্ম কি?

উঃ। যিনি ত্বং ও তৎ পদার্থের উপাধি হইতে স্বতন্ত্র, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম ও কেবল সত্বামাত্র পদার্থ, তিনিই আত্মা।

৩১ প্রঃ। মায়া কি?

উঃ। যাহা অনাদি ও অন্তর্ব্বর্ত্তী অর্থাৎ কার্য্যোৎপাদনে সমর্থা, যাহা প্রমাণ ও অপ্রমান সাধারণ, যাহা সতী ও অসতী বা সদসতী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, যাহা লক্ষণশূন্য—তাহাই মায়া।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত।

———:0:———

অনুভূতি

কর্ম্মক্লান্ত সংসারের শত কোলাহলে
প্রকৃতির অনাবৃত সুনীলিম তলে
বসি যবে স্নেহময়ী ধরণীর কোলে
নিরাশ হৃদয় লয়ে ক্ষুব্ধ হতাশায়,
যেন কার অলক্ষিত স্নেহ-করুণায়
দাবদগ্ধ মরমের তীব্র যাতনায়
ঢালো গো অমিয়ধারা স্নিগ্ধ সুশীতল।

যেন কার সুললিত অস্ফুট আহ্বান
সহস্র বীণায় তুলি' সুমধুর তান
হতাশ হৃদয়ে করে নব প্রাণ দান,
বাসনা কামনা গুলি মরমে মরিয়া
সলজ্জ সম্ভ্রমে দূরে দাঁড়ায় সরিয়া,
অনন্ত তড়িৎ ভাতি উঠে হৃদে জ্বলিয়া,
পূর্ণেন্দু পীড়িয়া শান্ত শুভ্র সুবিমল॥

যেন কার সুকোমল আশীষ পরশে
সঞ্জীবনী সুধাধারা অশ্রান্ত বরষে
নির্জ্জীব হৃদয়োপরি বিশুদ্ধ হরষে,
বিপ্রথবিক্ষিপ্ত চিত্ত সস্নেহে ধরিয়া
ভীষণ প্রবৃত্তি-বহ্নি চরণে দলিয়া
নিবৃত্তির পূত মার্গ বিমুক্ত করিয়া
সযত্নে দেখায় যেন পন্থা সুনির্ম্মল॥

(যেন) তাঁর অমল ধবল কান্তি সুশোভন
সহস্র দামিনী জিনি উজ্জ্বল বরণ,
অনন্ত সিতাংশু চারু সহাস্য আনন
সৌম্য শান্ত প্রেমময় হৃদি-বিমোহন,
(যেন) শত কোটী স্মৃতি, শ্রুতি, বেদ, দরশণ
ভক্তিভরে সযতনে করিছে পূজন
অলক্ত রঞ্জিত রাঙ্গা চরণযুগল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

———:0:———

বৈদিক-প্রসঙ্গ।

(২৯.)

"পূর্ব্বপক্ষ"। আচ্ছা; অমরা যে বিশ্বের অতীত কোন বস্তুর নিত্যত্ব এবং অস্তিত্ব স্বীকার করিব, তাহা কি প্রকারে করিব? এখনও আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। কারণ, বিশ্বের অতীত হইলেই মনের অতীত হইল,—বাক্যের অতীত হইল,—কর্ম্মের অতীত হইল, গুণের অতীত হইল। এক-কথায়,—এইরূপ সকলেরই অতীত হইল। কিন্তু, মনের যাহা অতীত, তাহা কি প্রকারে গ্রহণ করিব? মন যাহা ধরিতে পারে না,—বাক্য যেখানে যায় না, তাহা আবার 'আছে' কি প্রকারে বলিব? আরও দেখুন, যাহা গুণের অতীত,—অর্থাৎ গুণ যেখানে স্থান পায় না, তাহার কোনরূপ আকার নাই—(নিরাকার)। যাহার আকার নাই (অর্থাৎ যাহা নিরাকার) তাদৃশ বস্তুতে বুদ্ধি প্রবেশ হয় না। এরূপাবস্থায়, "আপনাদের কথা মত"—যদ্যপি আমরা বলি, হাঁ—নিত্য ঈশ্বর আছেন, তাহাহইলে আমাদের ঐ 'হাঁ' 'নিত্য' বাক্য এবং শব্দ গুলি তো মন ও বাক্যের অন্তর্ভূত হইয়া বিশ্বের অন্তর্গত হয়। এইরূপ, আমরা যাহাই বলি না কেন, সবই ত বিশ্বের অন্তর্গত হইয়া বিশ্বের কথাই দাঁড়ায়। তবে, আমরা কি করিয়া, কি লইয়া বিশ্বের অতীত কথা কহিব? আপনি যাহা বুঝাইবেন, আপনার সমস্ত কথাই ঐ বিশ্বের অন্তর্গত হইবে,—সমস্ত প্রমাণই জগতের অন্তর্ভূত হইবে,—অর্থাৎ আপনি মুখে এবং মনে বিশ্বের কথাই কহিবেন, বিশ্বের ভাবনাই ভাবিবেন;—আর আমাদিগকে বলিবেন,—"তোমরা বিশ্বের অত্যন্ত কোন কিছু কথা বলিতে থাক,"—"বিশ্বের অতীত নিত্য বস্তু স্বীকারে,—তাঁহার ভাবনায় মন দাও" ইত্যাদি। একথা আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি; স্মরণের জন্য পুনরাবৃত্তি করিলাম মাত্র। অতএব, আপনি হাজার বুঝাইলেও আমরা কি করিয়া বিশ্বের অতিশয় বা বিশ্বের অতীত নিত্য বস্তু স্বীকার করিব?—বুঝিতে পারি না। এরূপাবস্থায়, জন্য 'ঈশ্বর' স্বীকার করিলে,—অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ + বর" এইরূপ স্বীকার করিলে, যদ্যপি "ঈশ্বর" পদার্থটী ধ্বংসী বা বিনাশী বস্তু গণ্য হয়,—তাহা নিবারণ করিবার উপায় মানুষের দ্বারা আর কি হইতে পারে? "ঈশ্বরত্ব লোপ হয়,—আমরা তাহার আর কি প্রতীকার করিব? "হিন্দুত্ব" না থাকে,—আমরা তাহা কি উপায়ে ধরিয়া রাখিব? কোন কিছুই বুঝা যায় না। তাই বলিয়া, "আকাশে গোলাপ ফুল" "নিরাকারের দশভূজা" এরূপ বাক্য মহর্ষি সাংখ্যকার গ্রাহ্য করেন না।

"উত্তর পক্ষ"। অবশ্য, যাহা শুনিলে অন্যান্য অশ্রুতও শ্রুত হয়,—অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়,—অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়;—অর্থাৎ যাহা কখন শুনিবার নয়, তাহাও শ্রবণ গোচর হয়; যাহা চিন্তা করিবার নয়, তাহাও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়; যাহা নিশ্চয় রূপে জানা হয় নাই, তাহাও "একরূপ" নিশ্চিত হয়;—এইরূপ যাহা তর্ক দ্বারা জানা হয় নাই,

তাহাও তর্কিত হয়;—এবম্ভূত নিরতিশয় আনন্দ-স্বরূপ পরম বস্তুর পরম তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, তাহার স্বরূপ অবধারণ করা,—যে সে লোকের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নহে; সম্ভাবনাও নাই। অপিচ, তাহা কথার কথাও নহে। সুতরাং, ঐ তত্ত্বের পরম রূপ জানিবার জন্য, তাহার পুনরপি আন্দোলন দোষাবহ নহে।

কিন্তু, "ঈশ্বরত্ব লোপ" এবং হিন্দুত্ব লোপ,"—এই দুইটী কথার প্রসঙ্গে তোমরা যাহা অনায়াসে বলিয়াছ, "যথা—আমরা তাহার আর কি প্রতীকার করিব,—বা তাহা কি উপায়ে ধরিয়া রাখিব ?"— ইত্যাকার বাক্য হিন্দুর পক্ষে কদাচ শোভন নহে; খুব সম্ভব,—উহা পশ্চাত্য শিক্ষার বা অনুন্নত মনের পরিচায়ক। আর এক কথা,—ঐ কথার প্রসঙ্গে তোমারা যে "প্রকারান্তরে" মহর্ষি সাংখ্যকারকে তোমাদের পক্ষভুক্ত করিতেছ, ইহাও অসাধু দোষ-দুষ্ট,—বা অসংযত নামসোদ্ভব। অভিপ্রায় এই যে, তোমরা মহর্ষির হৃদয় নিহিত তত্ত্ব যেরূপ অধিকার করিয়াছ, তাহাই প্রকাশ্যে আনিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেছ;—"সে একটী পৃথক কথা"। আর, মহর্ষির হৃদয় নিহিত সার তত্ত্বের সার রূপ,—"সে আর একটী পৃথক কথা"। প্রয়োজন হইলে অবশ্য সে বিচার পরে হইবে।

এক্ষণে কথা এই যে,—মন, বাক্য, কর্ম্ম যেখানে যায় না, অবশ্যই তাহা ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান। এবম্বিধ যাহা "অনুপলভ্যমান" তাহার নিত্যত্ব কি প্রকারে সমর্থন করা যায় ? ইহাই হইতেছে তোমাদের পক্ষের "মূল" আখ্যা। কেবল তোমাদেরই বা বলি কেন ! আজ কাল অনেক উপাধিধারী ধর্ম্মপ্রচারকেরও এই আশঙ্কা থাকিয়া যায়; "তজ্জন্য আক্ষেপ বৃথা"। তবে, এই টুকু জানিয়া রাখা ভাল, যথা,—"অনুকূলেন তর্কেণ সনাথে সতি সাধনে" ইত্যাদি। অর্থাৎ, সাধন অনুকূল তর্কের সহিত সংমিলিত হইলে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে সকল অভীষ্টই সুসিদ্ধ হয়। অতএব, ন্যায় দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখ, কি কথায় কি কথা হইতেছে। তোমাদের কথা মত "প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য" আমরা সাধারণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ছয়টী পদার্থের অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়া, একটী "বিরাট বিশ্ব" তোমাদের সম্মুখে রাখিয়াছি। বিশ্বের ঐ ছয়টী পদার্থ কোথা হইতে আসিতেছে, বা ঐ পদার্থ গুলির পরিণাম কি,—অপিচ, উহাদের যে অস্তিত্ব গ্রহণ, তাহার মূল্যই বা কিরূপ ইত্যাদি কোন কিছুর স্থির নিশ্চয় অদ্যাপি হয় নাই। কেবল কথা হইতেছে, এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, ইহার অতীত বা অত্যন্ত কোন কিছু বস্তু আছে কি না ! ঐ কথার মূলে যাহা দাড়াইয়াছে তাহা এইরূপ, যথা—

তোমাদের উত্থাপিত প্রস্তাব মতে ঐশ্বর্য্যার্থক—ঈশ + বর" = ঈশ্বর" পদার্থটী সৃষ্টি-কর্ত্তা, গুণবান ইত্যাদি হওয়ায়, বিশ্বের অন্তর্ভূত হইয়াছেন। বিশ্ব সাকার বস্ত, সাকার বস্ত। নিধন এক দিন না এক দিন অবশ্যম্ভাবীর কাজেই "বিশ্ব" বিনাশী বা ধ্বংসী পদার্থ-বিশেষ। বিশ্ব যখন ধ্বংসী পদার্থ,—অর্থাৎ বিশ্বের বিনাশ বা ধ্বংস যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন মনে কর বিশ্ব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আলাচ্য "ঈশ্বর" পদার্থটী সগুণ ও সক্রিয়;

কাজেই সাকার। সাকার বিশ্ব যখন ধ্বংস হইয়াছে, তখন সাকার "ঈশ্বর" পদার্থটীও অবশ্যই ধ্বংস হইয়াছে। এইরূপ মন, বাক্য কর্ম্ম,—ঋষি, মহর্ষি, আচার্য্য সমস্তই ঐরূপে "ধ্বংস" হইয়াছে। ধরিবার, ছুঁইবার কোন কিছুই নাই। ইহাই প্রবন্ধের ফলিতার্থ দ্বারা ব্যক্তীভূত হইয়াছে।

অতঃপর, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্ব নামক বস্তুটী কি ঐ রূপেই চিরতরে ধ্বংস হইয়া থাকিবে ? কিংবা পুনরায় বিশ্বের "স্ফোটন" অবশ্যম্ভাবী হইবে ? অর্থাৎ, বর্ত্তমান আপামর সাধারণ, যে রূপ ভাবে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করিতেছে, ঠিক এইরূপ ভাবেই আবার "সাধারণে" প্রত্যক্ষ করিবে কি না ? তোমারা একটু বিচার পূর্ব্বক ইহার উত্তর প্রদান কর।

"পূর্ব্বপক্ষ"। বিশ্ব চিরতরে ধ্বংস হইয়া যায়, এরূপ কথা কি প্রকারে বলিব ? কারণ,—দৃশ্যমান জগৎ বর্ত্তমানে উত্তম আকার লইয়া,—"অর্থাৎ সশরীরে" বর্ত্তমান। যদ্যপি চিরতরেই ধ্বংস হইত, তাহা হইলে স্থাবর জঙ্গম; চরাচর সমস্তই এককালীন ধ্বংস হইয়া যাইত; আর কস্মিন্ কালেও কেহ দেখিতে পাইত না। কিন্তু, বর্ত্তমানে যখন সমস্তই প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, তখন বিশ্ব একবারে চিরদিনের মত ধ্বংস হয়,—এরূপ কথা বলা যায় না। অন্যপক্ষে, চিরদিনের মত স্থূল-শরীরে বর্ত্তমান থাকে, বা চিরদিন সাধারণে পার্থিব বস্তু প্রত্যক্ষ করে,—এরূপ কথাও বলা যায় না। বিশেষতঃ ব্যবহারিক জগতে "জন্ম আর মৃত্যু"; যখন সাধারণের সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়, এবং তাহা প্রত্যক্ষ গোচরও হয়, তখন জগৎ চিরতরে ধ্বংস হয় বলা যায় না। জগতের ধ্বংসও আছে আর উৎপত্তিও আছে। ইহাই আমাদের পক্ষের কথা।

"উত্তরপক্ষ"। উত্তম কথা। তোমরা ধ্বংস প্রত্যক্ষ কর বলিয়াই, বা মৃত্যু দেখ বলিয়াই আমরা "অর্থ বোধের নিমিত্ত" বিরাট বিশ্বকে "ধ্বংসের" কোলে রাখিয়াছি। সুতরাং, 'বর্ত্তমানে' ধ্বংস লইয়া আর কথা কি আছে ? আর এক কথা বিশ্ব শব্দটী ক্লীবলিঙ্গবাচক শব্দ;—অর্থাৎ ঐ শব্দ শ্রবণমাত্র স্ত্রী কিম্বা পুরুষ কিছুই বোধ হয় না। উৎপত্তি শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দ; উহার অর্থ জন্ম। আবার ঐ জন্ম শব্দটী পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। এই 'উৎপত্তি' স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দটী, আর 'জন্ম' পুলিঙ্গবাচক শব্দটী দ্বারা কোন স্ত্রীবিহিত জাতি কিম্বা পুরুষ বুঝাইবে, কিম্বা স্ত্রীবিহিত প্রত্যয় হইতেছে বটে; ফলত, উহা স্ত্রী-জাতিবোধক নয়; এইরূপ কোন কিছু অর্থ হইবে, তাহা তোমাদের বাক্যার্থ দ্বারা বুঝা যায় না। তবেই দেখ, লিঙ্গজ্ঞান না হইলে, পরমতত্ত্বের পরম রূপ কতকগুলি ভাষার ছটায় বুঝা যায় না। হয়ত এরূপ নষ্ট চিত্ত কোথাও কেহ আছে, সে বিশ্বের উৎপত্তি" এই শব্দটীর এইরূপ অর্থ করিবে যথা, (ক্লীবলিঙ্গ) বিশ্বের যখন (স্ত্রীলিঙ্গ) উৎপত্তি হইবে, তখন ঐ (স্ত্রীলিঙ্গ) উৎপত্তির অর্থ (পুংলিঙ্গ) জন্ম হইবে। অর্থাৎ কি না, ক্লীবলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া পুংলিঙ্গ অর্থ প্রকাশ করিবে। যেমন সুধা (ক্লীবলিঙ্গ) কাসুন্দী (স্ত্রীলিঙ্গ) হইয়া ঘণ্ট (পুংলিঙ্গ) হইবে; শুন্তে

কুমুদিনী ফুটিয়া আদর্শ হইবে; ইত্যাকার অর্থ করিবে। তবেই দেখ, "বিশ্বের উৎপত্তি" কথাটী তাহারা কিরূপ অসঙ্গত ও অসমীচীন ভাবে লইবে। অতএব, পরম তত্ত্ব—প্রকাশ্যে আনিবার পূর্ব্বে, যতদূর সম্ভব বা যতটুকু পার লিঙ্গজ্ঞান বজায় রাখিবে।

পক্ষান্তরে, ঐ রূপ মন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফলেই, তোমাদের মতে 'ব্রহ্ম' নির্গুণ হইলেই, ব্রহ্ম; আর সগুণ হইলেই ঈশ্বর। এইরূপ 'ব্রহ্ম' কখন পুরুষ, কখন নারী;—অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ বোধক 'ব্রহ্ম' শব্দ, কখন পুংলিঙ্গ আর কখন স্ত্রীলিঙ্গ ইত্যাকার হইয়া থাকে। বিশেষ অর্থ এই হয় যে, দেব কখন দেবী হইয়া যায়। কিন্তু, ব্যবহারিক জগতে পুরুষ কখন নারী হয় নাই। তবেই দেখ, সাধারণে কি করিয়া তোমাদের কথায় বিশ্বাস করিবে? অপিচ, কি করিয়াই বা শাস্ত্রের পরম ভাব গুলি তাহারা গ্রহণ করিবে? কাজেই, এরূপ ক্ষেত্রে শাস্ত্রের নাম শুনিলেই, তাহাদের নাসিকা কুঞ্চন অব্যাহত হইবে। অবশ্য, এমন কোন স্থান আছে, যেখানে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের ভেদাভেদ জ্ঞান কোন কিছুই থাকে না। কিন্তু, সে স্থান সাধনলব্ধ সিদ্ধের পর; পূর্ব্বে নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের ফলিতার্থ সে সাধনে এখনও উপনীত হয় না। সুতরাং, পরম তত্ত্বের কথোপকথনে লিঙ্গ-জ্ঞান সৌকর্য্যার্থে একটু সংযত হওয়া অকর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু, মূল সংস্কৃত ভাষায় যখন লিঙ্গ-জ্ঞান লাভ করা একরূপ দুরূহ বলিলেই হয়, তখন বাঙ্গলা ভাষার তো কথাই নাই। "মহাবাক্য সম্ভাষণে" বাঙ্গলা ভাষা নিন্দনীয় হয়। এরূপাবস্থায়, অন্যান্য 'সাহিত্যিক' কথায় যতদূর পার আর নাই পার, কিন্তু মহাবাক্য সম্ভাষণে অবশ্যই ক্লীবলিঙ্গের স্থানে ক্লীবলিঙ্গ, পুংলিঙ্গের স্থানে পুংলিঙ্গ, আর স্ত্রীলিঙ্গবোধক শব্দের স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করাই ঠিক। কিন্তু,—যে সে কথায় বা সকল কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রতিফলন সম্ভবপর নহে। এই জন্যই ব্যবহারিক জগতে জড়পদার্থবোধক শব্দের উত্তর স্ত্রী-বিহিত আ, ঈ, প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। ঐ প্রত্যয় লইয়া শব্দ গুলি স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ব্যবহৃত হয়;—ফলত, তাহা স্ত্রীজাতিবোধক নহে; যেমন কাটারী, বৃহতী, ধুনা ইত্যাদি। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে এই মন্ত্র পরম তত্ত্বের পরম রূপ ব্যক্তীভূত করিতে পারে না। অপর কথা এই যে, সাহিত্য সম্ভাষণ সে একটী পৃথক কথা; আর "বেদ যাঁহর কীর্ত্তি প্রখ্যাত",—সেই পরম বস্তুর পরম রূপ প্রকাশ্যে আনিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া অপিচ, সহজবোধ্য বাক্য স্থানে স্থানে লাগান সে একটী সাধনার কথা। সে যাই হ'ক, কথা হইতেছে যে—

বোধসৌকার্য্যার্থে আমরা বলিলাম, "বিশ্বের স্ফোটন," আর, তোমরা উত্তর করিলে "বিশ্বের উৎপত্তি।" শব্দ দুইটীর অক্ষর ভিন্ন, শব্দও ভিন্ন; কেবল জাতি—"অর্থাৎ ভাষা" এক। কিন্তু, এই এক ভাষা ব্যবহারবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এই জন্যই শাস্ত্রের বিচার কেবল ভাষার উপর লক্ষ্য করে। ভাষাই ভাবের অবয়ব-স্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয়,—অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গণের পক্ষে, এরূপা-

বস্তুর ভাষা-জ্ঞান শিক্ষা অগ্রেই প্রয়োজন অন্যথায়, ধর্ম্মপ্রচারক হওয়া ঠিক নহে। অপিচ, নিত্য বস্তুর যাহারা অস্তিত্বলোপী, তাহাদের ঐরূপ বাক্য যথা,—বিশ্বের উৎপত্তি অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে; উৎপাটক। এই জন্যই বর্ত্তমানে বলা যায় যে,—'বিশ্ব' শব্দটী ক্লীবলিঙ্গ; আর 'স্ফোটনও' ক্লীবলিঙ্গ। ক্লীবলিঙ্গ অবশ্যই ক্লীবলিঙ্গ হইয়া যায়। অপিচ ক্লীবলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গেরই সহিত মিলিত হয়। যেমন আলোর সহিত আলো, অন্ধকারের সহিত অন্ধকারই মিলিত হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু, "বিশ্বের উৎপত্তি" কথাটী মতান্তরে সঙ্গতি-রহিত। এই জন্যই মহাবাক্য-সম্ভাষণে ঐ রূপ দোষ অধর্ত্তব্য নহে।

এক্ষণে কথা এই যে, অতঃপর তোমাদিগকে দুইটী বিষয় একটু প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথম—"বিশ্বের উৎপত্তিও আছে,—আর ধ্বংসও আছে,"—তোমাদের এইরূপ যে "সত্য" বোধ (জ্ঞান), এই "সত্য" বোধ তোমরা কোথায় পাইলে! "দ্বিতীয়, যাহা বিশ্বের অতীত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অনুপলভ্যমান, তাহার নিত্যত্ব স্বীকার যে কোন কাজেরই নহে,—অর্থাৎ "আকাশে গোলাপ ফুল"—"নিরাকারের দশভুজ" ইত্যাদিবৎ অলীক, তোমাদের এইরূপ যে "অলীকত্ব" অনুমান, এই অনুমানই বা তোমরা কোথায় পাইলে? মহর্ষি সাংখ্যকারের নামে যাহা উল্লেখ করিয়াছ, তাহা তোমাদের "ভ্রম মাত্র"।

এইবার প্রথমটী দেখ। "বিশ্বের উৎপত্তিও আছে, আর ধ্বংসও আছে,"—এইরূপ "সত্য" বোধটী নিশ্চয়ই বিশ্ব-ধ্বংসের সহিত একবারে 'চিরতরে' ধ্বংস হয় নাই। কারণ, চিরতরে ধ্বংস হইলে আবার তোমরা তাহা পাইবে কেন? তবেই দেখ, ঐ "সত্য"বোধটীর অস্তিত্ব কোথাও না কোথা অবশ্যই ছিল বা আছে; না হয় বিশ্ব ধ্বংসের পর কোন কেহ আবার ঐ বোধ-বস্তুটী নির্ম্মাণ করিতেছে। এই দুইটী অবলম্বন ব্যতীত, আর অন্য কোন রূপেই ঐ বস্তুটী তোমরা পুনরায় পাইতে পার না। কিন্তু দেখ, বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, তাহার আর নির্ম্মাণকর্ত্তা প্রয়োজন হয় না। কারণ, যাহাকে নির্ম্মাণ করিবে, সেই বস্তুর যদ্যপি অস্তিত্ব থাকে,—অর্থাৎ সেই বস্তু বিদ্যমান রূপেই থাকে, (সহজ কথায় বস্তুর জীবন যদ্যপি থাকে) তবে তাহার আর নির্ম্মাণই বা কি? আর নির্ম্মাণকর্ত্তাই বা কেন? "যাহাকে নির্ম্মাণ, সেত আছেই"। এইরূপ অর্থবোধ করিতে হয়। অন্য পক্ষে, যদ্যপি কর্ত্তাই স্বীকার কর, তবে তাহার পরিণাম সেই "ঐশ্বর্য্যার্থক ঈশ+বর" পদার্থের ন্যায় হইয়া ধ্বংস হইবে।—অর্থাৎ "বোধের" নির্ম্মাণ কর্ত্তাটীও যাইবে, আর "বোধ" বস্তুটীও যাইবে,—অর্থাৎ চিরতরে ধ্বংস হইবে; আর কস্মিন্ কালেও পাইবে না। অতএব, ঐ বোধ বস্তুটীর কোন কেহ নির্ম্মাণকর্ত্তা আছে,—এ কথা তোমরা ভুলিয়া যাও। তবেই দেখ,—"অস্তিত্ব-স্বীকার," না হয় কর্ত্তা-স্বীকার,"—এই দুইটী অবলম্বনের মধ্যে যদ্যপি একটী ভুলিতে হয়,—অর্থাৎ কর্ত্তা-স্বীকারটী ভুলিতে হয়, তবে নিশ্চয়ই বোধ-বস্তুটীর অস্তিত্ব-স্বীকার অনন্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ "বিশ্বের উৎপত্তিও আছে, আর ধ্বংসও আছে"—এইরূপ যে "সত্য"বোধ, এই বোধ-বস্তুটীর অস্তিত্ব

এবম্প্রকারে অন্তরে ধারণ ভিন্ন তোমাদের আর অন্য কর্ত্তব্য কিছুই নাই। এরূপ হইলে,—অর্থাৎ ঐ বোধ (জ্ঞান)—বস্তুটীর অস্তিত্ব গ্রহণ, "তোমাদের পক্ষে কর্ত্তব্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ-স্বরূপ হইলে; দ্বিতীয় বিষয়টী,—অর্থাৎ "বিশ্বাতীত বস্তুর নিত্যত্ব-স্বীকার কোন কাজেরই নহে" "আকাশে গোলাপফুলের ন্যায় অলীক";—ইত্যাকার অনুমানটী একেবারেই অসার ও ভিত্তি শূন্য-হইবে।

"পূর্ব্বপক্ষ"। আচ্ছা; বোধ বস্তুটীর যদ্যপি ঐ রূপেই অস্তিত্ব গ্রহণ করা হয়, তবে বলিতে হইবে যে, ঐ অস্তিত্বটী অবশ্যই কোথা ছিল বা আছে। সে স্থানটি কোথায়?

"উত্তর পক্ষ"। ভাল কথা; (তোমাদের কি বলিতে ইচ্ছা করে?) দেখ, বিরাট বিশ্ব তোমাদের মতানুকূলে ধ্বংস হইয়া অদ্যাপি ধ্বংসের মধ্যেই আছে। এখনও তাহার পুনরুত্থান হয় নাই;—"অর্থাৎ তোমাদের মতে যাহা সৃষ্টি বা উৎপত্তি, তাহা হয় নাই"। তোমারা নিত্য-বস্তুর অস্তিত্বগ্রহণে নারাজ; অথচ "বিশ্বের উৎপত্তিও আছে,—আর ধ্বংসও আছে",—এই রূপ বাক্য যথা তথা বিতরণ কর। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, ইত্যাদি বস্তুর নাম-গ্রহণ, রূপ-গ্রহণ,—অপিচ ঐ সকল বস্তুর অবধারণ, ইহা এরূপ নহে,—উহা সেরূপ নহে, ইত্যাদিতে ঐ সকল বস্তু সেবন, ধারণ, বিতরণ—সকলই করিয়া থাক। এই জন্যই "প্রশ্ন" হইয়াছিল, ঐরূপ "সত্য" বোধ তোমারা কোথায় পাইলে? অর্থাৎ বোধ বস্তুটীর অস্তিত্ব অন্তরে ধারণ ভিন্ন তোমারা কস্মিন্ কালেও ঐ রূপ বাক্য প্রযুক্ত করিতে পার না। এক্ষণে, ঐ বোধ বস্তুটীর অস্তিত্ব গ্রহণ এবং ধারণ,—তোমাদের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য। সুতরাং, বোধের যে অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বের অবস্থান কোথায়? "প্রশ্ন" উক্তমই হইয়াছে। তদুত্তরে যাহা বলি, শুন।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী

(২৬)

ললিত মিশ্র— কাওয়ালী

আধ কায়া গিরিবালা আধে শোভে মহেশ্বর,
প্রেমের মিলন কিবা হের অর্দ্ধ-নারীশ্বর॥
আধ শিরে কুন্তল, পরশে চরণ তল,
আধে সোভে জটাজাল, জাহ্নবী কলকল,

রজত বরণ ভাল, আধে করে ঝলমল,
আধে কনক-কিরণ জিনি কোটি শশধর ॥
আধে মুকুট উজলে, আধে বিশধর খেলে,
আধ চাঁদ আধ ভালে, আধে হুতাশন জ্বলে,
মনিহার আধ গলে, আধে হাড়মালা দোলে,
আধশোভা বাঘছালে, আধে রক্ত অম্বর ॥
হরগৌরী এক অঙ্গে, প্রেমানন্দে মিশে গেল,
রজত ভূধরে যেন, আধ ইন্দু লুকাইল,
মধুময় সে মিলনে, সুধা-সিন্ধু উথলিল,
মধুর প্রেম-তরঙ্গে ভাসে বিশ্ব চরাচর ॥

———:0:———

দারুব্রহ্ম

সত্যযুগে রাজস্থানের অন্তর্গত মালবদেশে অবন্তী (১) নামক নগরে সূর্য্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী ছিল। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী, দেবগুরু বৃহস্পতিসম বুদ্ধিমান, কুবেরের তুল্য ধনবান, সদাচারী, প্রজাবৎসল, মহাযোগী এবং অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি একদিন পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ বেষ্টিত হইয়া বিষ্ণু আরাধনায় রত ছিলেন, এমন সময়ে ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ জটিল (২) ব্রাহ্মণ রূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুক্ষেত্র সমূহের বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। ভগবান জটিল অন্যান্য বিবরণের সহিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের স্থুল বিবরণ যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এস্থলে লিখিত হইল। "বঙ্গোপসাগরের উত্তর তীরবর্ত্তী পঞ্চক্রোশ স্থানকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বলে। এই পঞ্চক্রোশ স্থানের মধ্যে ক্রোশত্রয় পরিমিত স্থান দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খাকৃতি এবং অতীব দুর্গম। এই শঙ্খাকৃতি স্থানে নীলাদ্রি নামক পর্ব্বতে মাধবমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছেন। নীলপর্ব্বতের নিকটে শবর নামে এক দ্বীপ বিরাজ করিতেছে এবং উক্ত দ্বীপে বিশ্বাবসু নামে এক ব্যাধ বাস করে। নীলমাধবকে দেবতাগণ ছয় মাস এবং বিশ্বাবসু ছয় মাস পূজা করিয়া থাকেন। যদি তুমি এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অগ্রে এক ব্যক্তিকে তথায় প্রেরণ কর। তিনি পথ নিরূপণ এবং নীলপর্ব্বত দর্শন করতঃ

(১) উজ্জয়িনী। (২) জটাধারী ব্রহ্মচারী।

ফিরিয়া আসিলে পশ্চাৎ তুমি যাত্রা করিবে।" জটিল ব্রাহ্মণ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। উপরি উক্ত জটিল-বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, পুরাকালে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র সমুদ্রগর্ভে শৈলদ্বীপ ছিল। তদনন্তর এই স্থানটী ত্রিকোণ দ্বীপ-(৩) আকার ধারণ করিয়াছিল। এই ত্রিকোণ দ্বীপে, নীলপর্ব্বত ছিল এবং ইহা তৎকালে শবরদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুভক্ত বিদ্যাপতিকে নীলাদ্রি গমনার্থ আদেশ করিলেন। বিদ্যাপতি রথারোহণে ক্রমে ক্রমে মহানদী পার হইয়া শবরদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর তিনি শবরদ্বীপের ঈশ্বর বিশ্বাবসু ব্যাধের সহিত মিত্রতা স্থাপন করতঃ তাঁহার অনুগ্রহে মাধব দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং আদ্যো-পান্ত সমস্ত বিষয় রাজার নিকট প্রকাশ করিলেন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্ত্রির উপর রাজ্য-ভার অর্পণ করতঃ অকস্মাৎ আগত দেবর্ষি নারদের সহিত পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। তিনি মহানদী পার হইয়া কিছু কাল পরে একাম্রকাননে (৪) উপস্থিত হইলেন। তদন-ন্তর অরণ্য ও পর্ব্বতময় প্রদেশ অতিক্রম করি-বার সময় নানা দুর্লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "মহা-রাজ! নীলপর্ব্বত প্রবল ঝটিকা কর্তৃক বালুকা দ্বারা আবৃত হইয়াছে এবং ভগবান নীল-মাধব এস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর শোকে, দুঃখে এবং আশাভঙ্গে অত্যন্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

তখন দেবর্ষি নারদ রাজাকে বলিলেন "মহারাজ! যে দিন ভগবান নীলমাধব দারুময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্বেতদ্বীপ গমন করিয়াছেন, সেই দিনই আমি পিতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসি-য়াছি। তিনি তোমাকর্ত্তৃক দারুব্রহ্মরূপে স্থাপিত হইয়া জগতের জীবসকলকে দর্শন দানে চরিতার্থ করিবেন। মহারাজ! তোমার মত ভাগ্যবান আর কে আছে; অতএব শোক পরিত্যাগ করতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।"

তদনন্তর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের আদেশমত নীলকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া তন্নিকটস্থ নৃসিংহদেবের সমীপে আবাসগৃহ এবং বর্ত্তমানে যেখানে গুণ্ডিচাগৃহ সেই স্থানে যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনু-ষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞসমাপনের শেষ রাত্রে, মহারাজ স্বপ্ন দেখিলেন যে "ক্ষীরসমুদ্র-মধ্যস্থিত শ্বেতদ্বীপে এক কল্পবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে এবং তাহার মূলপ্রদেশস্থ সুবর্ণময় মণ্ডপের মধ্যে এক রত্নসিংহাসন রহিয়াছে, তদুপরি নীল নীরদকান্তি পিতাম্বর-ধারী—বনমালাবিভূষিত—স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণে শ্রীদেবী (৫) এবং তদ্দক্ষিণে নীলাম্বরধারী বলরাম রহিয়াছেন। বিষ্ণুর বামভাগে সুদর্শনচক্র অবস্থিতি করিতেছে। মহারাজ স্বপ্নে ভগবানকে

(৩) ডেল্টা বা বদ্বীপ। (৪) ভুবনেশ্বর।

(৫) সুভদ্রা

এইরূপ দর্শন করিয়া প্রফুল্ল মনে নিদ্রাত্যাগ করতঃ দেবর্ষি নারদের নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিলেন। নারদ স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ভগবান এইরূপে এইস্থানে আবির্ভূত হইবেন। তুমি আগামী কল্য সাগরতীরে দারুরূপী ভগবানকে দেখিতে পাইবে।"

তৎপর দিবস প্রাতঃকালে সমুদ্র-স্নান করিবার সময় মহারাজ সমুদ্রতীরে শঙ্খ-চক্রান্বিত এক বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি মহাসমারোহে সেই দারুকে আনয়ন করিয়া যজ্ঞবেদী মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং ভগবানের কিরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে তাহা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল "মহারাজ! আগামি কল্য এক বৃদ্ধ বর্দ্ধকী (৬) এইস্থানে উপস্থিত হইবে, সেই ব্যক্তি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। তুমি পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত যজ্ঞবেদীর চারিদ্বার রুদ্ধ রাখিবে এবং সর্ব্বদা বাদ্যধ্বনি করিবে; কারণ যে নির্ম্মাণশব্দ শ্রবণ করিবে, সে বধিরাদিদোষগ্রস্ত হইবে। পঞ্চদশ দিবস পরে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া যেরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে তাহাই ভগবানের ইচ্ছারূপ মূর্ত্তি জানিবে।"

তৎপরদিবস মহোৎসব সময়ে একজন বৃদ্ধ সূত্রধর তথায় আসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ষোড়শ দিবসে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শন এই চারি মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু বর্দ্ধকী নাই। তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন, "মহারাজ! অদ্য জীবগণ ধন্য হইল, কারণ তোমাকর্ত্তৃক স্থাপিত এই মূর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া ভব-যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার পাইবে। হে রাজন্! বারানসী এবং কুরুক্ষেত্রে যাবজ্জীবন বাস করিলে যে ফল হয়, এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়াও যদি এক দিন বাস করে তাহা হইলে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। বারানসীতে যোগযুক্ত হইয়া মৃত্যু হইলে যে ফল, এই স্থানে অর্দ্ধঘণ্টাকাল বাস করিয়া মৃত্যু হইলে সেই ফল প্রাপ্তি হইবে।"

তদনন্তর রাজা বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া মন্দির নির্ম্মাণের ভার দিলেন। অষ্টাদশ দ্বীপ হইতে প্রস্তর আনাইয়া তাহাদের সাহায্যে মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। মহারাজ কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া নীলাচলে যে স্থানে নীলমাধব ছিলেন, সেই স্থানে সহস্র হস্ত পরিমাণ উচ্চ এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। এই মন্দির পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু কাল-ক্রমে বালুকাবৃত হওয়াতে পর্ব্বতের বিশেষ কোন চিহ্ন অধুনা এস্থলে দৃষ্ট হয় না। তাহার পর বহুতর দেবদেবী-মূর্ত্তি পোদিত হইল এবং সেই সকল মূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অনেক মন্দির নির্ম্মিত হইল।

উপরিউক্ত মন্দির ও প্রতিমাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নারদের সহিত স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে মাল-

(৬) সূত্রধর।

বাধিপতি! তুমি যে সময়টুকু আমার নিকট অপেক্ষা করিলে তাহার মধ্যে এক মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। তোমার অনেক পুরুষ ধ্বংস হইয়াছে তোমার প্রসাদ ও প্রতিমা সকল বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসুবংশীয়দিগের দ্বারা অধিকৃত। তুমি পুরুষোত্তমে যাইয়া প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর, আমি দেবতাদিগের সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিব। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

রাজা মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া দেখিলেন যে, স্বকৃত মন্দিরে মাধবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। তখন মহারাজ মন্দিরের পশ্চিমে মাধবজিউকে রাখিয়া তাঁহার সেবায় সেবক নিযুক্ত করিলেন। তাহার পর নন্দীঘোষ, তালধ্বজ ও পদ্মধ্বজ নামে তিনখানি রথ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি প্রতিমাদিগকে স্থাপন করতঃ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। এইদিন হইতে এই উৎসব রথযাত্রা বা গুণ্ডিচাযাত্রা নামে খ্যাত হইয়াছে।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠোপযোগী সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিলে প্রজাপতি স্বর্গ হইতে দেবগণ সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর ব্রহ্মা দেবতাদিগের সহিত প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। জগন্নাথের পূজা কিরূপে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে রাজাকে উপদেশ দিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

কতক দিন রাজা এইভাবে জগন্নাথ দেবের সেবা করিলেন। তাহার পর মনোবাসনা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হইলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতিবংশীয়দের উপর সেবার ভার দিয়া এবং তথায় গালব রাজার উপর তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়া দেবর্ষি নারদের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। অদ্যাবধি বিশ্বাবসুবংশীয় দয়িত এবং বিদ্যাপতিবংশীয়েরা ভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

উপরিউক্ত পৌরাণিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের রাজা এবং কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সুতরাং সে সময় কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম কেবল নরদেহধারী কৃষ্ণ-বলরামের নাম নহে, কৃষ্ণাবতারের পূর্ব্বেও ইহা ভগবানের নামান্তর মাত্র ছিল। জগন্নাথ প্রভৃতি মূর্ত্তি সকলের গঠনপ্রণালী দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল মূর্ত্তি শিল্পবিদ্যার প্রথমাবস্থায় গঠিত হইয়াছে, তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কাহার অবলম্বনে মূর্ত্তিত্রয় গঠন করিয়াছিলেন, ওঁকার ব্রহ্ম। ভাষ্যকার্ত্তারা উহাকে অকার-উকার-মকার যোগ দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সেই ওঁকারকে যন্ত্ররূপে নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুরা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহাও বর্ত্তমানে দেখা যায়। ওঁকার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। এই ত্রিমূর্ত্তির দ্বারা ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ জগন্নাথ সৎ-স্বরূপ বলরাম

চিৎ-স্বরূপ, এবং সুভদ্রা আনন্দ-স্বরূপ। সুতরাং প্রতিমা যে বেদানুমোদিত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ পূর্ণাবতার, সেই হেতু কৃষ্ণাবতারের পর দারুত্রয়ের নাম কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই মূর্ত্তিত্রয়ের বাহিরে যে সুন্দর আকৃতি দেখা যায়, তাহা পশ্চাৎ কল্পিত; তন্মধ্যে যে দারুময় মূর্ত্তি আছেন, তিনি এরম্প্রকার নহেন—কেবল কর-চরণ-বিহীন দারু মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্ম নাম-রূপাদি বর্জ্জিত বলিয়াই মূর্ত্তিত্রয় চরণ বিহীন, ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণ দেখা যায় না।

শ্রীমন্দির প্রথমতঃ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপন করেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। "মাদলা পঞ্জিকা" ভিন্ন অন্য কোন বিশ্বাস-যোগ্য উড়িষ্যার ইতিহাস নাই। সুতরাং এই পঞ্জিকাতে জগন্নাথদেবের মন্দির এবং উড়িষ্যার নরপতি দিগের ইতিবৃত্ত যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই পঞ্জিকা মন্দিরের সমকালীন। মাদলা পঞ্জিকার লেখা হইতে বোধ হয় যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্ত্তৃক মন্দির ভূমিসাৎ হইলে খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম দশম শতাব্দীতে সুশোক দেব (१) নামধেয় একজন হিন্দু রাজা সেই স্থানে ৪৫ হস্ত পরিমিত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সশোকের পর ভোজ, বীরবিক্রমাদিত্য, শালিবাহন প্রভৃতি অনেক রাজার অধীনে মন্দির ছিল। ৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্য-বংশীয় চন্দ্রবাহু রাজার রাজত্বকালে দিল্লি হইতে রক্তবাহু নামে এক যবন রাজা পুরী অভিমুখে আসিতেছেন শুনিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবকেরা রাজাজ্ঞায় সোনিপুরে পৃথ্বীগর্ভে প্রস্তরের একটী সামান্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে জগন্নাথাদি বিগ্রহ রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা প্রোথিত করিলেন এবং সেই স্থানে চিহ্ন-স্বরূপ একটী বটবৃক্ষ রোপণ করিলেন। রক্তবাহুবংশীয়েরা প্রায় ১০০ বৎসরের অধিক সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেইসময়ে জগন্নাথদেবের মন্দির শূণ্য হইয়া পুনরায় ভূমিসাৎ হইয়াছিল।

৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশরীবংশীয় রাজা জন্মেজয়ের পুত্র যযাতিকেশরী রক্তবাহু বংশীয় রাজা দিগকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা স্বাধীন করেন। তিনি উপরি উক্ত বটবৃক্ষ নিম্নস্থ মূর্ত্তিত্রয় উদ্ধার করিয়া মহাসমারোহে পুরীতে আনিলেন। তাহারপর প্রাচীন মূর্ত্তির সদৃশ মূর্ত্তিত্রয় নির্ম্মাণ করিয়া নবনির্ম্মিত মূর্ত্তিত্রয়কে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তন্মধ্যে পূর্ব্ব মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বস্থানে ৩৪ হস্ত পরিমিত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে পূর্ব্বস্থিত রত্ন সিংহাসনে মূর্ত্তিত্রয়কে স্থাপন করিলেন। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে সেবাকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল।

কেশরীবংশীয় রাজগণ ৪৪ পুরুষ ব্যাপিয়া ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজা দিগের মধ্যে যযাতিকেশরী, ললাটেন্দুকেশরী এবং নরেন্দ্রকেশরী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ললাটেন্দুকেশরীর সময় শ্রীভুবনেশ্বর দেবের মন্দির নির্ম্মিত এবং নরেন্দ্রকেশরীর সময় নরেন্দ্র-সরোবর খনিত হইয়াছিল।

গোকর্ণেশ্বরের ঔরসে এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে চৌরগঙ্গ নামক একজন প্রতাপশালী

१ বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্বে ইনি একজন হিন্দুরাজা ছিলেন।

রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কেশরী বংশের রাজাকে পরাস্ত করতঃ ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হইলেন। চৌরগঙ্গ বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তাহার পর এই বংশের ষষ্ঠ নৃপতি অনঙ্গভীমদেব প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। এই মহারাজের সময়ে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ১২৮ হস্ত পরিমিত বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত মন্দিরের ঊর্দ্ধ ভাগস্থ প্রস্তরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—"শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপ নক্ষত্রনায়কে প্রাসাদঃ কারিতোহনঙ্গ ভীমদেবেন ধীমতা।" এই রাজা অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ইনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে "শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবই উড়িষ্যার রাজা, আমি তাহার দাস মাত্র।" কৃষ্ণানদী হইতে গঙ্গা নদীপর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই বংশীয় সপ্তম রাজা লাঙ্গুলা নরসিংহদেবের সময় কোণার্কের মন্দির নির্ম্মিত হয়।

তৎপর এই বংশীয় উনবিংশ সংখ্যক রাজা কপিলেন্দ্র দেব মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, নিজের প্রধান মহিষীর অশেষ গুণসম্পন্ন অষ্টাদশ পুত্র থাকা সত্ত্বেও শ্রীজগন্নাথ দেবের আদেশে কপিলদাসী-পুত্র পুরুষোত্তম দেবকে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পুরুষোত্তম দেব অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত এবং বিদ্বান ছিলেন। ইনিও অনঙ্গ ভীমদেবের ন্যায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কপিলেন্দ্র দেবের রাজত্ব সময়ে মন্দিরের বহির্বেষ্টন এবং পুরুষোত্তম দেবের সময়ে ভিতরকার প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। রাজা পুরুষোত্তম দেব কোন সময়ে কাঞ্চী-নগরের রাজাকে জয় করিবার জন্য যাত্রা করেন। এই মহাত্মার ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ দেব ও শ্রীবলভদ্র দেব উৎকল রাজার পক্ষে যথাক্রমে শুক্ল ও ও কৃষ্ণবর্ণের তুরঙ্গোপরি আরূঢ় হইয়া যাত্রা করেন এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে সৈনিকবেশে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হন; কিন্তু রাজা এই ঘটনার কিছুই জানিতেন না। ভগবানের কৃপায় কাঞ্চী-নগরের রাজা পরাজিত হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে শ্রীজগন্নাথ দেব ও শ্রীবলভদ্র দেব মাণিক্য নাম্নী এক গোয়ালিনীর নিকট হইতে হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়ক বন্ধক দিয়া দধি ক্রয় করেন এবং গোয়ালিনীকে বলেন যে পশ্চাৎ যে রাজা আসিতেছেন তাহার নিকট হইতে অঙ্গুরীয়ক ফেরত দিয়া দধির মূল্য লইবে। উভয়ে প্রস্থান করিলে রাজা তথায় আসিয়া গোয়ালিনীর নিকট সমস্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া আত্মাহারা হইলেন এবং গোয়ালিনীকে ধন্য মনে করিলেন। সেইদিন হইতে ঐ গোয়ালিনীর নামানুসারে উক্তগ্রামের নাম মাণিক্যপট্টন হইয়াছে এবং এইনাম অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

তাহার পর ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বগুণধর প্রজারঞ্জন, বীর পুরুষ, সুপণ্ডিত এবং পরম ভক্ত প্রতাপরুদ্রদেব পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময় দক্ষিণ ও পূর্ব্বোত্তর দিক সমূহ হইতে মুসলমানগণ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিল। মহারাজ যখন দক্ষিণ দিকে মুসলমান দিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন সেই সময় বঙ্গদেশ হইতে মুসলমান

আসিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করে। রাজার অনুপস্থিতি হেতু সেবকগণ। ভীত হইয়া জগন্নাথ প্রভৃতি মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে চিল্কাহ্রদ-মধ্যস্থ চড়েইগুহা নামধেয় পর্ব্বতকন্দরে লুকাইয়া রাখিলেন। তাহার পর রাজা উপস্থিত হইয়া মুসলমানদিগকে পরাস্থ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিগুলি আনয়ন করিয়া রত্নসিংহাসনোপরি স্থাপন করা হইল। ইহাঁর সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। জীব-উদ্ধারই চৈতন্যের ব্রত। জগন্নাথের মহিমা বিস্তার করিবার জন্যই তিনি শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম, মন্ত্রী রায় রামানন্দ, মহারাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি সকলেই চৈতন্যের দলভুক্ত হইলেন। সকলেই গৌর-ভক্ত হইলেন এবং মহাপ্রভু ঘরে ঘরে পূজিত হইতে লাগিলেন—উড়িষ্যায় এক নব যুগের অভ্যুদয় হইল। পুরীতে স্থানে স্থানে মঠ স্থাপিত হইল। এই আনন্দ-স্রোত অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া বহিল, পরে ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানেই চৈতন্য দেবের তিরোভাব হইলে রায় রামানন্দ শোকে অধীর হইলেন এবং স্বরূপ ও দামোদর প্রাণত্যাগ করিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরই শোকে অধীর হইয়া বন-গমন করিলেন। যেমন আনন্দ সেই পরিমাণ নিরানন্দ হইল। শ্রীমন্দির গঙ্গাবংশীয় রাজাগণের অধীনে ৪০২ বৎসর ছিল। মহাত্মা প্রতাপরুদ্রের সময় হইতে গঙ্গাবংশীয় সৌভগ্য-রবি অস্তাচলগামী হইল। ভোইপুন ও তাৎকালীন মন্ত্রী গোবিন্দবিদ্যাধর উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হইলেন। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ভোইবংশীয়দিগের অধীন মন্দির ছিল। তৎপর তেলেঙ্গা মকুন্দ হরিচন্দনকে প্রহারী রাজা করেন। ইহাঁর সময়ে বঙ্গ-শাসনকর্ত্তা সুলেমান উড়িষ্যা আক্রমণ করিবার জন্য কালাপাহড়কে প্রেরণ করিলেন। কালাপাহাড় ১৫৬৭খৃঃ অব্দে রাজা মুকুন্দদেবকে বিনাশ করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করে।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ দাসবসু।

—:0:—

অমৃত

আশ্চর্য্য হইবে শুনি মানবও যোগ্য,
অমৃত কেবল নহে দেব-উপভোগ্য।
দেবগণ সুধাপান করি কোন কালে,
অমরত্ব লভেছেন শুনি লোকে বলে।
অমৃত দেবের ভোগ্য অন্য কারো নয়,
এ ধারণা রাখি বল কিবা ফলোদয়?
যে অমৃত করি পান অমরের গণ,
লভেছেন অমৃতত্ব,—সবার কারণ।
এ মর-জগতে যদি অমর হইবে,
প্রযত্ন করহ তবে অমৃত মিলিবে।
জ্ঞান-সিন্ধু মন্থনেতে ভক্তি-প্রেম ধন,
উঠিবে আপনা হ'তে অমৃত-রতন।
পান কর, দান কর, রহ নিসগণ,
ডুবিলে অমৃত-হ্রদে মরে কি সে জন?

ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ।

যবন হরিদাসের বাস্তুভিটা।

কলিপাবনাবতার শ্রীমদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমকালে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশ ধন্য করিয়াছিলেন, যবন হরিদাস তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কি প্রকারে ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াছিলেন, বৈষ্ণব-মত আশ্রয় করিয়া নাম-জপকেই জীবনের অবলম্বন করিয়া লইয়াছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের শত অত্যাচার উৎপীড়ন সহিয়াও স্বীয় গৃহীত মত পরিহার করেন নাই; আর তাহারই ফলে পরিশেষে শাশ্বত প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়া, কিরূপে উচ্চ, নীচ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের কথা যে, তাঁহার মত মহানুভবের, সাধু পুরুষেরও বাস্তুভূমির কোনও সন্ধান নাই। তিনি কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কোন স্থল তাঁহার আবির্ভাবে পবিত্র হইয়াছিল, তাহা কাহারও পরিজ্ঞাত নহে। সাধুদিগের বাস্তুভিটা ও সমাধিভূমি উভয়ই তুল্যরূপ পবিত্র, মানব-মাত্রেরই পূজনীয়, বিশেষতঃ তাঁহাদের গৌরব মহিমার পূর্ণানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দের, গুণানু-রাগী ভক্তগণের ভক্তির তীর্থক্ষেত্রসদৃশ; পাপহর পুণ্যস্থান রূপে পরিগণিত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং হরিদাসের তুল্য পবিত্রকীর্ত্তি সাধুর লুপ্তপ্রায় বাস্তু-ভূমির যদি সন্ধান হয়—তাঁহার জন্মস্থানের যথার্থ অবস্থান যদি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশের, বঙ্গবাসী বৈষ্ণবদিগের যে একটা প্রধান অভাব নিবারিত ও মহোপকার সাধিত হয়, তাহা কে না বুঝিতে পারেন? আমরা বহুদিন যাবৎ বহু যত্ন, চেষ্টা ও অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি তাহাতে সাফল্য-লাভ করিয়াছি—যবন হরিদাসের বাস্তুভিটার আবিষ্কারে, প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশে সমর্থ হইয়াছি, আর আজ তাহারই সুসংবাদ, এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের দ্বারা আমাদের সহৃদয় পাঠকপাঠিকা তথা সমগ্র বৈষ্ণব জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অনুসঙ্গী বা পার্ষদশ্রেণী-ভুক্ত প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণবেরই বাস্তুভিটা ও সমাধিস্থল নিরূপিত আছে এবং অনেকেরই বসতিস্থান, সাধন-ক্ষেত্র বা সমাধিভূমির উপরে পাটবাড়ী, মন্দির ও আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র যবন হরিদাসের সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম কেন হইয়াছে, তাঁহার বাস্তুভিটার সেরূপ কিছু হয় নাই কেন, অধিক কি—তাঁহার জন্মভূমির বিশেষ কোনও সংবাদ সংগ্রহেও তাঁহার সঙ্গী সহচরেরা বা উত্তরকালবর্ত্তী বৈষ্ণব ভক্তেরা চেষ্টা করেন নাই কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের কিন্তু মনে হয়, হরিদাসের মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণই উহার একমাত্র কারণ। তিনি যখন শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর শিষ্যত্বগ্রহণ করেন, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার মুসলমান মাতা-পিতা জীবিত ছিলেন, আর, তজ্জন্যই বোধ হয় তাঁহার বৈষ্ণব সঙ্গীরা, তিনি পরমপূজ্য সাধু হইলেও, তাঁহার বাসগ্রামের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই।

তাঁহাদের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরাও সেই পন্থার অনুসারী হইয়াছিলেন, এবং বৃন্দাবন দাসপ্রমুখ বৈষ্ণব লেখকেরাও— 'বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস' প্রভৃতি দুই এক কথা লিখিয়াই তাঁহার জন্ম স্থানের বিবরণ অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, হরিদাস মুসলমান ছিলেন কি না তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কয়েক-জন বৈষ্ণব-গ্রন্থকার তাঁহাকে ব্রাহ্মণবংশীয় হিন্দু বলিয়াই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন—'হরিদাস ব্রাহ্মণপিতার ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি শৈশবে মাতাপিতৃহীন হওয়ায়, এক মুশলমানের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, আর সেই কারণেই শেষে বৈষ্ণব হইলেও 'যবন হরিদাস' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার মাতাপিতার নাম ও তাহাদের মৃত্যুর কারণ পর্য্যন্তও উল্লিখিত হইয়াছে। ভগীরথ বন্ধু কৃত 'চৈতন্য-সঙ্গীত' পাঠে জানা যায়—'হরিদাসের পিতার নাম সুমতি ও মাতার নাম গৌরী, সুমতি পরলোক গমন করিলে, গৌরী সহমৃতা হন। কোনও মুশলমান পরিবার পুত্র-নির্ব্বিশেষে ছয়মাস তাঁহার লালন পালন করেন। সেই মুসলমান-সংসর্গ হেতু হরিদাস 'যবন হরিদাস' আখ্যায় আখ্যাত।'

জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থেও প্রাগুক্ত মত স্বীকৃত হইয়াছে, তবে তাহাতে হরিদাসের মাতাপিতার নাম ভিন্নরূপ। জয়ানন্দ তাঁহার পিতাকে "মনোহর" ও মাতাকে 'উজ্জ্বলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত এবং 'শ্রীমৎ হরিদাসঠাকুরের জীবনচরিত' প্রণেতা গৌরভূষণ শ্রীল অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় উহাতে দোষ বিবেচনা করেন না, পরন্তু তিনি এই প্রবন্ধলেখকের পত্রের উত্তরে বৈষ্ণবোচিত কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক, হরিদাস সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাতে 'লোকের দুই নামও থাকে এবং ডাকনামও একটা পৃথক্ থাকে' এই বলিয়া উহার সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি নিজ গ্রন্থে জয়ানন্দের মত উদ্ধৃত করেন নাই, বোধ হয় তাঁহার পুস্তক প্রকাশের সময়ে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' আবিষ্কৃত না হওয়াই উহার কারণ। যাহা হউক, অচ্যুতবাবুর পত্রে আমরা একটী নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। কথাটী ৪১২ গৌরাঙ্গের বিষ্ণুপ্রিয়াপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বনগ্রামের শ্রীযুত দুর্গাদাস দত্ত মহাশয় যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, অচ্যুতবাবু তাহারই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন উহার মর্ম্ম এইরূপ—হরিদাসের মুসলমান-প্রতিপালকের নাম জাহেরউদ্দীন। তাহার সহিত সুমতি ঠাকুরের এবং তাহার পত্নীর সহিত গৌরী দেবীর আত্মীয়তা ছিল। সেই আত্মীয়তার ফলে, গৌরীর মৃত্যুর পরে, তাহার নিরাশ্রয় শিশুপুত্রের লালন-পালনভার, তাহারাই গ্রহণ করিয়াছিল। জাহেরউদ্দীনের বংশধরগণ এখনও বুড়নগ্রামে বসবাস করিতেছে। উল্লিখিত পরস্পর-বিরুদ্ধ নূতন নূতন বিষয় পাঠ করিয়া হরিদাসের হিন্দুত্বে আমাদের আরও অধিক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সেই সংশয়ের গাঢ়তা জন্মিয়াছে আবার কয়েকখানি সুনামপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থের দ্বারা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন প্রামাণিক ও সর্ব্বজনমান্য ভক্তিগ্রন্থে হরিদাসের জীবনকথা বিবৃত হইয়াছে, তহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে কোনও কথাই লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ, তিনি যে নীচ যবন কুলে জাত—সেই কথাই বারবার উক্ত হইয়াছে, তাঁহার মুখ দিয়াও পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলে তাহার সামান্য ইঙ্গিতও কি ঐ সকল গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইত না। এই সকল এবং অপর অনেক কারণ বশতঃ আমাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে, হরিদাস হিন্দু নহেন মুসলমান, বৈষ্ণব-মত আশ্রয় করিয়াই হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থকার হরিদাসকে ব্রহ্মণকুমার বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা অবশ্যই হরিদাসের সমসাময়িক ছিলেন না, তাঁহার নিকটে শুনিয়া কি তাঁহার বাসগ্রামে সন্ধান লইয়াও তাঁহার জন্মকর্ম্মাদির কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই, খুব সম্ভব কোনও লোকের নিকটে জানিয়া অথবা কাহারও লেখা দেখিয়াই স্ব স্ব অভিমত পরিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম সেই সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই সম্ভবতঃ উহার বিকৃতি ঘটাইয়াছিলেন, উৎকট জাত্যভিমান বশতঃ হরিদাসকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর উদারচরিত সরলবিশ্বাসী বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা সেই কথা স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ হরিদাস, মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, কোনও স্বার্থপর জাত্যভিমানীর কুচক্রে পড়িয়া, শেষে হিন্দুরূপে, জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে জাতিবিচার নাই, বৃথা জাত্যভিমানও নাই। তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই স্বমতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকলের প্রতিই সামান যত্ন ও আদর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই পুজ্য—হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, আর নীচ অধম চণ্ডালই হউন, বৈষ্ণব মাত্রেরই সমান গৌরব ও ভক্তির পাত্র। বৈষ্ণব হইয়া যাঁহারা সেকথা না বুঝেন, জাতিভেদবিহীন নিত্যশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে জাত্যভিমানের আবিলতা আনিয়া উপস্থিত করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। যিনি হরিদাস ব্রাহ্মণরূপে বর্ণনা করিয়া কয়েকজন অকপট বৈষ্ণব গ্রন্থকারকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়াছেনই, তদ্ব্যতীত বৈষ্ণবধর্ম্মেরও শক্রতা করিয়াছেন! তাঁহার অন্ততঃ এই একটী প্রধান কথাও চিন্তা করা উচিত ছিল যে, ব্রহ্মণসন্তান বলিয়া হরিদাস সম্মান লাভ করেন নাই। তিনি যে গৌরবের ভাগী হইয়াছেন, 'হরিদাস ঠাকুর' 'ব্রহ্ম হরিদাস' প্রভৃতি গৌরবাত্মক নামে অভিহিত হইয়া যে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মণজন্মের হেতু নহে, তাঁহার অনন্যসাধারণ ভগবন্নিষ্ঠা, অলৌকিক নামে বিশ্বাস ও নামজপেরই অমৃতময় ফল মাত্র। সুতরাং হরিদাসকে ব্রাহ্মণ করিতে পারিলেই যে তাঁহার অনুচর সহচরগণের, বৈষ্ণবদিগের মর্য্যাদা বাড়িবে, আর তিনি মুসলমান-কুলসম্ভূত হইলেই যে তাহার লঘুত্ব ঘটিবে, তাহাদের

জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে, এমন কোনও কথাই নহে। শ্রীমহাপ্রভুর মতাশ্রয় করিলেই যখন জাত্যভিমানে বিলোপ ঘটে, হিন্দুমুসলমান, বিপ্র-চণ্ডাল ভেদ তিরোহিত হয়, তখন বৈষ্ণবসমাজের লাভালাভ কিছুই নাই।

বুড়ন ও ভাটকলাগাছী এই উভয় গ্রামই হরিদাসের জন্মভূমি নহে। দুই গ্রামে এক ব্যক্তির জন্মগ্রহণ কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। অথচ জয়ানন্দের ন্যায় বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থকারদিগের কথাও অভ্রান্ত। এই বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, হয় বুড়ন ও ভাটকলাগাছীকে এক গ্রাম, না হয় বুড়নকে ভাটকলাগাছীর কিংবা ভাটকলাগাছীকে বুড়নের অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ঘটনা অনেকটা সেইরূপই বটে, শেষের কথাটাই যথার্থ। হরিদাস বুড়নের অন্তঃপাতী ভাটকলাগাছী গ্রামেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুড়ন, গ্রাম বিশেষের নাম হইলেও পরগণারূপেও পরিগণিত। পরগণা অনেকগুলি গ্রাম লইয়া গঠিত হয় সুতরাং বুড়ন পরগণার মধ্যে ভাটকলাগাছী গ্রামের অবস্থিতি অসম্ভব নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন আর বুড়নের মধ্যে ভাটকলাগাছীর অস্তিত্ব নাই। অধুনা হাকিমপুর, তারালী, নিত্যানন্দবাটী, বালতী, বয়ারঘাটা, চিতারু, নবাতবাটি প্রভৃতি ১২।১৩ খানি গ্রাম উহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিলেও ভাটকলাগাছী নামক কোনও গ্রাম আর উহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সে গ্রাম এখন আত্মগোপন করিয়াছে, সাধু হরিদাসের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অদৃশ্য হইয়াছে, ভিন্ন গ্রামদ্বয়ে আপনার অঙ্গ মিশাইয়া দিয়া যেন নীরবে অভিগোপনে অবস্থিতি করিতেছে। তবে সেই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের পুণ্যপূত বাস্তুভিটার পুণ্যবিশেষ পরিহার করিতে পারে নাই বলিয়া এখনও তাহার স্থান নিরূপণ অসম্ভব হয় না। জয়ানন্দের স্বর্ণনদী এখন সোণাই আখ্যা লাভ করিয়াছে। তাহার গতি প্রকৃতিরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও সে সাধুর বাস-গ্রামের স্পর্শসুখ হইতে বঞ্চিত হয় নাই স্বর্ণনদী সোণাই নামে অদ্যাপি সেই পবিত্র ভাটকলাগছীর পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর বাম তীরবর্ত্তী একটি গ্রামের নাম কেঁড়াগাছী। ইহার সহিত কলাগাছী নামের সাদৃশ্য দেখিয়া, অনেকে হয়ত ইহাকে চৈতন্যমঙ্গলোক্ত ভাটকলাগাছী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে; কারণ উহাদের মধ্যে নামতঃ একরূপতা থাকিলেও কার্য্যতঃ নাই, কেড়াগাছী লুপ্তনাম ভাটকলাগাছীর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইলেও, বুড়ন পরগণার অন্তর্নিবিষ্ট নহে এবং সেখানে যবন হরিদাসের কোনও স্মৃতি নিদর্শনও বিদ্যমান নাই। সে নিদর্শন, সাধুর বাস্তুভিটার সেই পবিত্র ধ্বংসবিশেষ বহন করিতেছে, উহারই পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী, সোণাই নদীর দক্ষিণ তীরস্থ একটি স্থান। এইস্থান, 'এই পুণ্যভূমি এখন 'হরের ডাঙ্গা' নামে অভিহিত হইয়া, সেই স্বনামখ্যাত সাধুর পুণ্যস্মৃতি সমুদ্রিক্ত করিয়া দিতেছে। ইহা অধুনা নব প্রতিষ্ঠিত হাকিমপুর পল্লীর সীমাভুক্ত হইলেও পূর্ব্বে ভাটকলাগাছীর অন্তর্বর্ত্তী ছিল; আর সেই সংবাদ শুনিয়াই জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের মনে হয়—কলাগাছী কেঁড়াগাছীরই অপভ্রংশ অথবা কলাগছী হইতে কেঁড়াগাছী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কেঁড়াগাছী বা কলাগাছী পূর্ব্বে প্রকাণ্ড গ্রাম ছিল এবং ইহার একাংশ সোণাইনদীর দক্ষিণ তীরেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অতঃপর কোনও কারণে গ্রাম দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় পশ্চিমাংশ অর্থাৎ সোণাইনদীর দক্ষিণ তটবর্ত্তী স্থান পৃথক গ্রামে পরিণত ও ভাট-কলাগাছী বা ভাটকেঁড়াগাছী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তবে এই 'ভাট' শব্দটি কি সূত্রে, কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। বহুসংখ্যক ভাট-উপাধিক ব্রাহ্মণের বসতিসূত্রে গ্রামের নামের পূর্ব্বে ভাট শব্দের সংযোজন হইয়াছিল কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, আর জয়ানন্দ ভাট কেঁড়াগাছী লিখিতে ভাটকলাগাছী লিখিয়াছেন কি কলাগাছীই ক্রমে শুদ্ধ কেঁড়াগাছীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণও সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, জয়ানন্দের সেই ভাটকলাগাছী গ্রাম এখন বিলুপ্ত। উহার মধ্যভাগ প্রান্তরে পরিণত, দক্ষিণাংশ তারালী নামক প্রাচীন গ্রাম বিশেষের এবং উত্তরাংশ হাকিমপুর পল্লীর গর্ভগত হইয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত অংশে অর্থাৎ হাকিমপুরের মধ্যেই ভারতবিশ্রুত সাধু যবন হরিদাসের সুপবিত্র বাস্তুভিটা 'হরের ডাঙ্গা' বিরাজমান। 'হরের ডাঙ্গা' প্রাচীন বুড়ন হইতে ৪॥০ সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে, উত্তরপশ্চিম কোণে অবস্থিত এবং বনগ্রাম হইতে ৮ আট ও শান্তিপুর হইতে ১২।১৩ বার, তের ক্রোশমাত্র দূরবর্ত্তী।*

এই 'হরের ডাঙ্গা'ই যে হরিদাস ঠাকুরের বাস্তুভূমি তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। আমরা বহু বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, পূর্ব্বে এই স্থানের প্রতি তীর্থ-সম্মান প্রদত্ত হইত। বৎসরের কোনও নির্দ্দিষ্ট দিবসে গ্রামবাসীরা দলে দলে এইস্থানে সমবেত হইয়া পরলোকগত মহাত্মার উদ্দেশ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য উৎসর্গ করিত, কেহ জল, তুলসী বা পুষ্পযোগে তাঁহার নামে পূজা দিত, কেহ বা বাস্তুর উপরে জলসেচন করিত এবং মুসলমানেরা 'হাজত' দিত ও 'মনসা' করিত। যখন দেশে 'মারীভয়' উপস্থিত হইত, বিসূচিকা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ও স্পর্শক্রামক রোগে বহুলোক প্রাণত্যাগ করিত, তখন ভীত হইয়া ভিন্ন গ্রামের লোকেরাও 'হরের ডাঙ্গার আশ্রয় লইত, সকাল সন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া ইহার উপরে জল-সেচন ও দীপ-দান করিত। শুনিতে পাওয়া যায়, এখনও নাকি দুই চারিজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসমান সেই ভাবেই 'হরের ডাঙ্গা'র প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তবে দিন দিন দেশের লোক যেভাবে ইহার কথা বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে

---

*বুড়নগ্রাম সাতক্ষীরা সবডিবিজনের অন্তর্গত এবং সাতক্ষীরা নগরের উত্তর পশ্চিমে ৩।৪ মাইল দূরে, 'মাইচম্পার দরগার' নিকটে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় হইলেও এক সময়ে সমুন্নত ছিল। বহু পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন, ধ্বংসাবশেষ এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। চেষ্টা করিলে, এখান হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

'হরের ডাঙ্গা' এই নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইবে; সহস্র চেষ্টাতেও কেহ আর ইহার কথা স্মরণ করিতে পারিবে না। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রকৃত অবস্থান নিরূপণও সুদূর পরাহত, দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। অতএব এখনও যদি দেশের লোক বিশেষতঃ সাধুর গুণানুরাগী বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় সচেষ্ট হন, তাহা হইলেই, তাঁহার যথার্থ বাস্তুভিটার উপরে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নাদি স্থাপিত, পাটবাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে পারে। আশা করি দেশের গৌরব বিবেচনায়, দেশের গুণী ও শিক্ষিত সমাজ, অবিলম্বেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন।

'হরের ডাঙ্গা' বিলধাগন্থ স্থান, অধুনা ঘনাকীর্ণ, তাল প্রভৃতি বৃহৎবৃক্ষে ও খড়নামক দীর্ঘ তৃণবিশেষে সমাবৃত এবং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ দুর্গমও বটে। এই স্থান অধুনা হাকিমপুরের খাঁ উপাধিধেয় মুসলমান ভূস্বামীদিগের অধিকারভুক্ত, এই খাঁ সাহেবেরা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, শেষে যশোহরের পিরালী খাঁ নামা মুসলমান শাসনকর্ত্তার পক্ক গোমাংসের আঘ্রাণ লইয়া পিরালী হন, এখন মুসমান হইয়া গিয়াছেন। ইহাদের এক শাখা এখন নিজ বুড়নে এবং অপর শাখা চুবড়িয়া নামক স্থানে বাস করিতেছেন। সুতরাং হরিদাসের বাস্তুভিটার উপরে কোনও স্মৃতি-নিদর্শন রক্ষা করিতে হইলে, অগ্রে হাকিমপুরের খাঁ সাহেবদিগের সম্মতি লইতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ সহৃদয় ও উচ্চমনা, তাহাতে সে সম্মতি গ্রহণ আয়াসসাধ্য হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এখন যদি দেশের হিন্দুপ্রধানগণ এই কার্য্যে মনোযোগী হন, আলস্যত্যাগ করিয়া দেশের গৌরব বর্দ্ধনে আত্মনিয়োগ করেন, তবেই এই প্রথিতযশা সাধুর লুপ্তপ্রায় বাস্তুভূমির উদ্ধারসাধন ও তৎস্থলে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হইতে পারে। আজকাল বাঙ্গালার কৃতবিদ্য ও মনস্বী সম্প্রদায় দেশের পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কার, ও সংস্কার সংরক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং কতকগুলি স্বনামধন্য, দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির লুপ্তপ্রায় জন্মস্থানাদির উপরে স্মৃতি-মন্দির, পাঠাগার পাটবাড়ী প্রভৃতিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি একটু চেষ্টা করেন, সহজেই এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে এবং আমারাও হরিদাসের প্রকৃত বাস্তুভূমির সমুদ্ধার ও তদুপরি সুন্দর একটী আশ্রম বা পাটবাড়ীর প্রতিষ্ঠা দেখিয়া ধন্য হইতে পারিব। হরিদাসের সদৃশ ভগবদ্ভক্ত পূত চরিত্র মহাত্মার সুপবিত্র জন্মস্থানের প্রতি এতদিন এ ভাবে উপেক্ষা প্রদর্শনই অন্যায় হইয়াছিল। সুতরাং এখন এই চারি শতাধিক বর্ষ পরে, তাহার আবিষ্কার সত্ত্বেও যদি দেশের লোক তৎপ্রতি যথাযোগ্য সম্মান বা ভক্তি প্রদর্শনে বিরত থাকেন তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশের তথা বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালীরা তাহাদের এই দেশবিশ্রুত সাধুর প্রতি কখনই অকৃতজ্ঞ হইবেন না। অচিরেই তাঁহার নবাবিষ্কৃত, প্রকৃত বাস্তুভিটার উপরে পাটবাড়ীর স্থাপনা করিয়া দেশের মুখ উজ্জল করিবেন। *

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

আমারা আগামী বর্ষে উক্ত মহাপুরুষের পূত জীবনী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। লেখক পত্র-সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন এই প্রবন্ধটী স্ব স্ব পত্রে অবিকল উদ্ধৃত করেন এবং হরিদাসের, স্মৃতিসংরক্ষণ-কল্পে, তাঁহারা যথার্থ জন্মস্থানের উপরে পাঠবাড়ীর প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। আঃ দঃ সঃ।

—:0:—

আশ্রম-সংবাদ

বিগত পৌষমাসে—বড়দিনের বন্ধের মধ্যে অত্র সারস্বত মঠে শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম-পরিচালকসঙ্ঘের অধিবেশন যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ আবাহন ও বন্দনার সহিত জগদ্গুরু শ্রীমচ্ছঙ্কর ও গৌরাঙ্গ দেবের প্রতিমূর্ত্তিকে সভাপতিরূপে আসনে স্থাপিত করা হয়। মঠের পূজ্যপাদ মহন্তমহারাজ প্রতিনিধিরূপে সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে অনাথ বিভাগের দুইটী বালক দাঁড়াইয়া প্রার্থনা-সঙ্গীত গাহিলে পর ব্রহ্মচারিগণ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা স্তোত্র পাঠ করেন। অনন্তর পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ অভিভাষণে অমৃতময় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। "সেবা ও সঙ্ঘ" এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ * পাঠ হয়। পরে আশ্রমের কর্ম্মকর্ত্তা গতবৎসরের কার্য্যালোচনা ও আয়ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশ প্রদান করেন এবং পরিচালকগণ মিলিয়া আগামী বর্ষের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন। অনন্তর পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজকে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ-গ্রহণান্তে সভাভঙ্গ হয়। আলোচ্য বৎসরে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে ১৮৴৭৬৴১৫ টাকা ও ৪০/০ মোন ধান্য এবং শ্রীশ্রীকাশীধামের শাখাশ্রমে ৭৬৫, ১৫ টাকা মোট; ২৫৯২৮৶/১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণ হইতে ভিক্ষা ও দান দ্বারা সংগৃহীত ১৩৩।৵০ টাকা বাদে বাকী ২৪৫৯।/১০ টাকা মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। আর শ্রীশ্রীকাশীধামের স্ত্রী-বিভাগে ৫৪১৷৷/০ টাকার মধ্যে সাহায্য ৩৬৲ টাকা বাদে বাকী ৫০৫৷৷/১৫ টাকা চাঁদা, দান ও ভিক্ষা দ্বারা সাধারণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বৎসরের সর্ব্বসমেত ৩৩৫৪৷৷৶/১০ টাকা সেবাশ্রমে ব্যয় হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে স্ত্রীবিভাগের সেবিকাগণের কার্য্য সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

অত্র মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীমান বরদাচরণ (নরেন্দ্র চন্দ্র) সংস্কৃত কাব্য-পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হওয়ায় কতক গুলি মূল্যবান পুস্তক পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

*এই প্রবন্ধ গুলি সময়ে অত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সঃ, আঃ দঃ।

———0———

বরঙ্গাইল হরিসভার বার্ষিক উৎসব

বিগত ১০ই পৌষ হইতে ৪দিন ব্যাপী বরাঙ্গাইল হরিসভার বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এরূপ বিরাট আয়োজন ও উৎসবানন্দ ইতঃপূর্ব্বে উক্ত সভায় দৃষ্ট হয় নাই। প্রথম দিন—অধিবাস, মঙ্গলাচরণ, কীর্ত্তন ও মাল্যচন্দনাদি প্রদান হয়। দ্বিতীয় দিবস—নগরসংকীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে বিষ্ণুপূজা ও ভোগাদি, অপরাহ্নে বিরাট সভার অধিবেশন, ভাগবত-পাঠ, লীলাকীর্ত্তন। ৩য় দিবস—নগর-কীর্ত্তনাদি পূর্ব্বদিনের ন্যায়। ৪র্থ দিবস—অহোরাত্র-ব্যাপী নামসংকীর্ত্তন, প্রসাদ-বিতরণ ইত্যাদি। তৎপর দিবস জলকেলী করিয়া উৎসবযজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়। উৎসবে যে সকল মহানুভব আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আসাম সারস্বত মঠের প্রচারক শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ, পাবনা টোলের অধ্যাপক অদ্বৈতবংশধর ষড়্দর্শনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী, কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য, ভক্ত শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক মহাশয়ের ভাগবত-পাঠ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কীর্ত্তন অতীব শ্রুতি-সুখকর ও ভাবোদ্দীপক হইয়াছিল।

———:0:———

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, } চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা।

বৈদিক-প্রসঙ্গ

(৩০)

[উত্তর পক্ষের কথা] "তোমাদের প্রশ্ন যথা,—বিশ্ব ধ্বংস হইলে পর বোধ বস্তুটীর যে অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্ব কোথায় অবস্থিত—বা তাহার অবস্থান কোথায় ?"

ভাল কথা; একটু স্থির চিত্তে ইহার উত্তর শ্রবণ কর। ধ্বংসের পর যদ্যপি কোন বস্তুর অস্তিত্ব গ্রহণ করা হয়, তবে ধ্বংস কথাটী একবারেই ভুলিতে হয়। ধ্বংস-সৃষ্টি, লয়—উৎপত্তি, মৃত্যু—জন্ম এই শব্দ গুলি একরূপ একার্থ-বোধক;—অর্থাৎ ইহা দ্বারা মূলীভূত সার ভাব ঠিক একরূপই বুঝা যায়। তবেই দেখ, ধ্বংস কথাটী ভুলিতে হইলে, লয়, মৃত্যু, অপিচ সৃষ্টি, উৎপত্তি, জন্ম সকল গুলিই একে একে ভুলিয়া যাইতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্র এক সূতার বাঁধন; সূতাটী ধরিলেই সব বাঁধন আল্‌গা হয়। অতএব, ধ্বংসের পর যদ্যপি বোধ বস্তুটীর অস্তিত্ব গ্রহণ কর, তবে তোমাদের ঐরূপ সংস্কারগুলি "জ্ঞান-পক্ষে" ভুলিতে হইবে। তারপর যখন বিশ্ব প্রকৃতই "বিশ্ব" হইয়া দাঁড়াইবে বা জগৎ প্রকৃতই জগতের রূপ ধারণ করিবে, তখন ঐ গুলির মানে কি,—সারভাব কি, অবশ্যই সাধারণে বুঝিয়া লইবে। ইহাই সার কথা। এক্ষণে কথা এই যে, অস্তিত্ব মানে তোমরা কিরূপ বুঝিয়া রাখিয়াছ, সেটী অগ্রে প্রকাশ করিলেই ভাল হয়। আর এক কথা, বোধ বস্তুটীর অস্তিত্ব লইয়াই যখন কথা উঠিয়াছে, তখন "অস্তিত্ব" জিনীসটী কিরূপ জিনীস, এটী না জানিলে খুব সম্ভব কথার সারভাবে সহজেই সাধারণের বুদ্ধি প্রবেশ সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ মতেও "অস্তিত্ব" জিনীসটীর ওজন, তোমাদের পক্ষ হইতে জানিয়া লওয়া আমাদের পক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বপক্ষ। আমরা যতদূর জানি তাহা এইরূপ যথা; ধ্বংসের পর যাহা থাকিয়া যায়; তাহাই তাহার "অস্তিত্ব"।

উত্তর পক্ষ। উত্তম কথা; ধ্বংসের পর যাহা থাকিয়া যায়, মৃত্যুর পর যাহা থাকিয়া যায়, তাহাই তাহার "অস্তিত্ব"। ভাল, জিজ্ঞাসা করি; ধ্বংসের পর যদি সে থাকিয়া যায়, তবে আর তার ধ্বংস হইল কৈ? মৃত্যুর পর যদি সে থাকিয়া যায়, তবে আর তার মৃত্যু হইল কৈ? এই রূপ লয় হইয়া যদ্যপি সে থাকিয়া যায়, তবে আর তার লয় হইল কৈ? মনেকর, হরিমোহন মারা গেল; মরিবার পর যদ্যপি আবার ঐ হরিমোহন কোথাও থাকে, তবে আর হরিমোহনের মরণ হইল কৈ? যে মরিবে, সেত কোথাও না কোথা আছে! তবে আর সে কি করিয়া মরিল! তবে কি সে (হরিমোহন) "মরিয়া বাঁচিয়া" আছে? যদ্যপি তাহাই হয়, তবে কোন কেহ অন্ধ সে সবই দেখিতেছে;—কোন কেহ বন্ধ্যার সাতটী পুত্র আছে; শূন্যেও পাঁচটী গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে;—ইত্যাকারও সম্ভব হইয়া যায়। সেই রূপ 'হরিমোহন' ধ্বংস হইবার পর (মরিবার পর) আবার তাহার অস্তিত্ব আছে (অর্থাৎ আবার সে বাঁচিয়া আছে, আবার তাহার সত্ত্বা আছে) এই রূপ বাক্য তোমাদের পক্ষেই ধ্রুব হয়। আর অতি বিস্তারের প্রয়োজন নাই। অবশ্য, মহর্ষি সাংখ্যকার এরূপ বাক্য গ্রাহ্য করেন না; এ কথা অভ্রান্ত। তোমারা এই টুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হয়।

পূর্ব্বপক্ষ। আচ্ছা; যদ্যপি এরূপ বলা হয় যথা, ধ্বংসের অর্থ "লয়"—অর্থাৎ যাহা একবারে বিনাশ হয় না; তাহাই লয় বা অস্তিত্ব। আবার লয় অর্থ ধ্বংস; কিন্তু ধ্বংসের অর্থ—একবারে বিনাশ মনে করিবেন না। তবেই দেখুন, ধ্বংসের পর যাহা থাকে,—অর্থাৎ একবারে বিনাশ না হইয়া যাহা থাকে,—তাহাই তাহার অস্তিত্ব;—নামান্তর "লয়"।

উত্তরপক্ষ। হাঁ; কথাগুলি ঐরূপ করিয়া গুছাইয়া বলিলে, অপর সাধারণে অবশ্যই তাহা সত্য মনে করিবে; একথা অসম্ভব নহে। কিন্তু, যাঁহারা সাধু, তাঁহারা তাহা মনে করিবেন কেন? 'ধ্বংস' 'লয়' 'মৃত্যু' তোমাদের ঐ বাক্যগুলি একার্থ-বোধক; অপিচ, উহা স্ব-বিরোধী বাক্য;—"যেমন হরিমোহন "মরিয়া বাঁচিয়া" আছে ইত্যাদিবৎ" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আর উহার দ্বারা (অর্থাৎ যাহা একবারে বিনাশ হয় না,— এইরূপ কথা দ্বারা) নূতন তত্ত্ব কি প্রসব করিল?—কোন কিছুই বুঝা যায় না। অধিকন্তু, উহা ঠিক ঐ পূর্ব্ব বাক্যেরই পোষক হইল। তাহা বুঝাইয়া দিই দেখ।

যাহা একবারে বিনাশ হয় না,—বা একবারে বিনাশ মনে করিবেন না,—তাহাই "ধ্বংস"। তবেই হইল, একবারে বিনাশ না হইয়া যাহা থাকে,—কিনা ধ্বংসের পর যাহা থাকে, তাহাই তাহার "অস্তিত্ব"। কথা হইতেছিল ধ্বংসের পর যাহা থাকে, তাহাই তাহার "অস্তিত্ব"; বর্ত্তমানে নাহয়

হইল, একবারে বিনাশ না হইয়া (ধ্বংস না হইয়া) যাহা থাকে, তাহাই "অস্তিত্ব"। ইহার দ্বারা আর নূতন তত্ত্ব কি বাহির হইল; অপিচ, ইহা একরূপ "প্রহসন" হইয়া পড়িল। এইবার ঐ মন্ত্রটী মৃত্যুতে খাটাইয়া লও; অর্থাৎ যাহা একবারে বিনাশ হয় না, তাহার নাম "মৃত্যু"। ভালকথা; 'হরিমোহনের' মৃত্যু হইয়াছে কি না একবারে বিনাশ হয় না; তবেই হইল সে হাবড়ার হাটে হাট করিতেছে। অর্থাৎ 'হরিমোহন' আধখানা মরিল, আর আধখানা কোথাও থাকিল; ইহার নামই তো (অর্দ্ধ ভাগ যুবতী,—আর অর্দ্ধ বৃদ্ধা) কি না অর্দ্ধ-জরতী। তোমরা যাহা সাধারণকে বুঝাইয়া দাও, যথা—ধ্বংস অর্থ একবারে বিনাশ মনে করিবেন না; ধ্বংস অর্থ লয়"—ইত্যাকার বাক্য গুলিও ঠিক ঐরূপ। ছি! ছি! আর লোক হাসাইও না। তোমাদের ঐ সকল উপদেশ যাহারা মাথায় করিয়া রাখে, তাহারা রাখুক; কিন্তু, হিন্দু ইহা হইতে দূরে থাকিবে। অবশ্য মনে রাখিও মহর্ষি সাংখ্যকার এরূপ বাক্য গ্রাহ্য করেন না। অপিচ, "নাশঃ কারণ লয়ঃ" মন্ত্রের ব্যাখ্যাও ঐরূপ "অসাধু দোষ-দুষ্ট" নহে।

পূর্ব্বপক্ষ। আচ্ছা যদ্যপি ঐরূপই হয়, তবে দৃশ্যমান জগতের—"জন্ম—মৃত্যু" "উৎপত্তি—লয়" "সৃষ্টি—ধ্বংসের" এইরূপ যে, উপলব্ধি বা প্রতীতি,—এইগুলি কি অবাস্তব? যদ্যপি তাহাই হয়, তবে এই অবাস্তব প্রতীতি—কোথা হইতে আসিতেছে?

উত্তরপক্ষ। হাঁ; আমরাও তো ঐ প্রসঙ্গই আরম্ভ করিয়াছি। অভিপ্রায় এই যে, তোমরা নিত্য-বস্তুর অস্তিত্ব গ্রহণ কর না "ঈশ্বরের" নিত্যত্ব গ্রাহ্য কর না; অথচ "জগতের উৎপত্তিও আছে, আর ধ্বংসও আছে" (নাগান্তর জন্মও আছে, আর মৃত্যুও আছে) এইরূপ বাক্য যথা-তথা বলিয়া থাক। এইটী পৃথিবী, এইটী জল, এইটী অগ্নি—ইত্যাকার বোধ কর। এই জন্যই যে কথা হইতেছে যে, তোমাদের ঐ যে "সত্য" বোধ, উহা কোথা হইতে আসিতেছে! সেই মূলেই ত বিশ্ব ধ্বংস হইয়া "আপদ চুকিয়া" গিয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ বোধ বস্তুটীর অস্তিত্ব গ্রহণ করিলেই, অবশ্য জগতের কথা আরম্ভ হইবে। অন্যথায়, জগৎই বা কোথায়? ঈশ্বরই বা কি? জগতের "জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি" অভিমত বাস্তব কি অবাস্তব? ইহার উত্তর তো দূরের কথা। তোমাদের পক্ষ হইতে "ঈশ্বরের নিত্যত্ব" সমর্থন প্রকাশ্যে আসিলে,—[illegible] তোমরা যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পার; অন্যথায়, জগতের কোথা কি?—কেন হইতেছে? এরূপ প্রশ্নের অধিকার তোমাদের নাই,—বলা যাইতে পারে। ইহাই সার কথা।

পূর্ব্বপক্ষ। তবে আপনি অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি রূপ বলিতে চান?

উত্তরপক্ষ। হাঁ; এ কথা অবশ্যই উত্তম কথা। তদুত্তরে যাহা বলি শুন। লৌকিক জগতে দেখা যায়, প্রত্যক্ষগোচর পদার্থ মাত্রেই আমাদের "সত্য" বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য ব্যবহারিক জগতে আমরা ঐ পদার্থের "অস্তিত্ব" গ্রহণ করি। যেমন দ্রব্য বলিলে ক্ষিতির, গুণ

বলিলে রূপের, কর্ম্ম বলিলে গমনাগমনের অস্তিত্ব "সত্য" বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু, এই যে ক্ষিতি (পৃথিবী)—উহা একটী দ্রব্যের অন্তর্গত পদার্থ; (পূর্ব্বে বিরাট বিশ্ব দেখাইবার সময় বলা হইয়াছে)। কিন্তু, লৌকিক জগতে ঐ ক্ষিতিকে (পৃথিবীকে) অন্যান্য সাধারণে কেহ তো "এক" বলিয়া প্রত্যয় ও ব্যবহার করে না।—অর্থাৎ, আমার জমী, তোমার পুকুর, তাহার বাড়ী, এইরূপে ঐ পৃথিবীর —নামান্তর মাটী (মৃত্তিকা) বা ক্ষিতির ভিন্ন-ভেদ প্রচলিত আছে; বর্দ্ধমানের মাটী, কাশীর মাটী, এলাহাবাদের মাটী, এই রূপেও মাটীর (ক্ষিতির) ভিন্ন-ভেদ প্রচলিত আছে; সরা, ভাঁড়, মালসা, হাঁড়ি এই রূপেও ভিন্ন ভেদ প্রচলিত আছে,—ইত্যাদি। কিন্তু, মাটী (ক্ষিতি) তো আর স্বরূপে দুই দুই নহে; মাটী (ক্ষিতি) তো এক; অর্থাৎ, লৌকিক জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্ষিতির (পৃথিবীর) ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও, মূলে তো সেই এক "ক্ষিতি" ভিন্ন আর অন্য কিছুই নহে। তবেই দেখ, একই ক্ষিতির (মাটীর) সরা, ভাঁড়, জমী, কোটাঘর ইত্যাদি বহু বহু ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও, ঐ ব্যবহার "লৌকিক ব্যবহার" মাত্র; মূলে কিন্তু সেই—একই "ক্ষিতি"। অতএব, বহু ক্ষিতি (মাটী) হইতে ঐ যে একটী "এক" পাওয়া গেল, ঐ একেরই নাম "ক্ষিতিত্ব"। তবেই হইল ক্ষিতিত্ব এক; কস্মিন্ কালেও দুই নহে। আর ঐ যে সরা, ভাঁড়, জমী ইত্যাদিতে দুই, দুই হইতেছে, ঐটী কি?—না, ক্ষিতি। তবেই দেখ, ক্ষিতিই ব্যবহারিক কার্য্যে দুই, দুই হয়; কিন্তু ক্ষিতিত্ব সেই যেমন "এক" থাকে, তাহা ঠিক "একই" থাকে। ঐ একেরই নাম 'ক্ষিতির'—ক্ষিতিত্ব।

এই বার গুণ পদার্থটী ঠিক ঐরূপ নিয়মে খাটাইয়া লও। তাহা দ্বারা ঐ একরূপই অর্থ পাইবে। অভিপ্রায় এই যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ; শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত ইত্যাদিতে যত রকমই গুণ পদার্থ থাকুক না কেন, লৌকিক—ব্যবহারিক কার্য্যে তাহার দুই দুই ভিন্ন ভেদ হয় বটে; কিন্তু, তাহা কথার কথা মাত্র। মূলে যে "এক",—সেই একেরই নাম "গুণত্ব"।—অভিপ্রায় এই যে গুণত্ব আর দুই, দুই নহে; গুণই লৌকিক কার্য্যে দুই, দুই হয়। গুণত্ব, সেই সেই যেমন "এক" থাকে, তাহা বরাবরই সেই "এক" থাকে। ঐ একেরই নাম 'গুণের' গুণত্ব।

অতঃপর, ঠিক ঐরূপ নিয়মে কর্ম্ম পদার্থটী খাটাও; ঠিক ঐরূপ অর্থই পাইবে। অর্থাৎ, লৌকিক জগতে কর্ম্ম বহু বহু হইবে; কিন্তু কর্ম্মত্ব ঠিক "এক" থাকিবে। আরও একটু বুঝিবার জন্য "বিদ্যমান" শব্দটী ঐরূপ নিয়মে খাটাও। তাহা দ্বারা দেখিতে পাইবে তুমি বিদ্যমান, তিনি বিদ্যমান, আমি বিদ্যমান; এই রূপ কলিকাতা বিদ্যমান, কাশী বিদ্যমান, এলাহাবাদ বিদ্যমান;—পক্ষান্তরে স্থাবর বিদ্যমান, জঙ্গম বিদ্যমান চরাচর বিদ্যমান;—এই রূপে বহু বহু "বিদ্যমান" পাইবে; অর্থাৎ, লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত 'বিদ্যমান' বহু বহু হইবে। কিন্তু "বিদ্যমানত্ব" ঠিক 'এক' থাকিবে;—কস্মিন কালেও দুই দুই হইবে না। এইবার তোমরা বেশ বুঝিতে

পারিয়াছ যে, ঐরূপ নিয়মে "লৌকিক কার্য্যে" পার্থিব পদার্থ মাত্রেরই ঐরূপ অর্থ অবগত হওয়া অসম্ভবপর নহে।

অতঃপর, তোমাদের যাহা আসল কথা সেই "ধ্বংস"টী ঐ রূপ নিয়মে খাটাও। তাহার দ্বারা দেখিতে পাইবে,—লৌকিক জগতে ব্যবহারিক কার্য্যের জন্য "ধ্বংস" বহু বহু হইবে।—যথা ভূমিকম্পে ধ্বংস, বজ্রাঘাতে ধ্বংস, যুদ্ধের গোলায় ধ্বংস,—(ইত্যাদিতে বহু বহু 'ধ্বংস' পাইবে)। কিন্তু "ধ্বংসত্ব" এক ভিন্ন কদাচ দুই দুই হইবে না। এই রূপ ব্যবহারিক কার্য্যে "লয়" বহু বহু হইবে। কিন্তু "লয়ত্ব" ঠিক সেই 'এক' থাকিবে। যদু মরিল, হরিমোহন মরিল, পাখী মরিল, মশা মরিল; এইরূপে 'মৃত্যু' কথায় কথায় লৌকিক জগতে বহু বহু পাইবে। এগুলি লৌকিক—ব্যবহারিক "চলিত কথা" মাত্র। কিন্তু "মৃত্যুত্ব" ঠিক সেই 'এক' ভিন্ন কদাচ দুই নহে।

এইবার যাহা কাজের কথা, "অস্তি" অর্থাৎ আছে" লইয়া দেখ। যদু আছে, ভুবন আছে, মাখন আছে, এই রূপে একটী "আছে" (অস্তি) পাওয়া যায়। বোম্বাই কাপড় আছে, রেলির কাপড় আছে, আমামের এণ্ডী আছে; এইরূপেও একটী "আছে" পাওয়া যায়। জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, ধ্বংস আছে, লয় আছে, সৃষ্টি আছে, উৎপত্তি আছে; এই রূপেও একটী "আছে" পাওয়া যায়। স্থূল আছে, সূক্ষ্ম আছে, কারণ আছে এই রূপেও একটী "আছে" (অস্তি) পাওয়া যায়। এইরূপ জগতের সর্ব্বত্রই নানারূপ পদার্থ আছে ইত্যাদিতে বহু বহু "আছে" (অস্তি) পাওয়া যায়। এই যে "আছে" গুলি কেবল লৌকিক—ব্যবহারিক কার্য্যেরই হেতু মাত্র। কিন্তু 'আছেত্ব-'—সাধু ভাষায় যাহা অস্তিত্ব, তাহা কস্মিন কালেও দুই দুই নহে; সম্ভাবনাও অসম্ভব। তাহা পূর্ব্বাপরই সেই "এক";—এবং 'এক'-স্বরূপ। এক্ষণে তোমরা বিলক্ষণরূপ বুঝিয়াছ যে,—অস্তি (আছে) ব্যবহারিক জগতে ভিন্ন-ভেদ হয়; দুই, দুই হয়। কিন্তু "অস্তিত্ব" কখন ভাঙ্গে না; ঠিক 'এক' থাকে। যেমন ক্ষিতি দুই দুই হয়, "ক্ষিতিত্ব" হয় না। ডোবার জল, নালার জল, নদীর জল ব্যবহারিক জগতে দুই দুই হয়; কিন্তু "জলত্ব" স্বরূপে ঠিক 'এক' থাকে ইত্যাদি। ইহাই হইল যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সহজ ভাষায় "অস্তিত্ব" তত্বটী বুঝাইয়া দেওয়া। অন্যথায় "কাগজে কলমে," বুঝাইতে হইলে, ইহার কূল-কিনারা মিলে না। কেবল লিখিলেই হয়; লেখার আর শেষ হয় না। যাই হ'ক তোমরা সূক্ষ্ম ভাবে সার ভাবটী ধরিয়া লও। ইহাই সার কথা। কি রূপ ধরিবে? না, ধ্বংস, ধ্বংসত্ব; লয় লয়ত্ব; অস্তি, অস্তিত্ব ইত্যাদি।

অতঃপর আরও একটু সহজ রূপে দেখ। ঐ যে উপরের ছোট ছোট "আছে" গুলি,—ঐ ছোট ছোট 'আছে' র উপর একটী "বড় আছে" নিশ্চয়ই আছে। কারণ, ছোট থাকিলেই একটী বড় নিশ্চয়ই থাকিবে, ইহাই লৌকিক জগতের প্রমাণ-সিদ্ধ অভিজ্ঞান;—অর্থাৎ, প্রাত্যহিক স্মরণ-চিহ্ন;—সহজ কথায় চিহ্নবাদ, বা ব্যবহার-সিদ্ধ ধারণা'। এইরূপে একটী "বড় আছে" থাকিলেই, আবার তাহার উপর কোন কেহ অবশ্যই আছে।

ক্রম-পরম্পরায় এইরূপ অনাদি, অনন্ত কাল 'তাহার উপর আছে' 'তাহার উপর আছে করিলে আর তো তাহার বিরাম পাইবে না। কাজেই জ্ঞানের আপ্যায়ন;—বা তোমার চিত্ত-বৃত্তির শান্তির জন্য, এমন একটী 'আছে' ঠিক করিতে হইবে, যে "আছে" সকলের উপর; তাহার উপর কেহ নহে। সেই সকলের উপর "আছে" বস্তুটীই,—ছোট ছোট'আছে' গুলির উপর। তাহারই নামান্তর—(আছের আছেত্ব;) সাধু ভাষায় অস্তির "অস্তিত্ব" স্বরূপ; নামান্তর অক্ষয়, অমর, অচ্যুত। অন্যথায়,—একটী ফুল ঝরিয়া পড়িল, শুকাইয়া গেল;—তাহার অস্তিত্ব আছে। একটী পিপীলিকা মরিয়া গেল, তাহার অস্তিত্ব আছে। বকে মাছ খাইল, সাপে বেঙ খাইল, বিড়াল ইঁদুর খাইল; ইহাদের প্রত্যেকের স্ব-স্ব অস্তিত্ব আছে। 'একরূপে' সকলের স্ব-স্ব নিত্যত্ব আছে। এরূপ কথাগুলি বক্তার নিজের আয়ত্ত না থাকায়,—শাস্ত্রে অধিকার না থাকায়,—সকল মতগুলি ও সকল শাস্ত্র-গুলির সার ভাব, সার উদ্দেশ্য ঠিক 'এক' ঐক্য করিবার শক্তি না থাকায়,—কি কথা বলিলে কিরূপ ভাব দাঁড়াইবে, তাহার কোন কিছুই সংজ্ঞা না থাকায়,—বলিবার, কহিবার ও বুঝাইবার ক্ষমতা না থাকায়, বাক্য গুলি স্ব-বিরোধী হইয়া উলটপুল হইয়া পড়ে; কোন কথাই বাক্যার্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না। আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে, বক্তার উন্মাদ-লক্ষণ তো প্রকাশ পায়ই; অপিচ, হিন্দু শাস্ত্রের উপর সাধারণের "নাসিকা-কুঞ্চন" চির-অব্যাহত হয়। অবশ্য, মহর্ষি সাংখ্যকার ঐরূপ স্ব-বিরোধী বাক্য গ্রাহ্য করেন না। তোমারা এই টুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট হয়।

পূর্ব্বপক্ষ। আচ্ছা, যদ্যপি এক বস্তুর অস্তিত্বই আপনাদের পক্ষে অস্তিত্ব মধ্যে গণ্য হয়, তবে ইতিপূর্ব্বে আপনি যে ছয়টী পদার্থের অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়া বিরাট বিশ্ব-রূপ দেখাইয়াছেন, ঐ অস্তিত্বগুলির পরি-নাম কিরূপ হইবে? আপনারা কি ঐ "অস্তিত্ব"গুলি লোপ করিয়া জগতের অস্তিত্ব উড়াইতে চান? আপনাদের যেরূপ বাঁধা-বাঁধি, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে ঐরূপ আশঙ্কা অসম্ভব নহে।

উত্তরপক্ষ। মহাভারত! মহাভারত! এরূপ আশঙ্কা ভিত্তিশূন্য। "অমরা এই মহাব্রত লইয়া" কোথায় দাঁড়াইতে কোথায় দাঁড়াইব,—যিনি প্রতীক্ষ্য, যিনি নির্ব্বিশেষ, তিনিই তাহা জানেন। তবে কথা এই যে, তোমারা ঈশ্বরের নিত্যত্ব সমর্থন করিলে, জগৎ,—বাস্তবিকই জগতের রূপ ধারণ করিলে, ঐ অস্তিত্বগুলির পক্ষে যাহা হয় অবশ্যই তাহা হইবে। ভবিষ্যৎ চিন্তা বন্ধনা মুক্ত করিতে পারে না; জড়াইয়া দেয়। সাধুর পক্ষে এই জন্যই উহা ত্যাগার্হ।

পূর্ব্বপক্ষ। আচ্ছা; তবে আপনি যে বলিলেন, অস্তিত্ব,—নামান্তর অক্ষয়, অমর, অচ্যুত; এ কথা আমরা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? আমাদের মূল প্রশ্ন বোধ বস্তুটির অবস্থান কোথায়? ইহার কোন কিছুই উত্তর আমারা জানিতে পারিলাম না। এই উভয় বিষয়ের যথাযথ উত্তর আমরা জানিতে

পারিলে, বোধ বস্তুটীর অস্তিত্ব গ্রহণ,—অপিচ তদনুগত সাধন, আমাদের পক্ষে সম্ভবপর কি না, যাহা হয় অবশ্যই একটী চরম স্বীকারোক্তি "আমাদের পক্ষ হইতে" পাইবে। যাহা, আর যথা-তথা ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী নহে।

উত্তরপক্ষ। তথাস্তু।

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

—:0:—

উৎসর্গ

এসেছি চরণপ্রান্তে ওহে বিশ্বপতি করুণাসিন্ধু!
শঙ্কিত স্খলিত পদে মিশাইতে তুচ্ছ জীবন-বিন্দু।
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে শৃঙ্খলিত উন্মত্তের প্রায়।
ওষ্ঠাগত প্রাণ-বায়ু দুর্ব্বিসহ, রুদ্ধ নিরাশায়।
সাহসে করিয়া ভর, বাধাবিঘ্ন সব উল্লঙ্ঘিয়া
জ্বালা-জর্জ্জরিত দেহে পদপ্রান্তে এসেছি ছুটিয়া।
স্বজন-সোহাগ-প্রীতি, অরাতীর ভীম দণ্ডাঘাত,
স্তাবকের একনিষ্ঠ আনুগত্য, তব বজ্রাঘাত,
ভোগৈশ্বর্য্য সুখাবেশ, অবিচ্ছিন্ন দুঃখ-রোগ-শোক
ইহ-পর-কাল কিম্বা কর্ম্মার্জ্জিত উর্দ্ধ অধো লোক,
ঘনঘোর অমানিশা সূচীভেদ্য স্তব্ধ অন্ধকার,
ঊষার কনক-রশ্মি, স্মিত স্নিগ্ধ কৌমুদী-সম্ভার,
উপেক্ষা করেছি সব, শুধু চেয়ে ওই পদ পানে
জেনে সুনিশ্চয়, হবে সুপ্রভাত অমা-অবসানে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—:0:—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব সংবাদ

বন্ধ-মুক্তাদির লক্ষণ

ভগবান কহিলেন,—"আমার সত্ত্বাদি গুণরূপ উপাধিবশতঃ আত্মা বন্ধ ও মুক্ত হইয়া থাকেন; বস্তুতঃ তিনি তাহা নহেন,—গুণ মায়ামূলক বলিয়া বাস্তবিক বন্ধ-মোক্ষ নাই; আমি এইরূপ নির্ণয় করিয়াছি। শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ এবং দেহোৎপত্তি মায়া দ্বারা হইয়া থাকে; স্বপ্নের ন্যায় সংসারও বুদ্ধি-কার্য্য এবং অবাস্তব। হে উদ্ধব! নিশ্চয় জানিও, শরীরীদিগের বন্ধ-মোক্ষকরী বিদ্যা ও অবিদ্যা—আমার দুই আদ্যাশক্তি, আমার মায়ার দ্বারা বিরচিত। হে মহামতে! আমার অংশ-স্বরূপ অদ্বিতীয় এই অনাদি জীবেরই অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ এবং বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে। হে তাত! ইহার পর এক আশ্রয়ে অবস্থিত, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসম্পন্ন বন্ধ ও মুক্তির বৈলক্ষণ্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। ইহারা উভয়ে সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট সদৃশ-সখা; যদৃচ্ছাক্রমে বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাঁদিগের একটি পিপ্পল ভক্ষণ করেন, অন্যটী নিরাহারী

হইলেও বলদ্বারা শ্রেষ্ঠতর। যিনি পিপ্পল আহার করেন না; সেই বিদ্বান্ আত্মাকে ও আত্মভিন্নকে জ্ঞাত আছেন; যিনি পিপ্পল ভক্ষণ করেন, তিনি সে রূপ নহেন। যিনি অবিদ্যার সহিত সংযুক্ত, তিনি নিত্যবদ্ধ, যিনি বিদ্যাময়, তিনি নিত্যমুক্ত। স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায়, বিদ্বান, দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন; মূঢ়বুদ্ধি অপর ব্যক্তি, স্বপ্নদর্শীর ন্যায় দেহস্থ না হইয়াও দেহস্থ। যিনি নির্ব্বিকার বিদ্বান, তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় এবং গুণগণ দ্বারা গুণগণ গ্রহণ করিলেও,—তিনি 'আমি গ্রহণ করিতেছি, এরূপ মনে করিবেন না। অপণ্ডিত ব্যক্তি গুণজনিত কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম করতঃ এই দৈবাধীন শরীরে বাস করিয়া, 'আমি কর্ত্তা, ভাবিয়া তাহাতে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বিদ্বান ব্যক্তি এইরূপে বিরক্ত হইয়া শয়ন, উপবেশন, পর্য্যটন, মজ্জন, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ করাইয়া, ঐরূপে বদ্ধ হন না; প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিয়াও আকাশ, সূর্য্য ও অনিলের ন্যায় নিঃসঙ্গ হইয়া বৈরাগ্যযোগ দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃতা নিপুণ বুদ্ধিসংবর্দ্ধনী দৃষ্টি দ্বারা সংশয় ছেদন করেন এবং স্বপ্ন হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায় দেহাদি-প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্তি হইয়া থাকেন। যাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয় মন, ও বুদ্ধির আচরণ সকল সঙ্কল্পশূন্য, তিনি দেহস্থ হইয়াও তাহার গুণগণ হইতে মুক্ত। যাঁহার দেহ হিংস্রকগণ কর্ত্তৃক হিংসিত বা কোথাও কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদৃচ্ছাক্রমে কিঞ্চিৎ পূজিত হয়, তাহাতে পণ্ডিত ব্যক্তি বিকারযুক্ত হন না। সমদর্শী গুণদোষবর্জ্জিত মুনি প্রিয়কারী বা অপ্রিয়কারীকে এবং প্রিয়বাদী বা অপ্রিয়বাদীকে স্তব বা নিন্দা করিবেন না; মুনি ভাল মন্দ করিবেন না, বলিবেন না বা চিন্তা করিবেন না; আত্মারাম হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জড়ের ন্যায় পর্য্যটন করিবেন। শব্দব্রহ্মের পারগামী হইয়াও যদি পরব্রহ্মে ধ্যানাদি যোগ না করে, তাহা হইলে অধেনু গোরুর প্রতিপালকের ন্যায় পরিশ্রমই তাহার শ্রম ফল। হে উদ্ধব! যাহার দুঃখের পর দুঃখ নির্দ্দিষ্ট, সে অপ্রজনন সমর্থা গাভী, অসতী স্ত্রী, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, অপাত্রসাৎকৃত ধন ও মদ্বিরহিত বাক্য রক্ষা করে। অহে! যাহাতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসস্বরূপ মদীয় পাবন কর্ম্ম বা লীলাবতারেই অভীপ্সিত জন্ম-চরিত না থাকে; সে বাক্য নিষ্ফল; পণ্ডিত তাহা ধারণ করিবেন না। এইরূপ তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মাতে নানাত্ব-ভ্রম ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত সর্ব্বত্র আমার প্রতি আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক উপরত হইবে। যদি ব্রহ্মে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ হইয়া আমাতে সমুদায় কর্ম্ম সমর্পণ কর। হে উদ্ধব! পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার লোক-পাবনী, সুমঙ্গল কথা শ্রবণ, গান ও স্মরণ এবং বারংবার আমার জন্ম ও কর্ম্মের অভিনয় করতঃ আমার জন্য ধর্ম্মার্থকাম সকল আচরণ করিয়া, আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তিনি সৎসঙ্গবশতঃ প্রাপ্ত আমার প্রতি ভক্তি দ্বারা আমাকে ধ্যান করেন। তিনি সাধুগণ প্রদর্শিত মদীয় পদ নিশ্চয়ই সুখে লাভ করিতে পারেন। উদ্ধব কহিলেন, "হে উত্তমঃশ্লোকে! হে প্রভো! কিরূপ

সাধু আপনারা উত্তম বলিয়া সম্মত ? সাধুগণের আদৃত কিরূপ ভক্তিই বা আপনাতে যোগ করা যায় ? হে পুরুষাধ্যক্ষ ! হে লোকাধ্যক্ষ ! হে। জগৎপ্রভো ! আমি প্রণত, অনুরক্ত ও বিপন্ন, আমাকে ইহা বলুন। আপনি আকাশসদৃশ সঙ্গহীন, প্রকৃতির অতীত পুরুষ, পরম ব্রহ্ম; হে ভগবন ! স্বেচ্ছাক্রমে পরিমেয় দেহ ধারণ করিয়া আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন"। ভগবান কহিলেন,—"উদ্ধব ! যিনি সকল শরীরীর প্রতি কৃপালু, অহিংস্রক ও ক্ষমাশীল; সত্য যাঁহার বল; যিনি নির্দ্দোষ, সমদর্শী ও সর্ব্বোপকারী; যাঁহার চিত্ত কামসমূহ দ্বারা অনভিভূত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি কোমল চিত্ত, স্বধর্ম্মনিরত, মদেকাবলম্বী ও চিন্তাশীল; যিনি সাবধান, নির্ব্বিকার-চিত্ত, ধৈর্য্যশালী; ষড়গুণবিজয়ী, মানবিষয়ে অপ্রত্যাশী, মানপ্রদ, পরকে বুঝাইতে দক্ষ, অপ্রতারক, কারুণিক ও সম্যক্ জ্ঞানী;—তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ। আর যিনি গুণ-দোষ সকল জ্ঞাত হইয়া বেদরূপে আদিষ্ট স্বীয় কর্ম্মনিচয় পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আরাধনা করেন, তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ। আমি যাহা যতটুকু ও যে রূপ, ইহা পুনঃ পুনঃ জানিয়া, যাঁহারা একান্ত মনে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ। হে উদ্ধব ! আমার প্রতিমাদি চিহ্ন দর্শন; আমার ভক্ত দর্শন, স্পর্শন, অর্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি ও মনোহর গুণ-কর্ম্মের কীর্ত্তন; মৎ কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার চিন্তা, আমাতে সমুদয় লব্ধ বস্তুর সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্মনিবেদন, মদীয় জন্মকর্ম্মকীর্ত্তন; মদীয় পর্ব্বসমুদয়ের অনুমোদন; গীত, বাদিত্র এবং সম্প্রদায় দ্বারা গৃহে উৎসব সকল, বার্ষিক যাত্রা ও পুষ্পোহার প্রভৃতি প্রদান; বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, মদীয় ব্রত ধারণ; আমার প্রতিমা-স্থাপনে শ্রদ্ধা, উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর ও মন্দির কর্ম্মে স্বতঃ বা দলে মিলিত হইয়া উদ্যম, সম্মার্জ্জন, উপলেপন, সেক ও মণ্ডলাবর্ত্তন দ্বারা দাসের ন্যায় অকপট ভাবে আমার গৃহ-সেবা; অভিমান ত্যাগ; অদাম্ভিকত্ব এবং আচরিত ধর্ম্ম-কর্ম্মের কীর্ত্তন না করা,—এই সকল ভক্তির লক্ষণ। ভক্তির আরও লক্ষণ বলি, আমাকে নিবেদিত দীপালোক ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিবে না; লোকে যাহা যাহা অতিশয় অভিলষিত এবং যাহা নিজের প্রিয়, আমার উদ্দেশে নিবেদিত হইলে, অসীম ফলজনক হইবে। হে ভদ্র ! সূর্য্য, অগ্নি, বিপ্র, গাভী, বৈষ্ণব, হৃদয়, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদায় প্রাণী আমার পূজার আধার। অহে ! বেদবিদ্যা দ্বারা সূর্য্যে, ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্য দ্বারা ব্রাহ্মণে, তৃণাদি দ্বারা গো-সমূহে, মিত্রের ন্যায় সম্মাননা দ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যান দ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণদৃষ্টি দ্বারা বায়ুতে, জল প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা জলে এবং গোপনীয় মন্ত্রন্যাস দ্বারা পৃথিবীতে আমার অর্চ্চনা করিবে। নানাবিধ ভোগ দ্বারা আত্মাতে আত্মরূপী আমার পূজা করিবে। আমি সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ; সমত্ব দ্বারা আমার যোগ করিবে। সমাধি-যোগে আমার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত চতুর্ভুজ শান্তরূপ ধ্যান করিয়া এইরূপে এই সমস্ত আধারে পূজা করিবে। যিনি সমাধিস্থ হইয়া ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা এইরূপে আমার যাগ করিবেন, তিনি আমাতে উত্তম

ভক্তিমান হইবেন। সাধুসেবা দ্বারা আমার সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হে উদ্ধব! সৎসঙ্গ জন্য ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার তরণের আর অন্য উত্তম উপায় নাই, কারণ, আমি সাধুদিগের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। হে যদুনন্দন! তুমি পরম গুহ্য কাহিনী শ্রবণ করিয়াছ, ইহার পর তোমাকে আরও অত্যন্ত নিগূঢ় বিষয় বলিব, তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃদ ও সখা।"

দীন—কৃষ্ণদাস।

—:0:—

আকিঞ্চণ

(১)

তব বিশ্ব মাঝে সেজে নানা সাজে
কত খেলি দিন রাত;
তুমি সুধু আছ নীরবে চাহিয়া
কত দূরে বিশ্বনাথ!

(২)

তোমারি দেওয়া তোমারি নেওয়া
তোমারি করুণা দানে;
ক্ষণেকের সুখে ক্ষণেকের দুখে
বাঁচিয়া আছি যে প্রাণে।

(৩)

অনন্ত আশায় শোক নিরাশায়
আনন্দ হিল্লোল বায়;
কভু প্রেমরঙ্গে কভু আশা ভঙ্গে
জীবন্ চলিয়া যায়।

(৪)

কি কাজে আমারে পাঠালে সংসারে
কি কাজে দিন যে গেল;
করিব বলিয়া রাখিনু ফেলিয়া
কভু নাহি করা হ'ল।

(৫)

কত জন্মান্তর এই ভাবে মোর
গেছে চলে কতবার;
প্রতিজ্ঞা লইয়া আশিষ্ মাগিয়া
গেছি ফিরে কোটীবার।

(৬)

(পুনঃ) সংসারে পশিয়া সকলি ভুলিনু
বিস্মৃতি সাগর আসি
ঢেকে দিল মোর স্মৃতির কাহিনী
অনন্ত পিয়াসা পশি।

(৭)

ফেলিয়া রাখিনু দূরে সরাইয়া
বিশ্বের প্রথম বাণী;
(যথা) জলন্ত অনলে পুড়িছে মক্ষিকা
আপন মরণ জানি।

(৮)

লভি যদি পুনঃ মানব জীবন
সংসার মঝারে আসি;
যেন নাহি ভুলি আদেশ তোমার
হে মম অন্তরযামী।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন

—:0:—

পরিব্রাজকের পত্র

কাঁথি—হরিসভা।

১লা মাঘ, ১৩২৩ সাল।

ঠাকুর, শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন এই—আমি তোমার কৃপাশীর্ব্বাদে মঠ হইতে রওনা হইয়া প্রথমতঃ শিবরাত্রি উপলক্ষে ৺বৈদ্যনাথ ধাম যাই। তথা হইতে গয়া, বুদ্ধগয়া, বিন্ধ্যাচল হইয়া প্রয়াগ, সেখান হইতে চিত্রকুট যাই, পুনরায় প্রয়াগ আসি; তৎপর অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, নৈমিষারণ্য হইয়া হরিদ্বার যাই। সেখানে কণখলে কিছু দিন বিশ্রাম করতঃ ঋষিকেশ যাই। তথা হইতে বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করি; তথায়, কেদারনাথ, জোশিমঠ ও বদরীনারায়ণ দর্শন করতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে ফিরিয়া আসি। তৎপর ঋষিকেশে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া কণখলে আসি—এখানে জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু সহজেই ভাল হইয়াছিলাম। তৎপর দেরাদুন যাই। সেখান হইতে পাঞ্জাব অভিমুখে রওনা হইয়া চিন্তাপূর্ণী ও জ্বালামুখী পীঠস্থান দর্শন করতঃ অমৃতসর যাই। সেখান হইতে লাহোর রেওয়ালপিণ্ডী হইয়া কাশ্মীর (শ্রীনগর) যাই, তথায় খুব জ্বরে পড়িয়াছিলাম—এবৎসর যে অমরনাথ দর্শন হইবে এরূপ সম্ভাবনা ছিল না, তবে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে, তাই তোমার কৃপায় ৺ঝুলন পূর্ণিমাতে অমরনাথ দর্শন করি। তৎপর ক্ষীরভবানী প্রভৃতি অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ভ্রমণান্তে রেওয়ালপিণ্ডী ফিরিয়া আসি। তৎপর মথুরা হইয়া বৃন্দাবন যাই; তথা হইতে গোকুল, মহাবন, দাউজী, গিরি-গোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, বর্ষাণ, নন্দিগ্রাম হইয়া সপ্তমী মহাপূজার দিন জয়পুর আসি। সেই রাত্রেই জ্বর হয়, এখানেও কিছু দিন ভুগিতে হইয়াছিল, তথাপি তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই। এখান হইতে যাত্রা করিয়া আজমীর হইয়া পুষ্কর যাই। তৎপর সেখান হইতে উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বর, ভর্ত্তৃহরি-গুহা প্রভৃতি দর্শন করতঃ ওঁকারনাথ যাই তথা হইতে "অজন্তগুহা" হইয়া পঞ্চবটী, নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব, জটাজুটগঙ্গা (গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান) প্রভৃতি দর্শন করিয়া বোম্বে আসি।

বোম্বে হইতে ষ্টিমারে ৺দ্বারকাধাম পৌঁছি; তথায় দ্বারকানাথ, সারদা মঠ দর্শনান্তে বেট দ্বারকা, গোপীতালা, মুল দ্বারকা হইয়া সুদামাপুরী আসি। তথা হইতে প্রভাস পট্টন, সোমনাথ প্রভৃতি দর্শনান্তে গিরণার, পাহাড়ে যাই। তৎপর আহাম্মদাবাদ হইয়া ডাকোরে আসি, সেখানে রণছোড়নাথ প্রভৃতি দর্শনান্তে সুরাটে সোমনাথ প্রভৃতি দর্শন করি তৎপর পুনরায় বোম্বে আসি। বোম্বে হইতে ষ্টিমারে গোকর্ণ (মহাবলেশ্বর শিব) তীর্থে যাই। সেখান হইতে পদব্রজে ১৩০ মাইল দূরে অবস্থিত শৃঙ্গেরী মঠে যাই। পরে তথা হইতে ৫৫ মাইল দূরে তারিকেরী রেল ষ্টেশন হইতে রামেশ্বর যাত্রা করি। তৎপর ত্রিচিনাপল্লীতে শ্রীরঙ্গম্, মদুরাতে সুন্দরেশ্বর মহাদেব ও মীনাক্ষীদেবী দর্শনান্তে রামেশ্বর

পৌঁছি। তথায় রামেশ্বর মহাদেব দর্শনান্তে ধনুষ্কোটী তীর্থ হইয়া মান্দ্রাজ যাত্রা করি। পথে—চিদাম্বরম্ মহাদেব, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণু-কাঞ্চি, বালাজী, ত্রিপুদী, হইয়া মান্দাজ আসি। তথা হইতে ওয়ালটেয়ার, ভিজগাপট্টম, সাক্ষী গোপাল হইয়া জগন্নাথধাম পৌঁছি। সেখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব "গোবর্দ্ধন মঠ" প্রভৃতি দর্শনান্তে ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি দর্শন করতঃ এখানে আসিয়াছি।

ঠাকুর! তোমার কৃপায় চারিধাম-দর্শন সুসম্পন্ন হইয়াছে এক্ষণে আর ঘুরিবার ইচ্ছা নাই। বিভিন্ন অবস্থায় পদে পদে তোমার কৃপা অনুভব করিয়াছি—সে সমস্তই তুমি জান—তুমি অন্তর্যামী, সে সব আমি আর কি লিখিব? তোমার আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে। ভিতাবর ষ্টেশনে কাশী-যাত্রা কালে তুমি সস্নেহ করুণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়াছিলে সেই স্নেহমাখা চাহনিটী হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছে। ঠাকুর! আমি তোমার নিকট চিরকালই বালক, পাগলের মত কত কি বলিয়াছি কত অপরাধ করিয়াছি, তোমার মনে কত কষ্ট দিয়াছি—কিন্তু তুমি তাহা মনে স্থান দাও নাই, চিরদিনই ক্ষমা করিয়া আসিয়াছ! "মোর অধিকার অপরাধ করা—তোমার করিতে ক্ষমা; চিরদিন হতে যুগাযুগান্তরে এ সম্বন্ধ তোমা-আমা"। কতরূপ অপরাধই ক্ষমা করিয়াছ? কতই না স্নেহ করিয়াছ—সে সব স্মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তোমার অহেতুক ভালবাসা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি!

ঠাকুর, তোমাকে আমি কোন দিনই খুঁজি নাই, ডাকি নাই, চাই নাই—সংসারের মায়া-মোহের আবর্ত্তে ডুবিয়া যাইতেছিলাম, তুমিই অহেতুক কৃপা বিতরণ করিয়া মোহান্ধকে দেখা দিয়াছ এবং যেচে কৃপা করেছ, তাহা প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝিতে পারি। ঠাকুর, আমার এখন এই বিশ্বাস আছে যে, যখন যেখানে যে ভাবেই রাখনা কেন "আমি তোমারই", তুমি ছাড়া আমার আর কেহই নাই। তবে তুমি সুখে আছ শুনিলেই আমার সুখ—তোমরা ভক্তগণ সহ সদানন্দে বিরাজ করিতেছ, এইটুকু শুনিলেই সুখী হইব। ঠাকুর, এক্ষনে তোমার দ্বিতীয় আদেশটী পালনের চিন্তা করিতেছি—অর্থাৎ তুমি পত্র দ্বারা আমাকে আদেশ করিয়াছ যে "সত্যলাভ করিয়া পুনরায় আমার সহিত দেখা করিবে, তিন বৎসরের মধ্যে উহা করিবে এরূপ সংকল্প করিয়া বাহির হও"।

ঠাকুর, আমি তোমার নিকট বালকটী ছিলাম, আমার মনে হয় এখনও বালকই আছি এবং ভবিষ্যতেও তোমার নিকট বালকই থাকিব—আমায় বল, আমি কি করিব? কিরূপে সত্যলাভ করিব? কি উপায় অবলম্বন করিলে তোমার আদেশ পালন হইবে? শুনিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইলে যোগকরা আবশ্যক—আমাকে যদি সেই সাধন করিতে হয়, তবে কোন্ যোগ, কি ভাবে কতদিন সাধন করিতে হইবে, কোন্ সময়ে আরম্ভ করা উচিত, দুগ্ধ-ফলাদি আহার করিয়া থাকিতে হইবে কি না, মৌন অবলম্বন কিম্বা অন্য কোন প্রকার বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে কি না, কিরূপ স্থানে সাধন করিতে হইবে, মাটীর নীচে কোন গুহা করিয়া বসিতে হইবে কিনা, —এই সম-

বিষয় যথাযথ ভাবে উপদেশ না পাইলে কি রূপে সাধনে প্রবৃত্ত হইব। এই সমস্ত উপদেশ গ্রহণের জন্যই যদি সাক্ষাৎ উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হয়, তবে সেরূপ আদেশ পাইলে সাক্ষাৎ পৌছিব। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, গারোহিল তুমি সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিলে সেখানে সাধনের সুবিধা হইতে পারে, এ সম্বন্ধে কামাখ্যা পাহাড়ে কিরূপ সুবিধা তাহাও আমি অবগত নহি। এতৎ ব্যতীত এখানে রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর জগন্নাথ বাড়িতে (রাজনী—ঠাকুরের ভক্ত, চিদানন্দ দাদা বোধ হয় ঠাকুরের কাছে ইহার কথা বলিয়া থাকিবে) বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগে একটী আবশ্যক মত কুটীয়া বান্ধিয়া কার্য্য করিবার জন্য রাজনী অনুরোধ করিতেছে; তাহারা যথাসময়ে আমার আবশ্যকীয় ফল কিংবা দুগ্ধাদি প্রদান করতঃ সেবা করিতে প্রস্তুত আছে। তবে এস্থানের সম্বন্ধে ঠাকুরের আদেশ উপদেশ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। ঠাকুরের জানামত বা ইচ্ছামত অপর কোন স্থানে যাইয়া যদি সাধন করিতে হয় এবং তদ্দরুণ যদি খরচের দরকার হয়, তবে কি পরিমাণ খরচের দরকার জানিতে পারিলে তাহা যোগাড় করিয়া সেইরূপ স্থানে যাইতে প্রস্তুত আছি।

এক বৎসর আশ্রমের কোন সংবাদ পাই নাই। সারদা, চিদানন্দ দাদা প্রভৃতি কে কেমন ও কোথায় আছে জানিতে বাসনা। আশ্রমবাসী গুরুভাইদিগকে প্রেমালিঙ্গন জানাইতেছি ভুবনেশ্বরে একটী লোক বলিল, দুই মাস পূর্ব্বে চিদানন্দ দাদা নাকি সেখানে গিয়াছিলেন।

ঠাকুর! আর কত দিন দূরে ভুলাইয়া রাখিবে? আমাকে তোমার করিয়া লও। শ্রীচরণে যেমন আশ্রয় দিয়া ধন্য করিয়াছ, তেমনি প্রকাশ হইয়া ধন্য কর—জ্ঞান নয়নে তোমাকে দেখিয়া জীবন সার্থক করি। একবার কৃপা কর প্রভু! তোমার মহত্বের নিকট আমার আমিত্বের বলিদান হউক! আমি তোমার হইয়া তোমার মনমত কার্য্য সাধন করিয়া তোমারি প্রেমগাথা গাইতে গাইতে মহানির্ব্বাণ লাভ করি! শ্রীচরণে ইহাই শেষ নিবেদন।

মোহ-সিন্ধু মাঝে বাসনা-তরঙ্গে,
যেতেছিনু আমি ডুবিয়া,
কেবা সেই জন, করুণানিধান,
(আমায়) তুলিল তীরে টানিয়া॥

ভব-কারাগারে বাঁধা পড়ে হায়,
কেঁদেছি, হেসেছি উন্মাদের প্রায়,
সহসা কেবা আসিয়ে সেথায়,
বন্ধন কাটিল হাসিয়া॥

বাসনা-বিদগ্ধ মরু-সম প্রাণে,
কেবা দিল শান্তি সুধা বিতরণে,
করিল শীতল পদছায়া দানে,
কোলেতে লইল তুলিয়া॥

প্রবৃত্তি-তাড়নে চড়ি মনোরথে,
আসা যাওয়া কত করেছি কুপথে,
কেবা হেন অন্ধে নিল সৎপথে,
জ্ঞানের আলোক দানিয়া॥

সে যে আমার গুরু হৃদয়-দেবতা,
প্রেম-কল্পতরু দীন জন ত্রাতা,
"যোগেন" গাহিবে তাঁরি জয়গাথা,
প্রেমানন্দে সদা ভাসিয়া॥

তোমারই সেই হতভাগা—
যোগানন্দ

:০:

দারুব্রহ্ম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কালাপাহাড়ের ভয়ে জগন্নাথ প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলি পারিকুদ-দুর্গভূমিতে প্রোথিত করা হয়। দুরাত্মা কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়া মূর্ত্তিত্রয় ভূমি হইতে উঠাইয়া এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। উড়িষ্যা-বাসী বিশার মহান্তি একজন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি এই দগ্ধ মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া কুজঙ্গ রাজার নিকট প্রদান করেন। তিনি নাভিস্থ ব্রহ্মমনি নূতন মূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়া মূর্ত্তি-প্রতিষ্টা করিলেন।

মুকুন্দদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কতক দিন রাজত্ব করেন। এই বংশ শেষ হইলে ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে প্রজারা জনার্দ্দন বিদ্যাধরের পুত্র রামচন্দ্রদেবকে উড়িষ্যার রাজা করিলেন। রাজা রামচন্দ্রদেব কুজঙ্গ হইতে অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথদেবের নাভিমূল আনিয়া পুনর্ব্বার প্রতিমূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক তন্মধ্যে উক্ত মূর্ত্তির নাভি নিহিত করিয়া পুরুষোত্তমের মন্দিরে স্থাপন করিলেন।

এই মন্দির ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী সেবা পরিত্যক্ত হইয়া বৈষ্ণব মতে সেবা আরম্ভ হয় এবং এখন পর্য্যন্ত সেইরূপে সেবা চলিতেছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদের পরাজয় হইলে রামচন্দ্রদেবের বংশধরগণ মন্দিরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্বরূপ নিযুক্ত হ'ন। পুরীর বর্ত্তমান রাজা মুকুন্দদেবই মন্দিরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট ২৩৩৩৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এক্ষণে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। বর্ত্তমান ম্যানেজারের নাম রায়সাহেব গৌরশ্যাম মহান্তি। এই মহাত্মার সুবন্দোবস্তে মন্দিরের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির কেশরী-বংশের ষষ্ঠ নৃপতি অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই মন্দির সমুদ্র হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরে চারিটী দ্বার—পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার, উত্তরদিকে হস্তিদ্বার, পশ্চিমদিকে ব্যাঘ্রদ্বার এবং দক্ষিণ দিকে অশ্বদ্বার। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরকে মেঘনাদ প্রাচীর বলে। এই প্রাচীর ২৪ ফিট উচ্চ উত্তর দক্ষিণে ৬৭৬ ফিট ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬৮৭ ফিট। সিংহদ্বারে দ্বাবিংশতি হস্ত উচ্চ একটী অরুণস্তম্ভ আছে, ইহা একটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তত হইয়াছে। এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া ডানধারে পতিত-পাবন মূর্ত্তি আছে। এই দ্বারটী পার হইলে বামদিকে একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ৺কাশীর বিশ্বেশ্বর মহাদেব আছেন। ক্রমে উপর দিকে উঠিয়া আর একটী দ্বার পাওয়া যায়, এই দ্বারে মিষ্টপ্রসাদ বিক্রয় হয়। এই দ্বারের নিকটে উত্তর ও পূর্ব্ব কোণে অনন্দ বাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। চারি

দ্বারের মধ্যে যে কোন দ্বার দিয়া সিঁড়ি হাঁটিয়া উপরে উঠিলে দ্বিতীয় দ্বার পাওয়া যায়; সেই দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্দিরের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে।

শ্রীমন্দির চারিভাগে বিভক্ত—মুল মন্দির জগমোহন মন্দির, নাটমন্দির ও ভোগমন্দির। এই মন্দিরের চূড়া ১২৮ হস্ত এবং বিষ্ণুচক্র ও ধ্বজাদ্বারা সুশোভিত। মুল মন্দিরের ভিতর লক্ষ শালগ্রাম শিলাযুক্ত এক রত্নবেদী আছে তাহার উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব শ্রীশ্রীবলরাম দেব, শ্রীশ্রীমতী সুভদ্রা দেবী এবং শ্রীশ্রী-সুদর্শনচক্র স্থাপিত। নাটমন্দিরের মধ্যে এবং ভোগ মন্দিরের সম্মুখে একটী স্তম্ভ আছে, তাহার উপর গরুড়মূর্ত্তি আছে। এই স্তম্ভকে গরুড়স্তম্ভ বলে। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব এইস্তম্ভের উপর হাত রাখিয়া এবং নিকটে দাঁড়াইয়া শ্রীমুখ দর্শন করিতেন। স্তম্ভের সম্মুখে একটী গর্ত্ত আছে, তাহা তাহার প্রেমাশ্রু পতনে হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। এই স্থানে প্রদীপ দান এবং পূজাদি হইয়া থাকে। ভোগমন্দিরে জগন্নাথ দেবের অন্নভোগ হইয়া থাকে। জগন্নাথের সেবার জন্য নর্ত্তকী আছে। ইহারা ভোগের সময় ও অন্যান্য সময় নৃত্য করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব গরুড়-স্তম্ভের নিকট হইতে কেন জগন্নাথ দর্শন করিতেন? ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ—প্রথম জগন্নাথ দর্শনের দিন গৌরের ভাব-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি আত্মসংযম করিতে না পারিয়া জগন্নাথকে কোলে করিবার জন্য জগমোহন মন্দির হইতে উল্লম্ফন প্রদান করিলেন। পরিছারিগণ ছড়ি হাতে তাঁহাকে মারিবার জন্য চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেলেন। নিকটে উৎকল রাজের সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শন করিতে ছিলেন, তিনি অপরূপ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন। তাহার পর গৌরের চৈতন্য সম্পাদনে কৃতকার্য্য না হইতে পারিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাকে স্বভবনে আনয়ন করিয়া এক নিভৃত কক্ষে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। তিন প্রহরকাল গৌর-সিংহ হরিসংকীর্ত্তন-শ্রবণ করিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তাহার পর সার্ব্বভৌম বলিলেন "আপনি একলা দর্শনে যাইবেন না"। শ্রীচৈতন্য বলিলেন "আজ হইতে জগন্নাথ দর্শনে আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইব না বাহিরে গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিব।" দ্বিতীয় কারণ—কিছু দূর হইতে জগন্নাথকে ভাল দেখায় এবং হৃদয়ে এক মহান ভাবের উদয় হয়। ভগবানকে দূর হইতে দেখিতে হয়, বোধ হয় জীবকে এই শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে শ্রীমুখ দর্শন করিতেন। এখনও অনেক লোক প্রথমে এই স্তম্ভের নিকট হইতে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্দিরের গঠন-প্রণালী দেখিয়া অনেক মহাত্মাই বলিয়া থাকেন যে ইহা জীবদেহের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে লিখিবার পূর্ব্বে জীবদেহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেহ তিনটী—কারণ, সূক্ষ্ম এবং

স্থূল দেহ। নিত্যজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-বিশিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সুষ্মাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। সেই প্রকৃতি দুই প্রকার—মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্বগুণের নৈর্ম্মল্যহেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া এবং মালিন্য-প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা; অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণকে মায়া এবং রজস্তমঃ গুণযুক্ত সত্ত্বগুণকে অবিদ্যা বলে। উক্ত মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তিনি সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন এবং অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীব শব্দে কথিত হন। এই অবিদ্যার নাম কারণ-শরীর। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্মশরীর এবং যে শরীর পিতৃ-মাতৃ-ভুক্ত অন্নের পরিণাম-বিশেষ-রূপ শুক্রশোনিত হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরস দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয় তাহাকে স্থূল শরীর বলে। এই ত্রিবিধ শরীর আবার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চ কোষে বিভক্ত হইয়াছে।

আমাদের দেহের মধ্যে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী আছে, তাহার মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী যোগীরা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না এই তিন নাড়ী প্রধান। মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া মেরুদণ্ড বেষ্টন করিয়া এই তিন নাড়ী মস্তকাভিমুখে গিয়াছে, এই তিন নাড়ী ছয়স্থানে একত্রে মিলিত হইয়া ছয়টী চক্র উৎপন্ন করিয়াছে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্র। সাধনার দ্বারা এই ছয়টী চক্র ভেদ করিতে পারিলে শীর্ষোপরি সহস্রদলে পৌঁছিয়া পরমাত্ম-দর্শন হইয়া থাকে।

জীবদেহ সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করা হইল, এক্ষণে ইহার সহিত শ্রীমন্দিরের সাদৃশ্য আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক। শ্রীমন্দিরের বাহিরের চতুর্দ্দিকটী (অর্থাৎ সিংহ প্রভৃতি দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত স্থানকে) স্থূলদেহ কিম্বা অন্নময়কোষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কারণ এই স্থানে শস্য-সংগ্রহ, প্রসাদ-প্রস্তুত, প্রসাদ-বিক্রয় প্রভৃতি যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা স্থূলদেহ কিম্বা অন্নময়কোষের বলাধান হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের সহিত সূক্ষ্মদেহ কিংবা প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের এবং মন্দিরের সহিত কারণ-দেহ কিংবা কেবল আনন্দময় কোষের তুলনা হইতে পারে। কারণ-দেহ যেমন সূক্ষ্ম-দেহের অন্তর্গত, মূল মন্দিরও সেইরূপ শ্রীমন্দিরের অন্তর্গত।

শ্রীমন্দির চারিভাগে বিভক্ত যথা—ভোগ মন্দির, নাট মন্দির, জগমোহন মন্দির এবং মূল মন্দির (মনিকোঠা) ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভোগমন্দিরকে প্রাণময় কোষ, নাট মন্দিরকে মনোময় কোষ, জগমোহন মন্দিরকে বিজ্ঞানময় কোষ এবং মূল মন্দিরকে আনন্দ-ময় কোষ বলা যাইতে পারে। এক্ষণে ভোগ মন্দিরকে প্রাণময় কোষ বলা যাইতে পারে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

বায়ু দ্বারাই শরীরস্থ যন্ত্রসকল চালিত হইতেছে, বায়ু দ্বারাই অন্নপাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে, এবং বায়ু দ্বারাই ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ চালিত

হইয়া শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রকে সতেজ করিতেছে। ভোগ পক্কশালায় পাক হইয়া ভোগমন্দিরে নীত হয়। তাহার পর উক্ত ভোগ নিবেদিত হইলে কতক রাজবাড়ীতে যায়, কতক আনন্দ বাজারে যায় এবং কতক খরিদ্দারে লয়; এইরূপে সমস্ত ভোগ বিলী হইয়া যায়। শরীরস্থ বায়ু যেরূপ অন্নপাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাহার সারাংশ নানা যন্ত্রে চালিত করিতেছে, ভোগ মন্দিরেও সেই রূপ ভোগ নিবেদিত হইয়া নানা স্থানে পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং প্রাণময় কোষের সহিত ভোগ-মন্দিরের তুলনা করা যাইতে পারে। মনোময় কোষেতে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মনের ক্রিয়া হইয়া থাকে। এদিকে নাটমন্দিরে নৃত্য-গীত, ধ্যান—ধারণা প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে। নৃত্যগীত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য এবং ধ্যান ধারণা মনের কার্য্য। সুতরাং নাট মন্দিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মনের ক্রিয়া হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই নাট মন্দিরের সহিত মনোময় কোষের তুলনা করা যাইতে পারে। বিজ্ঞানময় কোষেতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধির ক্রিয়া হইয়া থাকে। একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই জীব ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন। এদিকে জগমোহনে পৌঁছিতে পারিলে জগন্নাথ দর্শনের আর কোন গোল থাকেনা; গোল ততক্ষণ যতক্ষণ জগমোহনের দরজা খোলা না থাকে। সুতরাং বিজ্ঞানময় কোষের সহিত জগমোহনের তুলনা হইতে পারে। জীবদেহস্থ আনন্দময় কোষে পরমাত্মরূপী ভগবান বাস করিতেছেন। এদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মূল মন্দিরের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। এই স্থানে আসিতে পারিলে জীবের আনন্দের সীমা থাকে না, প্রাণ ভরিয়া চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া জীব আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকে। সুতরাং মূল মন্দিরের সঙ্গে আনন্দময় কোষের তুলনা করা যাইতে পারে।

ত্রিবিধ দেহ এবং পঞ্চ কোষের সহিত শ্রীমন্দিরের তুলনা করা হইল। এক্ষণে শরীরস্থ ছয়টী চক্রের সহিত শ্রীমন্দিরের প্রধান ছয়টী দ্বারের তুলনা করা যাইতে পারে। প্রধান ছয়টী দ্বার—(১) সিংহদ্বার (২) যে দ্বারে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিক্রয় হয় (৩) ভোগমন্দিরের পূর্ব্ব দ্বার (৪) ভোগমন্দিরের পশ্চিম দ্বার (৫) নাটমন্দিরের পশ্চিম দ্বার (৬) জগমোহন মন্দিরের পশ্চিম দ্বার। ষড়চক্র ভেদ করিয়া যেমন সহস্রদলে ভগবানকে দর্শন করিতে হয়। সেইরূপ এই ছয় দ্বার অতিক্রম করিয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে হয়। উক্ত ছয়টী দ্বার সমসূত্রপাতে রহিয়াছে, দ্বারগুলি খুলিয়া দিলে মণিকোঠার ভিতর প্রবেশ না করিয়াও অনায়াসে জগন্নাথ দর্শন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শ্রীমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যে দ্বার সকল আছে তাহাদিগের সহিত চক্ষু কর্ণের তুলনা হইতে পারে। ভগবানের রূপদর্শন এবং তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রগাঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা যেমন অতি অল্প কালের মধ্যে তাঁহার দর্শন লাভ হয়, সেইরূপ কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি ষড়চক্র ভেদ না করিয়াও উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অতি সত্বর ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা

বাহুল্য। শ্রীমন্দির যে জীবদেহের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীমন্দিরের বহির্গাত্রে যে অশ্লীল ছবি আছে, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই অশ্লীল মূর্ত্তি থাকিলে বজ্রপাত হয় না, কেহ বলেন—বৌদ্ধদিগের এই মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্যই এই অশ্লীল মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে, কেহ বলেন—চিত্তের স্থিরতা পরীক্ষা করিবার জন্য এই সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, অপর কেহ বলেন—বাহিরে জগতের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং ভিতরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। কি উদ্দেশ্যে উক্ত মূর্ত্তিগুলি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন, তবে মহাত্মারা যাঁহা যাহা বলিয়াছেন তাহার কোনটাই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীমন্দিরকে আমরা জীবের স্থূল-দেহের সহিত তুলনা করিয়াছি। সূক্ষ্ম-দেহ যে প্রকার হইলেও তন্মধ্যস্থ চৈতন্য অর্থাৎ আত্মা বিভিন্ন নহেন। সকল দেহের মধ্যেই সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীনাথদেব বহির্গাত্রস্থ অশ্লীল মূর্ত্তি ও দেবদেবী মূর্ত্তি গুলি দেখিয়া বোধ হয় যেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব বলিতেছেন "জীব! তুমি পাপী হও আর দেবতাই হও কোন ভয় নাই, আমি দেবতা ও মহাপাপীকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছি। উভয়কেই সমভাবে স্নেহ করি, বরং পাপী প্রতিই আমার অনুগ্রহ অধিক, কারণ পাপী আমাকে না জানিতে পারিয়া সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। আমি সেই সমুদ্র সাগর কূলে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। তোমাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিব বলিয়াই আবির্ভূত হইয়াছি। আর তোমাদের ভয় নাই, তোমরা শুচি অবস্থায় থাক, আর অশুচি অবস্থায় থাক, আমার প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া একবার মন্দির মধ্যে প্রবেশ কর, তাহা হইলে বহু জন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি নষ্ট হইয়া আমার দর্শন পাইবে। আমার সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন করিলে এবং মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে স্বীয় এবং পরদেহের মধ্যে আমাকেই দর্শন করিতে পারিবে এবং জীবনান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, আর তোমাদিগকে এই দুঃখ-তাপ-পূর্ণ সংসারে আসিতে হইবে না"।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দ্বাদশ মাসে যে যে উৎসব হইয়া থাকে তাহা নিম্নে লিখিত হইল। জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠার তারিখে তাঁহার স্মৃতির জন্য স্নান যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্নান-যাত্রা প্রথম ধরিয়া উৎসব গুলির নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

উৎসবাদির নাম—(১) স্নান-যাত্রা। (২) নবযৌবন। (৩) নেত্রোৎসব বা ... । (৪) রথযাত্রা। (৫) হোরা-পঞ্চমী। (৬) পুনঃ-যাত্রা। (৭) শয়ন যাত্রা। (৮) দক্ষিণায়ন। (৯) ঝুলন-যাত্রা। (১০) পার্শ্বপরিবর্ত্তন-যাত্রা। (১১) জন্মাষ্টমী। (১২) বনভোজ বেশ। (১৩) কালী-দমন। (১৪) প্রলম্বাসুর-বধ। (১৫) বামণ-জন্ম। (১৬) রাজবেশ। (১৭) রাধাদামোদর বেশ। (১৮) ঠিয়নাকিয়া, আড়-কিয়া, বালিকিয়া, ডালিকিয়া, বাকোজুড়া এবং নাগার্জ্জুন বেশ। (১৯) উত্থান একাদশী। (২০) প্রাবরণ। (২১) পারণ। (২২) পুষ্যাভিষেক। (২৩) মাঘচন্দ্রবেশ। (২৪)

পদ্মবেশ। (২৫) গজোদ্ধারণবেশ। (২৬) মকর সংক্রান্তি। (২৭) চাচরি বেশ। (২৮) দোলযাত্রা। (২৯) রামনবমী। (৩০) দমনকভঞ্জিকা। (৩১) চন্দন-যাত্রা। (৩২) রুক্মিণী-হরণ।

রথ-যাত্রা এবং স্নান-যাত্রা ভিন্ন অন্য কোন যাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা গমন করেন না। মদনমোহন ইহাদের প্রতিনিধি রূপে যাইয়া থাকেন। এই সকল উৎসবের দিনে জগন্নাথকে দর্শন করিলে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়।

শ্রীক্ষেত্র এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব। শ্রীক্ষেত্রের তুল্য পবিত্র তীর্থ ভারতের কুত্রাপি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কারণ জীব এই স্থানে সহজে ব্রহ্মজ্ঞান এবং প্রগাঢ় ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মোপাসনার এমন সুন্দর স্থান আর কোথায় আছে? একবার সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকুন, তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, সমুদ্র ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ সহায়ক। আহা! সমুদ্র যেন প্রেমোন্মত্ত হইয়া অহর্নিশ সেই প্রেমময়, সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। আবার আমাদের মত মহাপাপীকে শেষের দিনটী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যেন বলিতেছেন, আমি লোকক্ষয়-কর্ত্তা উৎকট কাল। পুনরায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া অভয় দিতেছেন, "জীব! ভয় কি। আমিই পিতা এবং আমিই মাতা। দেখ কত জীব-জন্তু আমার ক্রোড়ে নৃত্য করিতেছে, আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাহাদিগকে স্তন্য দানে লালন পালন করিতেছি। তোমরা সংসারের জ্বালা যন্ত্রনায় যখন অস্থির হইয়া পড়িবে, তখন আমার ক্রোড়ে আসিও আমি তোমাদের তাপিত অঙ্গ শীতল করিব।" সমুদ্রের এই উভয় ভাব দেখিলে সেই বিশ্ব-পিতা এবং বিশ্ব-জননীর কথা কি মনে পড়ে না? সমুদ্রের প্রশান্ত ভাব দেখিলে মনে কত আনন্দ হয় এবং বাত্যাবিলোড়িত তরঙ্গ-বুক্ষ সমুদ্র দেখিলে প্রলয় কাল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই উভয় ভাব সর্ব্বদা সেই অনন্ত পুরুষকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ভূমণ্ডল সমুদ্র হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে, সমুদ্রই জীবজন্তু এবং বৃক্ষাদিকে বারি এবং রস প্রদান করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষণ করিতেছেন এবং প্রলয় কালে এই সমুদ্রই সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিবেন। এইজন্যই ভগবান বলিয়াছেন "সরসামস্মি সাগরঃ" অর্থাৎ জলাশয় সমুদ্রের মধ্যে আমি সাগর। তাহা হইলে সমুদ্র যে ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা যে ব্রহ্মের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ তাহা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। সূর্য্য-রশ্মি সকল স্থানে থাকিলেও তাহার দাহিকা শক্তি সর্ব্বত্র নাই, কিন্তু সূর্য্যকান্তমণি দ্বারা সেই সকল রশ্মি একত্রিভূত করিতে পারিলে তাহার দাহিকা শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ ভগবান সকল স্থানে বিরাজ করিলেও ভক্তের হৃদয়-রূপ সূর্য্যকান্তমণি দ্বারা তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহার ভক্তিতে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান

কাষ্ঠ নির্ম্মিত ত্রিমূর্ত্তির অণুপরমাণুতে সম্পূর্ণ রূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীজগনাথ দেবের চক্ষু দুইটী দর্শন করিলে, কি এক মহান ভাবের উদয় হয়, তাহা যাহারা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। কিছুক্ষণ চক্ষুর্দ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে "শশি-সূর্য্যানেত্রম্" এবং "একাংশেন স্থিতো জগৎ" এই ভগবদ্বাক্য দুইটী মনে উদয় হইয়া থাকে। জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিয়া ভগবান বিরাটমূর্ত্তি বলিয়া অনেকেরই ধারণা।

মহাপ্রসাদও ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহায়ক; কারণ ইহাদ্বারা সর্ব্বজীবে সমভাব আনয়ন করিতেছে। মহাপ্রসাদে জাতিভেদ নাই। সকলেই ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরের মুখে প্রসাদ দিয়া থাকেন। তাহাহইলে সমুদ্র, জগন্নাথ এবং মহাপ্রসাদ এই তিনই ব্রহ্ম-জ্ঞানের সহায়ক। এই সকল কারণে শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে, দারুব্রহ্মের দর্শনে মুক্তি, তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণে মুক্তি, তাঁহার ক্ষেত্রে বাস করিলে মুক্তি। এখানে যাহা ইচ্ছা আহার কর, মহা-হবিষ্যের ফল হইবে, এখানে নিদ্রাতে যোগের ফল, আলাপে বেদাধ্যায়নের ফল, শয়নে জগন্নাথকে প্রণাম করিলে যে ফল হয় সেই ফল এবং যে কোন ভাবে মৃত্যু হউক মুক্তি অবধারিত। এরূপ সহজে মুক্তিলাভ আর কোন তীর্থ দিতে পারেন না। সাঙ্খ্যযোগ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণোক্ত সাধনদ্বারা যাহা লাভ হয়, তৎসমস্তই দারুব্রহ্ম দর্শন দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। সূর্য্যের স্বভাব যেমন তাপ দেওয়া, চন্দ্রের স্বভাব যেরূপ শীতলতা প্রদান করা, সেইরূপ এই দারুব্রহ্মের স্বরূপ মোক্ষ প্রদান করা সুতরাং জীবের আর ভাবনা নাই। সকলে প্রাণ ভরিয়া একবার "জয় জগন্নাথ" বলুন।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ দাসবসু।

—:0:—

যোগানন্দ-লহরী

সিন্ধু— (২৭) মধ্যমান।

ভিক্ষা দে মা অন্নপূর্ণে, ভিখারী দাঁড়ায়ে দ্বারে।
সিংহাসনে বসেছ মা, দীনে কি গো মনে পড়ে?
সুধাভাণ্ড লয়ে হাতে,
পালিছ মা ত্রিজগতে,
ব্রহ্মাণ্ড-উদরী মাগো, বিতর করুণা মোরে॥
ভিক্ষা ঝুলি কাঁধে লয়ে,
আছি মুখপানে চেয়ে,

ভব-ক্ষুধা দূর কর মা, দীনের প্রতি সদয় হয়ে;—
দেশ দেশান্তর ঘুরে,
এসেছি মা তোরই দ্বারে,
জ্ঞান-বৈরাগ্যের ভিখারী যাচি গো মা যুক্ত করে ॥
কাশীপুর অধীশ্বরী,
অন্নপূর্ণা শঙ্করী,
প্রফুল্ল নয়নে মাগো, চাহ না বারেক ফিরি;—
তুমি রাজ-রাজেশ্বরী,
আমি গো মা দীন ভিখারী,
যোগানন্দ শ্মশানবাসী, তোর অভয় চরণ পাবার তরে ॥

———:0:———

বর্ষশেষে নিবেদন

স্বার্থময় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিষময় ফলে আজ পৃথিবী-ব্যাপী সমরানল প্রজ্জ্বলিত। রাজা প্রজা সকলেরই সমান দুর্দ্দিন। প্রতিদিন কত কোটী কোটী টাকা ও লক্ষ লক্ষ প্রাণী এই ধ্বংসকরী মহাযজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, এই বিরাট কুরুক্ষেত্রে কত মহারথী যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত পুত্রশোকাতুরার হৃদয়ভেদী হাহাকারে—কত পতিবিয়োগবিধুরার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত তাহার সংখ্যা নাই। কখন কার কি আপদ ঘটে এই আশঙ্কায় বাকী অন্যান্য সকলে সদা উৎকণ্ঠিত ভাবে কালযাপন করিতেছে। যে সকল দেশ এই মহাসমরে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জড়িত, সেই সকল দেশবাসীর ত কথাই নাই, যাঁহারা দূরে আছেন, তাঁহাদিগকেও এই ভীষণ যুদ্ধের ফলভোগী হইতে হইয়াছে,. তাই আজ বিস্তৃত মার্কিণ রাজ্যের—তথা সুইজরলণ্ড,—সুইডেন প্রভৃতি নিরপেক্ষ দেশের গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধমান শক্তিসমূহকে আপন আপন অসুবিধা জানাইয়া অচিরে সন্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সমগ্র পৃথিবীর সারা দেশবাসিগণকেই এই মহাযুদ্ধের জন্য অল্প-বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, আর বৃটীশরাজ-আশ্রিত ভারতবাসীর খাইয়া পরিয়াও শান্তি নাই। নিত্য আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এই দুর্দ্দিনে চিরকাঙ্গাল বাঙ্গালীর খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই সুকঠিন;—সংবাদপত্র-পত্রিকাদি পরিচালন যে কি দুরুহ ব্যাপার তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারিতেছেন। কাগজ পাওয়াই যাইতেছে না,—আর যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা চতুর্গুণ মূল্যে ক্রয়

করিতে হইতেছে, কাগজের মূল্যাতিরিক্ত-হেতু কত সাময়িক ও মাসিক পত্রাদি হইলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের সত্বাধিকারিগণ কেহ বা মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, কেহ বা অঙ্গহীন করিয়া, কেহ বা খর্ব্বাকার কিংবা বিকৃত আকারে নিজ নিজ পত্র-পত্রিকার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। মূল্য-বৃদ্ধি না করিয়া তিন বৎসর যাবৎ আমরা আর্য্য-দর্পণের কলেবর যে এক ফর্ম্মা বাড়াইয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় এই দুর্দ্দিনে কয়েক মাস যাবৎ সেই বর্দ্ধিত অংশ আর আমাদের পাঠকবর্গকে দিতে পারিতেছি না।

এই সময়ে আর্য্য-দর্পণের মত কৌপীন-মাত্রৈক-সম্বল সন্ন্যাসী পরিচালিত পত্রিকার আত্মরক্ষা করা একান্ত অসম্ভব; কেবল একমাত্র শ্রীভগবানের অশেষ করুণা এবং ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় গ্রাহকগণের সাহায্য ও সহানুভূতিতে এখনও জীবিত রহিয়াছে। আর্য্য-দর্পণ সর্ব্ব সাধারণের কাগজ, কারণ ইহা সকল সম্প্রদায়েরই পাঠোপযোগী। হিন্দুমাত্রেই আর্য্য-দর্পণকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া স্বধর্ম্মে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। তাই আমরা আর্থিক লাভের বিশেষ সম্ভাবনা না থাকিলেও নয়-বৎসর যাবৎ ইহার প্রচার করিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিভ্রাটে কাগজ ও মুদ্রণ সরঞ্জামাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায়—পাঁচ টাকা রিমের কাগজ ষোলটাকা মূল্য ধার্য্য হওয়ায় আমরা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। অথচ আর্য্য-দর্পণের আকার কমাইয়া দিলে গ্রাহকগণও সন্তুষ্ট থাকিবেন না—মূল্যবৃদ্ধি করিলেও অনেকের কষ্ট হইবার সম্ভবনা। এদিকে শিক্ষিত ও সজ্জন গ্রাহকবর্গ আর্য্য-দর্পণ যাহাতে বন্ধ না হয়, তজ্জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতেছেন। তাই আমরা নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া আরও এক বৎসর-কাল মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া পত্রিকা-পরিচালনে কৃতসংকল্প হইয়াছি, শ্রীভগবানের কৃপা ও সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ গ্রাহকগণের সহানুভূতি আমাদিগের সহায় হইয়া আরব্ধ কার্য্যে উৎসাহিত করুন।

অতএব গ্রাহকগণ ১০ম বর্ষের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুইটাকা চৈত্রমাসের মধ্যে প্রেরণ করিবেন। চৈত্র মাসের মধ্যে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য না পাইব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাঁহাদিগের নিকট নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে প্রেরণ করিব। যাঁহাদিগের ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিতে কোন প্রকার আপত্য আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া চৈত্রমাসের মধ্যে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া জনাইবেন, নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া দরিদ্র পত্রিকাকে অকারণ ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। আশাকরি, কোন ভদ্রসন্তানই এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ধর্ম্মপ্রাণ শিক্ষিত ও সজ্জন গ্রাহকগণের সততায় অমাদের অগাধ বিশ্বাস বশতঃ এতদিন আমরা এরূপ অনুরোধ করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই; কিন্তু দুই একটা ঘটনায় আমাদের সে বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই আজ এই বিনীত অনুরোধ জানাইতে হইল। একটা ঘটনা গ্রাহকগণের গোচর না করিয়া পারিলাম না।

প্রাতঃস্মরণীয় মাতৃস্বরূপিণী স্বর্গগতা রাণী শরৎসুন্দরীর রাজধানী পুঁঠিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত। গত কার্ত্তিকমাসে পূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীপরমহংস দেবের সঙ্গে আমরা পুঁঠিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার পূত সঙ্গলাভের জন্য প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ভদ্র সমবেত হইতেন। আমারা দুর্ব্বৎসর জনাইয়া পত্রিকাখানির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাঁহাদের গ্রাহক হইতে অনুরোধ করায়, পনর জন শিক্ষিত ভদ্র সন্তান স্বেচ্ছায় গ্রাহক হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তদপর প্রায় মাসাধিক কাল পরে আমরা আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পত্রিকা ভিঃ পিঃ করিলাম। কিন্তু কয়টা ভিঃ পিঃ ফেরত আসিল। আমরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কারণ যাঁহারা নিজমুখে স্বীকার করিয়া ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও সত্যনিষ্ট বলিয়া আমাদের পরিচিত। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সান্ন্যাল,—বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ লোকটী সর্ব্বদাই আমাদের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন, উপাধিধারী রাজপণ্ডিতটী ও সারস্বতী উপাধিধারী ডাক্তারটীও সবিশেষ ভদ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন; রাণী হেমন্তকুমারীর পুরোহিত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বিদ্যারত্ন, জ্যোতির্ভূষণকে সবিশেষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়াই জানিয়াছিলাম এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত কবিশেখরের ব্যবহারে, তাঁহাকে আমাদের একজন হিতৈষী বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, এই কয়জন উপাধিধারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণই ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া দরিদ্র-সেবায় উৎসর্গীকৃত পত্রিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। আর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ স্ব স্ব প্রতিশ্রুত মত পত্রিকা গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু-সমাজের মুকুটমনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের এইরূপ সত্যনিষ্ঠা, ভদ্রতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা কি বর্ণাশ্রমাভিমানীর স্বধর্ম্মের অজীর্ণোদ্গার। আমরা সুহৃদ্যোগী "বঙ্গবাসী" ও "ব্রাহ্মণ পত্রিকাকে" জিজ্ঞাসা করি,—ইহা অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি বাবুদের 'বো' কি বিকট? আবার উহাঁদের মধ্যে ডবল উপাধিধারী পণ্ডিতটী পত্রিকা ছাড়া একসেট "সারস্বত-গ্রন্থাবলী" পাঠাইতে বলেন, শেষে পার্শ্বেল ফেরত দিয়া মাশুলাদিতে বার আনা ক্ষতি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আমরা হিন্দুসমাজের নেতা, উপদেষ্টা ও পরিচালক বলিয়া গৌরব অনুভব করি, আর আজি সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরিত্র আলোচনা করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। যাঁহারা ইংরাজীশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির অনবরত নিন্দা প্রচার করেন, তাঁহারা কি এইরূপ ব্যবহারকে শাস্ত্রানুমোদিত মনে করেন?* নিজে নিজে নিজেদের যতই বাড়াওনা কেন, এযুগে কাহারও চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। তাই ব্রাহ্মণ সমাজের কর্ত্তাদের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, সর্ব্বাগ্রে নিজেদের গৃহের জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া ফেলুন, পরে পরের ঘরে হাত দিবেন। নিজের ঘরে শস্য সঞ্চয় না করিয়া দুর্ভিক্ষদমনের বৃথা চেষ্টা করিলে বিজ্ঞের নিকট অবজ্ঞাত—সাধারণের হাস্যাস্পদ হইবেন মাত্র। কেবল উপাধী, টিকি, ফোঁটা আর নামাবলীতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হইবে না; সত্য-নিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতাই এই সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি—এ কথা ভুলিলে চলবে কেন? আমারাও এই বিশ্বাসে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ গ্রাহকগণের নিকট ভিঃ পিঃ করিতে এ পর্য্যন্ত কুণ্ঠা বোধ

* হিন্দু-সমাজপত্র ও মাসিক সমালোচনা তিশূল কি বলেন।

করি নাই। কিন্তু পুঁঠিয়ার এই ঘটনায় আমারা নূতন শিক্ষা পাইয়াছি তাই আজ সামান্য বিষয়ের জন্য আমাদের গ্রাহকবর্গকে বিনীত নিবেদন জানাইতে বাধ্য হইলাম। যেন গ্রাহক মাত্রেরই স্মরণ থাকে, এই পত্রিকা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, ইহার সমস্ত আয় দরিদ্র ও অনাথ নারায়ণ-সেবায় ব্যয়িত হয়। ইহার একটী পয়সাও অনর্থক নষ্ট না হয়, সেজন্য শিক্ষিত ও সজ্জন গ্রাহকগণের সতর্ক দৃষ্টি প্রার্থনীয়। অতএব ভিঃ পিঃ গ্রহণে আপত্তি থাকিলে চৈত্র মাসের মধ্যে আমাদিগকে অবশ্য জানাইবেন, ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

উপসংহার কালে আমাদের সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এই দুর্দ্দিনের কথা বিস্মৃত না হইয়া "আর্য্য-দর্পণকে" সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য ও সহানুভূতি করিতে পশ্চাৎপদ না হন। আর্য্য-দর্পণের গ্রাহকগণ যেমন একদিকে সাধুভক্তের অমৃতময়ী লেখনীর মধুরাস্বাদে তৃপ্ত হইবেন; তেমনই তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থে অন্যদিকে দরিদ্র নারায়ণ-সেবার পুণ্য সঞ্চয় করিবেন। যেন স্মরণ থাকে, আপনাদের অনুগ্রহের উপরেই আর্য্য-দর্পণের উন্নতি ও স্থায়ীত্ব নির্ভর করিতেছে। এই দুর্ব্বৎসরে আপনারা ত গ্রাহক থাকিবেনই, অধিকন্তু বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে ইহার যথাসাধ্য প্রচার এবং গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া—যাহাতে ইহার লোপ না হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবেন। আশা করি, কোন গ্রাহকই আমাদিগের এই অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না। কিমধিকং বিস্তারেণ;—

বিনীত-

কর্ম্মকর্ত্তা—"আর্য্য-দর্পণ"

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

বার্ষিক উৎসব—আগামী বৈশাখ মাসের—শুক্লপক্ষীয় অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে অত্র সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তি-আশ্রমের ১০ম বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইবে; তদুপলক্ষে ঐ দিন শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের আবাহন ও অর্চ্চনা,—চতুর্থী তিথিতে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও আলোচনা এবং পঞ্চমী তিথিতে জগদ্গুরু শ্রীমৎ ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে সারস্বত মঠের তদীয় আসনে তাঁহার পূজা, আরত্রিক, হোম ও বেদপাঠাদি হইবে; সমস্ত দিন ব্রহ্মনাম-যজ্ঞ এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবা, পূজা হইবে। এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমারা সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ এবং আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছি।

—:0:—